নেদায়ে তাওহীদ

আবু উমার আল-মুহাজির
মুফতী, মুহাদ্দিস, গবেষক, অনুবাদক
পরিচালক : মাদরাসাতুশ্ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম তাকাব্বালাহুল্লাহ
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

আল-মুহাজিরূন পাবলিকেশন্স

নেদায়ে তাওহীদ

আবু উমার আল-মুহাজির
মুফতী, মুহাদ্দিস, গবেষক, অনুবাদক
পরিচালক : মাদরাসাতুশ্ শাইখ আব্দুল্লাহ আয্যাম তাকাব্বালাহুল্লাহ
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায়

আল-মুহাজিরুন পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ:

নভেম্বর ২০১৮ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশঃ

এপ্রিল ২০১৯ ইং

বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ

আল-ইহদা

এক. আমার শ্রদ্ধেয় বাবার জন্য। যিনি আমার দ্বারা দুনিয়া অর্জনের ফিকির না করে 'কিশোর আমাকে' সেই নব্বইর দশকে দেশের শীর্ষস্থানীয় এক কওমী মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে ছিলেন। শিক্ষা জীবনে তো উত্তমরূপে আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছেনই, কর্ম জীবনেও আমার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন। ফলশ্রুতিতে, দুনিয়ার পেরাশানী থেকে মুক্ত হয়ে দ্বীনের পথে চলা এবং দ্বীনের কাজ করা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য আসান করে দিয়েছেন।

বিগত বছরাধিক কাল যাবত আমার বাবা অসুস্থ। এখন বিছানাই তাঁর ২৪ঘণ্টার সঙ্গী। পার্শ্বপরিবর্তনের জন্যও আরেক জনের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রিয় পাঠক! আপনার কাছে দুআর নিবেদন, যেন আল্লাহ তাআলা আমার বাবাকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন এবং যেন তিনি সহীহ ঈমান ও বিশুদ্ধ তাওহীদ নিয়ে তাঁর রবের সাথে মিলিত হতে পারেন।

দুই. ঐ সব মুজাহিদ ভাইদের জন্য যারা পৃথিবীর এই কঠিনতম পরিস্থিতিতে বিরোধীদের বিরোধিতা এবং নিন্দুকদের নিন্দা উপেক্ষা করে অতি সংগোপনে রব্বে কারীমের ভালবাসায় দ্বীন ও উম্মাহর জন্য নিজেদের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ ও জান-মাল কুরবান করে যাচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যে রব্বে কারীমের সান্যিধ্যে চলেগেছেন, আর কেউ যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মেহনত এবং শাহাদাতকে কবুল করেন। আমাদেরকের তাদের পদাংক অনুসরণের তাওফীক দান করেন। আমীন।

আবু উমার আল-মুহাজির
মার্চ-২০১৯ইং

দ্বিতীয় প্রকাশনের শুরুর কথা

আলহামদুলিল্লাহ। তাওহীদ ও জিহাদ বিষয়ক সংকলন 'তাওহীদের আহবান' পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কিতাব ছাপার দু'মাসের মাথায় স্টক ফুড়িয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে কিতাবটি পুনরায় প্রকাশের আবেদন জানানো হচ্ছিল। কিন্তু বিষেশ কিছু জটিলতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বর্তমানে পরিস্থিতি অনুকূল থাকায় আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার রহমতে আপনাদের পরিচিত **'তাওহীদের আহবান'কে-ই এবার 'নেদায়ে তাওহীদ'** নামে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। নিরাপত্তাজনিত বিশেষ কারণে কিতাবের প্রচ্ছদ, নাম ও লেখকের নাম-ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া দালিলিক আলোচনাও আগের তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মাসায়েলে আরবাআ' নামক বিশেষ সংকলন থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা 'মাসায়েলে আরবাআ' সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্বীনের ই'লা ও বুলান্দীর জন্য কবুল করেন। তাছাড়া 'আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাই কিতাবের পরিসর আগের তুলনায় বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে। আর দারুল হারবে জুমআ বিষয়ক মাসআলাটি এড়িয়ে গিয়েছি।

প্রিয় পাঠক! কিতাবটি নিজে সংগ্রহ করুন, পড়ুন এবং আরেকজনকে এক কপি হাদিয়া দিন। আখেরাতের সম্বল মনে করে দেশময় কিতাবটি ছড়িয়ে দিন।

এই কিতাব আল্লাহ সুবহানাহুর জন্য ওয়াকফ করা হল। পৃথিবীর যেকোনো মুসলিম ভাই কোনো রকম পরিবর্তন–পরিবর্ধন ছাড়া এই কিতাব ছেপে কিংবা ফটোকপি করে বিতরনের অধিকার রাখে। আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে ব্যাপকভাবে কবুল করেন। উম্মতের জাগরনের ওসীলা বানান। আমীন।

আবু উমার আল-মুহাজির

মার্চ-২০১৯ ইং

প্রথম প্রকাশের শুরুর কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم ، أما بعد :

মানুষ নামের দু'পেয়া হায়েনা ও নেকড়ের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, ক্ষতবিক্ষত, রক্তাত্ব এক 'শরীরের' নাম মুসলিম উম্মাহ। বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত এক মানবগোষ্ঠীর নাম মুসলিম উম্মাহ। ক্ষুধার্ত, দুর্বল, সহায়-সম্বলহীন, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদকৃত এক জনগোষ্ঠীর নাম আজ মুসলিম উম্মাহ। একবিংশ শতাব্দিতে দাঁড়িয়ে আমাকে অতি কষ্টের সাথে সেই জাতির উত্তরসূরীদের নির্মম চিত্র তুলে ধরতে হচ্ছে যাদের পূর্বসূরীগণ অতিঅল্প সময়ে খুব সামান্য রণসামগ্রী নিয়ে তখনকার দুই সুপার পাওয়ার কায়সার-কেসরার গর্ব-অহংকার ধুলিস্মাৎ করে দিয়েছিলেন। রোম-পারস্যের রাজপ্রাসাদে কালিমা খচিত পতাকা উড়িয়েছিলেন। খুব সামান্য সময়ের ব্যবধানে যারা অর্ধ পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে আদল ও ইনসাফের চাষাবাদ করেছিলেন। যে ভূমিতে অমুসলিমরাও শতভাগ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করত। যেখানে ছিল না কোনো জুলম, অন্যায়, অনাচার। ছিল না কোনো হাহাকার ও আর্তচিৎকার। ছিল শুধু শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নতি, অগ্রগতি ও নিরাপত্তা। আর ছিল শুধু প্রাপ্তি ও তৃপ্তি।

কিন্তু হায়! মুসলিম উম্মাহর এই চিত্র আজ অতীত স্মৃতিকথা। এসবই রূপকথার গল্পের রূপ ধারণ করেছে। নির্মম বাস্তবতা তো ওটাই যার চিত্র আমরা অংকন করেছি। আজ মুসলমান জাতিই পৃথিবীর সবচাইতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত এক জাতি। সমস্ত অমুসলিম জাতি আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নামে বিভিন্নভাবে একতাবদ্ধ হচ্ছে। মুসলিমদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পাঁয়তাড়া করছে। কিন্তু মুসলিমদের এ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। নেই কোনো অনুভব-অনুভূতি। তারা শত শত দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছোড়াছুড়িতে ব্যস্ত। প্রত্যেক দলই নিজেকে হক্কানী দাবি করে অন্যদেরকে না-হক বলে প্রত্যাখ্যান করছে। কেউ 'তাওহীদের' ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছে না।

এহেন পরিস্থিতিতে এমন কিছু মৌলিক নীতিমালার আলোচনা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে যার ভিত্তিতে প্রত্যেক মুসলিমই নিজেকে ও নিজের ঈমানকে যাঁচাই করার সুযোগ পাবে। প্রত্যেকেই এ কথা যাঁচাই করে দেখতে পারবে যে, সেকি 'মুক্তি প্রাপ্ত একটি দল' আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মধ্যে রয়েছে নাকি

সে নিজের লালনকৃত আকীদা ও পালনকৃত মানহাজের কারণে মুক্তি প্রাপ্ত দল থেকে বের হয়ে, নিজের অজান্তেই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে। এই ছাকুনির মাধ্যমে যারা প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ প্রমাণিত হবে, তারা যেন মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ঈমান ও তাওহীদের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, মুসলিমদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠনকারী আল্লাহর শত্রু কাফের-মুরতাদ ও তাদের দোসরদেরকে তাদের যথোচিত পাওনা বুঝিয়ে দিতে পারে, সে জন্য আমাদের এই সামান্য প্রয়াস।

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের সমস্ত অবস্থা আমার উম্মতের উপর হুবাহু আপতিত হবে। এমনকি বনী ইসরাঈলের কেউ যদি তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন কেউ থাকবে যে ঐ কাজ করবে। নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এক দল ছাড়া সবদলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি হে আল্লাহর রাসূল? নবীজী সা. বললেন, 'মা-আনা আলাইহি ওয়াআসহাবী'/ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে আকীদা-মানহাজ এর উপর আছি, যারা তার উপর থাকবে কেবল তারাই মুক্তি পাবে।" (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং-২৬৪১, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের)

মুসলিম উম্মাহর চলমান বাস্তবতা এই হাদীসটির সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। মুসলিম উম্মাহ দ্বীন ও ধর্মকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে তেহাত্তরেরও অধিক ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, এই দলগুলোর মধ্য থেকে যে দলটি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজ তথা নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ঈমান-আকীদা এবং কর্মপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে শুধু তারাই মুক্তি পাবে। এই হিসাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দলটিকে 'আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' বলা হয়। কারণ, যারা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' শুধু তারাই বাস্তবিক ও সঠিক

অর্থে নবীজী সা. ও এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা মানহাজের উপর আমল করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে শুধু তারাই সত্যের মাপকাঠি মনে করে থাকে। জামা'আতুস সাহাবার অনুসরণ মূলত তারাই করে থাকে।

যে বা যারাই নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর পোষণকৃত ঈমান-আকীদা ও কর্মপন্থা থেকে সরে দাঁড়াবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। এ কথা সবার উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। আহলুসসুন্নাহ দাবিদারও কেউ যদি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজ থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আহলুসসুন্নাহ থেকে বের হয়ে আহলুন্নার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

পূর্ণাঙ্গরূপে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজ অনুসরণ করা ব্যতীত আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মধ্যে শামিল হওয়ার কোনো উপায় নেই। আমরা যারা নিজেদেরকে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকি তাদের খুব সতর্কতার সাথে যাঁচাই-বাছাই করে দেখা উচিত যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত কিনা? আমরা বাস্তব জীবনে যে আকীদা-মানহাজ মেনে চলছি তা প্রকৃতপক্ষে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজ কিনা? আমরা নিজেদের অলক্ষ্যেই এমন কোনো আকীদা-মানহাজ লালন করতে শুরু করছি না তো যা আমাদেরকে আহলুসসুন্নাহ থেকে বের করে আহলুন্নার এর অন্তর্ভুক্ত করে দিবে?

জাহান্নাম থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বারবার এই বিষয়টি যাচাই করে দেখতে হবে যে, আমি বর্তমানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে আকীদা লালন করছি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. সেসব বিষয়ে এই আকীদা লালন করতেন কিনা? আমি যেভাবে দ্বীন পালন করছি এবং দ্বীন কায়েমের জন্য যে পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম সেভাবে দ্বীন পালন করেছেন কিনা এবং আমার গৃহিত পন্থায় তাঁরা দ্বীন কায়েম করেছেন কিনা? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হা-বাচক হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত। আর যদি না-বাচক হয়, তাহলে এখন থেকেই সর্তক হওয়া উচিত। নিজের আখেরাতের স্বার্থেই নিজেকে পরিবর্তন করা উচিত। আমার পোষণকৃত আকীদার যতটুকু ভুল ততটুকু বাদ দিয়ে সহীহ আকীদা আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দ্বীন পালন ও কায়েমের পথে আমার অনুসৃত মানহাজ বা কর্মপন্থার সাথে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরামের মানহাজ ও কর্মপন্থার যতটুকু অমিল রয়েছে ততটুকু

পরিবর্তন করে আমাকে শতভাগ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজকে আঁকড়ে ধরতে হবে। দ্বীন পালন ও দ্বীন কায়েমের সর্ব স্তরে, সর্বক্ষেত্রে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ই আমার মডেল ও আদর্শ বলে বিবেচিত হবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে 'মাসূর' তরীকা থেকে সরে গিয়ে কাফের ফাসেকদের আবিষ্কৃত, কিংবা নিজেদের উদ্ভাবিত নতুন কোনো পথ ও পন্থা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে এই উম্মাহর প্রথম অংশ যে তরীকায় মেহনত করে সফল হয়েছে, শেষ অংশও একই তরীকায় মেহনত করে সফল হবে। আকীদা-মানহাজের ক্ষেত্রে কারো সাথে কোনো শিথীলতার আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ, আকীদা-মানহাজের উপরই এই উম্মাহ একতাবদ্ধ হবে। তাই আমাদের আকীদা-মানহাজ এমন স্বচ্ছ-শুভ্র হওয়া লাগবে নবীজী সা. যেমন স্বচ্ছ-শুভ্র রেখে গিয়েছিলেন। কাল ও মহাকালের পরিবর্তন ও বিবর্তনে অনেক কিছু পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আকীদা-মানহাজ পরিবর্তন হতে দেয়া যাবে না, এর পরিবর্তন মেনে নেয়া যাবে না। আকীদা-মানহাজের বিষয়টি এতই স্পর্শকাতর যে, নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজ থেকে আমরা সামান্য একটু সরে দাঁড়ালেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের ধ্বংস আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

বক্ষমাণ গ্রন্থে আমরা শরীয়তের দলীলের আলোকে আহলুসসুন্নাহওয়াল জামাআহ এর এমন কিছু আকীদা-মানহাজ নিয়ে আলোচনা করব, যে আকীদা-মানহাজকে এদেশের প্রকৃত আহলুস সুন্নাহদাবিদার এবং আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্বকারীগণও আজ ভুলতে বসেছে এবং উপেক্ষা করতে শুরু করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে নিজেকে যাচাই করত নবীজী সা. এর রেখে যাওয়া স্বচ্ছ-শুভ্র আকীদা-মানহাজের দিকে ফিরে যাওয়ার তাওফীক দান করেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে ও অন্যদেরকে বাঁচানোর তাওফীক দান করেন। আমীন।

বক্ষমাণ গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় 'দাওয়াহ ইলাল্লাহ' ফোরামে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের লেখা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তাদের নাম আমার জানা নেই। তাই লেখাগুলোকে তাদের সাথে সম্পর্যুক্ত করতে পারিনি। তবে দুআ করি যাদের লেখা থেকে উপকৃত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা যেন দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

কিতাবটি প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রিয়জন বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। কেউ বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে, কেউ শ্রম দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে 'দাওয়াত ও জিহাদে'র জন্য কবুল করুন। শাহাদাতের নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করুন। সহীহ ঈমান নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আবু উমার আল-মুহাজির

অক্টবর-২০১৮ ইং

সূচিপত্র

ঈমান ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

চার মাযহাবের ফকীহগণের ফতওয়া

কিয়াস থেকে দলীল

প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল

বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

জ্বিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাওহীদ বাস্তবায়ন করা

আল্লাহ তাআলা জ্বিন ও মানব সৃষ্টি করেছেন নিরংকুশভাবে তাঁর ইবাদত করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }

'আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি শুধুই আমার ইবাদতের জন্য'। তাফসীর কারকগণ বলেছেন, এখানে ইবাদাতের অর্থ হল, তাওহীদ। অর্থাৎ মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদ বাস্তবায়ন করার জন্য (তাফসীরে কুরতুবী, যারিয়াত:৫৬, তাফসীরে সমরকন্দী, সূরা যারিয়াত:৫৬)। অতএব, আমরা বিশ্বাস, কর্ম ও কথা সবদিক থেকেই তাওহীদ বাস্তবায়নের জন্য আদিষ্ট। আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাওহীদের দাবি মেনে চলতে এবং তাওহীদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে আদিষ্ট। তাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে আলমী জীবন সর্বত্রই তাওহীদের দাবি মেনে চলতে হবে এবং তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাওহীদের দাবি বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আমরা কেউই আল্লাহর বান্দা হতে পারব না এবং আমাদের দ্বারা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে না। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি আমাদের দ্বারা অর্জিত না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এক ভয়ানক অশুভ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গতানুগতিকভাবে আমি আমার জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু আমার ঈমান ও তাওহীদ সহীহ হচ্ছে কিনা সেটা একটিবারের জন্যও ভেবে দেখার সুযোগ হল না, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য ও আফসুসের কথা আর কী হতে পারে!

তাওহীদকে আঁকড়ে ধরার উপর ঈমানের শুদ্ধতা নির্ভর করে। তাই তাওহীদকে জানতে হবে, তাওহীদকে মানতে হবে। যার দ্বারা তাওহীদের কোনো দাবিই আদায় হয় না, যে অহরহ তাওহীদ পরিপন্থী কাজ করে বেড়ায়, সে নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও আসলে সে মুসলিম নয়, সে দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামাযসহ তাহাজ্জুদ পড়লেও মুমিন বলে গণ্য হবে না। তাই তাওহীদ জানা ও মানা একটি অপরিহার্য বিষয়। তাওহীদের ইলম অর্জন করা ফরযে আইন। এ ফরযের প্রতি কোনোরূপ অবহেলা করার সুযোগ নেই। তাই আসুন তাওহীদ জানি, তাওহীদ মানি এবং ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে শুরু করে সর্বত্র তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করি।

তাওহীদের পরিচয় ও প্রকারভেদ

তাওহীদের অর্থ হল, আল্লাহ তাআলাকে তাঁর যাবতীয় হকসহ পৃথক করা, আল্লাহ তাআলার গুণাগুণগুলো আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্ধারণ করা, অন্য কাউকে আল্লাহ তাআলার কোনো গুণ বা কর্মের মধ্যে শরীক না করা।

আহলে ইলমগণ তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন:

১. তাওহীদুররুবূ বিয়্যাহ: অর্থাৎ রব হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ/একত্ববাদকে স্বীকার করা। রুবূবিয়্যাত এর ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। যেমন, আসমান-যমীনের অধিপতী হিসাবে আল্লাহ তাআলাকে মেনে নেয়া। রাযেক, খালেক, মালেক, জীবনদানকারী, মৃত্যুদানকারী হিসাবে আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করে নেয়া; এসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। অতীতের অনেক কাফের সম্প্রদায়ও তাওহীদের এই প্রকারকে স্বীকার করত। তখনকার মক্কার মুশরিকরাও এই প্রকারের তাওহীদকে স্বীকার করত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} [يونس:৩১].

'তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো তারপরেও ভয় করছ না?' (সূরা ইউসুফ:৩১)

বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে, তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহকে স্বীকার করা।

তাগুত বর্জন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না

২. তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ: অর্থাৎ ইলাহ বা ইবাদাতের যোগ্য ও হুকুমদাতা হিসাবে শুধু আল্লাহকে স্বীকার করা। ইবাদাতমূলক যত কর্ম-কাণ্ড রয়েছে সব একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা, কোনো ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করা। হুকুমদাতা হিসাবে আল্লাহকে মানা, আল্লাহর হুকুমের সংঘর্ষিক অন্য কারো হুকুম না মানা। যেমন; দুআ করতে হলে শুধু আল্লাহর কাছেই দুআ করা, ভয় শুধু আল্লাহকেই পাওয়া, আশা শুধু আল্লাহ তাআর দরবারেই করা। হুকুম ও হুকুমাত শুধু আল্লাহরই মানা। ইরশাদ হচ্ছে,

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }

'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঐ প্রভূর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (আল বাকারা:২১)

মূলত: এই প্রকারের তাওহীদের দাওয়াত নিয়েই আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে আ. দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاعْبُدُونِ }

'আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।' (আল-আম্বিয়া:২৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ }

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত বর্জন কর।' (নাহল:৬)

কালিমার রুকন

তাওহীদের এই প্রকারই তখনকার মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল। আর এই তাওহীদকে অস্বীকার করার কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা মূলত এই তাওহীদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মধ্যে দুইটি বিষয় রয়েছে। এক. লা-ইলাহা (কোনো উপাস্য নেই) বলে আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয় তাদের সকলকে অস্বীকার করা হয়েছে। দুই. ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত) দ্বারা যাবতীয় ইবাদাতকে শুধু আল্লাহর জন্য স্বীকার করা হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে। অস্বীকার করা এবং স্বীকার করা **এই দুইটি হল কালিমার রুকন**। অস্বীকার ব্যতীত স্বীকার ধর্তব্য নয়, এমনিভাবে স্বীকার ব্যতীত অস্বীকারও গ্রহণযোগ্য নয়। এই কথাটাই আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন আয়াতে আরো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত হচ্ছে,

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

‘দ্বীন কবুলের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করবে এমন সুদৃঢ় হাতল যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।’ (বাকারা:২৫৬)

পূর্বে বর্ণিত সূরা নাহল এর ৩৬ নং আয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ইবাদাত করতে বলেছেন। সূরা যুমার এর ১৭ নং আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

‘যারা তাগুতের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, অতএব, আপনি আমার বান্দাকে সুসংবাদ দিন।’

এসব আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হল, সহীহ ঈমান গ্রহণের জন্য তাগুতের ইবাদতকে অস্বীকার করে শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদাতকে স্বীকার করতে হবে। কেউ যদি আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না করে, তাহলে সে ঈমানদার বলে বিবেচিত হবে না। এখন প্রশ্ন হল ‘তাগুত’ কী? তাগুত কাকে বলে? তাগুত এবং তাগুতের ইবাদাত অস্বীকার করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা কী বুঝিয়েছেন?

তাগুতের সংজ্ঞা

ইমাম তবারী (রহ.) তাগূতের সংজ্ঞায় বলেন:

والصواب من القول عندي في"الطاغوت"، أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أو شيطانا، أو وثنا، أو صنما، أو كائنا ما كان من شيء.

‘আমার মতে তাগূতের সঠিক সংজ্ঞা হল: সেই হল তাগুত যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তাআলাকে ব্যতিরেকে তারই উপসনা করা হয়, হয়ত তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন বস্তু। [তাফসীরে তবারী, খণ্ড:৩, পৃষ্টা:২১]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাগূতের ব্যাখ্যায় বলেন:

....

الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ، أو يعبدونه من دون الله ، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله ، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله (إعلام الموقعين ৫০/১).

তাগুত হল: উপাস্য, অনুসরণীয় কিংবা মান্যবরদের মধ্য থেকে যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা হয় (এবং সে এর উপর রাজি থাকে)।

সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাগুত হল সেই ব্যক্তি, লোকেরা আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রর্থনা করে, আল্লাহ তাআলাকে ছেড়ে যার উপাসনা করে অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের (বিধানের) প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যার আনুসরণ করে বা এমন বিষয়ে তার আনুগত্য করে যে বিষয়ে তারা জানে না যে, এটাই আল্লাহর আনুগত্য। [ই'লামুল মুআক্কিয়ীন, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৫০]

তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা যা বুঝাগেল

তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূলের বিপরীত যার কাছে বিচার প্রর্থনা করা হয়, আল্লাহ তাআলা ব্যতিরেকে যার উপাসনা করা হয়, আল্লাহর অবাধ্যতায় যাকে মান্য করা হয় সেই তাগুত। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই অর্থে তাগুত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রর্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে। ' (সূরা-নিসা, আয়াত:৬০)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

هذا إنكار من الله، عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب

الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين، ممن أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا؛

'এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের উপর ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের উপর যা অবর্তীণ করেছেন সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ সে বিবাদমান বিষয়াদিতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহকে ছেড়ে ভিন্ন কোন কিছুর কাছে বিচার ফায়সালা চায়। এ আয়াতের সাবাবে নুযূলে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, একজন আনসারী ও একজন ইয়াহুদী পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। ইয়াহুদী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে মুহাম্মাদ। আনসারী বললো: তোমার ও আমার মাঝে ফায়সালা করবে কা'আব বিন আশরাফ। আরো বলা হয়ে থাকে: আয়াতটি অবর্তীণ হয়েছে এমন একদল মুনাফিকের ব্যাপারে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম জাহের করতো আর জাহিলিয়্যাতের বিধান দিয়ে ফায়সালাকারী বিচারকদের কাছে বিচার প্রর্থনার ইচ্ছা পোষন করতো। কেউ আবার অন্য মত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত আয়তটি এ ধরনের সকল ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক। কেননা আয়াতটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে তিরষ্কার করছে, যে কুরআন সুন্নাহ থেকে ফিরে যায় এবং এ দুটি ব্যতিরেকে অন্য কোন বাতিলের কাছে বিচার প্রর্থনা করে। [আর যার কাছে বিচার প্রর্থনা করে] এ আয়াতে তাগুত দ্বার সেই উদ্দেশ্য। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:২,পৃষ্ঠা:৩৪৬]

আয়াতটি স্পষ্ট করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বিধানকে পিছনে ফেলে ভিন্ন কোন বিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করে সে তাগুত। আর যারা এখানেই ক্ষ্যান্ত থাকেনা বরং মহান রবের বিধানগুলোকে পরিবর্তন করে নিজেরাই বিধান রচনা করে, রাষ্ট্রে সে বিধানই বাস্তবায়ন করে, আল্লাহর বান্দাদেরকে সে বিধান মানতে বাধ্য করে। তার বিধান না মেনে আল্লাহ তাআলার বিধান মানলে শাস্তি প্রদান করে। তাদের ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকগণ কি বলবেন?! তারা কি তাগুত না কি আকবারুত তাওয়াগীত?!!

মোট কথা, তাগুতের সংজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝা গেল যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয়, আল্লাহর বিপরীতে যাদেরকে মান্য করা হয় তারাই তাগুত। যেমন: মূর্তী, কাহেন (ভবিষ্যৎবক্তা), দরবারী আলেম যে নিজের

ইলম দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে এবং এমন সব শাসক ও বিচারক যারা কুরআন-সুন্নাহর আইনের বিপরীত বিচার-ফায়সালা করে। মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী আইন মানতে বাধ্য করে। সূদের প্রচলন ঘটায়। মদ ও যিনার লাইসেন্স দেয়। কুরআনে বর্ণিত দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। বরং কুরআন-সুন্নাহর আইনকে মধ্যযুগীয় বরবর আইন বলে তামাশা করে। এদের প্রত্যেকে তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। সহীহ ঈমানের জন্য যেহেতু তাগুতকে বর্জন করা শর্ত তাই উপরিউক্ত সব ধরণের তাগুত থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের বিরোধিতা করতে হবে, তাদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না যা দ্বারা বুঝে আসে যে আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট, বরং স্পষ্ট ভাষায় তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিতে হবে যেমন ঘোষণা দিয়েছিলেন জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আ.। ইরশাদ হচ্ছে:

{ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ } [الممتحنة : 8]

‘তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। ’ (মুমতাহিনা:৪)

দ্বীন-ইসলামের হাকীকত

এই প্রকারের তাওহীদ তথা তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ-ই হল দ্বীন-ইসলামের হাকীকত। সব প্রকারের তাগুতকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করাই এই তাওহীদের শিক্ষা। নবীজী সা. এই তাওহীদেরই প্রচার করে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এই তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাগুতকে বর্জন করে, জাহেলী শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের ঘোষণার কারণেই মূলত তখনকার মক্কার মুশরিকরা নবীজী সা. এবং সাহাবা রাযি. এর উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে ছিল। আজও যদি কেউ কালিমাকে ঐ অর্থে বুঝে যে অর্থে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বুঝে ছিলেন, ঐ তাওহীদ গ্রহণ করে যে তাওহীদ সাহাবা রাযি. গ্রহণ করে ছিলেন, তাহলে তার হালতও ঠিক তেমনি হবে যেমন হয়ে ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর হালত।

তাবলীগী ভাইদের কাছে আবেদন

তাবলীগী ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা কালিমার আলোচনার সময় কালিমার রুকন নিয়ে আলোচনা করুন। আপনাদের কালিমার আলোচনা শুধু তাওহীদুর রবূবিয়্যাহকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। তাওহীদুল উলূহিয়্যার ব্যাপারে আপনারা কোনো কথাই বলেন না। অথচ তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বা তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া, তাগুতের বিরোধিতা করা ব্যতীরেকে ঈমান পরিশুদ্ধ হবে না, গ্রহণযোগ্য হবে না, এই বিষয়টি আপনারা বয়ানের মধ্যে বলুন এবং তাগুত বর্জনের ঐরূপ ঘোষণা দিন যেরূপ ঘোষণা হযরত ইবরাহীম আ. দিয়েছিলেন।

তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ এর দাওয়াত দেওয়া ছাড়া নবীওয়ালা কিংবা সাহাবাওয়ালা কাজের দাবি করা বোকামি বৈ কিছু নয়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কালিমার দাওয়াত দিয়ে কাফের কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হতেন, কিন্তু আপনারা এখন দারুল হরবে গিয়েও কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন অথচ আপনাদেরকে কিছুই বলা হচ্ছে না! এর রহস্য কী জানেন? আপনারা ঐ তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন না যে তাওহীদের দাওয়াত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দিয়েছেন। আপনারা কালিমাকে ঐ অর্থে বুঝছেন না যে অর্থে সাহাবায়ে কেরাম বুঝে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যে তাওহীদের বিশ্বাস লালন করতেন আপনারা সেই বিশ্বাস লালন করেন না। অতএব, যদি এমন ঈমান চান যে ঈমান আপনাকে পরকালে মুক্তি দিবে, তাহলে তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাগুতের বিরোধিতা করতে হবে, তাগুতকে ধ্বংসের জন্য দাঁড়াতে হবে। তাগুতকে বর্জন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

৩. তাওহীদের তৃতীয় প্রকার হল, তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত: অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বিষেশ নামসমূহ এবং গুণসমূহ যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। এখানেও দু'টি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

১. কুরআন-সুন্নাহর ভিতর আল্লাহর যত আসমা ও সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে তা সব যথাযথভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করাএবং স্বীকার করা ২. সাদৃস্যতাকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ কোনো কিছু বা কেউ আল্লাহ তাআলার মত হতে পারে- এটাকে অস্বীকার করা। “কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর অন্তর, চোখ, হাত ইত্যাদি মর্মে যেসব আয়াত ও হাদীস পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, এগুলো সব আল্লাহ তাআলার সিফাত। আল্লাহ তাআলার শান মোতাবেক এই সিফাতগুলো তার জন্য সাব্যস্ত।”

কালিমায়ে তাওহীদ এই তিন প্রকারের তাওহীদের সমন্বয়ের নাম। কেউ কালিমা পড়ে, নিজেকে মুসলিম দাবি করে কিন্তু এই তিন প্রকারের তাওহীদের কোনো এক প্রকারকে অস্বীকার করে, অথবা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে মূলত মুসলিম নয়, মুমিন নয়, বরং সে কাফের, মুশরিক। তার ঈমান তাকে আখেরাতে মুক্তি দিবে না। দুনিয়াতেও সে ঐ আধূরা ঈমানের কারণে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: আকীদাতুত তায়েফাতুল মানসূরাহ পৃ.২-৬)

শিরক

তাওহীদের আলোচনার পাশাপাশি তাওহীদের বিপরীত বিষয় শিরক এর আলোচনা না করা হলে আলোচ্য বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আমরা এখানে শিরকের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

শিরকে সংজ্ঞা ও প্রকারসমূহ

শিরকের সরল সংজ্ঞা হল, গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তাআলার কোনো বৈশিষ্টের মধ্যে শরীক করা।

শিরক প্রধানত দুই প্রকার: ১. শিরকে আকবার ২. শিরকে আসগার।

১. শিরকে আকবার: এমন শিরক যে শিরককারীকে আল্লাহ তাআলা তাওবা ছাড়া কখনো ক্ষমা করবেন না। বরং সে যদি শিরকে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তাকে চিরকাল জাহান্নামের আগুনে রেখে দিবেন। ইরশাদ হচ্ছে,

{ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } [النساء : ৪৮] ، وقال تعالى : { إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ }

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না, তবে শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দেন।' (নিসা:৪৮) আরো ইরশাদ হচ্ছে, 'যে আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করবে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম।' (মায়েদা:৭২)

শিরকে আকবার মৌলিকভাবে চার প্রকার:

১. দুআর মধ্যে শিরক করা: আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে (যেমন, মাজার, পীর ইত্যাদির কাছে) দুআ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

: { وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ }

'যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য এমন উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।' (আল মুমিনূন:১১৭)

শাইখ, উস্তাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ নয়

২. শিরকের দ্বিতীয় প্রকার হল, আনুগত্যের মধ্যে শিরক করা: অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় পীর, ধর্মগুরু, শাসক, উলামায়েসূ বা এজাতীয় অন্য কাউকে মান্য করা। কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হুকুম স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের পীর, শায়েখ,শাসক বা ধর্মগুরুর আনুগত্য করত ঐ হুকুম পালন না করা। যেমন কারো কাছে কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হল যে, বর্তমানে তার উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু তার পীর/শাইখ, উস্তাদ বা শাসক তাকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছে এবং তাকে জিহাদের পথে অগ্রসর হতে নিষেধ করছে। এমতাবস্থায় এই লোকটি যদি পীর/শাইখ বা শাসকের কথামত জিহাদ পরিত্যাগ করে, জিহাদের পথে অগ্রসর না হয়, তাহলে সে আল্লাহর হুকুমের উপর পীর, শাইখ বা শাসকের কথাকে প্রাধান্য দিল এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করল। তখন এই ব্যক্তির দ্বারা আনুগত্যের মধ্যকার শিরক পাওয়া গেল। ফলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুশরিকে পরিণত হল। আল্লাহ তাআলা খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলছেন,

اِتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

'তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়ে ছিল শুধু মাত্র এক ইলাহ্‌র ইবাদতের জন্য, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তারা যে শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র। [সূরা তাওবা: ৩১]

উপরোক্ত আয়াতটি থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি জিনিষ বুঝে আসে না যে কী ভাবে– **"তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে।"** অথচ তারা তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করত না ও তাদের ইবাদতও করত না। বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে স্বীকার করত ও তাঁরই ইবাদত করত।

হাদীস শরীফে এসেছে ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন:

عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم.

'আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি গলায় একটি ক্রুশ ঝুলন্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলে তিনি বললেন, হে আদী! এই মূর্তিটি তুমি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। ফলে আমি তা খুলে ফেললাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকটে এসে দেখতে পেলাম, তিনি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছেন: **"তারা আল্লাহ ব্যতিরেকে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে রবরূপে গ্রহণ করেছে"** আমি বললাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করত আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করত আর তোমরাও তাকে হালাল ভাবতে? আমি বললাম, হ্যাঁ এমনটিই হত। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত। [তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী ৭ম খণ্ড ৪৭১ নম্বর হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৩০৯৫; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২/২১৮,২১৯; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০, সনদ: হাসান সহীহ)]

সূরা আহযাবে ইরশাদ হচ্ছে,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا . وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا . رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا .

'যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে; সেদিন তারা বলবে, হায় আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম!

তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন।' (সূরা আহাযাব:৬৬-৬৮)

প্রিয় পাঠক! নিজেকে নিয়ে ভেবে দেখুন। উপরিউক্ত আয়াতগুলো আপনার উপর প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে না তো?! শরীয়তের কোনো হুকুম স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝার পরও শুধু শাইখ, উস্তাদ,পীর বা শাসকের মান্যতার বাহানা দিয়ে ঐ হুকুমটিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন না তো? জেনে রাখুন 'সৃষ্টি কর্তার অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের কথা মান্য করা হারাম।' আল্লাহ তাআলা আপনাকে সুস্থ বুদ্ধি দিয়েছেন এবং চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও দিয়েছেন, আর চিন্তা-ফিকির করার হুকুমও দিয়েছেন, তথাপি স্পষ্টরূপে আল্লাহর অবাধ্যতায় পীর/ শাইখের আনুগত্য করছেন কেন? নিজের ঈমানকে হেফাজত করুন। নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। যে শাইখ বা পীরের কথায়/ অপব্যাখ্যার ফাঁদে পড়ে আপনি আজ আল্লাহর হুকুম পালন থেকে বিরত রয়েছেন, যে শাসকের দোহাই দিয়ে আপনি আল্লাহর হুকুম পালনে দ্বিধা করছেন, কাল কিয়ামাতের ময়দানে তারা আপনার কোনো কাজেই আসবে না। অতএব, উঠুন সব সংশয় ঝেরে ফেলে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য 'দাওয়াত ও জিহাদে'র পথে অগ্রসর হোন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। তাওফীক দান করুন।

শাইখ, উস্তাদ বা পীরের অন্ধ অনুসরণ কখনো কাম্য নয়। তারা কেউ শরীয়ত প্রণেতা নয় যে, তারা যা বলবে তা শরীয়তের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মানতে হবে। তারা যদি এমন কোনো কথা বলে যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে আপনার খটকা লাগে, তাহলে তার কাছে দলীল দাবি করুন। দলীল পেশ করার পরও যদি আপনার অন্তর আশ্বস্ত না হয়, তাহলে আরো দু'চারজন রব্বানী আলেমের সাথে ঐ ব্যাপারে কথা বলুন। আপনার শাইখ, উস্তাদ বা পীর যদি হক্কানী-রব্বানী আলেম হয়ে থাকেন, তাহলে দলীলদাবি করলে তিনি মোটেও রাগ করবেন না; অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং তিনি দলীল দিয়ে আপনার ইলমী পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করবেন। আপনার অশান্ত মন শান্ত করার ফিকির করবেন। আপনি তার কাছে দলীল চাওয়ার কারণে যদি তিনি রাগন্বিত হন, আপনার উপর রুষ্ট হন, চোখ রাঙ্গান, বেয়াদব বলে আপনাকে তাড়িয়ে দেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন আপনার এই উস্তাদ, শাইখ বা পীর হক্কানী-রব্বানীর লেবাসে একজন ভণ্ড-প্রতারক। আপনি যদি আপনার আখেরাতকে ধ্বংস করতে না চান, তাহলে তার কাছ থেকে শত মাইল দূরত্ব অবলম্বন

করুন এবং হক্কানী-রব্বানী, দুনিয়াবিমুখ, আখেরাতপ্রেমী একজন আলেমে দ্বীন অন্বেষণ করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন।

হাল যমানার মুরুব্বীদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবেন না

হাল যমানার পীর-মাশায়েখ, উস্তাদ/শাইখ, ইসলাহী মুরুব্বীদেরকে নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করবেন না। তাদের কাছ থেকে শরীয়তের দলীল মুয়াফিক ভাল যা কিছু পাবেন ততটুকু গ্রহণ করুন। কুরআন-সুন্নাহর দলীল ছাড়া তারা যা কিছু বলে তা পরিহার করুন। আর নবীজী সা., খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও খাইরুল কুরূনের সালাফে সালেহীনদেরকে নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করুন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন,

(مَن كانَ مُسْتَنًّا ، فَلْيَسْتَنَّ بمن قد ماتَ ، فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفِتْنَةُ ، أولئك أصحابُ محمد - صلى الله عليه وسلم - ، كانوا أفضلَ هذه الأمة : أبرَّها قلوبًا ، وأعمقَها علمًا ، وأقلَّها تكلُّفًا ، اختارهم الله لصحبة نبيِّه ، ولإقامة دِينه ، فاعرِفوا لهم فضلَهم ، واتبِعُوهم على أثرهم ، وتمسَّكوا بما استَطَعْتُم من أخلاقِهم وسيَرِهم ، فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم)

'কেউ যদি কাউকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চায়, সে যেন মৃতদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে, কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনায় নিপতিত হওয়া থেকে নিরাপদ নয়। ঐ যে মুহাম্মাদ সা. এর সাহাবাগণ তারা এই উম্মতের শ্রে'ব্যক্তিবর্গ, অন্তরের পবিত্রতা এবং ইলমের গভীরতায় তাঁরা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর, তারা লৌকিকতা মুক্ত। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে নিজ নবীর সুহবাতের জন্য এবং নিজ দ্বীন কায়েমের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তোমরা তাদের আদর্শ অনুসরণ কর, তাঁদের আখলাক-চরিত্র যতটা সম্ভব গ্রহণ কর। কারণ তাঁরা আমৃত্যু হেদায়াতের উপর অটল-অবিচল ছিলেন।' (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী হাদীস নং-১৮১০, এই উক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।[১])

---

[১]. والأثر رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٩٤٧/٢- رقم ١٨١٠) ، وفي إسناده ضعف ، إلا أنه أثر مشهور متداول في مصنفات أهل السنة ، ومعناه صحيح مستقر عندهم .
فإن المراد به : أنه من كان سالكا طريقا إلى ربه ، فلا يسلك طريقا ابتدأه هو ، ولا يقلد في دينه من هو مثله من الأحياء ؛ لأنه الحي لا يدرى بم يختم الله به ، فيقلد في دينه رجلا ، إن كان اليوم على الهدى والسنة ، فلعله أن يختم له بغير ذلك . وإنما المأمون أن يتابع في سيره إلى ربه طريق السلف الصالح : أصحاب النبي صلى الله

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর উপর আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে রহমত নাযিল করুন। তাঁর মর্যাদা আরো বুলান্দ করুন। তিনি আমাদের জন্য অত্যন্ত দামী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে যদি কাউকে অনুসরণ করতেই হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অনুসরণ করুন। তাঁদের সম্পর্কে লিখিত কিতাবগুলো বারবার অধ্যায়ন করুন ('সুওয়ারুন মিন

عليه وسلم ، الذين قد ماتوا ، ولم يعد يخشى عليهم من الفتنة .
قال الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله ، بعد ما روى هذا الأثر عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما :
"وهذا الذي ذكره ابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ، فقد أخبر الله تعالى عنهم بأكثر منه في غير موضع ، وأزال الشبه عنهم . وكذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمر بالرجوع إليهم ، والأخذ عنهم ، والعمل بقولهم ، مع علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع ، واختلاف الأهواء ، ولم يأمر بأن يتمسك بغير كتاب الله ، وسنة نبيه ، وسنة أصحابه ، رضوان الله تعالى عليهم ، ونهانا عما ابتدع خارجا عن ذلك ، وعما جاوز ما كان عليه هو وأصحابه .
فواجب علينا قبول أمره فيما أمر ، وترك ما نهى عنه وزجر .
وعلى هذا الأمر كان العلماء والأئمة فيما سلف ، إلى أن حدث من البدع ما حدث "
انتهى من "الحجة على تارك المحجة" ، لنصر المقدسي (১/১৫৯) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ لِمَنْ تَدَبَّرَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ: أَنَّ خَيْرَ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ - فِي الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالِاعْتِقَادِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ فَضِيلَةٍ أَنَّ خَيْرَهَا -: الْقَرْنُ الْأَوَّلُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ الْخَلَفِ فِي كُلِّ فَضِيلَةٍ: مِنْ عِلْمٍ وَعَمَلٍ وَإِيمَانٍ وَعَقْلٍ وَدِينٍ وَبَيَانٍ وَعِبَادَةٍ وَأَنَّهُمْ أَوْلَى بِالْبَيَانِ لِكُلِّ مُشْكِلٍ. هَذَا لَا يَدْفَعُهُ إلَّا مَنْ كَابَرَ الْمَعْلُومَ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ؛ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .. " انتهى من "مجموع الفتاوى" (4/১৫৭)
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله :
"وَالْآثَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ جَمِيعُهَا يَدُلُّ عَلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَالِاتِّبَاعِ لِطَرِيقِهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ طَرِيقُ النَّجَاةِ حَسْبَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْفِرَقِ فِي قَوْلِهِ: "مَا أَنَا عليه وأصحابي" " . انتهى من "الاعتصام" (৩/৩৫৭) . وينظر : "مرقاة المفاتيح" ، للملا علي القاري (১/৩৭৪)والله أعلم.

হায়াতিস সাহাবাহ’ লেখক: আব্দুর রহমান রফআত পাশা অনুবাদ ‘সাহাবীদের ঈমান দীপ্ত জীবন’ রাহনুমা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, এই কিতাবটি আলেম-গাইরে আলেম নির্বিশেষে সকলের পড়া উচিত)। তাদের আচার-আখলাক গ্রহণ করুন। দুনিয়াকে তাঁরা কতটুকু মূল্যায়ণ করতেন তা দেখুন, আর আখেরাতের জন্য তাঁরা কী পরিমাণ পাগল ছিলেন তাও জানুন। নিজেকে তাঁদের মত গড়ার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকুন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

প্রিয় পাঠক! নিজের দ্বীনের ব্যাপারে হাল যমানার কোনো বিশেষ ব্যক্তির উপর নির্ভর করবেন না।

ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন,

الثِّقَةُ بالأشخاصِ ضلالٌ، والرُّكونُ إلى الآراءِ ابتداعٌ

‘ব্যক্তির উপর নির্ভর করা পথভ্রষ্টতা, আর যুক্তির উপর নির্ভর করা বিদআত’। (দারউত তাআরুয:৪/১৩৩, ইবনে তাইমিয়া রহ.)

কোনো রব্বানী আলেমরও উচিত নয়, নিজের ছাত্র, মুরীদ ও মুসল্লীদেরকে নিজ ব্যক্তি সত্তার অন্ধ অনুসারী বানানো। বরং উচিত হল, কুরআন-সুন্নাহ ও খায়রুল কুরুনের সালাফুস সালেহীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করা। কেউ তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করতে চাইলে এর সুযোগ দেয়া ঠিক নয়। কারণ, আগামী কাল সে কী অবস্থায় পতিত হবে তা সে জানে না, তার খাতেমা কি ঈমানের উপর হবে নাকি কুফরের উপর হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই কোনো আলেমের যদি এমন কিছু ভক্তবৃন্দ তৈরি হয়ে যায়, যারা সর্বাবস্থায় অন্ধের মত তার অনুসরণ করে, তাহলে আল্লাহ না করুন, ঐ আলেম যদি গোমরাহীতে পতিত হয়; সে যদি ঈমান বিধ্বংসী কোনো কাজ করে বসে, দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে ঈমানকে বেঁচে দেয়, তাহলে তার অনুসারীরাও গোমরাহীতে পতিত হবে এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজ ও ঈমান বিকানোর ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করতে থাকবে। আর এভাবে একজন আলেমের কারণে হাজারো মানুষ ঈমান হারা হয়ে যাবে।

দ্বীন যেহেতু কল্যাণকামিতার নাম, তাই একজন হক্কানী-রব্বানী আলেমের দায়িত্ব হল, মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করা এবং ভক্ত বৃন্দকে এ কথা বারবার বলে দেয়া যে, ভাই! আমি একজন মানুষ। আমার থেকে যেকোনো সময় ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। আজ আমি হকের উপর আছি, আগামী কাল আমি পথভ্রষ্টও হয়ে যেতে পারি। তাই আপনারা কুরআন-সুন্নাহর

স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ব্যতীত আমার কোনো কথা গ্রহণ করবেন না। আমাকে অন্ধের মত অনুসরণ করবেন না। আমার থেকে সংশয় সৃষ্টিকারী কোনো বিষয় যদি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা আমার অনুসরণ না করে আরো দু'চারজন রব্বানী আলেমের সাথে আলোচনা করে সংশয় দূর করত আমল করুন। এই কর্মপন্থায় আপনাদের ঈমান ও আখেরাত সুরক্ষিত থাকবে। আমিও আপনাদের ব্যাপারে জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থাকব। আমার কারণে আপনারা পথভ্রষ্ট হবেন না ইনশাআল্লাহ।

মাযহাবের ইমামগণের সর্তকতা

দেখুন মাযহাবের ইমামগণ কত সর্তক ছিলেন। তাঁদের অনুসারীরা যেন তাঁদের কারণে কোনোরূপ পথভ্রষ্টতার শিকার না হয়, সে জন্য তারা বারবার অনুসারীদেরকে সর্তক করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেছেন,

(إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي) الفلاني في الإيقاظ ص ৫০)

'যদি আমি এমন কথা বলে ফেলি যা আল্লাহর কিতাব কিংবা নবীজী সা. এর হাদীসের বিপরীত হয়ে যায়, তাহলে তোমরা আমার কথা পরিহার কর' (আল ঈকায পৃ.৫০)

ইমাম মালেক রহ. বলেছেন,

(إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه) . (ابن عبد البر في الجامع ২ / ৩২)

'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ। আমার কোনো সিদ্ধান্ত ভুল হয়, কোনো সিদ্ধান্ত সঠিক হয়। অতএব, আমার মতামত তোমরা যাচাই করে দেখবে। যা কিছু কিতাব-সুন্নাহর মুওয়াফেক হবে তা গ্রহণ করবে, আর যা কিছু কিতাব-সুন্নাহর মুওয়াফেক হবে না, তা পরিত্যাগ করবে'। (জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি:২/৩২)

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন,

(أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد) . (الفلاني ص ৬৮)

'এ ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে ইজমা সংগঠিত হয়েছে যে, কোনো বিষয়ে যদি নবীজী সা. থেকে হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে কারো কথার কারণে সেই হাদীস পরিত্যাগ করা জায়েয নেই।' (আল ঈকায পৃ.৬৮)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এর সর্তকতা

এই উম্মতের সর্ব শ্রে'ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. যখন খেলাফতের দায়িত্ব হাতে নিলেন, তখন তিনি প্রথম খুতবায় বা অভিষেক ভাষণে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু কথা বলেছিলেন। পাঠকের জন্য আমরা তাঁর কথাগুলো উল্লেখ করা ভাল মনে করলাম। খুতবার শুরুতে হামদও সানার পর তিনি বললেন:

أَيُّها الناسُ فَإِني قد وُلِّيتُ عليكم ولست بخيركم فإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُوني.الصِدْقُ أمانةٌ والكَذِبُ خِيَانَةٌ . والضعيفُ فيكم قويٌّ عندي حتى أرجعَ إليه حقَّه إن شاء الله، والقويّ فيكم ضعيفٌ عندي حتى آخذَ الحقَّ منه إن شاء الله. لا يَدَعُ قومٌ الجِهادَ في سبيل الله إلا خَذَلَهم اللَّهُ بالذُلِّ ولا تَشِيعُ الفاحشةُ في قومٍ إلا عَمَّهم اللَّهُ بالبلاءِ. أَطِيعُوني ما أَطَعْتُ اللَّهَ ورسولَه فإذا عَصَيْت اللَّهَ ورسولَه فلا طاعةَ لي عليكم. قُومُوا إلى صلاتكم يَرْحَمْكُمُ الله .سيرة ابن هشام : ৪/২৪০، عيون الأخبار لابن قتيبة : ২/ ২৩৪.

'হে লোক সকল! আমাকে তোমাদের যিম্মাদারী অর্পণ করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভাল কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। **আর যদি আমি কোনো ভুল করি, তাহলে তোমরা আমাকে সংশোধন করে দিবে।** সত্য বলা আমানত, মিথ্যা বলা খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিও আমার নিকট শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবে যতক্ষণ না আমি তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেই, আর তোমাদের দাপটী ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না আমি তার থেকে অন্যের প্রাপ্য উদ্ধার করে নেই ইনশাআল্লাহ। কোনো কওম যখন আল্লহর রাহের জিহাদ পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন। আর কোনো কওমের মধ্যে যখন অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ব্যাপকভাবে বিপদে আক্রান্ত করেন। **আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার আনুগত্য করবে, আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তাহলে আমার আনুগত্য তোমাদের দায়িত্ব নয়।** নামাযের জন্য দাঁড়াও, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহম করুন।' (সীরাতে ইবনে হিশাম:৪/২৪০, উয়ূনুল আখবার:২/২৩৪)

অন্য কোনো মুসলিম যেন আমার কারণে বিভ্রান্ত না হয়, পথ না হারায়, আমি যেন অন্য কারো পথভ্রষ্টতার কারণ না হই, সে জন্য এই উম্মাহর সর্বশ্রে'ব্যক্তি এবং মাযহাবের ইমামগণ কত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গিয়েছেন। আমরা উলামায়ে কেরাম এই আদর্শকে পরিত্যাগ করেছি। কোনো শাইখ/ উস্তাদ বা পীর-মাশাইখের মুখে এজাতীয় জবাবদিহিতা মূলক কথা আজ শোনা যায় না। চিহ্নিত ভণ্ডদের কথা বাদই দিলাম, হক্কানী দাবিদার অধিকাংশ পীর-মাশায়েখও নিজের 'অন্ধ অনুসারী'র সংখ্যা বাড়ানোর ফিকিরে আছেন। যার 'অন্ধ অনুসারী'র সংখ্যা যত বেশি তাকে ততবেশি সফল ব্যক্তি মনে করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাফ করুন। সালাফে সালেহীনের আদর্শ ও কর্মপন্থা আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন।

যেহেতু মান্যতার শিরক নিয়ে আলোচনা চলছে। আর পীর-মাশাইখদেরকেও মান্য করা হয়, তাই হক্কানী রব্বানী পীর-মাশায়েখ বা সাদেকীন কারা তাদের নিয়ে আলোচনা করাও উপযুক্ত মনে হল।

সাদেকীন কারা

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুত্তাকী হতে বলেছেন এবং তাকওয়া হাসিলের জন্য সাদেকীনদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদেকীনের সাথে থাক।' (সূরা তাওবা:১১৯)

সূরা তাওবার এই আয়াতের বর্ণনা দিয়েই হাল-যমানার পীর-মাশায়েখ ও ইসলাহী মুরুব্বীগণ নিজ নিজ অধীনস্তদেরকে নিজেদের সংসর্গ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে থাকেন এবং ভাব-ভঙ্গিমায় এটা বুঝিয়ে থাকেন যে, তারাই এই যামানার সত্যবাদী বা কুরআনে বর্ণিত সাদেকীন। তাই তাদের সুহবত অবলম্বন ছাড়া ইসলাহ নসীব হবে না। আসুন আমরা প্রথমে এই আয়াতে 'সাদেকীন' এর ব্যাখ্যায় কী বর্ণিত হয়েছে তা দেখি। এরপর কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কাদেরকে সাদেকীন বলা হয়েছে তাও দেখব ইনশা আল্লাহ।

সাদেকীনের ব্যাখ্যা:

ইমাম কুরতুবী রহ. সাদেকীনের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা সাদেকীনদের সাথে থাক এর অর্থ হল, যারা নবীজী সা. এর সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হয়েছিল

তাদের সাথে থাক; মুনাফিক (যারা তাবুক যুদ্ধে বের হয়নি) তাদের সাথে থেক না। অর্থাৎ তোমরা সাদেকীনদের পথের উপর অটল-অবিচল থেক।

উল্লেখ্য, এই আয়াতে সাদেকীন দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে বেশ কিছু মতামত রয়েছে।

১. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আম্বিয়া আ. গণ।

২. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে যাদের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে তারা (এই আয়াতের আলোচনা সামনে আসছে)।

৩. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে যারা ফকীর ছিল তারা।

৪. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাদের জাহের বাতেন এক সমান। অর্থাৎ যারা মুনাফেকী থেকে মুক্ত।

৫. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান রাযি.।

৬. কেউ বলেছেন, সাদেকীন দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐ তিনজন সাহাবী যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাবুকের জিহাদে যাননি, কিন্তু পরবর্তীতে নবীজী সা. এর কাছে সত্য সত্য নিজেদের দোষ স্বীকার করে ছিলেন, তাওবা-ইস্তিগফার করে ছিলেন অতঃপর এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেন। (তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তবারী, ইবনে কাসীর)।

এবার আসুন আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে যেসব ব্যক্তিবর্গকে সাদেকীন বলে ঘোষণা করেছেন তাদেরকে খুঁজে দেখি। খুঁজে দেখি আল্লাহ তাআলা যে ধরনের সাদেকীনের সুহবত অবলম্বন করতে বলেছেন, তারা কারা? তাদের আখলাক-চরিত্র কেমন হবে? তাদের গুণাগুণ কী হবে?

ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

‘তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং **আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে।** তারাই সত্যনিষ্ঠ/ সাদেকীন।’ (সূরা হুজুরাত:১৫)

কারা গনীমতের মালের ভাগ পাবে তাদের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ হচ্ছে,

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

'এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং **আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।** তারাই সত্যবাদী।' (আলহাশর:৮)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেছেন, **তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে,** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে লড়াই করে। (তাফসীরে কুরতুবী, সূরা হাশর, আয়াত:৮)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও **যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারণকারী** তারাই হল সত্যাশ্রয়ী (সাদেকীন), আর তারাই পরহেযগার।' (আল বাকারা:১৭৭)

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وحين البأس أي : في حال القتال والتقاء الأعداء

""হীনাল বাআস' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তারা যুদ্ধের সময় এবং শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার সময় ধৈর্য ধারণ করে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আল-কুরআনে সাদেকীনদের পরিচয় সম্বলিত আমার জানামতে এই তিনটি আয়াতই আছে। এই তিনটি আয়াতে সাদেকীনদের যেসব গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আমি সংক্ষেপে নিম্নে পেশ করছি:

১. তারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে।

২. তারা রাসূল সা. এর উপর ঈমান রাখে এবং সাথে সাথে ঐ সব বিষয়েও ঈমান রাখে যেসব বিষয়ে ঈমান আনয়ন না করলে মুমিন হওয়া যায় না, যেমন: আসমানী কিতাব, কিয়ামত দিবস, রাসূলগণ ইত্যাদি।

৩. তারা পোখ্‌তা ঈমানদার; ঈমান আনয়নের পর তারা সমান্যতম সন্দেহ পোষণ করে না।

৪. তারা আল্লাহর পথে নিজের জান দিয়ে জিহাদ করে।

৫. তারা আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে।

৬. তারা কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর যুদ্ধের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক হালতের উপর ধৈর্য ধারণ করে।

৭. তারা দ্বীনের জন্য এত বেশি কুরবানী পেশ করে যে, প্রয়োজনে নিজের দেশ, ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এমন জায়গায় চলে যায়, যেখানে গিয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীন পালন করতে পারবে।

৮. তারা আত্মীয়-স্বজন, মুসাফির, কৃতদাসের মুক্তির ক্ষেত্রে এবং এতীম-মিসকীনদেরকে নিজের ধন-সম্পদ দান করে।

৯. সালাত কায়েম করে। যাকাত প্রদান করে।

১০. অভাবে, রোগে, শোকে ও বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে।

এই আয়াত তিনটির উপর গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করলে সাদেকীনদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য বের করা যাবে। আমি সংক্ষেপ করণার্থে এ কয়টির উপরই ক্ষান্ত করলাম। এবার আসুন মিলিয়ে দেখি। হাল যমানার ঐ সব পীর-মাশায়েখ যাদেরকে তাদের ভক্তগণ সাদেকীন এর আসনে বসিয়েছে এবং তারাও উক্ত অবস্থার উপর সন্তুষ্টি জাহের করেছেন, তাদের মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত সাদেকীনদের সবগুলো গুণ পাওয়া যায় কিনা? হ্যাঁ, তাদের মধ্যে বেশ কিছু গুণ পাওয়া যায়, যেমন, আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, আখেরাত, হিসাব নিকাশ, ফিরিশতা ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান আনয়ন। আবার কিছু গুণ পাওয়া যায় না। যেমন, জান-মাল দ্বারা জিহাদে অংশ গ্রহণের গুণ তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ তিনটি আয়াতের প্রত্যেকটির মধ্যেই জিহাদের গুণটিকে উল্লেখ

করা হয়েছে যা অন্যান্য গুণগুলোর বেলায় হয়নি। জিহাদ ফরযে কিফায়া থাকা অবস্থাতেও কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জান-মাল দ্বারা জিহাদে শরীক হতে হবে, অন্যথায় ঈমানের পূর্ণতা অর্জন হবে না এবং সাদেকীনদের অন্তর্ভুক্তও হওয়া যাবে না। কেননা কিফায়ার দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন থাকে। তাছাড়া বর্তমানে তো বিভিন্ন কারণে বিশ্ব মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় যদি পীর-মাশায়েখগণ জিহাদে শরীক না হন, জান-মাল দ্বারা জিহাদ না করেন, যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যের সবক হাসিল না করেন, কিংবা অন্তত: যারা জিহাদের ময়দানে কাজ করছে, তাদের পক্ষে ফাতওয়া দিয়ে সমর্থন না যোগান এবং সাধ্যানুযায়ী মালী সহায়তা না করেন, তাহলে তারা কীভাবে সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন? কোনো ফরয আমল ছেড়ে দিলে কি কবীরা গুনাহ হয় না? আর কবীরা গুনাহকারী এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, বিশেষত যার ঐ গুনাহ সম্পর্কে কোনো অনুভূতিই নাই এবং সে ঐ গুনাহকে গুনাহ-ই মনে করে না, এরূপ ব্যক্তি কোনোভাবেই সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কবীরা গুনাহ থেকে খালেস তাওবা করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি আল্লাহওয়ালা হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাকওয়া হাসিলের জন্য যেহেতু আল্লাহ তাআলা সাদেকীনদের সঙ্গ অবলম্বন করতে বলেছেন, তাই অবশ্যই সাদেকীনদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে, যদি আমাদের চোখে দেখা পীর-মাশায়েখগণ সাদেকীন না হয়ে থাকেন, তাহলে সাদেকীন কারা?

এর উত্তর হল, সাদেকীনের ব্যাখ্যায় তাফসীরের কিতাবে যেসব ব্যক্তিবর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরআনে সাদেকীন হওয়ার জন্য যেসব সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে সেসব সিফাত বা গুণাগুণ যাদের ভিতর পাওয়া যাবে তারাই সাদেকীন। বর্তমান যমানায় ঐ সব মুত্তাকী, পরহেযগার মুজাহিদ উলামাগণ সাদেকীনের অন্তর্ভুক্ত যারা পৃথীবির বিভিন্ন ফ্রন্টে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজ জান-মাল দ্বারা জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। কুফুরী শক্তিকে ধ্বংস করে পৃথীবিময় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলান্দ করার জন্য নিজের মান-সম্মান, ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ সব কিছু ত্যাগ করে মরু ভূমি, বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতে ফকীরানা জীবন-যাপন করছেন। শত্রুর উপর একের পর এক আঘাত হেনে শত্রুর দম্ভকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছেন; কুফরের ঝাণ্ডাকে পদদলিত করছেন। উম্মাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যেদিক থেকেই মজলুমানের আহ! ধ্বনি ভেসে আসছে সেদিকেই তিনি ছুটে যাচ্ছেন, তাঁরাই হল প্রকৃত সাদেকীন। তাঁদের সংসর্গ অবলম্বনের আদেশই আল্লাহ তাআলা

দিয়েছেন। তাদের সুহবতে থাকলেই অতিঅল্প সময়ে তাকওয়া, ইখলাসসহ আত্মশুদ্ধির অন্যান্য বিষয়গুলো খুব সহজে হাসিল হবে ইনশাআল্লাহ। তাই আসুন আর অপেক্ষা কীসের! তাঁদেরকে খুঁজে বেড়াই। তাঁদের সুহবতে থাকার জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হই।

৩. শিরকের তৃতীয় প্রকার হল, শিরকুল মুহাব্বাহঃ অর্থাৎ মুহাব্বতের মধ্যে শিরক করা। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

'আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহকে রেখে অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালবাসে।' (আলবাকারা:১৬৫)

মুহাব্বত চার ধরনেরঃ

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেছেন, মুহাব্বত চার ধরনের। প্রত্যেক প্রকারের পার্থক্য জানা উচিত। অন্যথায় গোমরাহীর আশংকা রয়েছে।

ক. আল্লাহকে মুহাব্বত করা। (শুধু আল্লাহকে মুহাব্বত মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, মুশরিকীন এবং ইয়াহুদী-নাসারাগণও আল্লাহকে মুহাব্বত করে, কিন্তু তাদের এই মুহাব্বত তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না।)

খ. আল্লাহ তাআলা যা কিছু ভালবাসেন তা ভালবাসা, তিনি যা কিছু পছন্দ করেন তা পছন্দ করা। এই প্রকারের মুহাব্বতই মানুষকে ইসলামে দাখেল করে। আর এই মুহাব্বতের অনুপস্থিতি মানুষকে কাফেরে পরিণত করে।

গ. আল্লাহর জন্য ভালবাসা। দ্বিতীয় প্রকারের ভালবাসা/ মুহাব্বত তৈরি হলে তৃতীয় প্রকার এমনিতেই তৈরি হয়ে যায়। এই প্রকারের মুহাব্বত দ্বিতীয় প্রকারের মুহাব্বতের আবশ্যকীয় অংশ।

ঘ. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ভালবাসা। আল্লাহকে যেমন ভালবাসা হয় অন্য কাউকে ঠিক তেমন বা তার চেয়ে বেশি ভালবাসা। এটাই হল শিরকী মুহাব্বত। যেকেউ আল্লাহর সাথে অন্যকাউকে বা অন্য কিছুকে ভালবাসবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। কারণ, তখনকার মুশরিকরা আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে তাদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসত। আল্লাহ তাআলা এই ভালবাসার কারণে তাদেরকে মুশরিক বলেছেন।

৪. শিরকে আকবারের ৪র্থ প্রকার হল নিয়তের মধ্যে শিরক করাঃ

অর্থাৎ কোনো আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা ব্যতীত অন্যকারো সন্তুষ্টি আশা করা; শুধু অন্যকারো সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমলটা করা। এই প্রকারের শিরক কারো থেকে পাওয়া গেলে তার ঈমান-আমল গ্রহণ করা হবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।' (আল বাকারা:২৬৪)

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু আয়াতে, একটিনষ্ঠভাবে শুধু তারই বন্দেগী করতে বলেছেন। আর সহীহ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, 'শুরাকাদের মধ্যে আমি শিরক থেকে সবচেয়ে বেশি অমুখাপেক্ষী, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যার মধ্যে সে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করল, তাহলে আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করব।' (সহীহ মুসলিম হাদীস নং- ২৯৮৫, আকীদাতুত তায়েফাতুল মানসূরাহ পৃ.৮)

বি.দ্র. নিয়তের মধ্যে শিরকের অনেক স্তর ও প্রকার আছে। এর মধ্যে কিছু প্রকার আছে শুধু শিরকে আসগার তথা রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন: আমল শুরু করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু শুরু করার পর লোক দেখানো ভাব চলে আসল, তাহলে এটা হবে রিয়া। আর কিছু প্রকার আছে যা বৈধ। যেমন: কেউ রোযা রাখল সাওয়াব অর্জন এবং সুস্থতা ধরে রাখার জন্য। আর যে প্রকারটি শিরকে আকবার তথা যার কারণে মুমিন ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হয় তাহল, কোনো একটি আমল শুরু করার পূর্ব থেকেই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা এবং উক্ত আমল দ্বারা বিন্দু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা না করা।

ঈমান ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

ঈমানের সংজ্ঞাঃ

ঈমানের সংজ্ঞায় জুমহুর সালাফগণ ও ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মধ্যে দ্বিমত বিদ্যমান। ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী (রহ.) বলেন :

ذهب مالك و الشافعي و أحمد و الأوزاعي و إسحق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين : إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ومنهم من يقول : إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه (شرح العقيدة الطحاوية)

'ইমাম মালেক, শাফিঈ, আওযাঈ, ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহ.) এবং সকল মুহাদ্দিস, মদিনাবাসিগণ, জাহিরীগণ ও অনেক তর্কশাস্ত্রবিদের মত হল, 'ঈমান হল অন্তরে সত্যায়ন, মুখে স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমলের নাম।' তবে আমাদের মাযহাবের অনুসারীদের মধ্য থেকে অনেকে ইমাম ত্বহাবী (রহ.) এর মত গ্রহণ করেছেন যে, 'ঈমান হল, আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকারোক্তি।' আর কারো কারো মত হল, 'মৌখিক স্বীকারোক্তি একটি অতিরিক্ত রুকন; মৌলিক নয়।' এই মতটি গ্রহণ করেছেন, আবূ মানসুর আল-মাতূরিদী (রহ.)। তিনি এটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর উপরোক্ত মতের উপর ভিত্তি করে অনেককে বলতে শুনা যায়, 'কেউ যদি শুধু অন্তরে আল্লাহকে এক বলে জানে ও মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর প্রেরিত রাসূল মনে করে, তাহলেই সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে। যদিও সারা জীবন মৌখিকভাবে স্বীকারোক্তি না দেয়, কোন আমল না করে, তথাপি একদিন না এক দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।' যারা এই মত ব্যক্ত করে থাকে তারা মূলত অজ্ঞ। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর উক্তি উপলব্ধি করার মত জ্ঞান তারা রাখে না। তার কথার মর্মার্থ কখনই এমনটি নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মত হল, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল ঈমানের অংশ নয় তবে ঈমানের জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ ঈমান বলা হয় ঐ বিশ্বাসকে যা সামর্থ্য থাকার শর্তে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমলকে আবশ্যক করে। ('সামর্থ্য থাকার শর্তে' বলা হয়েছে, কারণ যার মৌখিক স্বীকারোক্তীর সামর্থ্য নেই যেমন বোবা, তার জন্য মৌখিক স্বীকারোক্তী শর্ত নয়।) যদি কেউ অন্তর দ্বারা জানে আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল, কিন্তু এই জ্ঞান তাঁকে আল্লাহর সামনে মৌখিকভাবে ও কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মসমর্পণে বাধ্য না করে, তাহলে এটিকে ঈমান বলা হয় না, কেননা ঈমান বলা হয় গভীর ও সুদৃঢ়

বিশ্বাসকে। শুধুমাত্র কোন বিষয় জানা থাকাকে নয়। আর কারো যদি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে তাঁকে মানতে বাধ্য। ফলে তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তার বিশ্বাসের বহি:প্রকাশ ঘটবেই।

মূলত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও আহলুস সুন্নাহর অন্যান্য ইমামদের মাঝে ঈমানের সংজ্ঞায় যে পার্থক্য, সেটি সূক্ষ্ম শাব্দিক একটি পার্থক্য যা অনেকেই বুঝতে সক্ষম হয় না। উপরোক্ত পার্থক্য বুঝার জন্য একটি দৃষ্টান্ত হল, কোন এক ব্যক্তি মূর্তির সামনে স্বেচ্ছায় সিজদাহ করল। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সহ অন্যান্য সকল ইমামগণ বলবেন, সে কাফের হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আহলুস-সুন্নাহর মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই। এখন যদি অন্যান্য ইমামগণকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে কেন কাফের হল? তারা বলবেন, সে এমন একটি কাজ করেছে যা ঈমানের বিপরীত, তাই সে কাফের হয়ে গেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, লোকটি কাফের হয়ে গেছে কেননা তার অন্তরে ঈমান নেই। যদি ঈমান থাকত সে কখনই মূর্তিকে সিজদাহ করত না। মূর্তির সামনে সিজদাই প্রমাণ করে তাঁর অন্তর ঈমান শূন্য। (শরহুআকীদাতিত তহাবিয়্যাহ, ইমাম আব্দুল আয আল-হানাফী)

এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিৎ। কেননা ঈমানের অর্থ যদি হয় শুধু অন্তর দ্বারা জানা, তাহলে আবূ তালিব মুমিন হবে না কেন ? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাস্তবেই আল্লাহর রাসূল এটি সে ভালোভাবেই জানত এবং বুঝত, কিন্তু প্রবৃত্তি ও বংশীয় অহমিকার কারণে সে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেনি, তাই সে কাফের বলেই গণ্য হবে। দ্বীনের এত উপকার করা স্বত্ত্বেও জাহান্নামী বলে বিবেচিত হবে। একইভাবে, ঐ সময় অনেক ইয়াহুদি ছিল যারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য, তাঁর আনীত বিধানাবলি সত্য এটা ভালোভাবেই জানত। তারা নিজ নিকটাত্মীয়দেরকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের পরামর্শ দিত, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেরা তাকে মেনে নেয়নি। আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন :**"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা নিজ সন্তানদের ন্যায় তাঁকে চেনে কিন্তু তাদের একটি দল জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করে।"** তারা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসাবে সেভাবে চিনত যেভাবে নিজ সন্তানদেরকে চিনে। তথাপি তারা মুমিন হতে পারেনি। বরং তারা কাফের। চির জাহান্নামী। তাই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিৎ।

মুসলিম দাবিদার ব্যক্তিকে কি কখনো কাফের আখ্যায়িত করা যাবে?

ঈমান ভঙ্গ হয়ে যাওয়া এবং কাউকে তাকফীর বা কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে দু'টি দল বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। খারেজীগণ (যাদেরকে নবীজী সা. জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন) এ ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। ফলে তারা কবীরা গুনাহের কারণে মুমিনকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে। যেমন, কেউ যদি যিনা করে কিংবা মদ পান করে তাহলে এই গুনাহের কারণে তারা মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে।

আর মুরজিয়াগণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত শিথীলপন্থা গ্রহণ করেছে। ফলে তারা কোনো আমলের কারণে কাউকে কাফের বলে না যতক্ষণ না কেউ অন্তর থেকে ইসলামকে অস্বীকার করে। তাই তারা কোনো মুসলিম ব্যক্তি মূর্তীকে সিজদা করলেও তাকে কাফের বলে না, কোনো মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসূল সা.কে গালি দিলে তাকে কাফের বলে না। তারা মনে করে জুহুদে কলবী 'অন্তরনিহিত অস্বীকার' ব্যতীত কেউ কাফের হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চরম পন্থা এবং শিথীলপন্থা উভয় পন্থা থেকেই হেফাজত করেন। আমীন।

আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কি কাউকে তাকফীর করে?

আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ তাকফীরের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছে। তারা শুধু গুনাহের কারণে কাউকে তাকফীর করে না, আবার কাফের হওয়ার জন্য 'অন্তরনিহিত অস্বীকার'কেও শর্ত মনে করে না। ফলে তারা যিনা ও চুরীর মত কবীরা গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে না। পক্ষান্তরে কারো কাছ থেকে যদি স্পষ্ট কুফুরী কাজ পাওয়া যায় তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করার জন্য 'জুহুদে কলবীর' অপেক্ষাও করে না। অতএব, কেউ যদি মূর্তীকে সিজদা করে, তাহলে সে আল্লাহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর ইমামগণের মতে কাফের হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কেউ আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসূল সা. কে গালি দেয় তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। তাকে কাফের আখ্যায়িত করার জন্য তার অন্তরের বিশ্বাসের যাচাইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, সে ইসলামের বিভিন্ন হুকুমও আদায় করে, যেমন, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, কুরআন তিলাওয়াত করে,আবার এই লোকটি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে, দেশে গণতন্ত্র কায়েমের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে, শরয়ী আইনকে অপছন্দ করে, শরয়ী শাসনকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার শাসন কলে বিশ্বাস করে, তাহলে এই লোকটি দৈনিক শতবার নিজেকে মুসলিমদাবি করলেও সে মূলত মুসলিম নয়।

সে আল্লাহর কাছে এবং শরীয়তের আইনে কোনো জায়গায় মুসলিম বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, তার থেকে কুফুরীর মত সর্ববিধ্বংসী গুনাহ প্রকাশ পেয়েছে। আহলুসসুন্নাহ সাধারণ কবীরাগুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে না, কিন্তু কুফুরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ কারো থেকে প্রকাশ পেলে তাকে কাফের বলতে দ্বিধাও করে না। এটাই হল আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা; এটাই হল মধ্যপন্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাকফীরের ক্ষেত্রে মধ্য পন্থা গ্রহণের তাওফীক দান করুন। (বিস্তারিত দেখুন: আকীদাতুত তায়েফাতিল মানসূরাহ পৃ.১২)

আমরা মুরজিয়া হয়ে যাচ্ছি নাতো?

প্রিয় পাঠক! উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মাণ হল যে, তাকফীরের জন্য জুহুদে কলবীকে শর্ত গণ্য করে পথভ্রষ্ট মুরজিয়া সম্প্রদায়। আর আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর নিকট তাকফীরের জন্য 'জুহুদে কলবী' শর্ত নয়। ফলে কাউকে বাহ্যিকভাবে কুফুরী কাজে লিপ্ত দেখলে তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা যাবে। বরং করতে হবে। যেন অন্যান্য মানুষ তার অনিষ্টতা থেকে এবং কুফুরী থেকে বাঁচতে পারে। অথচ আমাদের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হতে মুরজিয়াদের অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছেন। এমনকি তাদের অনেককে বলতেও শোনা যায়, 'ওমুকের অন্তরের অবস্থা না জেনে কীভাবে কাফের বলা যায়!'

কিছু কিছু মুফতীদের অবস্থা আরো হাস্যকর। কোনো একজন মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল, কেউ যদি আল্লাহর রাসূল সা.কে গালি দেয়, আল-কুরআনকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয় তাহলে সে কাফের হবে কিনা? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা কুফুরী কাজ, কেউ এমন কাজ করলে সে কাফের হয়ে যাবে। এরপর তাকেই জিজ্ঞেস করা হল, গাবতলার বাসিন্দা কামরুলের ছেলে ভিমরুল ঐ কুফুরী কাজ করেছে এখন তাকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা যাবে কিনা? তিনি বললেন, দেখ! যদিও কাজটা কুফুরী কিন্তু একজন মুসলমানের ছেলেকে হুট করে কাফের বলে ফেলা যায় না! তাই এ ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল।

কী চমৎকার জবাব! কাফেরকে কাফের বলতে ভয় পাচ্ছে। কাফেরকে কাফের না বলা সতর্কতা মনে করছে। শাতেমুর রাসূলের ব্যাপারে সদয় আচরণ করছে। আচ্ছা! আল্লাহ তাআলা কি কাফেরদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন নি? সূরা আল-কাফেরুন খুলে দেখুন। আল্লাহর হাবীব কি

কাফেরদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে সর্তকতার নামে তাদেরকে কাফের বলা থেকে বিরত ছিলেন? সীরাতের কিতাবগুলো একটু খুলে দেখুন। সালাফুস সালেহীন কি কোনো মুসলিম থেকে কুফুরী কাজ প্রকাশ পেলে তাকে কাফের বলে ফতওয়া দেননি? পরবর্তী উলামাগণও কি এমনটি করেন নি? মনসূর হাল্লাজকে তো তখনকার মুফতীতের ফতওয়ার ভিত্তিতেই মুরতাদ হিসাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাহলে এত ভয় কেন? তাকফীরের ক্ষেত্রে সত্য উচ্চরণের এই ভয়টাই আমাদেরকে মুরজিয়া বানিয়ে দিচ্ছে। আমরা নব্য মুরজিয়া; মুরজিয়াদের নতুন ভার্সন। কোনো কাফেরকেও আমরা এখন কাফের বলতে ভয় পাই, পাছে যদি তার কলবে গোপন ঈমান থাকে!!

ভাল করে জেনে রাখুন, কারো কাছ থেকে 'কুফরে বাওয়াহ' প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পেলে তাকে তাকফীর করার জন্য অন্তরের অবস্থা জানা আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মতে শর্ত নয়। এ শর্ত পথভ্রষ্ট মুরজিয়াদের। তাই আমরা যারা নিজেদেরকে হক্কানী মনে করি, জাতির রাহবার হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করি, তারা যেন তাকফীরের ক্ষেত্রে মুরজিয়াদের শিথীলপন্থা অবলম্বন থেকে বিরত থাকি। আর তাকফীর, নাওয়াকেযে ঈমান (ঈমান ভঙ্গের কারণ), তাওহীদ, তাগুত এজাতীয় অতীবগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উম্মাহকে সঠিক দিকনির্দেশনা দান করি।

আজতো আমরা আমীন জোরে বলা হবে নাকি আস্তে বলা হবে, হাত কতটুকু উঠাতে হবে, সিজদায় কীভাবে যেতে হবে এজাতীয় গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করি, কিন্তু তাওহীদ কাকে বলে? ঈমানের জন্য কী কী শর্ত? তাগুত বর্জন ছাড়া ঈমান সহীহ হবে কিনা? কী কী কারণে ঈমান ভেঙ্গে যায়? কোন কোন কারণে ইসলামের দাবীদার ব্যক্তিও মুরতাদে পরিণত হয়? এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার মত সময় আমাদের হয় না। অথচ সহীহ ঈমান ছাড়া, সহীহ তাওহীদ লালন করা ব্যতীত এবং তাগুত বর্জন ব্যতীত কেউ আখেরাতে মুক্তি পাবে না। বরং চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

তাই আসুন! ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ, তাগুত, নাওয়াকেযে ইসলাম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা করি, উম্মাহকে বাঁচাই, নিজেও বাঁচি, নিজের মুক্তির একটা পথ তৈরি করি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরুর দিকেই ছাত্রদেরকে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে শিক্ষা দেই। তাদের ঈমান রক্ষার ব্যবস্থা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

৯৯টি কুফর আর একটি নেক আমল

বর্তমান সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে। কেউ যদি ৯৯ টি কুফরী কাজ করে আর একটি এমন কাজ করে যা প্রমাণ বহন করে যে সে মুসলিম, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। এর দ্বারা তারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে, যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু মাজারে সিজদা করে, মৃত ব্যক্তির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আ'লিমুল গায়েব (সকল অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) বলে দাবি করে, তাদেরকে কাফের বলা যাবে না।

এ মতটি কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক, সাহাবায়ে-কেরাম, তাবেয়ীন এবং তাবয়েতাবেয়ীনের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা নবীজী সা. এর ইন্তিকালের পর ইরতিদাদের ফেতনার সময় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঐ সমস্ত ব্যাক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে ছিলেন, যারা ইসলামের সকল বিধান পালন করত কিন্তু শুধুমাত্র যাকাতের বিধান পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে ৯৯টি ভাল কাজ পাওয়া গিয়েছিল আর মাত্র একটি কুফুরী কাজ পাওয়া গিয়েছিল। তাসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাদেরকে শুধু কাফের-মুরতাদ আখ্যায়িত করেই ক্ষান্ত হননি

বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই হল, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজ।

অনেকে বলে থাকেন, উপরোক্ত মতটি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর। অথচ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ঐ ব্যক্তিদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছেন যারা আল্লাহর সকল বিধান মানত, নামায পড়ত, রোযা রাখত, হজ্জ করত, যাকাত দিত, কিন্তু শুধুমাত্র বলত 'কুরআন মাখলুক'। ইবনু আবী হাতেম বর্ণনা করেন:

قال ابن أبي حاتم الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن مسلم ثنا على ابن الحسن الكراعي قال: قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر

'ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার সাথে ৬ মাস বাহাস (পর্যালোচনা) করেছি, অতঃপর আমরা এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছি যে, যে ব্যক্তি বলবে 'কুরআন মাখলুক' সে কাফের। (ইমাম বায়হাকী (রহ.) সহীহ সনদে এই আছারটি উল্লেখ করেছেন।)

আহমদ বিন কাসেম বিন আতিয়্যাহ্ বলেন :

قال أحمد بن القاسم بن عطية : سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول: سمعت محمد ابن الحسن يقول: والله لا أصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؛ ولا استفتي إلا أمرت بالإعادة.

‘ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ আমি ঐ ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ি না যে বলে কুরআন মাখলূক। (কেউ পড়লে) তাঁকে পুনরায় পড়ার আদেশ দিয়ে ফতওয়া প্রদান করি।’ (শরহু উসূলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, লালকায়ী)

সুতরাং উপরোক্ত মতটি যেভাবে বর্ণনা করা হয় তা আবূ হানীফা (রহ.) এর মত হতে পারে না। আর যদি ধরেও নেই যে, এটি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এরই উক্তি, তাহলে যে অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সে অর্থে এটি সঠিক নয়।

এর সঠিক অর্থ হবে, কেউ যদি এমন একশটি কাজ করে, যার ৯৯টি কাজই **অস্পষ্টভাবে** কুফরের উপর প্রমাণ বহন করে, কিন্তু একটি কাজ তাকে স্পষ্টরূপে মুমিন হিসাবে সাব্যস্ত করে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। কেননা ইসলাম হল ইয়াক্বীনী বিষয় যা সংশয় দ্বারা দূরীভূত হয় না। আর কারো কাছ থেকে যদি মাত্র একটি ‘কুফরে বাওয়াহ’ বা **স্পষ্ট কুফুরী** কাজ পাওয়া যায়, আবার তার থেকে স্পষ্ট কিছু নেক আমলও পাওয়া যায়, তখন স্পষ্ট কুফুরীকে স্পষ্ট নেক আমলের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। ফলে তাকে স্পষ্ট কুফুরীর কারণে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হবে। এক্ষেত্রে তার নেক আমল (যেমন, নামায, রোযা) তার তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। ভালর সাথে খারাপ মিশ্রিত হলে, পবিত্র বস্তুর সাথে সামান্য অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে যেমন ফলাফল খারাপ ও নাপাকের পক্ষে যায়, তেমনি নেক আমলের সাথে স্পষ্ট কুফরী মিশ্রিত হলে, ফলাফল কুফরীর দিকেই ধাবিত হবে। দশ কেজি দুধের ভিতর এক ফোটা পেশাব পতিত হলে যেমন সম্পূর্ণ দুধ নাপাক বলে গণ্য হয়, তেমনি হাজারো নেক আমলের সাথে একটি মাত্র স্পষ্ট কুফরী কাজ করে বসলে, নেক আমলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, ঈমান ধ্বংস হয়ে যাবে। লোকটি মুরতাদে পরিণত হবে। (এবিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, ইকফারুল মুলহিদীন, আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশ্মীরী রহ.। ‘ওরা কাফের কেন’ শিরোনামে কিতাবটির বঙ্গানুবাদও পাওয়া যায়।)

ঈমান ভঙ্গের কিছু মৌলিক কারণ

যেহেতু ঈমান ভঙ্গের বিষয়ে আলোচনা চলছে, তাই ঈমান ভঙ্গের আরো কয়েকটি কারণ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হল:

১. আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা। যেমন: আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা, মাজারে গিয়ে মাজারওয়ালার কাছে কিছু চাওয়া।
২. আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মাধ্যম স্থির করা। যেমন: নিজে সরাসরি কোনো কিছু আল্লাহর দরবারে না চেয়ে পীরের মাধ্যম ধরে চাওয়া। একথা মনে করা যে, নিজে চাইলে পাওয়া যাবে না, পীর চেয়ে দিলে পাওয়া যাবে।
৩. কাফের-মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা, অথবা তাদের কুফুরীর ব্যাপারে সন্দেহ করা বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করা। যেমন, এমন আকীদা পোষণ করা যে, বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম পালন করেও জান্নাতে যাওয়া যাবে।
৪. রাসূল সা. এর আনীত সংবিধানের চেয়ে অন্য কোনো সংবিধানকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা কিংবা অন্য কোনো সংবিধানকে ইসলামের সংবিধান থেকে উত্তম মনে করা। যেমন: বর্তমান যুগে ইসলামের বিধানকে অচল মনে করা। ইসলামের বিধানকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করা, আর মানব রচিত সংবিধানকে উত্তম ও যুগোপযোগী মনে করা।
৫. ইসলামের কোনো বিধানকে আন্তরিকভাবে অপছন্দ করা যদিও বাহ্যিকভাবে ইসলামের উপর আমল করা হোক না কেন। যেমন, পর্দার হুকুমকে অপছন্দ করা কিংবা উপযুক্ত ব্যক্তির একাধিক বিবাহকে অপছন্দ করা। এমনিভাবে জিহাদকে অপছন্দ করা। জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
৬. দ্বীনের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা। যেমন: দাড়ি, টুপি বা মেসওয়াক নিয়ে হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ করা।
৭. যাদু করা বা কুফুরী কালাম করা।
৮. ইসলামের বিপক্ষে বা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করা। অতএব, যে বা যারা মুজাহিদদের বিপক্ষে কাফেরদেরকে সাহায্য করবে তারা কাফের হয়ে যাবে।
৯. কাউকে শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা। যেমন, মারেফতের ধুয়া তুলে নিজেকে ইসলামের হুকুম আহকামের উর্ধ্বে মনে করা। বাতেনীভাবে নামায-রোযা আদায়ের কথা বলা।

১০. দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা, দ্বীনের জরুরী বিষয়গুলো শিখতে না চাওয়া, দ্বীনের আলোচনা থেকে দূরে সরে যাওয়া। দ্বীনের হুকুম-আহকামকে বোঝা মনে করা। মৌলিকভাবে দ্বীনকে অপছন্দ করা।
উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি কারণ এমন, যার একটি যদি কারো মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে; সে কাফের-মুরতাদ হয়ে যাবে। ঐ অবস্থায় তার কোনো ইবাদত কবুল হবে না। ঐ হালতে মৃত্যু হলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

অজ্ঞতার কারণে যদি কারো থেকে এ জাতীয় কোনো অন্যায় হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দ্রুত তাওবা করে নতুন করে কালিমা পড়ে ঈমান আনতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহীহ ঈমান নিয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।
(প্রমাণপঞ্জীঃ আকীদাতুত তহাবী, শরহে আকাইদ,আকীদাতুল ওয়াসেতিয়্যাহ, কিতাবুত তাওহীদ, কেফায়াতুল মুস্তাযীদ শরহু কিতাবিত তাওহীদ)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আকীদাঃ

১. আহলুসসুন্নাহওয়াল জামাআহ ন্যায় পরায়ন মুসলিম শাসকের আনুগত্যকে জরুরী মনে করে। মুসলিম শাসক যদি ফাসেকও হয় তথাপি তার ইমামতিতে নামায এবং তার নেতৃত্বে জিহাদকে জরুরী মনে করে।

মুসলিম দেশসমূহের শাসকদের হুকুম

৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কাফের ব্যক্তিকে মুসলিমদের শাসক নিযুক্ত করা বৈধ মনে করে না। কোনো মুসলিমকে শাসক নিযুক্ত করার পর যদি সে কাফের হয়ে যায়, তাহলে জিহাদের মাধ্যমে তাকে উৎখাত করে একজন আদেল তথা ন্যায়পরায়ন, মুত্তাকী-পরহেযগার মুসলিমকে শাসক নিযুক্ত করা ওয়াজিব মনে করে। তাৎক্ষণিকভাবে কাফের শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, জিহাদের প্রস্তুতিকে জরুরী জ্ঞান করে।

আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা

৪. আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ- এর এমন একটি আকীদা যা আজ মুসলিমরা ভুলে যেতে বসেছে। মুসলিমের বন্ধুত্বের ভিত্তি হল, ঈমান। যে বে-ঈমান, কাফের এবং আল্লাহকে অস্বীকারকারী তার সাথে মুসলিমের কোনোরূপ বন্ধুত্ব হতে

পারে না। বরং কাফেরদের প্রতি প্রকৃত মুসলিমের চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা কুরআনের একাধিক আয়াতে এ মর্মে আদেশ জারি করেছেন, যেন কোনো মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম ব্যাতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, যদি কেউ মুসলিম ব্যাতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। কেউ যদি কাফেরদের সাথে চুক্তি বা বন্ধুত্বের কারণে কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করে; মুসলিমকে গ্রেফতার করতে কিংবা হত্যা করতে কাফেরদেরকে সাহায্য করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

এখন আসুন আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটু যাচাই করে দেখি যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশসমূহে যেসব শাসকগণ শাসনকার্য পরিচালনা করছেন, তারা কি ইসলামের সীমার ভিতর আছেন নাকি ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কুফরের সীমায় প্রবেশ করত কাফেরে পরিণত হয়ে মুসলিম উম্মাহকে শাসনের হক হারিয়ে ফেলেছেন। আমাদের তাহকীক মতে বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের শাসকগণ নিম্ন বর্ণিত কারণে কাফের-মুরতাদে পরিণত হয়েছে, যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এবং ইসলামের অনেক বিবিবিধানও পালন করে তবুও তারা কাফের ও মুরতাদ।

বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের শাসকদের কাফের হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ:

- ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার স্লোগান তোলা, এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে তারা কাফের।
- কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করার কারণে তারা কাফের।
- কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধর্মীদের তৈরিকৃত আইনের অনুসরণ করার কারণে তারা কাফের।
- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূল ভিত্তি করার কারণে তারা কাফের।
- কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে পাশ্চত্য বিধর্মীদের তৈরিকৃত নীতিমালা দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা করার কারণে তারা কাফের।
- আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হারাম করেছেন (যেমন,সূদ, যিনা, মদপান) রাষ্ট্রীয়ভাবে তার অনুমোদন দেওয়া, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেসবের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং প্রচার-প্রসার করার কারণে তারা কাফের।
- আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে হালাল করেছেন, (যেমন বাল্য বিবাহ, জিহাদ) সেসব বস্তুকে নিষিদ্ধ করার কারণে তারা কাফের।

- সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করার কারণে তারা কাফের।
- মুজাহিদদেরকে ধরে ধরে ভারত, আমেরিকা, ইসরাঈলসহ অন্যান্য কাফেরদের হাতে হস্তান্তর করা এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে তারা কাফের।
- পবিত্র জিহাদের হুকুমকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নামে আখ্যায়িত করার কারণে এবং পাঠ্যপুস্তককে জিহাদ মুক্ত করার ঘোষণা দেয়ার কারণে তারা কাফের।
- মুজাহিদীনে ইসলামকে ঘৃণা ভরে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী ট্যাগ দেয়ার কারণে তারা কাফের।
- আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমন থাবা বাবা (রাজীব) এবং তার অন্যান সহচরদিগকে হত্যাকারী মুজাহিদগণকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দোষী সাব্যস্ত করত ফাঁসি ও অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডিত করার অপরাধে তারা কাফের।
- হেফাজতের ১৩ দফাকে নাকোচ করা, ১৩ দফাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং ১৩ দফার দাবীদার মুসলিমদের উপর রাতের আধাঁরে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার অপরাধে তারা কাফের।
- হিন্দুদের পূজায় অংশগ্রহণ করা এবং পূঁজা উপলক্ষে তাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার কারণে তারা কাফের।
- সর্বোপরি জিহাদকে অপছন্দ করা, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা, যারা আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য জিহাদ করতে চায় তাদেরকে আটক করে নির্যাতন ও হত্যা করার কারণে তারা কাফের।
- মুসলিমদেরকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-কানূন মানতে বাধ্য করার অপরাধে তারা কাফের।
- জাতিসংঘ নামক কুফুরী সংঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করা এবং তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথ মসৃণ করে দেয়া ও বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করার কারণে তারা কাফের।
- উপরে আমরা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসকগণ কী কী কারণে কাফের শুধু তার কারণগুলো উল্লেখ করলাম। নিম্নে এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা কিয়াস থেকে দলীল পেশ করছি।

কুরআন থেকে দলীল

দলীল নং- ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। **আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।** নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। [সূরা মায়েদা: ৫১]

ইমাম তবারী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم, أي من أهل دينهم وملتهم , فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخط وصار حكمه حكمه.

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের ব্যতিরেকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়। যখন সে তার উপর এবং তার দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট হবে তখন তার বিপরীত সবকিছুর ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। সুতরাং দুজনের হুকুম একই হবে। [তাফসীরুত তবারী, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:২৭৭]

আল্লামা শাওকানী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

{ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } أي : فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية . وقوله : { إِنَّ الله لاَ يَهْدِى القوم الظالمين } تعليل للجملة التي قبلها : أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالى الكافرين .

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।" অর্থাৎ সে তাদের মধ্য থেকে এবং তাদেরই দলভুক্ত হবে। এটি একটি কঠিন হুশিয়ারী কেননা এটা এমন গুনাহ যা কুফরকে আবশ্যক করে এবং একটি চূড়ান্ত সীমারেখা যার পর আর কোন সীমা বাকী থাকে না।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।” আয়াতের এই অংশটি পূর্বের অংশের কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ তাদের কুফরের মাঝে পতিত হওয়ার কারণ হল, যে নিজের প্রতি জুলম করে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন না যা কুফরকে অবধারিত করে (অর্থাৎ তাকে কুফরী থেকে বেঁচে থাকার শক্তি প্রদান করেন না)। যেমন ঐ ব্যক্তি, যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। [তাফসীরু ফাতহিল কাদীর, খণ্ড:২ পৃষ্ঠা:৭৩]

আল্লামা কুরতূবী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

(ومن يتولهم منكم) أي يعضدهم على المسلمين (فإنه منهم) بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة،

“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে”- অর্থাৎ মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে।“নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন”- আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের যেই হুকুম তারও ঐ একই হুকুম। এই আয়াতটি মুসলিমের জন্য মুরতাদের মিরাছ তথা উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যে ব্যক্তি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে ভালোবেসে ছিল, সে হল ইবনে উবাই, তবে বন্ধুত্ব ছিন্নের ক্ষেত্রে এই হুকুমটি কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত হয়ে গেছে। [তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড:৬, পৃষ্টা: ২১৭]

আর التولي বা পরষ্পর বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে জান-মাল দিয়ে সাহায্য করা। তথ্য দিয়ে, অস্ত্র যুগিয়ে অথবা সম্মান জানিয়ে তাদের পক্ষাবলম্বন করা। যেমনটি শায়েখ উসামা বিন লাদেন (রহ.) বলেন:

قال اهل العلم: "الذي يتولي الكفار قد كفر" ومن اعظم معالم الولاية المناصرة بالقول وبالسنان وباللسان-

উলামাগণ বলেন, **“যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে সে কাফের হয়ে যাবে।”** আর বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ মাধ্যম হল অস্ত্র, কথা বা সমর্থন দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করা। [আল-আরশীফুল জামে‘য়, পৃষ্টা:২১]

এই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, যারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে,মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে তথ্য, অস্ত্র, সৈন্য, বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে, তারা কাফের হয়ে যাবে।

নিম্নে আমরা আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত অন্য শরীয়ত বা সংবিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি।

দলীল নং- ২

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধি-বিধান কামনা করে? বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর বিধান দানকারী?' (সূরা:মায়িদাহ, আয়াত:৫০)

ইমাম তবারী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেনঃ

يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك، فلم يرضوا بحكمك، إذ حكمت فيهم بالقسط "حكم الجاهلية"، يعني: أحكام عبَدة الأوثان من أهل الشرك، وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم، وأنه الحق الذي لا يجوزُ خلافه. ثم قال تعالى ذكره موبِّخا لهؤلاء الذين أبوا قَبُول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولهم من اليهود، ومستجهلا فعلَهم ذلك منهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمًا، أيها اليهود، من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله، ويقرُّ بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أيّ حكم أحسن من حكم الله، إن كنتم موقنين أن لكم ربًّا، وكنتم أهل توحيدٍ وإقرار به؟

'আল্লাহ তাআলা বলছেন: এ সকল ইয়াহুদী যারা আপনার কাছে বিচার দায়ের করে, অতঃপর আপনি যখন তাদের মাঝে ন্যায় ফায়সালা করেন, তারা আপনার ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়। এরা কি "জাহিলিয়্যাতের বিধান" কামনা করে ? অর্থাৎ মুশরিক মূর্তিপুজারীদের বিধান কামনা করে। অথচ তাদের কাছে রয়েছে আল্লাহর কিতাব। আপনি তাদের মাঝে যে ফায়সালা করেছেন তার সত্যতা তাতে বিদ্যমান আছে। আর এটাই হক্ব যার বিপরীত সব কিছু নাহক।

অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা পক্ষে-বিপক্ষে হবার কারণে ইহুদীদের মধ্য থেকে যারা তা মানতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভর্ৎসনা করছেন এবং তাদের উক্ত কর্মকে জাহিলিয়্যাত আখ্যায়িত করে বলছেন: ওরে ইয়াহুদ! যারা আল্লাহ তাআলার ওয়াহদানিয়্যাতে বিশ্বাসী, যারা তার রুবূবিয়্যাতকে স্বীকার করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার চেয়ে আর কে আছে উত্তম বিধান দানকারী।

....

<u>আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি বিশ্বাস করো তোমাদের একজন রব আছেন, তোমরা তার তাওহীদে বিশ্বাস করো, মুখে তার স্বীকারোক্তি দাও, তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের চেয়ে উত্তম বিধান আর কী হতে পারে?!</u> [তাফসীরে তবারী, খণ্ড:১০, পৃষ্ঠা:৩৯৪]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেন:

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية - كما يصفها الله ويحددها قرآنه - هي حكم البشر للبشر ، لأنها هي عبودية البشر للبشر ، والخروج من عبودية الله ، ورفض ألوهية الله ، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله .

إن الجاهلية - في ضوء هذا النص - ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع يوجد بالأمس ، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً ، فيأخذ صفة الجاهلية ، المقابلة للإسلام ، والمناقضة للإسلام . والناس - في أي زمان وفي أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله - دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها ويسلمون بها تسليماً ، فهم إذن في دين الله . وإما إنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر - في أي صورة من الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته ، وليسوا بحال في دين الله . والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية ، ويعيش في الجاهلية .

'এই নসের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের অর্থ নির্দষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বর্ণনা ও তার কুরানের সংজ্ঞা অনুযায়ী জাহিলিয়্যাত বলা হয়, মানুষদের জন্য তৈরী মানুষের বিধানকে। কেননা, মানুষ যখন মানুষের তৈরি বিধান দ্বারা শাসিত হয়, তখন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দাসত্বকে বর্জন করে মানুষের দাসত্ব করা হয়। আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে প্রত্যখ্যান করা হয় এবং প্রত্যাখ্যানের পর তার মোকাবেলায় কতেক মানুষের উলুহিয়্যাতকে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদের দাসত্বের সামনে আত্মসমার্পণ করা হয়।

এই আয়াতের আলোকে বুঝে আসে, জাহিলিয়্যাত কোন এক সময়ের নাম নয়। জাহিলিয়্যাত হল, এক বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির নাম। যা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। যা আসে ইসলামের মোকাবেলায়, যার সাথে থাকে ইসলামের বৈপরীত্য। মানুষ যে সময়ে বা যে স্থানেই অবস্থান করুক, হয়ত সে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে, [তার

কতেক বিধান থেকে বিরত থাকা ব্যতীত] তা গ্রহণ করবে। পরিপূর্ণ ভাবে তার সামনে আত্মসমার্পণ করবে। তাহলেই তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে আছে বলে গণ্য হবে। নয়তো তারা মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার ফায়সালা করবে (যে কোন অবস্থাতেই করুক না কেন) এবং তা গ্রহণ করে নেবে, তাহলে তারা জাহিলিয়্যাতের মাঝে আছে বলে পরিগণিত হবে। তাদেরকে তার দ্বীনের মাঝে গণ্য করা হবে যার শরীয়াহ দ্বরা তারা বিচার ফায়সালা করছে। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দ্বীনের অনুসারী বলা হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান কামনা করে না, সেই জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে। যে আল্লাহর শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে সেই জাহিলিয়্যাতের শরিয়াহ্কে গ্রহণ করে ও তাতে জীবন যাপন করে। [তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৮৪]

এমন কি তিনি আরো বলেন:

إما إسلام وإما جاهلية . إما إيمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين ما هم بمؤمنين . .

‘হয়ত ইসলাম নয়ত জাহিলিয়্যাত। হয়ত ঈমান নয়ত কুফর। হয়ত আল্লাহর হুকুম নয়ত জাহিলিয়্যাতের বিধান। আর যারা আল্লাহর বিধার দ্বারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কাফের, জালিম, ফাসেক। যে সমস্ত বিচার প্রর্থীরা আল্লাহর বিধান গ্রহণ করে না তারা মুমিন নয়।’ [তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৮৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যখ্যায় তাতারদের নিয়ে আলোচনা করেন। তাতার জনগোষ্ঠি ইসলাম গস্খহণ করার পর তারা যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করেছিল সে কথা উল্লেখ করে বলেন :

....جنكز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها. وفيها كثير من الاحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير[تفسير ابن كثير]

......চেঙ্গিস খান “ইয়াসিক” নামক সংবিধান প্রণয়ন করেছে। ইয়াসিক হল ইসলামী, নাসরানি, ইয়াহুদীবাদসহ বিভিন্ন শরীয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি

....

সংবিধান। তাতে এমন অনেক বিধানও আছে, যা সে শুধুমাত্র নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা থেকেই গ্রহণ করেছে। আর সেটাই তার সম্প্রদায়ের নিকট পরিণত হয়েছে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে। ইয়াসিককে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে। এবং কম হোক বেশী হোক কোন অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড:৩, পৃষ্টা: ১৩১]

নির্দেশনাঃ

আমরা উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত দেখতে পেলাম। তাদের ব্যাখ্যা জানতে পরলাম। আমরা আমাদের সমাজে পরিচালিত শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি, এটা কি নব্য জালিয়্যাত নয়?! পাঠকগণকে অনুরোধ করবো তারা যেন ইতিহাস থেকে তাতারীদের সংবিধান সম্পর্কে জেনে নেয়। নিশ্চিত তারা বুঝতে পারবে আমাদের সমাজে প্রচলিত সংবিধান সেই ইয়াসিকের চেয়েও জঘণ্য, নিকৃষ্ট। কেননা ইয়াসীকের মাঝেতো অপরাধগুলোকে অপরাধ বলে স্বীকার করা হয়েছে ও তার শাস্তি বিধান করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মানব রচিত সংবিধানগুলোতো অনেক অপরাধকে অপরাধ বলেই স্বীকার করা হয়নি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রেতো অপরাধকে ভাল কাজ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইয়াসিকের ব্যাপারে যদি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ট আলেমগণের অভিমত এমনটি হয়। তাহলে বর্তমান সংবিধানের ব্যাপারে তাদের অভিমত কী হতে পারে?! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

দলীল নং-৩

রঈসুল কুফফার ওয়াল-মুরতাদ্দীন তথা কাফের মুরতাদদের পথিকৃত, প্রথম মুরতাদ ও মুরতাদদের প্রধান গুরু ইবলিসের ইরতেদাদের প্রসঙ্গ আমরা সবাই জানি। ইবলিস শুরু থেকে কাফের ছিল না; বরং সে ছিল উচ্চস্তরের একজন আবেদ, ঈমানদার। পরে ঈমান পরিপন্থী একটি কাজ করে সে অভিশপ্ত মুরতাদে পরিণত হয়েছে। আমরা এখানে অনুসন্ধান করতে চাই, কেন এবং কি কাজটি করে সে মুরতাদ হয়েছিল? তার এই কাজটির স্বরূপ ও প্রকৃতি কি ছিল? আশা করি এবিষয়টি যথাযথ পরিষ্কার করতে পারলে, আলোচ্য মাসআলাটি বুঝা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের

সকলকে সঠিক বিষয়টি যথাযথ বোঝার ও অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন এবং দ্বীন ও ইলমের বিষয়ে সকল ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামী কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় ইবলিসের ইরতেদাদের প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে দু'একটি আয়াত উদ্ধৃত করছি।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76)

“(স্মরণ করুন), যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর আমি যখন তাকে পরিপূর্ণরূপে তৈরি করে ফেলব, এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তাঁর সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।' অতঃপর ফেরেশতারা সকলে একযোগে সেজদা করল কেবল ইবলিস ছাড়া; সে অহংকার করল। সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি অহংকার করলি, না তুই ছিলি মর্যাদায় বড়? সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।”-সূরা সাদ: ৭১-৭৬

সম্ভবত এখানেই ইবলিসের ইরতেদাদের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। এছাড়া সূরা আ'রাফ এবং সূরা হিজ্‌রেও এর কাছাকাছি বিবরণ এসেছে। দেখুন–

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12)

"আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিলাম, কে তোমাকে বারণ করল সেজদা করতে? ইবলিস বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে।" -সূরা আ'রাফ: ১২

قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33)

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! কি হল তোর; সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি না? সে বলল, আমি মানুষকে সেজদা করার নই, যে মানুষকে আপনি পচা দুর্গন্ধযুক্ত কাদার ঠনঠনে শুকনো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।"-সূরা হিজ্‌র: ৩২-৩৩

আয়াতগুলোতে আমরা লক্ষ করছি, ইবলিস আদমকে সেজদা করেনি –এই বিবরণটি আল্লাহ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তারপর তিনি ইবলিসকে প্রশ্ন করেছেন, সে কেন সেজদা করেনি? ইবলিস তার নিজের ভাষায় সেজদা না করার কারণ বর্ণনা করেছে। এখান থেকে আমরা ইবলিসের ইরতেদাদের কারণটি বের করতে পারি দু'রকম–

১. সেজদা না করা।

২. সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা সেজদার হুকুম প্রত্যাখ্যান করা, যা ইবলিস নিজের বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার করেছে।

কিন্তু শুধু সেজদা না করার কারণে মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নয়। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহর একটি হুকুম লঙ্ঘন করা বা পালন না করাই ইরতেদাদ। সুতরাং একজন মুসলমান আল্লাহর যে কোনো একটি হুকুম কিংবা অন্তত সেজদার হুকুম পালন না করলেই মুরতাদ হযে যাবে। নাউযুবিল্লাহ। অথচ তাকফিরের ক্ষেত্রে আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালজামাআর আকিদা এমন নয়; এটি খারেজিদের আকিদা। আল্লাহর কোনো একটি হুকুম পালন না করলে আহলুস-সুন্নাহ কাউকে মুরতাদ মনে করেন না। এবং এই মতের পক্ষে কুরআন সুন্নাহর অসংখ্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এটি আকিদা ও তাকফিরের একটি স্বতন্ত্র মাসআলা, যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। এখানে সে আলোচনায় প্রবেশ করা সঙ্গত হবে না।

তাহলে ইবলিসের মুরতাদ হওয়ার কারণ হিসেবে বাকি থাকল দ্বিতীয়টি। অর্থাৎ সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানানো বা আল্লাহর একটি হুকুম প্রত্যাখ্যান করা। আর এটি উম্মতে মুসলিমার একটি ইজমাঈ মাসআলা। আমাদের জানামতে এখানে কোনো একজনেরও দ্বিমত নেই যে, কেউ যদি আল্লাহর একটি হুকুমও প্রত্যাখ্যান করে বা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর প্রতিটি বিধান গ্রহণ করা এবং মেনে নেয়া শুধু আমলের বিষয় নয়; বরং ঈমানের অংশ। একটি হুকুম পালন না করা বা সে অনুযায়ী আমল না করা এক বিষয় এবং তা গ্রহণ না করা বা প্রত্যাখ্যা করা ভিন্ন বিষয়; দুটি কখনো এক নয়। একটির সম্পর্ক আমলের সঙ্গে; অপরটির সম্পর্ক ঈমানের সঙ্গে।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। একজন ফজরের নামায পড়ে না। কিন্তু সে তা আল্লাহর বিধান হিসেবে জীবনের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ইচ্ছা আছে ফজরের নামায পড়ারও। হয়তো অলসতা বা শয়তানের ধোঁকায় জীবনে একদিনও তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যেহেতু সে আল্লাহর বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, এজন্য পড়তে না পারার অনুশোচনা হয়, সবসময় না হলেও মাঝে মধ্যে হয় এবং মনে মনে অপরাধ বোধ করে; সামনে পড়ার ইচ্ছা লালন করে। এটাকে বলা যাবে আমলের ত্রুটি এবং এ কারণে একজন ঈমানদার ফাসেক ও গোনাহগার হলেও মুতারদ হবে না।

পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে কিংবা মনে লালন করে কিংবা প্রতিজ্ঞা করে, আমি শরীয়তের সব বিধানই পলন করব, কিন্তু কখনো ফজরের নামায পড়ব না, তাহলে সে ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ সে আল্লাহর এই বিধানটি গ্রহণ করেনি এবং মেনে নেয়নি, যা ঈমানের অংশ। এমনকি সে যদি বিশ্বাস করে এবং স্বীকার করে, ফজরের নামায আল্লাহর হুকুম এবং মনে করে আমি তা না মেনে গুনাহগার হচ্ছি, তবুও ঈমানদার হতে পারবে না। কারণ ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, মেনে নেয়া এবং গ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করাও ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

এবিষয়টিকেই ঈমানে মুজমালে ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে– وقبلت جميع أحكامه‘এবং আমি আল্লাহর সকল বিধান কবুল ও গ্রহণ করে নিলাম’। সুতরাং সকল বিধান গ্রহণ করে নেয়া ঈমানের জন্য জরুরি। একটি বিধানও যদি কেউ

গ্রহণ না করে তবে সে ঈমানদার হতে পারবে না; ঈমানদার থাকা অবস্থায় না করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে; যেমন মুরতাদ হয়েছিল ইবলিস।

ইবলিসের মতো ঠিক একই কারণে কাফের ছিল আবু তালিবও। আমরা কে না জানি; আবু তালিব জানত ইসলামই সত্য, নবী মুহাম্মাদই হক। শুধু কি জানত? বিশ্বাস করত, মুখে স্বীকার করত এবং কর্মেও ইসলামের সমর্থন ও সহযোগিতা করত। কিন্তু তবুও কি সে মুমিন হতে পেরেছিল? সত্য দ্বীনকে সত্য হিসেবে জানা, বিশ্বাস করা ও স্বীকার করার পরও সে কেন কাফের থাকল? কেন মুমিন হিসেবে স্বীকৃতি পেল না? কারণ একটাই। তা হল ঈমান শুধু সত্যকে সত্য বলে জানা ও বিশ্বাস করার নাম নয়; বরং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করাও মেনে নেয়ার নাম এবং গ্রহণ করেছি বলে স্বীকৃতি দেয়ার নাম ঈমান। লোকলজ্জার ভয়ে এই কাজটিই করতে পারেনি আবু তালিব। যার কারণে সে ঈমানদার হতে পারেনি।

তবে আবু তালিব ও ইবলিসের মাঝে একটি পার্থক্য আছে। পার্থক্যটি হল, ইবলিস শুরুতে ঈমানদার ছিল; পরে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করে মুরতাদ হয়েছে। পক্ষান্তরে আবু তালিব শুরু থেকেই আল্লাহর কোনো বিধান গ্রহণ করেনি। ফলে সে শুরু থেকেই কাফের ছিল। শরীয়তের বিধান মুরতাদের ক্ষেত্রে কাফেরের চেয়েও কঠিন ও মর্মান্তিক।

উক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর ভাষায় নিম্নরূপ–

المحورُ الذي يدورُ عليه الإيمان

وإذا قد علمت أن التَّصديقَ والتسليمَ والمعرفةَ واليقينَ كلُّها يُجَامِعُ الجحود، فلا بد من تفسير يتميز به الكفرُ من الإيمان. كيف وهذا القرآن يشهدُ بمعرفة الكفار، قال تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءهُمْ} [البقرة: 146] وهذا أبو طالب يُقِرُ بنبوتِهِ ونباهته صلى الله عليه وسلّم ويُعْلنُ بها في أبياته، حتى دارت وسارت، فيقول:

***ودعوتَني وزعمتَ أَنَّكَ صادِق ... وصدقت فيه وكنت ثَمّ أمِينًا**

***وعرفتُ دينَك لا محالةَ أنه ... من خيرِ أديانِ البَرِيَّةِ دِينا**

***لولا الملامةُ أو حَذَارِ مَسَبَّةٍ ... لوجدتَّني سمحًا بذاك مُبِينًا**

وهذا هرقل عظيم الروم يقول: لو أني أعلم أني أَخْلُصُ إليه لتجَشَّمْتُ لقاءه، ولو كنت عنده لغَسَلْتُ عن قدميه، وفي «فتح الباري»: عن مرسل ابن إسحق عن بعض أهل العلم: أن هرقل قال: ويحك، والله إني لأَعْلَمُ أنه نبيٌ مرسل، ولكني أخاف الرومَ على نفسي، ولولا ذلك لاتَّبعتُهُ. فهل تريدُ من التصديق أمرًا وراء ذلك؟ فلما وُجِد منهم التصديقُ والتسليمُ والإقرارُ بهذه المثابة، وَجَبَ على التعريفِ المذكورِ أن يُحْكم عليهم بالإسلام، مع اتفاقهم على كونهم كافرين.

فأقول: إنّ الجزءَ الذي يمتاز به الإيمان والكفر، هو التزام الطاعة (1) مع الردع والتبري عن دين سواه، فإذا التزم الطاعة فقد خرجَ عن ضلالة الكفر ودخل في هَدْي الإسلام. وحينئذٍ تبين لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهم، وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه، إلا أنه لم يلتزم طاعته، ولم يدخل في دينه، ولذا قال: لولا الملامة أو حذار مسبة .... إلخ، فآثر النار على العار. وهكذا هِرَقل، وإن تمنى لقاءه وَبجَّلَه وعظمه بظهر الغيب، لكنه خشي الرومَ أشدَّ خشية، فلم يلتزم طاعته. وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله سبحانه عن معرفتهم، فإنهم مع معرفتهم الحقَ، صفحوا عن كلمة الحق، ولم يَدِينُوا بدين الإسلام.

ولذا أقول: إن الإيمان من الإرادات وترجمته في الهندية (ماننا) فهذا هو الصواب في تفسيره، فقد نقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماعَ على كون هذا الجزء مما لا بد منه في باب الإيمان، وحينئذٍ ينبغي أن يراد من الإقرار في قول الفقهاء: الإقرار بالتزام الطاعة. وإن كان المراد منه الإقرار بالشهادتين كما هو المشهور، يبقى الإشكال. اهـ فيض الباري شرح صحيح البخاري: 125/1، كتاب الإيمان.

“যে অক্ষকে কেন্দ্র করে ঈমান আবর্তিত হয়!

আপনি যখন জানতে পারলেন যে, তাসদিক (আন্তরিক সত্যায়ন), তাসলিম (আত্মসমর্পণ), মা'রেফত (জ্ঞানলাভ) এবং ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস)– সবগুলোই জুহুদ (অস্বীকার)- এর সাথে একত্রিত হতে পারে, তখন (ঈমানের) এমন একটি ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যার দ্বারা কুফর থেকে ঈমান পৃথক হবে। (আপনি)

কিভাবে (তা অস্বীকার করবেন)! যখন এই কুরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কাফেরদের মা'রেফত রয়েছে? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তারা তাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তেমনই চেনে, যেমন চেনে তাদের ছেলে সন্তানদেরকে।' (সূরা বাকারাঃ ১৪৬) এই যে আবু তালেব! সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত ও মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিতো। তার কবিতার পংক্তিতে সে তা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে। সে বলছে–

*তুমি আমাকে আহ্বান করেছ এবং বলেছো যে, তুমি সত্যবাদি ... এতে তুমি সত্যই বলেছো এবং এ ব্যাপারে তুমি বিশ্বস্ত।

*আমি তোমার ধর্মকে চিনতে পেরেছি যে, ... নিঃসন্দেহে তা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

*যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... তাহলে আমাকে স্পষ্টরূপেই তা গ্রহণকারী বলে দেখতে পেতে।

এই যে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াস! সে বলছে, 'আমি যদি জানতাম, আমি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে পৌঁছতে পারবো, তাহলে আমি অবশ্যই কষ্ট বরদাশত করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তাহলে তাঁর কদমের ধুলোবালি ধুয়ে দিতাম।' ফাতহুল বারিতে ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসাল সনদে কোনো কোনো আহলে ইলম থেকে বর্ণিত আছে, হিরাক্লিয়াস বলেছিল, 'আফসোস তোমার জন্য! আল্লাহর কসম! আমি জানি, নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী। কিন্তু আমি নিজের ব্যাপারে রোমানদের আশঙ্কা করছি। যদি এমনটা না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতাম।'

এর চেয়েও অধিক তাসদিক আপনি চান? এমন পর্যায়ের তাসদিক, তাসলিম ও স্বীকারোক্তি যখন তাদের থেকে পাওয়া গেছে, তখন উল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী তাদেরকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া আবশ্যক! অথচ তারা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

অতএব, আমি বলি– ঈমান ও কুফর পরস্পর থেকে আলাদা হবে যে মৌলিক জিনিসের মাধ্যমে, তা হলো– (নিজের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আনুগত্য অবধারিত করে নেয়া, সাথে সাথে অন্য সকল ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া ও সম্পর্কচ্ছেদ করা। যখন আনুগত্য অবধারিত

করে নেবে, তখন কুফরের গোমরাহি হতে বের হয়ে ইসলামের হেদায়াতে প্রবেশ করবে। আশা করি এখন আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাসদিক ও মা'রেফত থাকা সত্ত্বেও এসব কাফেরের কুফরির কারণ কি ছিল। কারণ, আবু তালেব যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম হক্ব বলে ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু সে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। তাঁর ধর্মে প্রবেশ করেনি। এ কারণেই সে বলেছে, 'যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... ।' লজ্জা (বরণের) অপেক্ষায় সে জাহান্নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হিরাক্লিয়াসও তা-ই করেছে। সে যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা করেছে, অনুপস্থিতিতে তাঁকে সম্মান করেছে, তা'জিম করেছে– কিন্তু সে রোমানদেরকে অতিমাত্রায় ভয় পেয়েছে, ফলে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। ঐসব কাফেরদের অবস্থাও এমনই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়েছেন– তাদের মা'রেফাত ছিল, কিন্তু হক্ব চেনার পরও তারা হকের কালিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেনি।

এ কারণে আমি বলি, ঈমান ইরাদাশ্রেণীভুক্ত বিষয়। হিন্দুস্তানের ভাষায় তার অনুবাদ হচ্ছে– 'মা-ননা' (মেনে নেয়া)। এটিই ঈমানের সঠিক ব্যাখ্যা। হাফেয ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহু তাআলা এ বিষয়টি ঈমানের জন্য অত্যাবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। এমনটা হলে তখন ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে স্বীকারোক্তি (الإقرار) দ্বারা আনুগত্য অবধারিত করে নেয়ার স্বীকারোক্তি ধরতে হবে। পক্ষান্তরে এর দ্বারা যদি শাহাদাতাইনের স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য হয়– যেমনটা প্রসিদ্ধ আছে– তাহলে জটিলতা থেকেই যাবে।" (ফয়জুল বারি, কিতাবুল ঈমান: ১/১২৫)

পাঠকের কাছে এবার আমার প্রশ্ন– ইবলিস যদি আদমকে সেজদা করব না বলে আল্লাহর একটি বিধান প্রত্যাখ্যান করার কারণে কিংবা গ্রহণ না করার কারণে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে–

১. যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই পাঁচটি হুকুম পালন করব না, তার বিধান কি হবে?
২. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই এই হুকুম পালন করব না, তা বিধান কি হবে?

৩. যে শপথ করে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আমি আল্লাহর এই হুকুমগুলো পালন করব না, তার বিধান কি হবে?

৪. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল, আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি নিজেও পালন করব না, কাউকে পালন করতেও দিব না, তার বিধান কি হবে?

৫. যে লিখিত প্রতিজ্ঞা করল আল্লাহর এই হুকুমগুলো আমি নিজেও পালন করব না এবং অন্যদেরকে পালন করা থেকে বিরত রাখার জন্য আমার সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব, তার বিধান কি হবে?

৬. যে তোমাকে লিখে দিল, আমার উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা একটি পবিত্র দায়িত্ব, তার বিধান কি হবে?

৭. যে ব্যক্তি উপরের সবগুলো কাজই করল, তার বিধান কি হবে? তবুও সে মুরতাদ হবে না?

আশা করি এমন অযৌক্তি উত্তর দেয়ার মতো বোকামি একজন পাঠকও করবেন না।

প্রিয় পাঠক! এবার দয়া করে একটু আমাদের সংবিধানটি খুলে দেখুন! আমাদের সংসদ সদস্যরা কত অসংখ্যবার এই সবগুলো কাজ করে রেখেছেন। আল্লাহর কত অসংখ্য বিধান সম্পর্কে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং শপথ করে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন– আমরা এই বিধানগুলো গ্রহণ করব না; বরং তার পরিবর্তে আমাদের বিধান হবে আমাদের স্বপ্রণীত কিংবা ইউরোপ আমেরিকার কাফের মুশরিকদের থেকে আমদানিকৃত।

দলীল নং-৪

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

(اِتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِاللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَـٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তারা যে অংশিদার স্থির করে, তা হতে তিনি পবিত্র।”(সূরা তাওবা: ৩১)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে স্বাভাবিকভাবে একটি ব্যাপার বুঝে আসে না যে, কিভাবে ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’ কারণ, বাহ্যত তারা তো তাদেরকে রব বলে বিশ্বাস বা স্বীকার করতো না বা তাদের ইবাদতও করতো না; বরং তারা আল্লাহকেই রব বলে স্বীকার করতো এবং তাঁরই ইবাদত করতো।

এ প্রশ্নের উত্তর হাদীস শরীফে এসেছে। ইমাম বুখারী রহ. (মৃত্যু: ২৫৬হি.)**‘আত-তারীখুল কাবীর’ এ বর্ণনা করেন–**

عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت إنا لسنا نعبدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتستحلون قلت بلى قال فتلك عبادتهم.اه

“আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন আমার গলায় একটি ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, হে আদী এই মূর্তিটি তোমার গলা থেকে ছুঁড়ে ফেল। আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। দেখলাম, তিনি সূরা বারাআ’র এই আয়াত তিলাওয়াত করছেন: ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’। আমি আরজ করলাম, আমরা তো তাদের ইবাদত করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবললেন, আল্লাহ তায়ালা যা হালাল করেছেন, তারা তা হারাম করতো আর তোমরাও তা হারাম মানতে এবং আল্লাহ তায়ালা যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করতো আর তোমরাও তাকে হালাল মেনে নিতে। আমি উত্তর দিলাম- হ্যাঁ, এমনটি তো হয়েছে। তিনি বললেন, এটিই তাদের ইবাদত।” (আত-তারিখুল কাবীর লিল ইমাম বুখারী, ৭ম খণ্ড: ৪৭১ নং হাদীস; সুনানে তিরমিযি: ৫০৯৩; আল-মু’জামুল কাবীর লিত তাবারানী: ১৭/৯২, ২১৮-২১৯; আস-সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ২০৩৫০)

এই হাদীস থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। পাদ্রী ও সংসারবিরাগীরা আল্লাহ কর্তৃক হালালকে হারাম, আর হারামকে হালাল

করতো। যার ফলশ্রুতিতে তারা মিথ্যা রবের স্থানে সমাসীন হয়েছে। আর যারা এক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, তারা বাস্তবে তাদেরকেই রব হিসেবে মেনে নিয়েছে। তারা যদিও আল্লাহ তায়ালারই ইবাদত করতো, কিন্তু জীবনের নানা ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে পাদ্রী ও সংসারবিরাগীদের বিধান গ্রহণ করেছিল। তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।

হুযায়ফা রাযি.-এর ব্যাখ্যা

عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة أرأيت قول الله اتخذوا أحبارهم؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله لهم حرموه، فتلك كانت ربوبيتهم.اه

“আবুল বাখতারী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা রাযি.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর বাণী اتخذوا أحبارهم সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি উত্তর দিলেন, তারা তো পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদের উদ্দেশ্যে নামায-রোজা করতো না, কিন্তু পাদ্রীরা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করতো তারাও তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক কোন হালালকে যদি পাদ্রীরা হারাম করতো, তারাও তা হারাম ধরে নিত। এটাই ছিল তাদেরকে রব হিসেবে মেনে নেয়া।”(তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৩৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর ব্যাখ্যা:

(اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ)قال عبد الله بن عباس: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم، ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، فسماهم الله بذلك أرباباً.اه

“আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, পাদ্রীরা তাদেরকে নিজেদের সিজদাহ্ করতে আদেশ করতো না; বরং তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দিত, আর তারা তাদের আনুগত্য করতো। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে রব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।” (তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং- ১৬৬৪১)

ইমাম ত্বাবারী রহ.(মৃত্যু: ৩১০হি.)-এর ব্যাখ্যা

ইমাম ত্বাবারী রহ.**أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ**এর ব্যাখ্যায় বলেন–

يعني سادة لهم من دون الله، يطيعونهم في معاصي الله، فيحلون ما أحلوه لهم مما قد حرمه الله عليهم، ويحرمون ما يحرمونه عليهم، مما قد أحله الله لهم.اهـ

"অর্থাৎ আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে মাননীয় সর্দার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করত। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত যে বিষয়কে তারা হালাল করত, এরা তাকে হালাল ধরে নিত। আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত যে বিষয়কে তারা হারাম করত, এরাও তাকে হারাম ধরে নিত।"(তাফসীরুত তবারী, খণ্ড: ১৪, পৃষ্ঠা: ২০৯)

ইমাম জাস্‌সাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.)

আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর ইমাম জাস্‌সাস রহ.বলেন–

ولما كان التحليل والتحريم لا يجوز إلا من جهة العالم بالمصالح ثم قلدوا هؤلاءأحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم وقبلوه منهم وتركوا أمر الله تعالى فيما حرم وحلل: صاروا متخذين لهم أربابا، إذ نزلوهم في قبول ذلك منهم منزلة الأرباب. اهـ

"হালাল বা হারামকরণ সকল মাসলাহাত ও কল্যাণ সম্পর্কে অবগত সত্তাব্যতীত অন্য কারো থেকে হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তারা হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে তাদের আলেম ও সংসারবিরাগীদের আনুগত্য করেছে এবং আল্লাহকর্তৃক আদিষ্ট হালাল-হারাম ছেড়ে দিয়ে তাদের হারাম-হালালকে গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতিতে তারা (যেন) তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। কেননা, তাদের থেকে হালাল-হারাম গ্রহণ করে তারা তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে।"(আহকামুল কুরআন: ৩/১৩৪-১৩৫)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, ইহুদী-খৃষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদের সামনে রুকু বা সিজদা করতো না। তারা যা করতো তা হল, ধর্মগুরুরা যা বৈধ করতো তাকে তারাও বৈধ হিসাবে মেনে নিতো। তারা যা অবৈধ ঘোষণা করতো তাকে তারাও অবৈধ হিসাবে মেনে নিতো। শরীয়তের বিধান ছেড়ে তারা ধর্মগুরুদের আনুগত্য করতো। একর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু এবং তাদের অনুসারী উভয় শ্রেণীকেই কাফের ঘোষণা দিয়েছেন।

ধর্মগুরুরা কাফের এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হালালকে অবৈধ আর হারামকে বৈধ করেছে। অথচ কোন কিছুকে বৈধ বা অবৈধ সাব্যস্ত করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তায়ালার। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

(إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)

'বিধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারোও ইবাদত করো না।' (সূরা ইউসূফ: ৪০)

কাজেই যারা নিজেরাই বিধান দিতে শুরু করেছে, আল্লাহর হালালকে অবৈধ কিংবা হারামকে বৈধ করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার রুবূবিয়্যাতে নিজেদেরকে শরীক দাবি করেছে। কাজেই তারা কাফের।

আর অনুসারীরা কাফের এ হিসেবে যে, তারা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের বিধান বাদ দিয়ে ধর্মগুরুদের দেয়া বিধান গ্রহণ করেছে। যেমন আনুগত্য আল্লাহ তায়ালার করার কথা তেমন আনুগত্য তারা ধর্মগুরুদের করেছে। আল্লাহ ও তাঁর শরীয়ত বাদ দিয়ে ধর্মগুরু এবং তাদের দেয়া বিধানের এই চূড়ান্ত আনুগত্যকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহর বিপরীতে ধর্মগুরুদের চূড়ান্ত আনুগত্য করার দ্বারা তারা মূলত তাদেরকে রবের স্থানে বসিয়েছে। তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে তাদেরকে আহবার ও রুহবানদের আবেদ সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা, এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নাসারাদের দুইপ্রকার কুফরের বিবরণ দিয়েছেন।

১. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা এবং তার ইবাদত করা।
২. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের বিধান গ্রহণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হওয়া।

আলেমরা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত বিধান প্রণয়ন করে মৌখিকভাবে না হলেও কর্মগতভাবে নিজেদেরকে রব বলে দাবি করেছিল। আর সাধারণ

জনগণ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে আলেমদের অনুসরণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছিল। এভাবে এ দু'শ্রেণী দুইপ্রকার কুফরে লিপ্ত হয়ে কাফের হয়ে গিয়েছিল।

প্রিয় পাঠক, কুফরী বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম নামধারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী উপরিউক্ত উভয় প্রকার কুফরীতেই লিপ্ত হয়েছে। একদিকে তারা শরীয়ত বিরোধী বিধান প্রবর্তন করে, আল্লাহর হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে নিজেদেরকে রবের আসনে বসিয়েছে, যেমনটা করেছিল ইহুদী খ্রিস্টানদের ধর্মগুরুরা। অপরদিকে জাতিসংঘের কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইনকে রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যপালনীয় এবং শিরোধার্য মেনে নিয়ে জাতিসংঘের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, যেমনটা করেছিল ইয়াহুদ-নাসারাগণ তাদের ধর্মগুরুদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে। কাজেই তারা তেমনি কাফের, যেমন কাফের ইয়াহুদ -নাসারারা এবং তাদের ধর্মগুরুরা। শুধু এতটুকুই নয়, বরং তারা আরোও জঘন্য কাফের। কারণ, তাদেরধর্মগুরুরা তো আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করেনি বরং ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত বিধান বানিয়েছিল মাত্র। কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠী শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত নয়। তারা তো সম্পূর্ণ শরীয়তকেই প্রত্যাখান করেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কুফরী আইন প্রবর্তন করেছে এবং নিজের পেটুয়া বাহিনী দিয়ে আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে; না মানলে গুরুতর অপরাধী সাব্যস্ত করে জঘন্য থেকে জঘন্যতর শাস্তি প্রদান করছে। কাজেই তারা শুধু কাফেরই নয় বরং অতি জঘন্য রকমের কাফের।

দলীল নং-৫

(قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)

'(ইহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবো না, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।' (সূরা আলে ইমরান: ৬৪)

এ আয়াত পূর্বোক্ত দলীলে আলোচিত সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের সমার্থক। এ আয়াতে দলীল নিম্নোক্ত অংশটুকু-

﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

'এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না।'

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের আহ্বান জানাও, 'আস, আমরা-তোমরা সাবাই ঐক্যবদ্ধ হই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবদত করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা নিজেরা একে অপরকে রব বানাবো না।'

রব বানানো দ্বারা উদ্দেশ্য– আল্লাহ তায়ালাকে ছেড়ে, তাঁর বিধান ছেড়ে আলেমদের এবং তাদের বানানো বিধানের আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা ইয়াহুদ-নাসারাকে আহ্বান জানাও, যেন তারা তোমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, তোমরা এবং তারা কেউই আল্লাহ ও তাঁর বিধান ছেড়ে অন্য কারো আনুগত্য করবে না। যদি তারা আহ্বানে সাড়া দেয় তো ভাল, অন্যথায় তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম। আমরা আল্লাহ ও তাঁর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করেছি। পক্ষান্তরে তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কুফরীতে লিপ্ত আছ।

ইমাম কুরতুবী রহ. (মৃত্যু: ৬৭১হি.) বলেন–

خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب. اهـ

"তাদেরকে এ আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের আলেমদেরকে রবের ন্যায় বানিয়ে নিয়েছে।" (তাফসীরে কুরতুবী: ৪/১০৫)

তিনি আরোও বলেন–

قوله تعالى:(ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله)أي لا نتبعه في تحليل شي أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى. وهو نظير قوله تعالى:" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله"[التوبة: 31] معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله. اهـ

“আল্লাহ তায়ালার বাণী- {এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না}; অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যা হালাল করেছেন, তা ব্যতীত হালাল বা হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না। এ বাণী আল্লাহ তায়ালার সেই বাণীর মতা, যেখান তিনি বলেছেন–‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে’। (সূরা তাওবা: ৩১) অর্থাৎ আল্লাহর হারাম ও হালালের বিপরীতে তাদের হারাম-হালালকে গ্রহণ করে তারা তাদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে।” (তাফসীরে কুরতুবী: ৪/১০৬)

আল্লামা সা’দী রহ. (মৃত্যু: ১৩৭৬হি.) বলেন–

{ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله}بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله، فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق، لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية. اهـ

“{আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না}; বরং সকলপ্রকার আনুগত্য হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। খালেকের নাফরমানীতে আমরা মাখলুকের আনুগত্য করবো না। কারণ এটা হচ্ছে, মাখলুককে রবের আসনে সমাসীন করা।” (তাফসীরে সা’দী: ১/১৩৩)

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন–

إذ كان الناس كلهم عبيد الله لا يستحق بعضهم على بعض العبادة ولا يجب على أحد منهم طاعة غيره إلا فيما كان طاعة لله تعالى وقد شرط الله تعالى في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان منها معروفا وإن كان الله تعالى قد علم أنه لا يأمر إلا بالمعروف لئلا يترخص أحد في إلزام غيره طاعة نفسه إلا بأمر الله تعالى كما قال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قصة المبايعات:{ولا يعصينك في معروف فبايعهن} فشرط عليهن ترك عصيان النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي يأمرهن به تأكيدا، لئلا يلزم أحدا طاعة غيره إلا بأمر الله وما كان منه طاعة لله تعالى.

....

وقوله تعالى:{ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله} أي لا يتبعه في تحليل شيء ولا تحريمه إلا فيما حلله الله أو حرمه. وهو نظير قوله تعالى:{اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم}...

وإنما وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوا أربابا لأنهم أنزلوهم منزلة ربهم وخالقهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحلله ولا يستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله تعالى الذي هو خالقهم والمكلفون كلهم متساوون في لزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه العبادة إليه دون غيره. اهـ

“সকল মানুষই যেহেতু আল্লাহর বান্দা, তাই তারা একে অপরের কাছ থেকে ইবাদত পাওয়ার হকদার নয় এবং আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের স্থান ব্যাতীত কারো উপর অন্যের আনুগত্য আবশ্যক নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও শর্ত লাগিয়েছেন যে, তা ন্যায়-সঙ্গত বিষয়ে হতে হবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা জানেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায় ব্যতীত ভিন্ন কিছুর আদেশ করবেন না। তা এজন্য করেছেন যে, কেউ যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ ব্যতীত অন্য কিছুতে কাউকে নিজের আনুগত্য করতে বাধ্য করার সুযোগ গ্রহণ না করতে পারে। বাইয়াতের ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, ‘এবং (যদি তারা এ শর্তে বাইয়াত হতে আসে যে,) কোন ভাল কাজে তারা আপনার অবাধ্যতা করবে না, তাহলে আপনি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন।’ (সূরা মুমতাহিনা: ১২) আল্লাহ তায়ালা মহিলাদের উপর শর্ত আরোপ করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে ভাল কাজের আদেশ দেবেন, তারা তাতে তাঁর অবাধ্যতা করতে পারবে না। এমনটি করেছেন গুরুত্বারোপের জন্য, যেন আল্লাহ তায়ালার আদেশ এবং তার আনুগত্যের বিষয় ব্যতীত কারও উপর অন্যের আনুগত্য আবশ্যক হয়ে না যায়।

আল্লাহ তায়ালার বাণী–{এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাবো না।} অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা হালাল বা হারাম করেছেন তা ব্যতীত, হালাল বা হারামের ক্ষেত্রে আমরা একে অন্যের অনুসরণ করবো না। এ বাণী আল্লাহ তায়ালার সেই বাণীর মতা, যাতে তিনি বলেছেন–{তারা আল্লাহকে

ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-জাযকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও}। (সূরা তাওবা: ৩১) ...

আল্লাহ তায়ালা এদেরকে এই বিশেষণে অভিহিত করেছেন যে, এরা পাদ্রী ও ধর্মজাযকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেননা, তারা তাদেরকে তাদের রব ও সৃষ্টিকর্তার আসনে সমাসীন করেছে। তারা তাদের এমন হালাল-হারামকে গ্রহণ করেছে, যাকে আল্লাহ তায়ালা হালাল বা হারাম করেননি। এধরনের আনুগত্যের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর তাঁর ইবাদত ও আদেশ পালন করা এবং ইবাদতকে শুধু তাঁরই সমীপে অর্পণ করা সকল বান্দার উপর সমভাবে আবশ্যক এবং সকলেই এক্ষেত্রে বরাবর।” (আহকামুল কুরআন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ২৯৭)

প্রিয় পাঠক, আশাকরি আমরা বুঝতে পেরেছি, হালাল-হারাম ও বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আনুগত্য মূলত ইবাদত। বিধান প্রণয়ন এবং হালাল ও হারামকরণ সেই সত্তার অধিকার, যিনি সকলের রব। সকলের প্রভু। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

‘স্মরণ রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ। আল্লাহ অতি বরকতময়, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।’ (সূরা আ’রাফ: ৫৪)

যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে নিজেরাই বিধান প্রণয়নে হাত দিয়েছে, নিজেরাই হালাল-হারাম করতে শুরু করেছে, তারা প্রকৃত অর্থে–মৌখিকভাবে না হলেও, কর্মগতভাবে–নিজেদেরকে রব দাবি করেছে। আর যারা আল্লাহর বিধি-বিধান, আল্লাহর হালাল-হারাম বাদ দিয়ে এদের বিধি-বিধান আর হালাল-হারামকে বেছে নিয়েছে, তারা মূলত এদের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে। এদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে। ফলত উভয়ই কাফেরে পরিণত হয়েছে। ইয়াহুদ-নাসারারা এ কুফরেই লিপ্ত হয়েছিল। মুসলিম নামধারী আমাদের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীও তাতে লিপ্ত হয়েছে। কাজেই তারা তেমনি কাফের, যেমন কাফের ছিল ইয়াহুদ-নাসারার জনসাধারণ এবং পাদ্রী ও ধর্মজাযকেরা।

দলীল নং-৬

....

(إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَه فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)

'যারা পিছন ফিরে চলে গেছে; ওদের সামনে সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও, নিশ্চয়ই শয়তান ওদের কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং ওদের (দূর-দূরান্তের) আশা দিয়েছে। তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করে, তাদেরকে ওরা বলেছে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।' আর আল্লাহ ওদের গোপন কথা-বার্তা জানেন। অতএব, তখন (ওদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান বের করবে ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে? তা এ জন্য যে, ওরা সেই পথের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে, ফলে তিনি ওদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।' (সূরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৮)

ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ–'পিছন ফিরে চলে গেছে' দ্বারা উদ্দেশ্য– ঈমান গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন–

{إن الذين ارتدوا على أدبارهم} أي: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر. اهـ

"{নিশ্চয়ই যারা পিছন ফিরে চলে গেছে} অর্থাৎ ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফরে ফিরে গেছে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩২০)

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন–

الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، قوم كفروا بعد إيمانهم .اهـ

"এটা স্পষ্ট যে, হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা পিছন দেকে ফিরে চলে গেছে, তারা এমন কিছু লোক, যারা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছে।" (আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪০)

এসব লোক কেন মুরতাদ হয়ে গেছে, এর কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ)

(তা এ জন্য যে, যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করেছে, তাদেরকে ওরা বলেছে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।')

অর্থাৎ যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও তার বিধি-বিধানকে অপছন্দ করে, সেসব কাফেরেদের সাথে এরা গোপনে ঐক্য করেছে যে, আমরা কোন কোন বিষয়ে আল্লাহর শরীয়তের বিধান না মেনে তোমাদের আনুগত্য করব। এটাই তাদের মুরতাদ হওয়ার কারণ। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে কাফেরদের আনুগত্যের এ সম্মতিকেই আল্লাহ তায়ালা রিদ্দাহ্ ও কুফর সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা দিয়েছেন।

আয়াতটি নাযিল হয়েছে মদীনার মুনাফিকদের ব্যাপারে। তারা গোপনে গোপনে ইহুদীদের সাথে আঁতাত করতো। ইহুদীদেরকে আশ্বাস দিত, প্রয়োজনের সময় তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে বের হবে না, বরং উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে সহায়তা করবে, ইহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলে তারাও তাদের সাথে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হবে। তাদেরকে সহায়তা করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন–

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾

"হে রাসূল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা ঘোষণা করে এখান থেকে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনোই অন্য কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো।" (সূরা হাশর: ১১)

শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. (মৃত্যু: ১৯১৪ইং.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'মাহাসিনুত-তাবীল'-এ বলেন–

ذلكإشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم،بأنهمأي بسبب أنهمقالواأي المنافقونللذين كرهوا ما نزل اللهأي لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلمسنطيعكم في بعض الأمرأي بعض أموركم، أو ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد، والتظاهر على الرسول، أو الخروج معهم إن أخرجوا، كما أوضح ذلك قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداًوَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ [الحشر: 11]، وهم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم.اهـ

“ذلك (যালিকা) দ্বারা ইশারা করা হয়েছে তাদের পূর্বোল্লিখিত ইরতিদাদের দিকে। আর তা এ কারণে যে, মুনাফিকরা ইহুদীদেরকে–যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অপছন্দ করেছে তাদেরকে– বলেছে, ‘আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মানব।’ অর্থাৎ তোমাদের কতক বিষয় কিংবা তোমরা যা আদেশ কর (তা মানবো)। যেমন, জিহাদ ত্যাগ করে বসে থাকা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সহায়তা করা, তাদেরকে বের করে দেয়া হলে তাদের সাথে বেরিয়ে যাওয়া। যেমনটা আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে পরিষ্কার বিবরণ দেয়া হয়েছে– ‘হে রাসূল, আপনি কি সেসব মুনাফিকের আচরণ লক্ষ্য করেননি, যারা তাদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলে, যদি তোমাদেরকে (কখনো এ জনপদ থেকে) বের করে দেয়া হয়, আমরাও তোমাদের সাথে (একাত্মতা প্রকাশ করে) বেরিয়ে যাবো এবং তোমাদের (স্বার্থের) বেলায় আমরা কখনোই অন্য কারো আনুগত্য করবো না। আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সহায়তা করবো।’ (সূরা হাশর: ১১)

তারা হচ্ছে, বনু কুরায়যা এবং বনু নযীর, যাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখতো।” (মাহাসিনুত-তাবীল: ৮/৪৭৬)

কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তারা মক্কার মুশরিকদের কাছে গিয়ে বলতো, মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আমরা তোমাদের সাথে আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তারা তাদেরকে সহায়তার আশ্বাস দিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী

বলে বিশ্বাস করার পরও প্রতিহিংসাবশত তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতো। তাঁর আনুগত্যের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করতো।

তবে নাযিলের প্রেক্ষিত যাই হোক, আয়াত ব্যাপক। আয়াতের বিধান শুধু তৎকালীন ইয়াহুদ বা মুনাফিকদের সাথে খাছ নয় এবং তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের বেলায়ই আয়াত প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কিতাব, শরীয়ত ও বিধি-বিধানকে যারা অপছন্দ করে, কোন কোন বিষয়ে শরীয়তের বিধানের বিপরীতে কাফেরদের বিধান মেনে নেবে বলে যারাই সম্মত হবে, তাদের উপরই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে। তারাই দ্বীন-ত্যাগী মুরতাদে পরিণত হবে। কারণ, তাফসীরের একটি মূলনীতি আছে–

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

অর্থাৎ “যে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আয়াত নাযিল হয়েছে, আয়াতের বিধান শুধু তার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আয়াতের বাহ্যিক ব্যাপক অর্থ যা কিছুকে শামিল করে, তার সব কিছুর উপরই আয়াতের বিধান প্রযোজ্য হবে।”(দেখুন ‘আল-ইহকাম’ লিল-আমুদী: ২/৩৪৭, ‘আল-মুওয়াফাকাত’ লিশ-শাতিবী: ১/৩০০, ‘মুনতাহাল উসূল’ লি-ইবনিল হাযিব: ৭৯, ‘আস-সারিমুল মাসলূল’ লি-ইবনি তাইমিয়া: ৩৩, ‘আহকামুল কুরআন লিল-জাসসাস: ১/১২৪, ২৯১ ...।)

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন–

واعلم أن هذه الآية الكريمة ، قد قال بعض العلماء: إنها نزلت في المنافقين.وقال بعضهم: إنها نزلت في اليهود ... والتحقيق الذي لا شك فيه ان هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله . اهـ

“জেনে রাখ, এই আয়াতে কারীমার ব্যাপারে উলামাদের কেউ কেউ বলেন, তা মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, তা ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। ... তবে বাস্তব সত্য, যাতে কোন সন্দেহ নেই, এ সকল আয়াত ব্যাপক। আয়াতের শব্দাবলী যা কিছু শামিল করে, তার সবই এগুলোতে অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে যে শাস্তি ও পরিণতির কথা বিধৃত হয়েছে তাও

ব্যাপক। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান যে অপছন্দ করে, তার আনুগত্য যে করবে তাদের প্রত্যেকের উপরই তা বর্তাবে।” (আদওয়াউল বায়ান: ৭/৪৪২)

প্রিয় পাঠক! বক্ষমাণ আয়াতের এতটুকু আলোচনাই মনে হয় যথেষ্ট। আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে: ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্রান্স-রাশিয়া, ইনল্যান্ড আর জাতিসংঘ থেকে আমদানীকৃত, কাফেরদের প্রণীত, কুফরী বিধানের অনুসারী মুসলিম নামধারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই মুমিন নয়। বরং তারা দ্বীনে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত কাফের ও মুরতাদ। যেখানে কোন কোন বিষয়ে কাফেরদের বিধান মেনে নিলেই কাফের হয়ে যায়, সেখানে আজ যারা গোটা শরীয়ত প্রত্যাখান করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুফরি বিধান প্রবর্তন করেছে, তারা কিভাবে ঈমানদার থাকতে পারে!? আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন!

দলীল নং-৭

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)

‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ।নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।’ (সূরা আনআম: ১২১)

যেসব জন্তু দেবতাদের নামে যবেহ করা হয় কিংবা যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, সেগুলো খাওয়া হারাম করে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন–

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)

‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না।’ (সূরা আনআম: ১২১)

তখন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের সাথে বিতর্কে জড়ায়। তারা বলে, ‘তোমরা কিভাবে আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় পথে চলার দাবি কর, অথচ তোমরা নিজ হাতে যা জবাই কর তা খাও, আর আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে যা জবাই করে দেন–অর্থাৎ মৃত জন্তু–তা খাও না?! তাহলে কি তোমরা আল্লাহর চেয়েও উত্তম?!’

তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন–

(وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)

'নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।' (সূরা আনআম: ১২১)

অর্থাৎ তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য করে আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের বিধানের বিপরীতে কাফেরদের বিধান গ্রহণ করে নাও তাহলে তোমরাও তাদের মতো মুশরিক হয়ে যাবে।

শরয়ী বিধানের বিপরীতে কাফেরদের আনুগত্য করা এবং তাদের বিধান গ্রহণ করে নেয়াকে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে শিরক আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.) বলেন–

وإن أطعتموهم فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه إنكم لمشركون مثلهم. اه

"তারা তোমাদেরকে যা করার আদেশ দেয় এবং যা থেকে বারণ করে, যদি তোমরা সেগুলোতে তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও তাদের মতো মুশরিক হয়ে যাবে।" (ফাতহুল কাদীর: ২/১৮০)

ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله، وما ذبح الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله: {وإن أطعتموهم} فأكلتم الميتة {إنكم لمشركون} وهكذا قاله مجاهد، والضحاك، وغير واحد من علماء السلف، رحمهم الله.

وقوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك، كما قال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون] } [التوبة:

....

31] . وقد روى الترمذي في تفسيرها، عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم، فقال: "بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم".اهـ

"সুদ্দী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, মুশরিকরা মুমিনদেরকে বলল, তোমরা কিভাবে দাবি কর যে, তোমরা আল্লাহ তায়ালার পছন্দের অনুসরণ কর; অথচ আল্লাহ তায়ালা যা জবাই করেন তা খাও না, আর তোমরা নিজেরা যা জবাই কর তা খাও?! এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর' অর্থাৎ (তাদের কথা মতো) মৃত প্রাণী খাও, 'তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে'। মুজাহিদ রহ. এবং জাহ্হাক রহ.সহ উলামায়ে সালাফের অনেকে – রাহিমাহুমুল্লাহ – এমনই বলেছেন।

আল্লাহর তায়ালার বাণী– 'যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে'। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দাও তাহলে সেটিই হবে শিরক, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যে শরীক স্থির করে, তিনি তা থেকে পবিত্র।'(সূরা তাওবা: ৩১) ইমাম তিরমিযি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদি. থেকে বর্ণনা করেন– তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা তো তাদের ইবাদত করতো না। তিনি জওয়াব দিলেন, তা ঠিক। কিন্তু তারা তাদের জন্য হারামকে হালাল করতো; হালালকে হারাম করতো, আর তারা তাদের অনুসরণ করতো। এটাই তাদের ইবাদত।" (তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:৩, পৃষ্ঠা: ৩২৮-৩২৯)

ইবনে কাসীর রহ. আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আনুগত্যকে {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} এ আয়াতে বিবৃত ইয়াহুদ-নাসারার জনগণ কতৃক তাদের আলেমদের আনুগত্যের অনুরূপ সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বিধান ছেড়ে আলেমদের আনুগত্য করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করে নেয়া যেমন শিরক ছিল, অন্যান্য কাফেরদের আনুগত্যকরত শরয়ী বিধানের বিপরীতে তাদের বিধান গ্রহণ করে নেয়াও তেমনি শিরক।

বি.দ্র.

এ আয়াতে শরীয়তের একটিমাত্র বিধান– মৃত প্রাণী ভক্ষণ না করার বিপরীতে কাফেরদের বিধান গ্রহণ করাকে শিরক আখ্যায়িত করা হয়েছে; তাহলে আজ যারা গোটা শরীয়ত প্রত্যাখান করে কাফেরদের আনুগত্যকরত জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের বিধান গ্রহণ করছে এবং অনুরূপ কুফরি বিধান নিজেরাও প্রবর্তন করছে, তাদের বিধান কি হবে??

আল্লামা শানক্বিতী রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন–

أَنَّ مُتَّبِعِي أَحْكَامِ الْمُشَرِّعِينَ غَيْرِ مَا شَرَعَهُ الله أَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِالله، وَهَذَا الْمَفْهُومُ جَاءَ مُبَيَّنًا فِي آيَاتٍ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ فِيمَنِ اتَّبَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانِ فِي إِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ بِدَعْوَى أَنَّهَا ذَبِيحَةُ الله: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، فَصَرَّحَ بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ بِطَاعَتِهِمْ، وَهَذَا الْإِشْرَاكُ فِي الطَّاعَةِ، وَاتِّبَاعِ التَّشْرِيعِ الْمُخَالِفِ لِمَا شَرَعَهُ الله تَعَالَى. اهـ

“আল্লাহ তায়ালার প্রদানকৃত শরীয়ত ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রণেতাদের দেয়া বিধানের অনুসারীরা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরককারী। এ বিষয়টি অন্যান্য আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি মৃত প্রাণী বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শয়তানের বিধানের আনুসরণ করে এই যুক্তি দিয়ে যে, এটা তো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যবেহকৃত, তার ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণী– ‘যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ গোনাহ। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।’ (সূরা আনআম: ১২১) আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তাদের অনুসরণ করলে এরা মুশরিক হয়ে যাবে। আর এটি হচ্ছে আনুগত্য ও আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীত ভিন্ন বিধানের অনুসরণের ক্ষেত্রে শিরক।” (তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৫৯, সূরা: আল-কাহ্ফ।)

তিনি আরো বলেন–

فَهِيَ فَتْوَى سَمَاوِيَّةٌ مِنَ الْخَالِقِ - جَلَّ وَعَلَا - صَرَّحَ فِيهَا بِأَنَّ مُتَّبِعَ تَشْرِيعِ الشَّيْطَانِ الْمُخَالِفِ لِتَشْرِيعِ الرَّحْمَنِ - مُشْرِكٌ بِاللهِ .اهـ

"এটি মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসমানী ফতওয়া। এতে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, রহমানের শরীয়তের বিপরীত শয়তানের বিধানের অনুসারী ব্যক্তি মুশরিক তথা আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরিককারী।" (তাফসীরে আদ-ওয়াউল বয়ান, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৫৪, সূরা: আশ-শূরা।)

প্রিয় পাঠক! উপরিউক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার– যারা ইসলামী শরীয়তের বিপরীতে কোনো ব্যক্তির বিধান গ্রহণ করে এবং তার অনুসরণ করে, চাই তা একটিমাত্র বিধানেই হোক না কেন– তারা মুশরিক। তাহলে ঐ সকল ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে, যারা আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত প্রত্যাখান করে ইউরোপ-আমেরিকা, ফ্রান্স-রাশিয়া আর জাতিসংঘের আইনকে নিজেদের জীবনবিধান বানিয়ে নিয়েছে? শুধু তাই নয়, এসব কুফরী আইন দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে? আল্লাহর বান্দাদেরকে তা মানতে বাধ্য করছে? অধিকন্তু নিজেরাও বিভিন্ন কুফরী আইন প্রণয়ন করছে? অবশ্যই তারা মুমিন ও মুসলিম নয়। হতে পারে না। বরং তারা মুশরিক। যাদের তারা আনুগত্য করছে, তাদেরকে তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছে।

দলীল নং-৮

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

"নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।" (সূরা তাওবা: ৩৭)

আল্লাহ তায়ালার শরীয়তবিরোধী আইন প্রবর্তন যে কুফরে আকবার, তার অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলীল সূরা তাওবার ৩৭ নং আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা

জাহেলী যমানার আরবীয় মুশরিক নেতাদের শরীয়তবিরোধী আইন প্রণয়নের বিবরণ দিয়েছেন এবং সেটাকে কুফরে আকবার সাব্যস্ত করেছেন।

আরবের মুশরিকরা মিল্লাতে ইবরাহীমিয়্যা'র বিকৃতি সাধন সত্ত্বেও আশহুরে হুরুম তথা সম্মানিত মাসগুলোর তা'জীম করত। সম্মানিত মাস চারটি। তিনটি লাগাতার আর একটি আলাদা। লাগাতার তিনটি হল– ১. যিলকদ ২. যিলহজ্ব ও ৩. মুহাররাম এবং অপরটি ৪. রজব। এ চার মাসে সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা কঠোরভাবে তা মেনে চলত। তারা অতি যুদ্ধ পিপাসু জাতি হওয়া সত্ত্বেও এ চার মাসে কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহে জড়াত না। স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে সামনে পেলেও হত্যা করতো না।

এভাবে যুগের পর যুগ চলে আসছিল। এক সময় কিনানা গোত্রের 'ক্বালাম্মাস' নামক ব্যক্তি আরবের নেতৃত্ব পায়। সে এসে প্রস্তাব করে, প্রতি বছর যিলকদ-যিলহজ্ব-মুহাররাম লাগাতার এই তিন মাস যুদ্ধ ছাড়া থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমরা মুহাররাম মাসের হুরমত ও নিষিদ্ধতাকে তার পরের মাস অর্থাৎ সফর মাসে নিয়ে যাব। এবারের বছর সফর মাসকে আমরা ধরব হারাম তথা যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাস আর মুহাররাম মাসকে বানিয়ে নেব হালাল তথা যুদ্ধ-অনুমোদিত মাস। এভাবে আমরা মুহাররাম মাসে যুদ্ধ করব আর তার পরের সফর মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব। তার প্রস্তাব আরবরা মেনে নিল।

পরের বছর তারা এর বিপরীত করত। অর্থাৎ ইব্রাহীমি ধর্মমতে মুহাররাম মাস হারাম হিসেবেই বহাল থাকত আর সফর মাস, যেটাকে তারা গত বছর হারাম সাব্যস্ত করেছিল এবছর সেটা ধর্মে যেমন হালাল ছিল, তেমন হালালই ধরত। এভাবে তারা আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মাসকে হালাল; আর হালালকৃত মাসকে হারাম করে যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ করে নিত। তাদের এ পরিবর্তিত রীতির ফলে বছরের হারাম মাসের সংখ্যা যদিও চারটি চারটিই থাকত, কিন্তু হারাম মাস হালাল হয়ে যেত; আর হালাল মাস হারাম হয়ে যেত। আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত মুহাররাম মাস হালাল হত আর হালালকৃত সফর মাস হারাম হত।

'ক্বালাম্মাস'-এর মৃত্যুর পর তার বংশধরদের মাঝে নেতৃত্বের ধারা চলে আসতে থাকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষ ক্বালাম্মাসের রেখে যাওয়া রীতি অনুসারে হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে থাকে। এভাবে আসতে আসতে সর্বশেষ তাদের নেতৃত্ব আসে তারই বংশধর

....
'জুনাদাহ্ ইবনে আউফ'-এর হাতে। তার নেতৃত্বের সময়ই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। আরবরা যখন হজ্ব থেকে ফারেগ হত, তখন সে সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিত। রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্ব মাসকে ধর্মের নিয়ামানুযায়ী হারাম ঘোষণা করত; আর মুহাররাম মাসকে যুদ্ধের স্বার্থে হালাল বলে ঘোষণা দিত। মুহাররামের পরিবর্তে তার পরবর্তী সফর মাসকে হারাম ঘোষণা দিত। পরবর্তী বছর ধর্মের নিয়মানুযায়ী মুহাররামকে হারাম আর সফরকে হালাল ঘোষণা দিত। শরীয়তের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করণের এ জঘন্য কর্মকে কুফর সাব্যস্ত করে আল্লাহ তায়ালা সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

"নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া (কাফেরদের পূর্ববৎ কুফরের উপর আরোও নতুন) কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেরদের (পূর্ববৎ পথভ্রষ্টতার উপর আরোও) পথভ্রষ্ট করা হয়। তারা এ (পিছিয়ে দেয়া মাস) টি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা (অর্থাৎ চার) ঠিক রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমলসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফের কওমকে হিদায়াত দেন না।" (সূরা তাওবা: ৩৭)

'কুফর বৃদ্ধি করে' অর্থ– কাফেররা কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। এখন হারাম মাসকে হালাল আর হালাল মাসকে হারাম করার দ্বারা কর্মগত কুফরে লিপ্ত হয়ে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে আরোও কুফর যুক্ত করল।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার যে, শরীয়তের হারামকে হালাল করা কিংবা হালালকে হরাম করা কুফরে আকবার।

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন–

" وقال عز وجل: " إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عام ليوطؤا عدة ما حرم الله " .

قال أبو محمد: وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه اهـ

"আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, (নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা কাফেররা পথভ্রষ্ট হয়। তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখতে পারে।) ... কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য জাতীয় নয়। অতএব প্রমাণিত হল– মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা কর্মমাত্র। তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব, যে আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে অথচ সে জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন– সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।" (আল-ফিছাল: ৩/২৪৫)

ইবনে হাযম রহ. এর বক্তব্যে আয়াতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা চলে এসেছে–

এক.

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ– "নিশ্চয় কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করে" এখানে কুফর বৃদ্ধি' দ্বারা কুফরে আকবার–বড় কুফর উদ্দেশ্য। কারণ, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উক্ত কর্মের কারণে তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন কুফর যুক্ত করেছেন। স্পষ্ট যে, কাফেররা আগে থেকে যে কুফরে লিপ্ত ছিল তা কুফরে আকবার ছিল। তাদের পূর্বের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর যুক্ত হয়ে তাদের কুফরে আরোও বৃদ্ধি করেছে তা হুবহু ঐ ধরনের কুফরই হবে যে ধরনের কুফরে তারা পূর্ব থেকে লিপ্ত ছিল। তারা কুফরে আকবারে লিপ্ত ছিল। কাজেই তাদের কুফরের সাথে নতুন যে কুফর বৃদ্ধি হয়েছে তাও কুফরে আকবার। কাজেই বুঝা গেল, হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করা কুফরে আকবার।

ইবনে হাযম রহ.তাঁর বক্তব্যের–

وبحكم اللغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تكون البتة إلا منه لا من غيره فصح أن النسيء كفر.

"কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে সে ভাষারই বিধানমতে, যা দ্বারা কোন বস্তুর বৃদ্ধি হয় তা ঐ জাতীয় বস্তুই হয়; অন্য বস্তু নয়। অতএব, প্রমাণিত হল মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর।" এ অংশের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই পরিষ্কার করেছেন।

শুধু ইবনে হাযম রহ. নয়, অন্যান্য ইমামগণও একই কথা বলেছেন। এটি ভাষার একটি সর্বজনবিদিত মূলনীতি। যেমন–

ইমাম জাসসাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন–

فأخبر الله أن النسيء الذي كانوا يفعلونه كفر لأن الزيادة في الكفر لا تكون إلا كفرا لاستحلالهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فكان القوم كفارا باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفرا بالنسيء. اهـ

"আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, মাস পিছিয়ে দেয়ার যে কাজটা তারা করত তা কুফর। কেননা কুফরে বৃদ্ধি হবে যা দ্বারা তা কুফরই হতে হবে। আর তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর হারামকে হালাল এবং আল্লাহর হালালকে হারাম করত। তারা প্রথমত কুফরী আকীদা বিশ্বাসের কারণে কাফের ছিল; পরে মাস পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা তাদের কুফর আরোও বৃদ্ধি পেল।" (আহকামুল কুরআন: ৪/৩০৯)

দুই.

কাফেরদের মাস পিছিয়ে দেয়াটা একটা আমল তথা বাহ্যিক কর্ম। আল্লাহ তায়ালা এ কর্মকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন। আয়াতে তাদের আকীদা বিশ্বাসের দিকে সামান্য ইশারা ঈঙ্গিতও করা হয়নি। অতএব বুঝা গেল, মাস পিছিয়ে দেয়ার এ বাহ্যিক কর্মটিই কুফর। তাতে লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে। তার আকীদা বিশ্বাস কি সেদিকে লক্ষ্য করার কোনই প্রয়োজন নেই।

ইবনে হাযম রহ. এ বিষয়টিই স্পষ্ট করেছেন তাঁর বক্তব্যের নিম্নোক্ত অংশে–

فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى فمن أحل ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه اهـ

“অতএব প্রমাণিত হল, মাস পিছিয়ে দেয়া কুফর। অথচ তা একটা কর্মমাত্র। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা। অতএব, যে আল্লাহ তায়ালার অবৈধকৃত কোন কিছুকে বৈধ করবে; অথচ সে জানে, আল্লাহ তায়ালা তা অবৈধ করেছেন, সে কেবল উক্ত কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।”

বি.দ্র.

১. ইসতিহলাল বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে

উপরিউক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বুঝা গেল ‘ইসতিহলাল’ তথা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা (অন্য ভাষায় একে ‘তাহলীল’ ও ‘তাহরীম’ও বলা হয়) আকীদা বিশ্বাসের মাধ্যমে যেমন হতে পারে, শুধু বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেও হতে পারে। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মাস পিছিয়ে দেয়াকেই কুফর সাব্যস্ত করেছেন, আকীদা-বিশ্বাসের শর্ত করেননি। অতএব, কোন ব্যক্তি কোন অকাট্য হারামকে হালাল কিংবা কোন অকাট্য হালালকে হারাম মনে করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, তদ্রূপ আন্তরিক বিশ্বাস ঠিক রেখে শুধু বাহ্যিক আইন প্রণয়ন করে তার বৈধতা দিয়ে দিলে কিংবা তাকে অবৈধ ঘোষণা করলেও কাফের হয়ে যায়।

২. শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রবর্তনই কুফর

মাস পিছিয়ে দেয়া শরীয়তের একটামাত্র বিধান পরিবর্তন। একেই আল্লাহ তায়ালা কুফর সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল, শরীয়তবিরোধী একটা আইন প্রণয়নই কুফর। অতএব, শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি যদি শরীয়তের উপর হয় এবং রাষ্ট্রে পূর্ণ শরীয়ত কায়েম থাকে, কিন্তু কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের কোন একটি অকাট্য আইন অপসারণ করে তদস্থলে কুফরী বিধান জারি করে, সে অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে–যেমন, মদের বৈধতা দিয়ে দেয় কিংবা সুদের বৈধতা দিয়ে দেয়–তাহলে তাই কুফর হবে এবং এ কর্মে লিপ্ত শাসক কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

একটা আইন পরিবর্তনকারী শাসকই যদি কাফের হয়, তাহলে যারা গোটা শরীয়তকে শাসন ব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুফরী বিধান প্রবর্তন করেছে তাদের বিধান কি হবে??

দলীল নং-৯

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)

এ আয়াতে مِن ('মিন' অব্যয়টি) যদি تبعيض (অংশবিশেষ)-এর অর্থে হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ হবে–

'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শুরা: ২১)

আর যদি তা بيانية (বিবরণের জন্য) হয়, তাহলে অর্থ হবে–

'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শুরা: ২১)
'এমন বিধান, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি' দ্বারা শরীয়তবিরোধী বিধান উদ্দেশ্য। আর 'এমন দ্বীন, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি' দ্বারা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন তথা 'ইসলাম' ভিন্ন অন্য দ্বীন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাফেরদের শরীকরা কোন কোন বিষয়ে তাদেরকে এমন কিছু বিধান দিয়ে থাকতে পারে, যেগুলো ইসলামবিরোধী; কিংবা এমনও হতে পারে যে, বিষয়টি শুধু কিছু বিধান দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে এক ভিন্ন দ্বীন-ই প্রণয়ন করে দিয়েছে, যে দ্বীন অনুযায়ী তারা তাদের সামগ্রিক জীবন পরিচালনা করে।

এ আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী এ আয়াতের সাথে–

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ)

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধানই বিধিত করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে এবং যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।' (সূরা শূরা: ১৩)
অর্থাৎ মৌলিকভাবে আমাদের শরীয়ত ও অন্যান্য নবী–আলাইহিমুস সালাম–এর শরীয়তে কোন ব্যবধান নেই। মৌলিক দাওয়াত এবং মৌলিক বিধি-বিধান সকল নবীর শরীয়তেই এক। তবে যামানা বা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার কারণে এবং আরোও বিভিন্ন কারণে তাফসীলী বিধি-বিধানে ভিন্নতা

এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন যামানার লোকজনকে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দেয়া হয়েছে। মৌলিক বিষয় সব শরীয়তেই এক ও অভিন্ন। এখানে বিশেষ মর্যাদার কারণে হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা–আলাইহিমুস সালাম–এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যথায় সকল নবীর শরীয়তই এখানে উদ্দেশ্য।

আল্লামা আলূসী রহ. (মৃত্যু: ১২৭০হি.) বলেন–

وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ...

وإلا فما من نبي إلا وهو مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع والأحكام. اهـ

"কয়েকজন নবী–আলাইহিমুস সালাম–কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের শান-মান-মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণে এবং তারা বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে। ... অন্যথায় দ্বীনে ইসলাম কায়েম করা, তথা তাওহীদ ও শরীয়তের ঐসব মৌলিক উসূল ও বিধান, যেগুলো যামানা কিংবা জাতি-গোষ্ঠীর ভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয় না এবং যেগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিশেষ কয়েকজন নবী আদিষ্ট হয়েছেন, অন্য সকল নবীও সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট।" (রূহুল মাআ'নী: ১৩/২১)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে ঐ শরীয়ত পালনের আদেশ দিচ্ছেন, যে শরীয়ত তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন; মৌলিক দিক থেকে যে শরীয়ত অন্য সকল নবীর শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যারা এই শরীয়ত ছেড়ে মানব বা জীন শয়তানদের প্রণীত কিংবা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রণীত বিধি-বিধান কিংবা তাদের রচিত দ্বীন ও জীবন-ব্যবস্থার অনুসরণ করে, তাদেরকে ধমকি প্রদর্শনপূর্বক বলছেন–

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)

'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শুরা: ২১)

আয়াতে ইবারত উহ্য আছে। পূর্ণ ইবারত হবে নিম্নরূপ–যেমনটা **ইমাম নাসাফী রহ. (মৃত্যু: ৭১০হি.)** বলেছেন,

أيقبلون ما شرع الله من الدين أم لهم آلهة{شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ الدين مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله}. اهـ

"আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন/দ্বীনের বিধান দিয়েছেন, তারা কি তা গ্রহণ করবে? 'না তাদের এমন কিছু উপাস্য আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (তাফসীরে নাসাফী: ৩/২৫১)
সহজ কথায় একে এভাবে বলা যায়–যেমনটা **কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী রহ. (মৃত্যু: ১২২৫হি.)** বলেছেন–

أيقبلون ما شرع الله أم يقبلون ما شرع لهم شركاؤهم. اهـ

"তারা কি আল্লাহর দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে, না তাদের শরীকদের দেয়া দ্বীন/বিধান গ্রহণ করবে?" (তাফসীরে মাযহারী: ৮/৩১৬)
লক্ষণীয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত বা শরীয়তের বিধি-বিধান ছেড়ে কাফেররা যেসব শয়তান, জীন বা ব্যক্তির প্রণীত দ্বীন বা বিধান গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে তাদেরকে 'শরীক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর অর্থ– যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করেছে, তারা যেন নিজেদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক দাবি করেছে, আর যেসব কাফের তাদের প্রণীত দ্বীন/বিধান গ্রহণ করেছে, তারা যেন এদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং এদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

ইমাম নাসাফী রহ.-এর পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যা থেকেও এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি شُرَكَاءُ(শুরাকা)-এর ব্যাখ্যা করেছেন آلهة(ইলাহসমূহ)।

ইমাম বাগাবী রহ. (মৃত্যু: ৫১০হি.) বলেন–

قوله تعالى:أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني كفار مكة، يقول ألهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام. اهـ

"আল্লাহর বাণী–'না তাদের এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদেরকে এমন দ্বীন/ দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' (সূরা শুরা: ২১) উদ্দেশ্য মক্কার কাফেররা। আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'তাদের কি এমন কতিপয় উপাস্য রয়েছে, যারা তাদের এমন দ্বীন/দ্বীনের বিধান প্রণয়ন করে

দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?' ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, 'তাদেরকে ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন প্রণয়ন করে দিয়েছে'।" (তাফসীরে বাগাবী: ৪/১৪৩)

এখানে তিনিও شُرَكَاءُ(শরীক)এর ব্যাখ্যা করেছেন آلهة(ইলাহ)। অতএব যারা ইসলামের বিপরীতে ভিন্ন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করে, তারা হচ্ছে মা'বূদ আর তাদের দ্বীন/বিধানকে যারা মেনে চলে তারা তাদের ইবাদতকারী, তাদেরকে রব ও মা'বূদরূপে গ্রহণকারী। এতএব এ উভয় শ্রেণীই কাফের। প্রণেতারা প্রণয়নের কারণে, অনুসারীরা অনুসরণের কারণে।

ইমাম আবু মানসূর মাতুরীদি রহ. (মৃত্যু: ৩৩৩হি.) বলেন–

أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع و (شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله)؛ أي: ما لم يأمر به اللَّه، وهم كذلك كانوا يفعلون، يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان، فيتبعون به، والرسل - عليهم السلام - قد أتوهم بالدِّين بالحجج والبراهين من اللَّه - تعالى - فلم يتبعوهم، فيقولون: إنهم بشر، ثم يتبعون بشرًا بلا حجة ولا برهان ... فكانالمراد من الشركاء هم الرؤساء والقادة، واللَّه أعلم. اهـ

"সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই (তাদের) অনুসারিদের জন্য আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ দেননি, এমন দ্বীন/বিধান প্রণয়ন করত। তারা এমনটাই করত। কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিজেদের থেকেই অনুসারিদের জন্য দ্বীন ও বিধান প্রণয়ন করত, আর অনুসারিরা তা অনুসরণ করত। রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের নিকট অকাট্য দলীল-প্রমাণসহ দ্বীন নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারা তার অনুসরণ করত না। বলতো, তারা তো (আমাদের মতো) মানুষই। পরক্ষণেই আবার কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া (তাদের মতো)মানুষেরই অনুসরণে লিপ্ত হত। ... এতএব, شركاء(শরীক) দ্বারা সর্দার ও নের্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই উদ্দেশ্য। ওয়াল্লাহু আ'লাম।" (তাফসীরে মা-তুরীদি: ৯/১২০)

ইমাম মাতুরীদি রহ. পরিষ্কার করে দিয়েছেন, সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকজন, যারা আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে বিধান প্রণয়ন করতো, এ আয়াতে شركاء(শরীক) দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। সাধারণ কাফেররা তাদেরই অনুসরণ করতো।

....

প্রিয় পাঠক! উপরিউক্ত আয়াত থেকে একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে যে কেউ আইন প্রণয়ন করবে–চাই সে জীন হোক, শয়তান হোক কিংবা মানুষ সে-ই এই কর্মের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর শরীক ও রব হওয়ার দাবিদার বলে গণ্য হবে।

আল্লামা শানকীতি রহ. (মৃত্যু: ১৩৯৩হি.) বলেন–

وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله، في تشريع مخالف لما شرعه الله، قفد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله:(وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ)فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد.وقوله تعالى:(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله)فقد سمى تعالى الذي يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء . اهـ

“মোট কথা– কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তিই গাইরুল্লাহর আনুগত্য করল; তার প্রণীত শরীয়তবিরোধী আইনকে গ্রহণ করল, সে-ই উক্ত গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করল। একথাই প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালার বাণী– ‘আর এভাবে অনেক মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা শোভিত করেছে।’ (সূরা আনআম: ১৩৭) সন্তান হত্যায় তাদের আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালার এ বাণীও তা প্রমাণ করে– ‘তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে কি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?’ (সূরা শূরা: ২১) আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন দেননি এমন দ্বীন যারা প্রণয়ন করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শরীক বলে আখ্যায়িত করেছেন।” (আদওয়াউল বায়ান, সূরা: আশ-শূরা, ৭/১৫৬)

সম্মানিত পাঠক! আজ আমরা মুসলিম নামধারী আমাদের শাসকগোষ্ঠীর দিকে তাকাই। তারা এ উভয় প্রকার কুফরেই লিপ্ত রয়েছে। একদিকে আন্তর্জাতিক কাফের গোষ্ঠী, জাতিসঙ্ঘ এবং তাদের আইন-কানূনের আনুগত্য করে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার রুবূবিয়্যাতে শরীক; অপরদিকে শরীয়তবিরোধী নেজাম ও আইন কানূন প্রণয়ন করে নিজেদেরকেওআল্লাহর শরীকের আসনে সমাসীন করেছে।

বি.দ্র.

দ্বীন বলা হয়, কোন ব্যক্তি যা নিজের জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করে এবং বাস্তব জীবনে তা মেনে চলে; চাই তা হক্ব হোক কিংবা বাতিল।

অনুরূপ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হোক বা জীন, শয়তান কিংবা মানুষের বানানো হোক।

দলীল:
আল্লাহ তায়ালার বাণী−

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)

'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।' (সূরা কাফিরূন: ৬)
এখানে আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত এবং কাফেরদের মনগড়া মতবাদ, উভয়কেই দ্বীন বলা হয়েছে।

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)

'আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।' (সূরা আলে ইমরান: ৮৫)

এখানে ইসলাম ব্যতীত অন্য মতবাদকে দ্বীন বলা হয়েছে।

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّه إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ)

'ফেরাউন বলল আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি; আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা হয়− সে তোমাদের দ্বীন বদলে ফেলবে।' (সূরা মু'মিন: ২৬)
ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪) বলেন−

يخشى فرعون أن يُضِلَّ موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم. اه

"ফেরাউন আশঙ্কা করছে, মূসা আলাইহিস সালাম লোকজনকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে এবং তাদের রুসূম-রেওয়াজ এবং অভ্যাস ও রীতিনীতি পরিবর্তন করে ফেলবে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/১৩৯)
এখানে ফেরআউনী সমাজে প্রচলিত মনগড়া রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানূনকে দ্বীন বলা হয়েছে।

(كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)

‘এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর এই ইচ্ছা না হলে বাদশার দ্বীন অনুযায়ী ইউসুফের পক্ষে তার ভাইকে তার নিজের কাছে রাখা সম্ভব ছিল না।’ (সূরা ইউসুফ: ৭৬)

এখানে মিশরের কাফের বাদশার রাষ্ট্রীয় আইনকে দ্বীন বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

{ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ } أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيره. اهـ

“অর্থাৎ মিশরের বাদশার আইন অনুযায়ী তার ভাইকে তার কাছে রাখার অধিকার ছিল না। জাহ্হাক রহ.সহ আরো অনেকে এমনই বলেছেন।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪০১)

আবুস সাউদ রহ. (মৃত্যু: ৯৮২হি.) বলেন–

في حكمه وقضائِه قاله قتادة ... لأن جزاءَ السارقِ في دينه إنما كان ضربَه وتغريمَه ضعفَ ما أخذ دون الاسترقاق والاستعباد كما هو شريعةُ يعقوبَ عليه السلام. اهـ

“বাদশার আইন ও ফায়সালা অনুযায়ী (তার ভাইকে তার কাছে রাখা সম্ভব ছিল না।) কাতাদাহ রহ. এমনই বলেছেন। কারণ বাদশার আইনে চোরের শাস্তি ছিল, প্রহার এবং চুরিকৃত বস্তুর দ্বিগুণ জরিমানা। ইয়াকূব আলাইহিস সালামের শরীয়তের মতোগোলাম বানিয়ে রাখা, (বাদশার রাষ্ট্রীয় বিধান) ছিল না।” (তাফসীরে আবুস সাউদ: ৪/২৯৭)

দ্বীনের পরিচয় জানার পর আশাকরি অস্পষ্ট নয়– বর্তমান প্রচলিত কুফরী গণতন্ত্র মতবাদ মূলত একটা নতুন দ্বীন, নতুন ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারিরা এ ধর্মকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার শর্তেই নির্বাচনে দাঁড়ায়। এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ তথা সংবিধানের সম্মান রক্ষার শপথ নেয়। একে বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের সুদৃঢ় অঙ্গিকার করে। এর জন্যই তারা বাহিনী গঠন করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ ধর্মের বিধান অনুযায়ীই তারা চলে। বিচারাচারের প্রয়োজন হলে এ ধর্মের বিধান অনুযায়ীই বিচার চায়। এ ধর্মকেই তারা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। এর বিধান দিয়েই তাদের বিচারাচার করে। এ ধর্মের বিরোধিতা যারা করে, তারাই অপরাধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী... ইত্যাদী অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আল্লাহ

রাব্বুল আলামীনের ধর্ম যারা যমীনে বাস্তবায়ন করতে চায়, এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী তারাই জঙ্গী-সন্ত্রাসী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, নাশকতাকারী, উগ্রবাদী, শান্তিবিনষ্টকারী, মানবতাবিরোধী ... ইত্যাদী অপরাধে আখ্যায়িত হয়। অতি গুরুতর ও অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। তাদের উপর জঘন্য থেকে জঘন্য রকমের নির্যাতন করা হয়।

পাঠক! একটু ইনসাফের সাথে বিবেচনা করুন, বর্তমান দুনিয়াতে গণতন্ত্র ছাড়া ইসলামের পর আর এমন কোন ধর্ম আছে কি, যার অনুসারিরা কঠোরতা ও দৃঢ়তার সাথে তাদের ধর্ম পালন করে? নেই; কিছুতেই নেই। গণতন্ত্রের সামনে সকলেই (একমাত্র আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ছাড়া) নতি স্বীকার করেছে, কিন্তু গণতন্ত্র কারোও সামনে নতি স্বীকার করেনি। কাজেই এ ধর্মের ধারক বাহকরা, এ ধর্মের অনুসারিরা তেমনি কাফের, যেমন ইহুদী ধর্মের অনুসারিরা কাফের, যেমন খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারিরা কাফের, যেমন বৌদ্ধরা কাফের, যেমন হিন্দু-শিখরা কাফের।

তারা শুধু আমাদের শরীয়তের সাথেই কুফরী করেনি, তারা আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। সকল নবীর সকল কিতাব, সকল জাতির সকল ধর্ম প্রত্যাখান করে একমাত্র নিজেদের খাহেশাতকে তারা রব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ব্যাপারে ঐ কথাই প্রযোজ্য, যেমনটা **আল্লামা শাওকানী রহ. (মৃত্যু: ১২৫০হি.)** বলেছেন–

ولا شك ولا ريب أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وبشريعته التي أمر بها على لسان رسوله واختارها لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله. بل كفروا بجميع الشرائع من عند آدم عليه السلام إلى الآن، وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية. اهـ

“কোন সন্দেহ কোন সংশয় নেই যে, এটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর শরীয়তের সাথে কুফরী; যে শরীয়তের আদেশ তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দিয়েছেন, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত তিনি তার বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। বরং তারা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অবতীর্ণ সকল শরীয়তের সাথেই কুফরী করেছে। এদের বিরুদ্ধে

জিহাদ আবশ্যক। এদের সাথে কিতাল ফরযে আইন; যতক্ষণ না তারা ইসলামী বিধি-বিধান কবুল করে, তার সামনে আত্মসমর্পণ করে, পবিত্র শরীয়ত দিয়ে নিজেদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে এবং যত শয়তানী তাগুতের মাঝে তারা লিপ্ত আছে, তার সব থেকে বের হয়ে আসে।” (আদ-দাওয়াউল আ-জিল: ১২-১৩, (মাজমুআতুর রাসায়িলিল মুনিরিয়্যাহ্’ এর অন্তর্ভুক্ত একটি রিসালা।)

প্রিয় পাঠক! আয়াতের আলোচনার শুরুতে বলে এসেছি, شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ এর মধ্যে منঅব্যয়টি تبعيضকিংবা بيانيةউভয় অর্থেই হতে পারে। সেখানে এও বলে এসেছি,শরীয়তবিরোধী কোন দ্বীন তথা জীবনবিধান প্রণয়ন যেমন কুফর, শরীয়তবিরোধী কোন আইন প্রণয়নও তেমনি কুফর। অতএব গণতন্ত্র নামক এই কুফরী ধর্ম যারা প্রণয়ন করেছে, তারা যেমন কাফের; এই ধর্মের কোন একটা বিধান যারা প্রণয়ন করবে তারাও কাফের। সে মুখে যতই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়ুক, যতই নিজেকে মুসলমান দাবি করুক, নামায-রোযা যতই করুক– সে বেঈমান; সে মুরতাদ। এই কুফরী কর্ম থেকে যতক্ষণ ফিরে না আসবে, তার কোন দাবিই কাজে আসবে না, কোন ইবাদতই তার উপকার করবে না।

দলীল নং-১০

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

‘আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক।’ (সূরা নিসা: ৫৯)

এ আয়াতে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ের সমাধান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং একে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, যারা কুরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে ভিন্ন কোন উৎস থেকে সমাধান নিতে যাবে, তারা ঈমানদার নয়।

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) বলেন–

وقوله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله.

وهذا أمر من الله عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى:10] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} أي: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}

فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. اهـ

“(আর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতোবিরোধ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও।) (সূরা নিসা: ৫৯) মুজাহিদ রহ.সহ সালাফের অনেকে বলেন, ‘অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর কাছে নিয়ে যাও।’

এখানে আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিচ্ছেন– দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত যে কোন বিষয়ে লোকজনের মতবিরোধ দেখা দেবে, তা কিতাব-সুন্নাহ’র কাছে নিয়ে যেতে হবে। যেমন (অন্য আয়াতে) আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে।’ অতএব, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ যে ফায়সালা দেবে, যা সঠিক বলে সাক্ষ্য দেবে–তাই হক্ব। আর হক্বের পর গোমরাহি ব্যতীত আর কি থাকতে পারে! এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক।’ অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি এবং যেসব বিষয়ের সমাধান জানা নেই, সেগুলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলে সুন্নাহর কাছে নিয়ে যাও এবং তোমাদের পারস্পরিক মত-বিরোধের বিষয়ে এ দু’য়ের কাছেই বিচার দায়ের কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক।

....

এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে না যায়, আল্লাহর হুকুমের দ্বারস্থ না হয় সে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী নয়।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৫-৩৪৬)

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন,

جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. اهـ

"(কুরআন ও সুন্নাহর নিকট) এ প্রত্যার্পণকে ঈমানের অপরিহার্য দাবি ও লাযেম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাজেই, এ প্রত্যার্পণ যদি না হয়, তাহলে ঈমানও থাকবে না। কেননা, লাযেম না পাওয়া গেলে মালযূমও পাওয়া যায় না।" (ই'লামুল মুআক্কিয়ীন: ১/৪০)

আলে শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম রহ. (মৃত্যু: ১৩৮৯হি.) বলেন–

إنّ من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ... في الحكم به بين العالمين، والرّدِّ إليه عند تنازع المتنازعين، مناقضة ومعاندة لقول الله عزّ وجلّ: {فإنْ تنازعتُم في شيءٍ فرُدّوه إلى اللهِ والرسولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً}. اهـ

"সুস্পষ্ট কুফরে আকবারের একটি হল– আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর বিপরীতে 'আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ।' (সূরা নিসা: ৫৯) লোকজনের মাঝে বিচারাচার এবং বাদানুবাদে লিপ্তদের মাঝে মীমাংসার জন্য, মানবরচিত অভিশপ্ত আইনকে ঐ বিধানের স্থলবর্তী করা, যে বিধান রূহুল আমীন (জীবরাঈল আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন। ..." (রিসালাতু তাহকীমিল কাওয়ানীন পৃ. ১)

তিনি আরো বলেন–

وتأمل ما في ... قوله تعالى: {فإنْ تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلاً..} كيف ذكر النّكِرة، وهي قوله:

{شيء} في سياق الشرط، وهو قوله جلّ شأنه: {فإنْ تنازعتم} المفيد العمومَ فيما يُتصوّر التنازع فيه جنسا وقدرًا.

ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله: {إنْ كُنتُم تؤمنون بالله واليوم الآخر}. اهـ

"চিন্তা করে দেখ!আল্লাহ তায়ালার এ বাণীতে– 'আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলেরকাছে নিয়ে যাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটাই উৎকৃষ্টতর পন্থা এবং এর পরিণতিও সর্বাপেক্ষা শুভ।' (সূরা নিসা: ৫৯) দেখ কিভাবে আল্লাহ তায়ালা{شيء}'নাকেরা'কে শর্ত অর্থাৎ {فإنْ تنازعتم}এর মাঝে উল্লেখ করেছেন; যা যে কোন বিষয়ে যে কোন বিবাদকেই শামিল করে।

এরপর চিন্তা করে দেখ!আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান অর্জনের জন্য কিভাবে একে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা এ বাণীর মাধ্যমে– 'যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক'।" (রিসালাতু তাহকীমিল কাওয়ানীনপৃ. ১-২)

দলীল নং-১১

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

'কিন্তু না! আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে নেয়।' (সূরা নিসা: ৬৫)

এ আয়াতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তথা তাঁর আনীত শরীয়তকে বিচারক ও ফায়সালাকারী নির্ধারণ করাকে ঈমানের জন্য শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়, তাঁর প্রদত্ত ফায়সালাকে জাহিরী বাতিনী সর্বদিক থেকে মেনে নিতে হবে। তার সামনে ঐকান্তিকভাবে আত্নসমর্পণ করতে হবে। তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোনরূপ কুণ্ঠা, সংশয় বা আপত্তি থাকতে পারবে না। বাহ্যিকভাবেও তার প্রতি কোন ধরনের

বিরূপ ভাব দেখানো যাবে না। এই সবগুলোর সমন্বয় সাধন হলে তবে ঈমান সাব্যস্ত হবে।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট হানাফি ফক্বীহ ও মুফাসসির ইমাম জাস্সাস রহ. (মৃত্যু: ৩৭০হি.) বলেন–

باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}، وقال تعالى:{وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله}، وقال تعالى:{من يطع الرسول فقد أطاع الله}، وقال تعالى:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.

فأكد جل وعلا بهذه الآيات وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبان أن طاعته إطاعة الله، وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله.

وقال الله تعالى:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}، فأوعد على مخالفة أمر الرسول، وجعل مخالف أمر الرسول والممتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان، بقوله تعالى:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}...

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. اهـ

“পরিচ্ছেদ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের।' ইরশাদ করেন, 'আমি কোন রাসূল এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, আল্লাহর আদেশক্রমে তার আনুগত্য করা হবে।' আরো ইরশাদ করেন, 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।' (সূরা নিসা: ৮০) আরো ইরশাদ করেন, 'কিন্তু না (হে নবী)! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে।'

আল্লাহ তয়ালা এ সকল আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য যে ফরয, তাকিদের সঙ্গে তা বুঝিয়েছেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য এবং এর মাধ্যমে এও বুঝিয়েছেন যে, তাঁর নাফরমানি আল্লাহরই নাফরমানি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে পড়ার ভয় করে।' (সূরা নূর: ৬৩) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। নিম্নোক্ত আয়াতে রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচারী, তিনি যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং তাতে সন্দেহ পোষণকারীকে ঈমান থেকে বহিষ্কৃত সাব্যস্ত করেছেন, যে আয়াতে বলা হয়েছে 'কিন্তু না (হে নবী)! আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণরূপে তা গ্রহণ করে।' ...

এই আয়াত প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরএকটি আদেশও প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক কিংবা মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তারা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন, যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল। তাদেরকে হত্যা করার এবং তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে বন্দী করার ফায়সালা দিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ তায়ালাসিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান ও

ফায়সালাকে মেনে নেবে না, সে ঈমানদার নয়।” (আহ্‌কামুল কুরআন লিল-জাস্‌সাস: ৩/১৮০-১৮১)
আল্লাহ তায়ালার একটি বিধান না মানার কারণে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস রহ. বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।’ আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে– ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, তাদের বিধান কি হতে পারে;তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এআয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: {ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. اهـ

“মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ও সম্মানিতসত্তার শপথ করে বলছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সকল বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নির্ধারণ করে। তিনি যে ফায়সালা প্রদান করেন তা-ই একমাত্র হক্ব ও সত্য এবং বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করা ও তার আনুগত্য করা অবধারিত। এ কারণেইতিনি বলেছেন, ‘অতঃপর আপনি যে ফায়সালা দেন সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে’। অর্থাৎ তারা যখন আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করবে, তখন আন্তরিকভাবে আপনার আনুগত্য করবে, আপনি যে ফায়সালা প্রদান করবেন সে ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়ে কোন সংকীর্ণতা পাবে না। বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করবে। কোন ধরনের বাক-বিতণ্ডা বা বিরোধিতা ব্যতীত পূর্ণরূপে তা মেনে নেবে।” (তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৪৯)

সংশয় নিরসন

১.আয়াতে যে ‘তাহকীমে রাসূল’ তথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়াকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, কেউ কেউ মনে করেন, এটি বিশ্বাসের বিষয়; কর্মের বিষয় নয়। অর্থাৎ সব বিষয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী মেনে নেয়া আবশ্যক–এই বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট। বাস্তব বিচার আচারের ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে–এমনটি জরুরি নয়। আর এই বিশ্বাস তো আমাদের শাসকদের আছেই।সুতরাংএই আয়াতের দাবিতে তারা কাফের হবে কেন?

এবিষয়ে প্রথম কথা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে, সকল বিষয়ে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা জরুরি–মুসলিম নামধারী সকল গণতান্ত্রিক সাশকই এই বিশ্বাস পোষণ করেন, এমন কথা মোটেও ঠিক নয়।কারণ তাদের অনেকেই সুস্পষ্টভাবে শরীয়তের সমালোচনা করে থাকেন। শরীয়তের বিধানকে সেকেলে, আধুনিক কালের জন্য অনুপযোগী, পশ্চাৎগামী, মানবতাবিরোধী, বর্বর ইত্যাদী আখ্যায়িত করেন। এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণও পেশ করে থাকে।

দ্বিতীয়ত কথা হল,‘তাহকীম’ তথারাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল ক্ষেত্রে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করা শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়; বরং এটি একটি আমল ও বাহ্যিক কর্মের নাম। কাজেই শুধু বিশ্বাস রাখাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়, বাস্তব জীবনেও সকল বিষয়ে রাসূলসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী বানানো আবশ্যক। তাছাড়া কেউ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। বিষয়টি খুব সুস্পষ্ট করে–

আল্লামা ইবনে হায্ম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন–

فنص تعالى وأقسم بفسه أن لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عنَّ ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى . فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به . اه (الفصل فى الملل والأهواء والنحل : 109/3)

....

"আল্লাহ তায়ালা নিজের কসম খেয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে 'তাহকীমে রাসূল' তথা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী বানিয়ে নেয়া ব্যতীত ঈমানদার হতে পারবে না। (শুধু এতটুকই যথেষ্ট নয় বরং) তারপর আন্তরিকভাবে তা মেনে নিতে হবে এবং তার ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ করতে পারবে না। এ থেকে প্রমাণিত হল, 'তাহকীম' অন্তরে মেনে নেয়া নয়; বরং তা সম্পূর্ণ একটিভিন্ন বিষয়। আর এই তাহকীমই হচ্ছে ঈমান। যার মধ্যে তাহকীম পাওয়াযাবেনা,তার ঈমান নেই।" (আল-ফিছাল: ৩/১০৯)

ইবনে হাযম রহ. আরোও বলেন–

فسمى الله تعالى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك، مع أنه لا يوجد فى الصدر حرج مما قضى، فصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وقول، لأن التحكيم عمل ولا يكون إلا مع القول، ومع عدم الحرج فى الصدر وهو عقد. اهـ (الدرة : ص338)

"আল্লাহ তায়ালা তাহকীমে রাসূলকে ঈমান সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়ে দিয়েছেন, এতদ্ব্যতীত ঈমান অর্জন হবে না। সাথে সাথে তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে অন্তরে কোন কুণ্ঠা বোধ না থাকতে হবে। অতএব, ইয়াকিনীভাবে প্রমাণিত হল, ঈমান বাহ্যিক আমল, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তির সমষ্টির নাম। কেননা, তাহকীম একটি বাহ্যিক আমলের নাম।আর তা মৌখিক স্বীকারোক্তি ব্যতীত এবং অন্তরের কুণ্ঠা দূরীভূত হওয়া ব্যতীত হতে পারে না। আর এই কুণ্ঠা দূরীভূত হওয়াটাই হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস।" (আদ-দুররা: ৩৩৮)

আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বিচারাচারের ভিত্তি শরীয়তের উপর না হলে আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তি স্বত্ত্বেও ঈমানদার বলে গণ্য হওয়া যাবে না। এ বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন এভাবে–

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

‘অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধকর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক।’ (সূরা নিসা: ৫৯)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. (মৃত্যু: ৭৭৪হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

{ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. اهـ

“{যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক}–এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে বিচারের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে না যায় এবং এ দু’য়ের দিকে প্রত্যার্পণ না করে, সে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাসী নয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৪৬)

২.আয়াতে কি ‘আছলে ঈমান’ তথা মূল ঈমান নফী করা উদ্দেশ্য, না কামালে ঈমান তথা ঈমানের পরিপূর্ণতা নফী করা উদ্দেশ্য? যদি কামালে ঈমানের নফী করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে– যারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারীরূপে গ্রহণ না করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়। এ থেকে বুঝা যায়, শাসকরা কাফের নয়, মুমিন। তবে পরিপূর্ণ ও পাকা ঈমানের অধিকারী নয়।
এসংশয় সম্পর্কে আমরা বলব,আয়াতে আছলে ঈমান তথা মূল ঈমান নফী করা উদ্দেশ্য। কাজেই যারা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক ও ফায়সালাকারী না বানাবে, তারা সম্পূর্ণ ঈমানহারা কাফের বা মুরতাদ। কেননা, কুরআনে কারীমের শব্দাবলীকে তার হাকীকী তথা প্রকৃত অর্থের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক। কোন প্রকার দলীল ব্যতীত রূপক ও বাহ্যিক অর্থের ব্যতিক্রম অর্থ করা জায়েয নয়। আর আল্লাহ তায়ালা যেখানে নিজের জাতের কসম খেয়ে এবং এতগুলো তাকিদ ব্যবহার করে বলছেন যে, তারা ঈমানদার হতে পারবে না; তাহকীমে রাসূল ব্যতীত, সেখানেকিছুতেই অন্য অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। নতুবা কসম খাওয়ারই কি দরকার ছিল আর এতগুলো তাকিদ ব্যবহারেরই বা কি দরকার ছিল!

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (মৃত্যু: ৪৫৬হি.) বলেন–

فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان . اهـ (الفصل فى الملل والأهواء والنحل : 193/3)

"এটি এমন এক সুস্পষ্ট বক্তব্য, যা কোন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না। এই বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ব্যতিক্রম অর্থে গ্রহণ করার মতো কোন দলিলই শরীয়তে নেই। এমন কোন প্রমাণও নেই যা বুঝায় যে, এখানে ঈমানের বিশেষ কোন প্রকার (অর্থাৎ কামালে ঈমান) উদ্দেশ্য।" (আল-ফিছাল: ৩/১৯৩)

সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের উদ্ধৃতিতে সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরসহ আলোচ্য বিষয়ের উপর কুরআনে কারীম থেকে এই কটিআয়াত পেশ করার উপরই ক্ষান্ত করলাম। অন্যথায় এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশাকরি এর মাধ্যমেই আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে মানব রচিত বিধান দ্বারা দেশ পরিচালনা করা যে কুফর ও রিদ্দাহ, তা সম্মানিত পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআনের পথে অটল-অবিচল রাখুন। আমীন!

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন: মায়েদা: ৪৯; আন'আম: ৫৭, ১১৪; ইউসুফ: ৪০, ৬৭; রা'দ্: ৪১; কাহাফ: ২৬; কাসাস: ৭০,৮৮; মুমিন: ১২; শূরা: ১০; জাসিয়াহ: ১৮

সুন্নাহ থেকে দলীল

দলীল নং-১

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

قال عبادة بن الصامت : (دعانا النبي فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما .

'হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি. বলেছেন, একদা নবীজী সা. আমাদেরকে ডাকলেন অতঃপর আমাদের থেকে এ মর্মে ওয়াদা নিলেন যে, আমরা আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা এবং আমাদের উপর কাউকে

প্রাধ্যান্য দান সর্বাবস্থায় আমরা শাসকের আনুগত্য করব এবং আমরা শাসকদের সাথে শাসনকার্যের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না। নবীজী বললেন, তবে যদি তোমরা শাসকদের থেকে এমন কোনো স্পষ্ট কুফুরী কাজ দেখতে পাও যেটা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে (কুরআন-সুন্নাহর) দলীল রয়েছে।' (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৬৪৭)

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, শাসকদের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব তক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের সীমার ভিতর থাকে। যখন তারা ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কুফরের সীমায় প্রবেশ করে তখন তাদের অনুগত্য গুনাহের কাজ। বরং তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তাদেরকে উৎখাত করা জরুরী।

দলীল নং-২

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) বর্ণনা করেন:

(قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة، حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى، فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهبا إليه، فقال الذي قضى له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي، فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى صاحبه أن يرضى، قال نأتي عمر بن الخطاب، فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى، فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك، فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فأنزل الله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) الآية) أ.هـ

'উৎবা বিন জামীরা (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট আমার পিতা বর্ণনা করেছেন: দুজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার দায়ের করল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে আর মিথ্যা দাবিদারের বিপক্ষে ফয়সালা দিলেন। রায় যার বিপক্ষে গিয়েছিল সে তার সাথীকে বলল, আমি সন্তুষ্ট নই। তার সাথী বলল, তুমি কি চাও? সে বলল, আমরা আবূ বকর (রাযি.) এর নিকট যাব, অতঃপর তারা আবূ বকর (রাযি.) এর নিকট উপস্থিত হল। যার পক্ষে রায় গিয়েছিল সে বলল, আমরা দুজন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলে তিনি আমার পক্ষে রায় দেন। আবূ বকর (রাযি.) বললেন,

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফয়সালা দিয়েছেন তার উপরই তোমরা স্থির থাক। তার সাথী তা মেনে নিতে অসম্মতি জানাল। সে বলল, চলো আমরা ওমর (রাযি.) এর নিকট যাই। অতঃপর তারা তার নিকটে গেল। প্রথম ব্যক্তি বলল, আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার পেশ করলে তিনি আমার পক্ষে আর তার বিরুদ্ধে রায় দেন। ওমর (রাযি.) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও একই কথা বলল। এমনটি শুনে ওমর (রাযি.) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ঘর থেকে একটি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে বের হলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার গর্দানে আঘাত করলেন। এবং তাকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন : **কিন্তু না! আপনার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে।** [সূরা নিসাঃ ৬৫] [হাদীস:হাসান, তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৫২]

[হাদীসটির সনদঃ হদীসটিকে রিদওয়ান জামে'য় রিদওয়া মুরসাল হাসান বলে উল্লেখ করেছেন, দেখুনঃ তাঁর তাহকীককৃর্ত, তাফসীরে ইবনে কাসীর। হাফেজ ইবনে তাইমিয়া রহঃ তার প্রসিদ্ধ কিতাব সরিমুল মাসলুলের মধ্যে উক্ত রেওয়াতটি উল্লেখ করে বলেছেন:

و هذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار

এই মুরসাল রেওয়াতটির অপর একটি শাহেদ রয়েছে। যা "ই'তেবার" হবার যোগ্য। অতঃপর তিনি উক্ত শাহেদ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করে বলেন, এই ঘটনাটি আমি উক্ত দুটি রেওয়াত ছাড়াও ভিন্ন রেওয়াতে পেয়েছি। দেখুনঃ আস-সরেমুল মাসলুল, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৪৩]

নির্দেশনা :

১. যে ব্যক্তিকে ওমর (রাযি.) হত্যা করলেন তার ভিতরের অবস্থা ওমর (রাযি.) জানতেন না। বাহ্যিকভাবে সে মুসলিম হিসেবেই পরিচিত ছিল। ইসলামের কোন বিধানকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করেনি। তার অপরাধ হল, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি ফয়সালা নিজ প্রবৃত্তির বিপক্ষে যাওয়ার কারণে তা না মেনে অন্য একজন সাহাবীর নিকট ফয়সালার জন্য যাওয়া। তার ব্যাপারে ওমর (রাযি.) ফয়সালা হল নাঙ্গা তলোয়ার। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করে ভিন্ন কোন ফয়সালা তালাশ হল রিদ্দাহ তথা স্ব-ধর্ম ত্যাগ।

২. ওমর (রাযি.) এর মতের স্বচ্ছতা ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন যে তার এই ফয়সালাই সঠিক ছিল কেননা উপরোক্ত ব্যক্তি নবীজী সা. এর বিচার মেনে নিতে না পারায় সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

৩. যারা শরীয়াহর সকল বিধান পরিবর্তন করে নিজেরাই আইন রচনা করে, মুসলিমদেরকে সে আইন মানতে বাধ্য করে, না মানলে শাস্তি প্রদান করে। তাদের ব্যাপারে ওমর (রাযি.) ফয়সালা কী হতে পারে? আর কুরআনই বা তাদের ব্যাপারে কি বলে?

দলীল নং-২

ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستَغْفَروا لهم، فنزلت: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ [قَالُوا فِيمَ كُنْتُم } إلى آخر] الآية،

‘মক্কায় কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা ইসলামকে গোপন করে রাখতো। বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরকে নিজেদের সাথে বের হতে বাধ্য করল। ফলে তারা কতকে কতকের দ্বারা আক্রান্ত হল (নিহত হল)। মুসলিমরা বলতে লাগল, আমাদের এই সাথীরা তো মুসলিম ছিল কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের জন্য ইস্তেগফার কর। তখন অবতীর্ণ হল:

“নিশ্চয়ই নিজের প্রতি যুলম করা অবস্থায়, ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন, তখন ফেরেশতাগণ (তাদেরকে) বললেন, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলল আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ বললেন, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।” [সূরা: আন্–নিসা:৯৭] [তাফসীরুত তবারী, হাদীস নং:১০২৫৯, খণ্ড:৯, পৃষ্টা:১০২]

উপরোক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ হল তারা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেনি। অন্যথায় বদর যুদ্ধে তারা তো স্বেচ্ছায় আসেনি বরং তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল। আর তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রও পরিচালনা করেনি।

তাহালে প্রশ্ন জাগে, হিজরত না করার কারণে কি তারা চিরকাল জাহান্নামী হবে। নাকি আয়াতে অস্থায়ী শাস্তির কথা বলা হয়েছে ?

বিন বাজ (রহ.) তার একটি প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তার লেখাটি হুবহু তুলে দেয়া হল:

هذه الآية الكريمة ذكر العلماء أنها نزلت في أناس تخلفوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فما كانت غزوة بدر أجبرهم الكفار على الخروج معهم، وحضروا القتال فنزلت الآية الكريمة فيهم لما قتل من قتل منهم، وإن قوله جل وعلا: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم). معنى ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين وهم قادرون على الهجرة، (قالوا فيم كنتم): يعني قالت لهم الملائكة فيم كنتم؟ (قالوا كنا مستضعفين في الأرض)، يعني في أرض مكة، (قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة)، يعني قالت لهم الملائكة: (ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنّم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين).. الآية. فهو متوعدون بالنار لأنهم أقاموا بين أظهر الكفار من دون عذر، وكان الواجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، إلى المدينة المنورة، فلما أجبروا على الخروج وأكرهوا صار ذلك ليس عذراً لهم، وكان عملهم سبباً لهذا الإكراه، وسبباً لهذا الخروج فجاء فيهم هذا الوعيد. لكونهم عصوا الله بإقامتهم مع القدرة على الهجرة، ولم يكفروا لأنهم مكرهون، أخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا لكن قتلوا، قتل من قتل منهم، أما لو قاتلوا مختارين راضين غير مكرهين لكانوا كفارا، لأن من ظاهر الكفار وساعدهم يكون كافراً مثلهم، لكن هؤلاء لم يقاتلوا وإنما أكرهوا على الحضور وتكثير السواد فقط، فقتلوا من غير أن يقاتلوا، وقال آخرون من أهل العلم إنهم كفروا بذلك، لأنهم أقاموا من غير عذر، ثم خرجوا معهم، وفي إمكانهم التملص والخروج من بين الكفرة في الطريق، أو في حين التقاء الصفين، وفي إمكانهم أن يلقوا السلاح ولا يقاتلوا، وبكل حال فهم بين أمرين: من قاتل منهم وهو غير مكره فهو كافر، حكمه حكم الكفرة الذين قتلوا، وليس له عذر في أصل الإكراه لأنه لما أكره باشر وقاتل و مساعدة الكفار فصار معهم وصار مثلهم ودخل في قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ظاهر الكفار والمشركين وساعدهم بالسلاح أو بالمال فإنه يكون كافرا مرتداً عن الإسلام، أما من أكره ولم يقاتل ولم يرض بقتال أهل الإسلام ولم يوافق على ذلك ولكن أجبر وأكره بالقوة والرباط والإكراه حتى وصل إلى ساحة القتال ولم يقاتل فهذا يكون عاصياً بأصل إقامته، ومتوعد على ذلك بالنار لأنه أقام معهم من دون عذر،[فتاوى نور على الدرب ৩৬০ - للشيخ : عبد العزيز بن باز]

“এই পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে এমন কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে যারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত না করে মদীনায় রয়ে গিয়েছিল। যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন কুফ্ফাররা নিজেদের

সাথে তাদেরকেও বের হতে বাধ্য করল। ফলে তাদেরকে যুদ্ধে অংশ নিতে হল। পরে যখন তাদের কতক ব্যক্তি নিহত হল তখন এই আয়াতটি তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হল:

আল্লাহ তাআলার বাণী:**"নিশ্চয়ই নিজদের প্রতি যুলম করা অবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের জান কবজ করলেন"**এর অর্থ হল হিজরতের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা মুশরিকদের সাথে বসবাস করে নিজেদের উপর জুলম করেছে।

"ফেরেশতাগণ বললেন, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'?"অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের অবস্থা কি ছিল?**"তারা বলল: আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম"** অর্থাৎ মক্কাতে।**"ফেরেশতাগণ বললেন, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না"**অর্থাৎ ফেরেশতাগণতাদের কে বললেন:**"আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল।"**

তাদেরকে জাহান্নামের ধমকি দেয়া হয়েছে। কেননা তারা কোন ওজর ব্যতিত কুফ্ফারদের মাঝে অবস্থান করেছে। অথচ তাদের উপর ওয়াজিব ছিল, তারা হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রে যাবে, মদীনায় গমন করবে। তাই তাদেরকে যখন যুদ্ধে যেতে চাপ দেয়া হল এবং তারা বাধ্য হল, তখন "এই বাধ্য হওয়া" তাদের ক্ষেত্রে ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হল না। বরং তাদের নিজেদের কর্মই ছিল এই বাধ্যতার কারণ, কাফেরদের সাথে বের হওয়ার হেতু। আর তাই তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত ধমকি এসেছে। কেননা তারা হিজরতের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবস্থান করেছে। তবে তারা কাফের বলে বিবেচিত হবে না, কেননা তারা ছিল বাধ্য। তাদেরকে বের করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তারা তো যুদ্ধ করেনি। যদিও বা তারা নিহত হয়েছে। যারা নিহত হওয়ার তারা তো নিহত হয়েছেই। <u>কিন্তু তারা যদি বাধ্য না হয়ে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধ করত তাহলে তারা কাফের হয়ে যেত। কেননা যারা কুফ্ফারদেরকে সমর্থন দেয় এবং সাহায্য করে, তারা তাদের মতই কাফের হয়ে যায়।</u> তবে উপরোক্ত ব্যক্তিরা যুদ্ধ করেনি। বরং তাদেরকে উপস্থিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই যুদ্ধ করা ব্যতীতই তারা নিহত হয়েছে।

তবে অনেক আলেমের মত হল:" উপরোক্ত কাজের দ্বারা তারা কাফের হয়ে গিয়েছে। কেননা তারা কোন ওজর ব্যতীতই অবস্থান করেছে অতঃপর তাদের সাথে যুদ্ধে বের হয়েছে। তাদেরতো এই শক্তি ছিল পথিমধ্যেই বা যখন দু-দল মুখোমুখি হয়েছে তখন তারা কাফেরদের মধ্য থেকে ভেগে যেতে পারত। এই

ক্ষমতাও ছিল তারা অস্ত্র সংবরণ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতো।” তবে সব ক্ষেত্রেই তাদের মাঝে দুটি অবস্থা বিদ্যমান:

১. তাদের মধ্যে থেকে যে বাধ্য না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ করেছে সে কাফের। তার ক্ষেত্রে নিহত কাফেরদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। কেননা ‘ইকরাহ’ তথা বাধ্যতার মূলনীতিতে তার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যখন তাকে (বের হতে) বাধ্য করা হয়েছে তখন সে সামনা-সামনি হয়ে যুদ্ধ করেছে (অথচ সে যুদ্ধ না করলেও পারত)। ফলে কুফ্ফারদেরকে সাহায্য করার কারণে সে তাদেরই দলভুক্ত ও তাদেরই অনুরূপ বলে গণ্য হবে। সে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অন্তর্ভূক্ত হবে:**“আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।”**উলামাগণ একমত পোষণ করেছেন, “যে ব্যক্তি কুফ্ফার ও মুশরিকদেরকে সমর্থন জানাবে, অস্ত্র ও সম্পদ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করবে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুরতাদ ও কাফের বলে গণ্য হবে।”

২. যে আসতে বাধ্য হয়েছে, তবে যুদ্ধ করেনি। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পছন্দও করেনি। তাদের সাথে একমত পোষণ করেনি। কিন্তু তাকে পাহারা দিয়ে শক্তি খাটিয়ে বাধ্য ও অপারগ করা হয়েছে। ফলে সে রণাঙ্গন পর্যন্ত এসেছে, কিন্তু লড়াই করেনি। তাহলে সে (হিজরত না করে) মক্কার কাফেরদের মধ্যে অবস্থানের কারণে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। একারণে সে, জাহান্নামের ব্যাপারে ধমক প্রাপ্ত হবে। কেননা সে কোন ওজর ব্যতীতই তাদের সাথে অবস্থান করেছে।’[ফাতাওয়া-নুরুন আলাদ দার্ব-৩৬০, শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বাজ রহ.]

নির্দেশনা ঃ

মক্কা থেকে আগত ব্যক্তিরা সকলেই ছিল বাধ্য তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় আসেনি। তবে তারা পূর্বেই হিজরত করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব কিছু ছেড়ে তারা হিজরত করতে রাজি হয়নি। বদর যুদ্ধে তাদের কতকে প্রাণ হারিয়েছে। ফলে মুসলিমরা যখন তাদের জন্য ইস্তেগফার করার ইচ্ছা পোষণ করল তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন: **ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম। আর তা কতইনা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল**। [সূরা: আন্–নিসা: ৯৭]

এখন প্রশ্ন দেখা দিল, তারা কি কাফের হবে? অনেক আলেমের মত হল- না তারা কাফের হবে না। কেননা তারা ছিল বাধ্য। অপর কতিপয় আলেম

বলেন- তারা কাফের বলেই বিবেচিত হবে। কেননা এখানে তাদের বাধ্যতা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত করেনি। তবে সঠিক মত হল, হিজরত না করার কারণে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না। তবে যদি কেউ রণাঙ্গনে এসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা এখানে তার বিকল্প ব্যবস্থা ছিল। আর যদি অস্ত্র সংবরণ করে থাকে, তাহলে অস্থায়ী জাহান্নামী বলে গণ্য হবে।

দলীল নং-৩

আলী (রাযি.) বর্ণনা করেন:-

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ قُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ-

'রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, যুবইরকে এবং মিকদাদকে এই বলে প্রেরণ করলেন, তোমরা 'রওযাতু খাখে' পৌঁছা পর্যন্ত যেতেই থাকবে। তোমরা সেখানে গিয়ে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পাবে যার সাথে একটি পত্র আছে। তোমরা সেটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসবে।

আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল, ফলে আমরা রওযাতে এসে পৌঁছলাম। আমরা সেখানে একজন বৃদ্ধাকে দেখতে পেলাম আমরা তাকে বললাম, চিঠি বের করো। সে বলল, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, তুমি কি চিঠি বের করবে নাকি আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে ফেলব? তিনি বলেন: অতঃপর সে তার বেণী বাধাঁ ফিতা থেকে চিঠি বের করলো। আমরা চিঠিটি নিয়ে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম।

আমরা দেখতে পেলাম চিঠিটি প্রেরণ করা হয়েছে হাতিব বিন আবী বালতা'আর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকদের নিকট। তাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বিষয় তাদেরকে অবগত করানো হয়েছে।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাতিব এটা কি?

হাতিব বললেন: আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।

আমি কুরাইশদের সাথে একজন ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলাম। তবে তাদের বংশের মধ্য থেকে ছিলাম না। আর আপনার সাথে যে সব মুহাজিরগণ আছেন তাদের রয়েছে নিকটাত্মীয় যারা মক্কায় তাদের পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাই আমার কাছে ভালো মনে হয়েছিল যে, যখন আমার সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাদের মাঝে আমার একটি কর্তিত্ব থাকবে যার ফলে তারা আমার নিকটাত্মীয়দেরকে হেফাজত করবে। আমি তো এটি ফুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুণরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে সত্য বলেছে।

উমর (রাযি.) বললেন: **আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলি।**

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তো বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বদরী সাহাবীদের বিষয়ে অবগত আছেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো কেননা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। [সনদ:সহীহ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং:৬০০, খণ্ড:২, পৃষ্টা:৩৭, এছাড়া বুখারী মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে]

ঘটনাটি যা প্রমাণ করে..।

উপরিউক্ত ঘটনাটি কয়েকভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করার মূল হুকুম হল, কুফর ও রিদ্দাহ।

প্রথমত: বিষয়টি অবলোকন করার পর নবুয়্যাতের মেজাযধারী সাহাবী উমর (রাযি.) এর প্রতিক্রিয়া :-

এক. তিনি বলেছিলেন: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলি।

দুই. স্বয়ং উমর (রাযি.) থেকে অপর একটি সহীহ রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

فاخترطت سيفي و قلت : يا رسول الله أمكني منه فإنه قد كفر فاضرب عنقه (المستدرك على الصحيحين)

'অতঃপর আমি আমার তরবারী কোষমুক্ত করলাম এবং বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সুযোগ দেন আমি তার গর্দান দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলি কেননা সে কুফরী করেছে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:৮৭; আল-জাম'য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৬৫]

তিন. অপর একটি রেওয়াতে এসেছে:

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أليس قد شهد بدرا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال عمر : بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك -[مسند أبي يعلى]

'অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে কি বদরে অংশ গ্রহণ করেনি? সাহাবারা (রাযি.) বললেন: জি, হ্যাঁ সে বদরে অংশ গ্রহণ করেছে হে আল্লাহর রাসূল।

উমর (রাযি.) বললেন: হ্যাঁ, তবে সে ভঙ্গ করেছে, আপনার বিরুদ্ধে আপনার শত্রুদেরকে সাহায্য করেছে। [ফাতহুল বারী, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:৬৩৪, মুসনাদু আবী ই'য়লা, হাদীস নং:৩৯৭, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৩১৬])

এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে উমর (রাযি.) মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করাকে কুফর ও রিদ্দাহ মনে করতেন। কেননা বিষয়টি যদি কুফর ও রিদ্দাহ না হয়ে অন্য কোন অপরাধ হত তাহলে তিনি হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাযি.) কে কখনই হত্যা করতে উদ্যত হতেন না এবং এটা তার জন্য বৈধও ছিল না।

দ্বিতীয়ত: মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ না হলে, উমর (রাযি.) যখন তাকে মুনাফিক বললেন, তিনি কুফরী করেছেন বললেন, তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলেন তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত বলতেন, এমন অপরাধের কারনে কেন তুমি একজন মুসলিমকে কাফের বলছো, মুসলিমকে হত্যা করতে চাচ্ছ যা কুফর বা রিদ্দাহ নয়? কেননা কোন নবীর পক্ষে সম্ভবপর নয় তিনি কোন ভুল বা অন্যায় সামনা সামনি দেখেও সে ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থাকবেন। এখানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর (রাযি.) এর মতকে ভুল সাব্যস্ত না করে হাতিব

বিন আবী বালতা'আ (রাযি.) এর বিষয়টি উত্থাপিত করলেন। তার ক্ষেত্রে কেন এই হুকুম প্রজোয্য হবে না তার কারণ বর্ণনা করলেন, 'সে তো বদরী সাহাবী, অল্লাহ তাআলা তার পূর্বা-পর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, (অপর রেওয়াতে এসেছে তিনি বলেছেন) এদের জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব।' যদি এমনটি না হত তাহলে তিনি বলতেন, তুমি যে মত ব্যক্ত করছো সে মতটি কারো ক্ষেত্রেই সঠিক নয় (চাই সে বদরী হোক বা না হোক)।

হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাযি.) কি লিখেছিলেন সেই চিঠিতে?

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বর্ণনা করেন. চিঠির শব্দগুলো ছিল-

أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام

'ওহে কুরাঈশ গোত্রীয়গণ! আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সৈনিকদেরকে নিয়ে ধেয়ে আসছেন অন্ধকার রাত্রির ন্যায়, যার গতি হল সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর শপথ তিনি যদি একাও তোমাদের বিরুদ্ধে আসেন আবশ্যই আল্লা তাআলা তাকে সাহায্য করবেন। তাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। সুতরাং তোমরা নিজেদের ব্যাপারটি ভেবে দেখ। শেষ করলাম। [ফাতহুল বারী, খণ্ড:৭, পৃষ্টা:৫২০]

ওকিদী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-মাগাজীতে' ইকরিমা (রাযি.) একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন, সেই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার চিঠির বাক্যগুলো ছিল এই:-

إِنّ رَسُولَ اللّهِ قَدْ أَذّنَ فِي النّاسِ بِالْغَزْوِ وَلَا أَرَاهُ يُرِيدُ غَيْرَكُمْ وَقَدْ أَحْبَبْت أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَكُمْ يَدٌ بِكِتَابِي إِلَيْكُمْ .

'আল্লাহর রাসূল মানুষদের মাঝে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে এবার তাঁর উদ্দেশ্য হল তোমরাই। আর আমি ভাল মনে করেছি এ চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে তোমাদের কাছে আমার একটি মূল্যয়ন থাকুক।' [আল-মাগাযী, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৭৯৯]

একটি সংশয়: হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাযি.) মক্কার মুশরিকদেরকে সাহায্য করার পদক্ষেপ নেবার পরও যেহুতু তার উপর কুফরের হুকুম সাব্যস্ত হচ্ছে না তাহলে অন্য কেউ যদি অন্য কোনভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে

কাফেরদেরকে সাহায্য করে তাহলে তার উপর কেন কুফর ও রিদ্দার হুকুম বর্তাবে?

যে কারণে হাতিব (রাযি.) এর উপর উপরিউক্ত হুকুম বর্তায়নি:-

'মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ' এটি উম্মাহর ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাসআলা, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের আবকাশ নেই। যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে হাতিব (রাযি.) এর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রজোয্য হল না কেন?

এর উত্তরটি দু'ভাবে দেয়া যায়:

১. তার উপরিউক্ত কাজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হাতিব (রাযি.) না কুফফারদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন না তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করেছেন। কাফেরদেরকে এমন কোন তথ্য জানানও তার উদ্দেশ্য ছিল না যা দ্বারা তারা লাভবান হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে ঘোষণার কথা তিনি বলে ছিলেন তা কোন গোপন বিষয় ছিলনা বরং তা ছিল তাঁর প্রকাশ্য সামরিক পদক্ষেপ। তিনি যেটা করে ছিলেন, তার ধারনার কথা বলেছিলেন, যে সম্ভবত তাঁর লক্ষ্য তোমরাই। তিনি তো মুশরিকদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকে যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধেও তাদের বিরুদ্ধেই বের হয়ে ছিলেন। সুতরাং তার এ কাজ সে পর্যায়ের ছিল না যাকে কুফরের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে তার এ কাজটি কুফরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই উমর (রাদি:) তাঁকে মুনাফিক ভেবে ছিলেন ও হত্যা করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন।
২. তার উপরিউক্ত কাজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তবে.....!!!

যদি ধরেও নেয়া হয় তার একাজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি এটা দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয় যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ্ নয়। কেন না সে ক্ষেত্রে তার উপর কুফরের হুকুম না বর্তানোর কারণ হল, তার মাঝে موانع الكفر বিদ্যমান ছিল (এমন কিছু বিষয়, কোন ব্যক্তির থেকে যদি কুফর প্রকাশ পায় আর তার কোন একটিও ঐ ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে কুফরের বিধান তার ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে না)।

(ক) তার জানা ছিল না এতটুকু কাজ কুফরের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমনটি তিনি নিজেই বলেন:

وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.

'আমি তো এটি ফুফরী হিসাবে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুণরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি।'

অপর একটি সহীহ রেওয়াতে এসেছে, যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন এমনটি করলে? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন:-

أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ،

"আল্লাহর শপথ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যপারে কল্যাণকামী।"

(খ) তিনি এ ক্ষেত্রে মুআউবিল ছিলেন, তার ইজতিহাদ ছিল এর দ্বারা মুসলিমদের কোন ক্ষতি হবে না, তাই এই সাহায্য কুফরের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তিনি বলেন:-

فَكَتَبْتُ كِتَابًا لاَ يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا

"আমি তো এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন ক্ষতি করবে না।"

[আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা:৮৭; আল-জাম'য়ু বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা:৬৫]

অপর রেওয়ায়েতে এসেছে তিনি বলেছেন:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ

'আর আমি জানি মিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে সাহায্য করবেন, এবং তার বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করবেন।' [মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড:২৩, পৃষ্ঠা:৯১]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন :

فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه

'তিনি এমনটি করেছিলেন একথা ভেবে যে, তাতে কোন সমস্যা নেই।' [ফাতহুল বারী, খণ্ড:৮, পৃষ্ঠা:৬৩৪]

এ ছাড়াও উপরিউক্ত হাতিব (রাযি.) ঘটনাটিকে ইমাম বুখারী (রহ.) যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন তা হল: (ما جاء في المتأولين) তাবীলকারীদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস। যা প্রমাণ করে তিনি তাকে তাবীলকারীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন।

আর তার পরিবার-পরিজন মুশরিকদের মাঝেই ছিল, তিনি কুরাঈশ বংশের না হবার কারণে তার এমন কোন নিকটাত্মীয় ছিল না যারা তাদের দেখা-শোনা করবে। তাই তিনি তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত ছিলেন যে, তারা না এদের কোন ক্ষতি করে বসে তাই তিনি নিজে নিজে এমন এক পদ্ধতি বেছে নিতে চেয়ে ছিলেন, যার দ্বারা দ্বীনেরও কোন ক্ষতি হবে না আর তার পরিবারেরও কিছুটা লাভ হবে। যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন:-

وَلَكِنْ كُنْتُ غَرِيبًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ ، وَكَانَ أَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخِفْتُ عَلَيْهِمْ ، فَكَتَبْتُ كِتَابًا لاَ يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْئًا ، وَعَسَى أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَهْلِي

'আমি ছিলাম মক্কাবাসীদের মাঝে অগন্তুক এক ব্যক্তি। আমার পরিবার তাদের মাঝেই বসবাস করত, আর আমি ছিলাম তাদের ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত। তাই আমি এমন চিঠি লিখেছি যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য কোন ক্ষতির কারণ হবে না। আর আমার আশা ছিল এর দ্বারা আমার পরিবার হয়ত কিছুটা উপকৃত হবে। [আল-মুসতাদরিক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং:৬৯৬৬, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:৮৭; আল-জাম'য়ূ বাইনাস সহীহাইন, হাদীস নং:৮৫, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৬৫]

(গ) তার জীবনের পূর্বা-পর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছিল:-

তিনি ছিলেন বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা যাদের জীবনের পূর্বা-পর সকল গুনাহ পূর্ব থেকেই ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেন। তারা ছিলেন নিশ্চিত জান্নাতী। তিনি স্বয়ং প্রতিটি জিহাদে জান-মাল দ্বারা কুফফারদের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। এমন কি উক্ত জিহাদটিতেও তিতি মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বের হয়ে ছিলেন। আর তিনি জানতেন মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে চলমান লড়াইয়ে যে বা যারা কাফেরদের পক্ষ অবলম্বন করবে, কাফেরদের বিধান ও তার বিধান একই হবে। কিন্তু তিনি কখনই এমনটি ভাবেননি যে তার এই কাজটিকেও সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুরতাদ ভেবে তার উপর রিদ্দাহ্‌র হুকুম বলবৎ করতে উদ্যত হবেন। তাই তিনি বলেছিলেন:- **'আমার (ফায়সালার) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।'** তিনি আরো বলেন:

'আমি এটি ফুফরী মনে করে অথবা দ্বীন ত্যাগ করতে বা ইসলামের পর পুণরায় কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি।'

নির্দেশনা ঃ

আমরা একটু লক্ষ্য করি, হাতিব বিন আবী বালতা'আ (রাযি.) কুফফারদেরকে এমনকি সাহায্য করেছিলেন? শুধুমাত্র একটি তথ্য জানাতে চেয়ে ছিলেন যা তার দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। তথাপি তার ব্যপারে উমর (রাযি.) এর মত নববী মেজাযের অধিকারী সাহাবীর অবস্থান কি ছিল? তাহলে যারা কুফর ও ইসলামের মাঝে চলমান লড়াইয়ে সরাসরি কুফফারদের ফ্রন্ট লাইন গ্রহণ করেছে তাদের বিধান কী হতে পারে?

দলীল নং-৪

বদরের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম বাধ্য হয়ে কুরাঈশদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস (রাযি.)। অতঃপর তিনি মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তখন আব্বাস রাযি. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন:

يا رسول الله إني كنت مسلما

হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মুসলিম ছিলাম!

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

الله اعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك

'আল্লাহ তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন।' [সনদ:সহীহ, সুনানুল বাইহাকী, খণ্ড:৬, পৃষ্টা:৩২২]

আব্বাস (রাযি.) নিজের ইসলামের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন- "হে আল্লাহর রাসূল আমি তো মুসলিম ছিলাম!" অর্থাৎ আমি তো বাধ্য হয়ে এসে ছিলাম তথাপি কি আমার উপরও কাফেরদের বিধান প্রজোয্য? আমাকেও মুক্তিপণ আদায় করতে হবে?

কিন্তু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আব্বাস (রাযি.) এর কথা গ্রহণ না করে তার উপর অন্যান্য কাফের বন্দীদের বিধানই প্রয়োগ করলেন? এর কারণ হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করার রুবুবী ফায়সালা হল তা কুফর। আর আব্বাস (রাযি.) কে এই কুফরে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে আর এটাই ছিল জহের বা বাহ্যিক দিক। তাই তার উপরও অন্যান্য কাফেরদের বিধানই প্রজোয্য হয়েছে। তার মুখের কথাকে গ্রহণ করা হয়নি। কেননা তা ছিল জহেরের খেলাফ বা বিপরীত। অন্যথায় নিশ্চিত তার কথা গ্রহণ করা হত। তবে তিনি যদি সত্যিই মুসলিম হয়ে থাকেন, বাধ্য হয়েই যুদ্ধে এসে থাকেন তাহলে সেটি তো আল্লাহ তাআলা দেখছেন। তাই রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:"আল্লাহ তাআলাই আপনার ইসলাম সম্পর্ক ভালো অবগত আছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয় থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলাই আপনাকে প্রতিদান দেবেন।"

ইজমা থেকে দলীল

১. শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) এর ফতওয়া :-

قتل مسلم کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ ہو کر ان کی فتح و نصرت کے لئے مسلمانوں سے لڑے یا لڑائی میں ان کی اعانت کرے اور جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو رہی ہو تو کافروں کا ساتھ دے- یہ صورت اس جرم کے کفرو عدوان کی انتہائی صورت ہے اور ایمان کی موت اور اسلام کے نابود ہو جانے کی ایسی اشد حالت ہے جس سے زیادہ کفر اور کافری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا- دنیا کے وہ سارے گناہ، ساری معصیتیں، ساری ناپاکیاں،ہر قسم کی نافرمانیاں جو ایک مسلمان اس دنیا میں کر سکتا ہے یا ان کا وقوع دھیان میں آ سکتا ہے سب اس کے آگے ہیچ ہیں- جو مسلمان اس کا مرتکب ہو وہ قطعا کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے- اس نے صرف قتل مسلم کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ اسلام کے برخلاف دشمنان حق کی اطاعت و نصرت کی ہے -اور یہ بالاتفاق اور بالاجماع کفر صریح ہے-جب شریعت ایسی حالت میں غیر مسلموں کے ساتھ کسی طرح کا علاقہ محبت رکھنا بھی جائز نہیں رکھتی تو پھر صریح اعانت فی الحرب کے بعد کیونکر ایمان و اسلام باقی رہ سکتا ہے-

[قتل مسلم ،کتاب: معارف مدنی افادات مولانا حسین احمد مدنی]
جمع و ترتیب:مفتی عبدالشکور ترمذی

‘মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, কোন মুসলমান কাফেরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য ও বিজয়ের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ চলতে থাকে তখন কাফেরদেরকে সমর্থন জানায়। **এমতাবস্থায় উপরোক্ত অপরাধটি কুফরী ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঈমান ধ্বংস ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে মারাত্মক কুফর ও কুফরী কর্মকাণ্ড কল্পনাও করা যায় না।** বিশ্বে যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। **যে মুসলমান এতে লিপ্ত হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।** সে শুধু মুসলমান হত্যায় জড়িত হয়েছে এতটুকুই নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর শত্রুদের আনুগত্য ও সহায়তা করেছে এবং **এটি সকলের ঐক্যমতে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরে ছরীহ বা সুস্পষ্ট কুফর।** এমতাবস্থায় শরীয়ত যেখানে অমুসলিমদের সাথে কোন প্রকার মহব্বতের সম্পর্কেরও বৈধতা দেয় না, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে সুস্পষ্ট সহযোগিতার পরেও কি করে ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকতে পারে?’

(অধ্যায়ঃ কতলে মুসলিম; মাআ’রেফে মাদানী; মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)। সংকলন ও বিন্যাসঃ- মুফতী আব্দুশশাকূর তিরমিজী।)

ইংরেজরা যখন খেলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে আক্রমণ করে তখন হিন্দুস্থান থেকে প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্য তাদের সাথে যোগদেয়। তখন **শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)** তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে নিম্নক্ত ফতওয়া প্রদান করেন :-

বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণকে মিস্টার লর্ড জর্জ ‘ক্রুসেড’ আখ্যায়িত করেছে। চার্চেলও এটিকে ‘ক্রুসেড’ বলে উল্লেখ করেছে। তাই আমি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি, **যে মুসলমানই খ্রিষ্টানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে, সে শুধুমাত্র গুনাহই করেনি বরং কাফের হয়েগেছে।** (‘উলামায়ে হক’ মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়াঁ, পৃষ্টা:২১৫)

নির্দেশনা:

আল্লাহু আকবার! হযরতের কথার প্রতি একটু লক্ষ্য করুন, **“বিশ্বে যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত**

হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের।” আর এ কারণেই খেলাফাতে উসমানিয়া পতনের লড়াইয়ে যে সমস্ত মুসলিম সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে তিনি মুরতাদ ঘোষণা করেছেন।

২. কাজী মুফতী মুহাম্মাদ আবূ সাউদ আল-ঈমাদী (রহ.) বলেন:

وقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم حكم مستنتج منه فإن انحصار الموالاة فيما بينهم يستدعي كون من يواليهم منهم ضرورة أن الاتحاد في الدين الذي عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكونهم ممن يواليهم من المؤمنين تعين أن يكون ذلك بكون من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة في الحقيقة وقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين تعليل لكون من يتولاهم منهم أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشانهم فيقعون في الكفر والضلالة وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم تنبيها على أن توليهم ظلم لما أنه تعريض لأنفسهم للعذاب الخالد (تفسير أبي السعود)

আল্লাহ তাআলার বাণী: **“আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন।”** এই হুকুমটি নির্ধারিত হয়েছে আয়াতের পূর্বের আংশ থেকে [**তারা কতকে কতকের বন্ধু**]। কেননা বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার দাবি হল- যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। আর এটি একারণে যে দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্যের উপর ভিত্তি করেই পরষ্পর ভালোবাসার বিষয়টি পরিচালিত হয়। মুমিনরা যেহুতু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্য হতে পারে না, সুতরাং যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে দ্বীনের ক্ষেত্রে ঐক্য করবে সে তাদের মধ্য থেকেই হবে। এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য কঠিন ধমক, যাতে তারা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্বও প্রকাশ না করে। যদিও বা বাস্তবিক বন্ধুত্ব না থাকে। আল্লাহ তাআলার বাণী- **“নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।”** এ অংশে, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমানের দিকে পথ দেখান না। বরং তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন। ফলে তারা কুফর ও গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত হয়। এখানে সর্বনামের [هم] স্থানে বিশেষ্যকে [القوم] ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব হল জুলম। কেননা, এর মাধ্যমে সে নিজেকে চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে নিপতিত করছে।

৩. পাকিস্থানের সাবেক মুফতীয়ে আজম শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহ.) এর ফতওয়াঃ

....

২০০১ ইং সালে আমেরিকাসহ তার সাথে জোট ভুক্ত ৪৮টি রাষ্ট্র (ন্যাটো) যখন ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানে আক্রমণ করে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের পক্ষাবলম্বন করে। এই যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। তাদেরকে বিমান ঘাঁটি প্রদান করে। তখন মুফতীয়ে আজম শহীদ নেজামুদ্দীন শামজায়ী (রহ.) নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক ফতওয়া জারী করেন :

بعد الحملة الأمريكية على أفغانستان فإن الأحكام الشرعية على المسلمين هي :

أولاً : أصبح الجهاد فرض عين على المسلمين كلهم خاصة وأنه في الأوضاع الحالية فإن الإمارة الإسلامية في أفغانستان هي البلد الإسلامي الوحيد الذي تطبق فيه الشريعة الإسلامية والدفاع عنها واجب كل المسلمين والهدف الأصلي من الهجوم الأمريكي اليهودي هو القضاء على النظام الإسلامي في أفغانستان .

ثانيا: لا يجوز لمسلم في أي بلد كان سواء كان موظفا حكوميا أو غير ذلك أن يقدم أي مساعدة كانت ومن أي نوع كان للعدوان الأمريكي على أفغانستان خاصة وأن الهجوم يشكل حملة صليبية على أفغانستان المسلمة. وأي مسلم يقدم المساعدة في هذا العدوان يعتبر مرتدا عن الدين

ثالثا :أي شخص يخالف أوامر الله عز وجل وشريعته فإن من كانوا تحته من موظفين أو جنود أو غير ذلك عليهم مخالفة أوامره ورفض الانصياع إليها .

رابعا : البلدان الإسلامية التي تؤيد أمريكا في هذه الحرب وتقدم مساعدة معلوماتية أو أرضية أو أجواء ويمنعون المسلمين من تأدية واجباتهم فإن على المسلمين واجب إزالة هذه الحكومات والحكام بأي وسيلة كانت.

خامسا : دعم المجاهدين في أفغانستان ماليا ومعنويا وماديا فريضة على كل مسلم في الوقت الحاضر، ومن يمكنه الوصول إلى أفغانستان والقتال إلى جانبه فأن الواجب الشرعي عليه أن يبادر إلى ذلك مباشرة ومن لا يستطيع ذلك عليه تقديم الدعم بكل وسيلة ممكنة لهم .

‘আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর মুসলমানদের উপর শরীয়তের বিধান নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ সকল মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে বিশেষতঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে। কেননা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সেই একক ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়িত হয়। এর প্রতিরক্ষা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। শত্রুদের সম্মিলিত আক্রমণের মূল লক্ষ্য আফগানিস্তানের ইসলামী শাসনকে ধ্বংস করে দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন দেশের যে কোন মুসলমান, হোক সে সরকারি চাকরিজীবী অথবা অন্য কেউ, তার জন্য আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসনে আমেরিকাকে যে কোন রূপে কোন ধরনের সহায়তা করা জায়েয নেই। বিশেষতঃ মুসলিম আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসন ক্রুসেড যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে। যে কোন মুসলমান এই আগ্রাসনে কাফেরদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে।

তৃতীয়তঃ যে কেউ আল্লাহপাকের বিধানাবলী এবং তার শরীয়তের বিরোধিতা করে, তার অধীনস্থ কর্মচারী অথবা সেনাসদস্য বা অন্য সবার উপর সেই ব্যক্তির নির্দেশাবলীর বিরোধিতা করা ও তার আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব।

চতুর্থতঃ যে সকল দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং ভূমি, আকাশ অথবা তথ্য দ্বারা সহায়তা করছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের কর্তব্য পালনে বাঁধা দিচ্ছে, এ ধরনের প্রশাসন ও শাসকদেরকে যে কোন উপায়ে অপসারণ করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

পঞ্চমতঃ বর্তমান সময়ে আফগান মুজাহিদদেরকে আর্থিক, নৈতিক ও রসদ-সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, আর যার পক্ষে আফগানিস্তানে পৌঁছা এবং তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করা সম্ভব নিশ্চিতভাবে তার জন্য শরয়ী ওয়াজিব হলো সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ করা। আর যে এতে অক্ষম তার কর্তব্য হলো, সম্ভব্য সব পদ্ধতিতে তাদেরকে সহায়তা করা।' (দৈনিক করাচী, 8 অক্টোবর 2001)

এ ফতওয়া প্রদানের কারণেই সম্ভবত পাকিস্থানী গোয়েন্দা সংস্থা তাকে শহীদ করে দেয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। শহীদ শামজায়ী রহ. ছিলেন নিটক অতীতের উলামায়ে হকের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইমাম আবূ হানীফার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সত্যের জন্য জেল থেকে বের হয়েছিলো যার লাশ। হায়! এধরণের আলেম কতই না বিরল! বাতিলের কাছে যারা মাথানত করে না! সত্য প্রকাশে যারা সর্বদা অকুতভয়।

৪. <u>আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) এর ফতওয়া :</u>

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন :

إن الله حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم{ومن يتولهم منكم فإنه منهم } فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم.(أحكام أهل الذمة)

'আল্লাহ তাআলা বিধান দিয়েছেন আর তার বিধানের চেয়ে শ্রে'কোন বিধান নেই। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের মাঝেই গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:**"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন"** সুতরাং যখন কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা জানা গেলো, ইয়াহুদী- খ্রিষ্টানের বন্ধুরা তাদেরই দলভূক্ত সুতরাং এদের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের বিধানই প্রযোজ্য হবে। [আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড:১, পৃষ্টা:৬৭]

৫. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর ফতওয়া :

যে সমস্ত ব্যক্তি, মুসলিম ও তাতারদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে তাতারদের পক্ষ গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ফতওয়া প্রদান করেন:

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الامراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام ، وإذ كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين- (الفتاوى الكبرى)

'সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে যে কেউ তাতারদের পক্ষ নেবে, তাতারদের বিধান ও তার বিধান একই বলে গণ্য হবে। ইসলামী শরীয়াহ্কে উপেক্ষা তার মাঝে যে পরিমাণ বিদ্যমান তাতারদের মাঝেও ঐ একই পরিমাণ বিদ্যমান। যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাকাত প্রদান থেকে বিরত ছিল তারা নামায, রোজা আদায় করা এবং মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ না করা সত্ত্বেও সালাফগণ তাদেরকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে ঐ ব্যক্তির বিধান কী হতে পারে যে আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রুদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? [আল-ফাতাওয়াল কুবরা, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:৩৩২]

৬. <u>জামেয়া আযহারের কেন্দ্রিয় ইফতা বোর্ডের ফতওয়া:</u>

১৩৬৬ হিজরীতে জামেয়া আযহারের কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ডের কাছে ইস্তেফতা করা হয়েছিল, যদি কোন আরব ইয়াহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করে যার ফলে তাদের জন্য ফিলিস্তীনি ভূখণ্ড দখল করা সহজ হয়ে যায় অথবা এ ধরণের অন্য

কোন কাজ করে, যার ফলে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সহায়তা হয় ইসলামে এমন ব্যক্তির হুকুম কি হবে?

শায়েখ আব্দুস সালীমের (রহ.) নেতৃত্বে ইফতা বোর্ড একটি দীর্ঘ উত্তর প্রদান করেন। উক্ত ফতওয়ার মূল অংশ নিম্নে তুলে দেয়া হল:-

إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المنكرة وساعد عليها مباشرة أو بواسطة لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.

'যদি কোন ব্যক্তি এই নিষিদ্ধ পাপ কাজগুলোর কোন একটিতে মুসলিমদের শত্রুদেরকে সাহায্য করে, এ গুলোর কোন একটির ব্যাপারে সরাসরি বা অন্য কোন মাধ্যমে তাদেরকে সহায়তা করে তাহলে সে ঈমানদারদের মাঝে গণ্য হবে না। মুমিনদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং সে নিজ কর্মের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে। সে তার নিকৃষ্ট কাজের মাধ্যমে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করে তাদের চেয়েও ভয়ানক শত্রু বনে গেছে।'

এরপর লিখেন:

ولا يشك مسلم أيضاً أن من يفعل شيئاً من ذلك، فليس من الله ولا رسوله ولا المسلمين في شيء، والإسلام والمسلمون براء منه وهو بفعله قد دل على أن قلبه لم يمسه من الإيمان، ولا محبة الأوطان، والذي يستبيح شيئاً من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه، يكون مرتدا عن دين الإسلام فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .

وعلى المسلمين أن يقاطعوه: فلا يسلموا عليه، ولا يعودوه إذا مرض ولا يشيعوا جنازته إذا مات، حتى يفيء إلى أمر الله ويتوب توبة يظهر أثرها في نفسه وأحواله، وأقواله وأفعاله. (فتاوى خطيرة في وجوب الجهاد الديني المقدس ص ১৭ –২৫.)

'কোন মুসলিমের এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে না, যে ব্যক্তি উক্ত কোন একটি (ইয়াহুদীদেরকে সহযোগিতামূলক) কাজ করবে, তার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল এবং মুসলিমদের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও মুসলিমগণ তার দায় থেকে মুক্ত। সে তার কর্ম দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছে পূর্ব থেকেই তার মাঝে ঈমান বা দেশের ভালোবাসার লেশমাত্র নেই। উক্ত কোন একটি বিষয়ে তার সামনে আল্লাহর হুকুম স্পষ্ট হওয়ার পরেও সে যদি সেটাকে মোবাহ মনে করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার মাঝে ও তার স্ত্রীর

মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে। তার সাথে সম্পর্ক রাখা স্ত্রীর জন্য হারাম গণ্য হবে। তার জানাযার নামায পড়া যাবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না।

মুসলিমদের উপর আবশ্যক হল তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তারা তাকে সালাম দেবে না। অসুস্থ হলে তার সেবা করবে না। সে মরে গেলে তার জানাযার ব্যবস্থা করবে না। যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যতক্ষণ না এমনভাবে তওবা করে যার প্রতিক্রিয়া ভিতর ও বাহিরে কথা ও কাজের মাঝে ফুটে উঠে। [ফাতাওয়া খতীরাহ ফী ওযূবিল জিহাদিদ দীনিল মুকাদ্দাস, পৃষ্টা:১৭-২৫]

৭. আল্লামা জাস্সাস (রহ.) এর ফতওয়া :

আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘কিন্তু না! তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোন দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নিসা: ৬৫]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমাদের মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ মুফাস্সির আল্লামা জাস্সাস (রহ.) বলেন:

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله - تعالى - أو أوامر الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهو خارج من الإسلام سواءً رده من جهة الشك فيه ، أو من جهة ترك القبول ، والامتناع عن التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم. لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. " أحكام القرآن للجصاص"

‘এই আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশসমূহ থেকে কোন একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহ বশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক ও মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকুক। আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে। তারা ঐ ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছিল। তাঁরা তাদেরকে হত্যা করেছিলেন ও

তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দী করে ছিলেন। কেননা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধান ও ফয়সালাকে মেনে নিবে না তারা ঈমানদারদের দলভুক্ত নয়। [আহ্‌কামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস: ৩/১৮১]

নির্দেশনা:

আল্লাহ তাআলার একটি বিধান না মেনে নেবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম যাকাতদানে অস্বীকৃতি প্রদানকারী সম্প্রদায়কে মুরতাদ ফতওয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস (রহ.) বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।" আর যারা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করছে, শ্লোগান তুলছে, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার আল্লাহ প্রদত্ত হালালগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে। তাদের বিধান কি হতে পারে পাঠক একটু ভাবুন?!!

৮. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) এর ফতওয়া :

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন:

...... إنكار المتواتر، عدم قبول إطاعة الشارع، ولا في مرتبة الاعتقاد أيضاً، ورد للشريعة وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه، قال في "الصارم المسلول": وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعرف الله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل مايصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك، ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لاأقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق، وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفيرمثل هذا النوع، بل عقوبته أشد اهـ. وقال: وقد قال الإمام أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف "بابن راهوية"، وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قدأجمع المسلمون أن من سب الله، أوسب رسوله – صلى الله عليه وسلم -،أودقع شيئاً مما أنزل الله، أوقتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقراً بماأنزل الله اهـ.

'...মুতাওয়াতের বিষয়কে অস্বীকার করা, শরীয়ত প্রণেতার (আল্লাহ ও তার রাসূলের) আনুগত্য গ্রহণ না করা এমনকি আক্বীদাগত বিষয়গুলোতেও গ্রহণ না করা এবং **শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা যদিও বা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে তা হবে কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরী**। আস-সরিমুল মাসলূলের মধ্যে শায়খুল ইসলাম বলেন, "যে সমস্ত বিষয়কে সত্যায়ন আবশ্যক তা জানা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো এসতেহলাল (হারামকে হালাল মনে করা) হোক তা ঔদ্ধতাবশত বা প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে এটিও কুফর। কেননা সে আল্লাহ ও

তাঁর রাসূলকে ও তাঁর নির্দেশসমূহ জানতে পেরেছে। মুমিনরা যা কিছু সত্যায়ন করে সেও তা সত্যায়ন করেছে। কিন্তু তার চাহিদা ও মন মতো না হওয়ার কারণে এগুলো তার ভাল লাগে না। পছন্দ হয় না। খারাপ লাগে। সে বলে আমি এগুলো মানতে পারব না। আঁকড়ে ধরবো না। এই সত্যকে সে অপছন্দ করে, তা থেকে পলায়ন করে। এই শ্রেণীটি ১ম শ্রেণী (যারা আন্তরিকভাবে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে) থেকে ভিন্ন। এদের কাফের হওয়ার বিষয়টি দ্বীন ইসলামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পুরো কুরআন জুড়ে এধরনের ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে বরং এদের শাস্তি আরও অধিক কঠিন বলে বর্ণিত হয়েছে।" ইমাম আবূ ইয়াকুব ইসহাক বিন ইব্রাহীম আল হানতলী (রহ.) যিনি 'ইবনে রাহবিয়া' নামে পরিচিত আমাদের ইমামদের একজন। যাকে শাফেঈ (রহ.) ও আহমাদ (রহ.) এর সাথে তুলনা করা হয়। তিনি বলেন, "সকল মুসলিমরা একমত পোষণ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে গালি দিবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মন্দ বলবে অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে বা আল্লাহর কোন নবীকে হত্যা করবে নিশ্চিত সে কাফের, যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে। [এছাড়াও আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) আরো দলীল পেশ করেছেন। দেখুন:ইকফারুল মুলহিদীন, পৃষ্টা-১১৯/১২০ প্রকাশনা:ইদারাতুল কুরআন,করাচী।]

নির্দেশনা:

১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল রিদ্দাহ (ইসলাম ত্যাগ) সর্বদা বিশ্বাসও স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে না বরং অনেক সময় মানুষের থেকে এমন কর্ম প্রকাশ পায়, যার দ্বারা সে কাফের হয়ে যায়, যদিও বা সে মৌখিকভাবে আল্লাহর সকল বিধানাবলীকে স্বীকার করে নেয়। যেমনটি তিনি বলেছেন:

وإن لم يكذب، وهوكفربواح بنفسه

'যদিও বা সে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে। তথাপি উক্ত কর্মটি কুফরে বাওয়াহ।'

২. ইসলামী শরীয়ত যদি সে অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মেনে নিতে অসম্মতি জানায়। অন্য কোন সংবিধানকে নিজ জীবন বিধান বানিয়ে নেয়, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। লক্ষ্য করুন- আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বলেছেন:

ورد للشريعة وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه

'এবং শরয়ী বিধানকে প্রত্যাখ্যান যদিও মিথ্যা প্রতিপন্ন নাও করে। তথাপি তা স্বয়ং কুফরে বাওয়াহ বা সুস্পষ্ট কুফরী।'

ইমাম ইসহাক বিন রাহবিয়া (রহ.) বলেছেন:-

أودفع شيئاً مما أنزل الله، أوقتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله اهـ

'অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কোন বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে। বা আল্লাহর কোন নবীকে হত্যা করবে নিশ্চিত সে কাফের। এই তার বিধান যদিও বা সে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানাবলীকে স্বীকার করে।'

৯. শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহ.) এর ফতওয়া :

আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) কে সিরিয়ার কয়েকজন সম্মানিত আলেম একটি ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন ঃ যে ব্যক্তি ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করার অপপ্রয়াস চালায়, ইসলামী আইনের পরিবর্তে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার আগ্রহ প্রকাশ করে; ইসলামী শরীয়তে এমন ব্যক্তির বিধান কি? আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে হক্বকে সাহায্য না করে যে ব্যক্তি নিরব ভূমিকা পালন করে তারই বা হুকুম কি?

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) লিখেন:

إن هذه هي أدهى الدواهي وأعظم المصائب، يذوب لهولها قلب كلِّ مؤمن صادق الإيمان، ولا سيّما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام، فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يُهجر هذا المطالب هجرا كليًا فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلاً حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة، ولأحكامهما دلالة واضحة لا ارتياب فيها، فتكون محاولة فصل الدين من الدولة كفرا صارخًا منابذا لإعلاء كلمة الله، وعداءً موجها إلى الدين الإسلامي في صميمه، ويكون هذا الطلب من هذا المطالب إقرار منه بالانبتار والانفصال فيلزمه بإقراره، فنعده عضوًا مبتورًا من جسم جماعة المسلمين وشخصًا منفصلاً عن عقيدة الإسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب

'নিশ্চয়ই এটি চরম বিপর্যয়, কঠিন মুসিবত; যা সত্য ঈমানের অধিকারী প্রতিটি মুমিনের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে। বিশেষ করে সিরিয়ার মত রাষ্ট্রে। অতীতে যার রয়েছে ইসলামের জন্য নানা খেদমত। কোন মুসলিমের আকল

....

সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যদি সে এ ধরণের প্রয়াস চালায়, আর যদি সে অঞ্চলে ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়িত থাকে তাহলে তার উপর মুরতাদের বিধান (হত্যা) বলবৎ হবে। আর যদি ভিন্ন অঞ্চল হয় তাহলে এই আগ্রহী ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ বয়কট করতে হবে। তার সাথে কোন ধরণের কথা বা লেনদেন করা যাবে না। যতক্ষণ না জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; আর সে তাওবা করে ফিরে আসে। কুরআন ও সুন্নাহর নসগুলো স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, দ্বীনে ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা জঘন্য কুফর। আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হল দ্বীন ইসলামের সাথে ঘোরতর শত্রুতা পোষণ। উপরোক্ত আগ্রহী ব্যক্তির এই প্রয়াসই তার পক্ষ থেকে (দ্বীন থেকে) পৃথক হয়ে যাওয়া ও বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। আর তার স্বীকারোক্তির কারণেই এই হুকুম তার উপর বর্তাবে। ফলে আমরা তাকে মুসলিম উম্মাহর শরীর থেকে একটি কর্তিত অঙ্গ এবং ইসলামী বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি বলে গণ্য করব। তাই তার সাথে বিবাহ বৈধ হবে না। তার জবেহকৃত পশুর মাংস হালাল হবে না। কেননা সে মুসলিমও নয় আহলে কিতাবও নয়।

এর পর আল্লামা যাহেদ কাউসারী (রহ.) এই ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পেশ করেন। অতঃপর উল্লেখ করেন :-

وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس ورد، لأهل الردة

‘এই কঠিন বিপর্যয়ে সত্যকে সাহায্য না করে শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যে নিরবতা অবলম্বন করবে, সে হল মুরতাদের সহায়তাকারী বোবা শয়তান।’

(দেখুন:-আল-মাক্বালাতুল কাউছারী, অধ্যায়- হুকমু মুহাওলাতি ফাসলিদ দ্বীন, পৃষ্টা:-৩৩০/৩৩১, প্রকাশনা:-আল-মাকতাবুত তাউফীকিয়্যাহ্)

১০. আল্লামা আলুসী (রহ.)এর ফতওয়া :

আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন:

لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع, ويقول هو أوفق بالحكمة, وأصلح للأمة, ويتميز غيظاً ويتعصب غضبا إذا قيل له في أمر الشرع فيه كذا . كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا

ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها, ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصا للحق

'সন্দেহাতীতভাবে ঐ ব্যক্তি কাফের; যে (শরীয়ত বিরোধী) কোন বিধানকে ভাল মনে করে এবং তাকে শরীয়াতের উপর অগ্রাধিকার দেয়, আর বলে এটাই বাস্তবসম্মত ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর। যদি তাকে কোন বিষয়ে বলা হয় , এখানে তো শরীয়ার বিধান এমনটি ছিল, সে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। যেমনটি আমরা কতক ব্যক্তির মাঝে দেখতে পাচ্ছি; আল্লাহ যাদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, তাদেরকে বধির বানিয়েছেন, তাদের চক্ষুগুলোকে অন্ধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধী কোন বিধানকে পছন্দ করে এবং শরয়ী বিধানকে অসম্পূর্ণ ভেবে উক্ত বিধানকে শরীয়ার উপর প্রাধান্য দেয়, তাকে কাফের বলে ঘোষণা দেয়ার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা অনুচিত। [তাফসীরু রূহুল মা'আনী, খণ্ড:২৮, পৃষ্টা:২০]

১১. ইমাম রাজি (রহ.) এর ফতওয়া :

ইমাম রাজি (রহ.) বলেন:

قوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (النور: ৬৩) وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة، وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم.

'আল্লাহ তাআলার বাণী: **অতএব, যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে (সূরা নূর: ৬৩)**। এটিই প্রমাণ করে তাঁর বিরোধিতা একটি মহা অপরাধ। এই আয়াতগুলো এটিও প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন একটি আদেশ প্রত্যাখ্যান করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। চাই সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক বা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে। এটি যাকাত প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করত তাদেরকে হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনকে বন্দী করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মতকে সত্য বলে সাব্যস্ত করে। [তাফসীরে রাজী, খণ্ড:৫, পৃষ্টা:২৫৯]

১২. আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহ.) এর ফতওয়া :

আল্লামা ইবনে আব্দিল বার (রহ.) বলেন:

....

فإنّ من ردّ ، وامتنع عن قبول حكم الله - تعالى - فهو كافر بالإجماع ، وإن كان مقرّاً بهذا الحكم ، "يقول إسحاق بن راهويه : وقد أجمع العلماء أن على من دفع شيئاً أنزله الله .. وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে ও তা প্রত্যাখ্যান করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হয়ে যায়। যদিও সে এ বিধানকে স্বীকার করে। ইসহাক বিন রাহবিয়া বলেন: সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ কোন একটি বিধানকেও প্রত্যাখ্যান করে সে নিশ্চিত ভাবে কাফের হয়ে যায়। যদিও সে সেটাকে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান বলে স্বীকার করে।' [তামহীদ:৪/২২৬]

একটু লক্ষ্য করুন তিনি বলেছেন, আল্লাহর বিধান বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও যদি প্রত্যাখ্যান করে তথাপি সকল ইমামের ইজমা অনুযায়ী কাফের হয়ে যায়।

১৩. আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) এর ফতওয়া :

আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন :-

" ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين "

'প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি ঐ আদেশ ও নিষেধ সমূহকে রহিত করে যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, সে মুসলিমদের ঐক্যমতে কাফের হয়ে যায়।' [মাজমূয়ুল ফাতাওয়া: ৮/১০৬]

তিনি আরো বলেন:

و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه , أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه : كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء.

'মানুষ যদি এমন বিষয়কে হালাল করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। অথবা এমন বিষয়কে হারাম করে যা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল অথবা ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন শরয়ী বিধান কে পরিবর্তন করে, তাহলে সে ফুকাহাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কাফের বা মুরতাদ হয়ে যায়। [মাজমূয়ুল ফাতওয়া, খণ্ড:৩, পৃষ্টা:২৬৭]

তিনি আরো বলেন:

متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {المص .كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للمُؤْمنينَ

. اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعوا مِنْ دونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرونَ} ولو ضُرب وحُبس وأُوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره؛ كان مستحقاً لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله؛

'যখন কোন আলেম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত এলেম ছেড়ে দেয় এবং শাসকদের বিধানের অনুসরণ করে, যে বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিধানের বিপরীত সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হয়। সে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :"আলিফ-লাম-মীম-সদ। এটি এমন কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।" (সূরা আ'রাফ: ১-৩)

যদি তাকে প্রহার করা হয়, বন্দী করা হয়, বিভিন্ন ধরণের শাস্তি প্রদান করা হয়, ফলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরয়ী এলেমকে ছেড়ে দেয়, যার আনুগত্য ছিল ওয়াজীব এবং অন্য কোন বিধানের অনুসরণ করে তথাপি সে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে। বরং তার উপর আবশ্যক হল যদি আল্লাহর জন্য তাকে শাস্তিও দেওয়া হয় তবুও ধৈর্যধারণ করা। [আল-মুন্তাখাব মিন কুতুবী শাইখিল ইসলাম, খণ্ড:১, পৃষ্টা:১৩৪]

১৪. আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহ.)এর ফতওয়া :

আল্লামা আহমদ শাকের (রহ.) এর ভাই আল্লামা মাহমুদ শাকের (রহ.) বলেন:

فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفرعلى حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لايشك أحد من أهل القبلة على اختلافه في تكفيرالقائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وإدعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها.)اهـ

'এ ধরণের কাজ (নতুনভাবে সংবিধান রচনা) হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রাহ্য প্রকাশ এবং মহান আল্লাহ তাআলার

বিধানের উপর কুফ্ফারদের বিধানকে প্রাধান্য প্রদান। এ সকল কর্ম কুফর। কোনো মুসলমান চাই সে যে মতেই বিশ্বাসী হোক এর প্রবক্তা এবং এর দিকে আহ্বানকারীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে, কোন প্রকার বাছ-বিচার ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান সমূহকে বর্জন করা হচ্ছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন ও তার নবীর সুন্নাহয় বর্ণিত বিধানের বিপরীত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। পূর্ণরূপে আল্লাহর শরীয়াকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং বিষয়টি এমন চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের উপর মানব রচিত বিধানকে যুক্তি দেখিয়ে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। যুক্তি প্রদানকারীরা এ দাবি করছে যে, ইসলামী শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে ভিন্ন এক সময়ে এবং এমন কিছু কারণে অবতীর্ণ হয়েছে যা ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং সে সব কারণ আজ বর্তমান না থাকার কারণে বিধানগুলো বাতিল হয়ে যাবে। [উমদাতুত তাফসীর, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:১৫৭]

ইতিহাস কী বলে?

ছয়শত হিজরী পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী শরয়ী আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার মত জঘণ্য আপরাধ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা তখন আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন করে কোন শাসকের ক্ষমতায় টিকে থাকা ছিল কল্পনার বাইরে। তখন সর্বোচ্চ যা ঘটতো তাহল, ঘুষ, আত্মীয়তার সম্পর্ক আথবা এ ধরনের পার্থিব কোনো স্বার্থের পিছনে পড়ে বিচারকরা এক জনের হক্ব আন্যজনকে দিয়ে দিত।

এক

সর্বপ্রথম মানব রচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু হয় ৬০০ হিজরীর পর। তাতাররা মুসলিম কিছু দেশ দখল করে অতঃপর তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ইসলামী শরীয়ার অনুসরণ করে না। বরং কোরআন থেকে কিছু বিধান গ্রহণ করে, কিছু গ্রহণ করে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে, কিছু বিধান রচনা করে নিজ হাতে। সবগুলোর সমন্বয়ে তারা যে সংবিধান রচনা করে তার নাম দেয় ইয়াসা বা ইয়াসিক। এর ফলে তৎকালীন সবচেয়ে বড় আলেমে দ্বীন আল্লামা ইবনে কাছীর [রহ:] সহ অন্যান্য আলেমগণ তাদেরকে মুরতাদ হবার ফতওয়া প্রদান করেন।

দুই

এর পর ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর তুরষ্ক যখন মানব রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল তখন দাউলাতে উসমানিয়ার সর্বশেষ শাইখুল ইসলাম মোস্তফা সবারী (রহ:) উক্ত কর্মকে কুফর ও রিদ্দাহ বলে ফতওয়া প্রদান করেন এবং সেখান থেকে হিজরত করে মিশরে চলে আসেন।

তিন

দাউলাতে উসমানিয়ার পতনের পর মানব রচিত সংবিধান যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিণত হয়, তখন মিশরের সবচেয়ে বড় আলেম মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা আহমাদ শাকের (রহ:) ও তার ভাই মাহমুদ শাকের (রহ:) এই বিধান রচনা কারীদেরকে কাফের ও মুরতাদ ফতওয়া প্রদান করেন।

চার

১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে সিরিয়ায় যখন কিছু ব্যক্তি সর্ব প্রথম রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চলাতে থাকে, তখন সিরিয়ান কিছু আলেম শাইখুল ইসলাম যাহেদ কাউসারী (রহ:) কে তাদের ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া প্রদান করেন।

হে পাঠক! একটু ভেবে দেখুন:

প্রথমত. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ কিভাবে কাটাবে তার নির্দেশনা ইসলামে দেয়া আছে। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানব জাতি যত সমস্যার সম্মুখীন হবে তার সমাধান তাতে বিদ্যমান আছে এবং সবক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তাই উত্তম ও উৎকৃষ্ট। আর এটাকে মেনে নেয়ার নামই ঈমান।

যারা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করে, আল্লাহর বিধানকে পিছনে ফেলে নিজেরাই বিধান রচনা করে। মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে, কেউ যদি তা অমান্য করে এবং আল্লাহর বিধান পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান করে। নিশ্চিত সে নিজ রচিত সংবিধানকেই উত্তম মনে করে, আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানকে সময় অনুপযোগী মনে করে। তাই সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত. একটু লক্ষ্য করুন:- ইসলাম ধর্মের মূল হল তাওহীদ। কিন্তু আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার কারণে আজ সমাজে তাওহীদের অবস্থা কী? হাজার

হাজার মুসলিম মাজার পূজা, কবর পূজা ও করে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। কিছু দাজ্জাল, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের এজেন্ট নিজেদেরকে পীর দাবি করে লাখ-লাখ মানুষের মাঝে কুফর ও শিরক ছড়াচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিশৌধ, ভাস্কর্যের নামে মোড়ে মোড়ে মূর্তি তৈরী করা হচ্ছে। এধরনের নানা শিরকে সমাজ ছেয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিরন্তন জাহান্নামকে নিজেদের ঠিকানা করে নিচ্ছে। একটু চিন্তা করুন, এর মূল কারণ কী? এই শাসকরা যদি আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন না করতো, আল্লাহর বিধান দ্বারা যদি দেশ পরিচালনা করত, তাহলে এই শির্কগুলো কি সমাজে বিদ্যমান থাকত? লাখ-লাখ মানুষ কি চিরন্তন জাহান্নামের দিকে ধাবিত হত?

যাদের কারণে লাখ-লাখ মানুষ কাফের হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তারা কী করে মুসলিম হতে পারে? অসম্ভব! কখনই তারা মুসলিম নয়।

তৃতীয়তঃ ইসলামের দ্বিতীয় রোকন হল নামায। আজ শতকরা কত জন মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে? যদি ইসলামী বিধান থাকত তারা কি নামায ত্যাগ করত। সুদ একটি জঘণ্য হারাম কাজ যাকে আল্লাহ তাআলা, তাঁর ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মানব রচিত সংবিধান সেটিকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মূল উপাদান হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। যার ফলে কজন মানুষ এর কালো থাবা থেকে পূর্ণ নিরাপদ থাকতে পারছে? এই সংবিধান ব্যভিচারের লাইসেন্স প্রদান করেছে। আর যদি ব্যভিচার উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত হয় তাহলে এ সংবিধানের মতে তা জেনাই নয়। জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতকে এ সংবিধান অবৈধ ঘোষণা করেছে। মোটকথা সকল পাপের দ্বার উন্মচিত করেছে, অনেক নেকের দ্বার বন্ধ করেছে।

চতুর্থতঃ মানবরচিত সংবিধানের দুটি মূলনীতি হল – ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাক স্বাধীনতা।

ধর্ম নিরপেক্ষতা :- ধর্ম নিরপেক্ষতার আবরণে সমাজে নাস্তিকতা ছড়ানো হচ্ছে। মুসলিম যুবকরা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ সিলেবাসের মাধ্যমে ছোট ছোট শিশুদের হৃদয়ে ধর্ম বিরোধী বিজ বপণ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রে খ্রিষ্টান মিশনারী গুলোকে অপতৎপরতা চালানোর অনুমতি ও নিরাপাত্তা দেয়া হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে তারা হাজার হাজার সহজ সরল মুসলিমকে খ্রিষ্টান বানাচ্ছে।

বাক স্বাধীনতা :- বাক স্বাধীনতার নামে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে পত্র-পত্রিকায় ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ব্লগ ও ফেসবুকে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়া

হচ্ছে। আর এই সবকিছু সম্ভব হচ্ছে এই শাসকবর্গ ও তাদের রচিত সংবিধানের সহায়তায়।

উপরের আলোচনা দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, কাফের-মুশরিকদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রব্বানী বিধান অমান্য করা, কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তাগুতদের শরনাপন্ন হওয়াসহ নানাবিধ অপরাধের কারণে বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের শাসকবর্গ কাফের ও মুরতাদ, যদিও তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, ইসলামের বিভিন্ন খেদমত করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিক না কেন।

মুসলিমদের শাসক যদি কাফের ও মুরতাদে পরিণত হয় সেক্ষেত্রে মুসলিমদের করণীয় কী? নিম্নে আমরা এব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

মুরতাদ শাসক ও উম্মাহর দায়িত্ব

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর শাসন ক্ষমতা এমন সব শাসক গোষ্ঠির হাতে যারা নানাবিধ কারণে ধর্মত্যাগী মুরতাদে পরিণত হয়েছে। কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়ে যা খুশি তাই করছে। দেশ থেকে ইসলামের নামনিশানা মিটিয়ে ফেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র আটঁছে। আলেম-উলামাসহ সর্বস্তরের মুসলিমদের উপর হাজারো প্রকার জুলম করছে। কিন্তু মুসলিমরা সকলে নিজের ফিকিরে ব্যস্ত। যেন রাষ্ট্র ও হুকুমাত নিয়ে চিন্তা ফিকির করার দায়িত্ব তাদের নয়। আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য সে আদিষ্ট নয়। ভাবখান এমন, তারা ক্ষমতায় থেকে যা খুশি করুক, তাতে আমার কী? আমি তো ভালই আছি, সুখেই আছি। আমি তো হুকুমাতের জুলমগুলো মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়েই গেছি। এভাবে যত দিন পারি বেঁচে থাকি।
আচ্ছা এই শাসকগোষ্ঠিকে কি এভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা কি তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে বলেছেন? নাকি তাদেরকে অপসারণ করতে বলেছেন? যদি অপসারণ করতে বলে থাকেন তাহলে কী ভাবে করতে হবে? গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে? দাওয়াত ও তাবলীগ এর মেহনতের মাধ্যমে? নাকি কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ এর মাধ্যমে?
দালিলিক আলোচনার পূর্বে নিকট অতীতের কিছু বাস্তব চিত্র আমাদের সম্মুখে থাকলে দলীল বুঝতে সহজ হবে।

বাস্তব প্রেক্ষাপটে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই ইসলামের ইতিহাসে জিহাদের প্রস্তুতি ও অভিযান ছাড়া কোন ভূখণ্ডে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিতাল ছাড়া অন্য সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থতার মুখ দেখেছে। কিতাল ছাড়া কোন ভূখণ্ডেই শুধুমাত্র গণ-অভ্যুত্থান বা গণ-জাগরণের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফাত কায়েম হয়নি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে আল-জেরিয়ায় ইসলামী দল ৮০% জন-সর্মথন নিয়ে ক্ষমতায় যেয়েও সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন তো (মুসলিম ব্রাদারহুড) এর জ্বলন্ত নমুনা। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা লাভের পর এক বছর ক্ষমতায় টিকে থাকল। তারা কি এই এক বছরে ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে? খেলাফততো দূরের কথা মদ, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তির মত মানবীয় দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধগুলোও বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি। তারপর কি হল তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্য দিকে তালেবানের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। বর্তমানে সোমালিয়া, মালি, ইয়ামান,আফগান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া,পাকিস্থানসহ বিভিন্ন দেশের ৫০ লক্ষ্য বর্গমাইলের অধিক এলাকা মুজাহিদদের কিতালের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে এবং তাদেরই অধীনস্থ রয়েছে। সেগুলোর দিকে তাকান, সেখানে কেউ কি ইসলাম বিরোধী কোন কাজ করার সাহস পাবে? প্রকাশ্য কোন অপরাধ সেখানে কি সংঘটিত হচ্ছে? এতো গেল বাস্তব পরিস্থিতি। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের উপর দায়িত্ব কী? শাসক কাফের-মুরতাদে পরিণত হলে তাদেরকে কি অপসারণ করতে হবে? হলে এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতি কী? এর উত্তর নিয়েই আমাদের এ অধ্যায়।

মূলকথা:

ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কাফের কখনই মুসলিমদের শাসক হতে পারে না। মুসলিম দেশের কোন শাসক যদি শাসনভার গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে সে অপসারিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং তার স্থানে একজন ন্যায় পরায়ণ মুসলিম ইমাম নিযুক্ত করা মুসলিম জনসাধারণের উপর ফরয। আর যদি শাসক জালিম হয়, তাহলে ইমামে আজম আবূ হানীফা (রাযি.) সহ অন্যান্য একাধিক নেককার সালাফদের মত অনুসারে তার বিরুদ্ধেও কিতাল করে তাকেও অপসারণ করা ফরয। তবে জমহুরের মতানুসারে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়ার পূর্বপর্যন্ত জালেমের বিরুদ্ধে কিতাল করা ফরয নয়।

কুরআন-সুন্নাহ থেকে কথার দলীল

দলীল নং-১

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ .

'যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না'। (সূরা বাকারা: ১২৪)

আল্লামা জাস্‌সাস (রহ:) এই আয়াতের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে বলেন:

فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته وكذلك قال النبي ص - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم

وكان قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول فإن لم يؤتمرله فبالسيف على ما روي عن النبي ص - وسأله إبراهيم الصائغ وكان من فقهاء أهل خراسان و رواه الأخبار ونساكهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال هو فرض وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ص - قال أفضل الشهداة حمزة بن عبدالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتل احكام القرآن

'এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ফাসিকের নেতৃত্বদান অগ্রহণযোগ্য। সে খলিফাহ্ও হতে পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি ফাসেক অবস্থায় এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে জনসাধারণের উপর তার অনুসরণ ও আনুগত্য আবশ্যক হবে না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছেন,"স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।" আয়াতটি এই প্রমাণও বহন করে, ফাসেক বিচারক হতে পারবে না। যদি সে বিচারকের পদ দখল করে, তাহলে তার বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে না।

তিনি আরো বলেন : ইমাম আবূ হানিফা (রহ.) এর মত হল 'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার' মুখ দ্বারা ফরয। যদি তা মান্য না করে তাহলে

তরবারি দ্বারা। যেমনটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। ইব্রাহিম আস সায়েক যিনি খুরাসানের একজন ফকীহ, হাদিসের রাবি, এবং বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবূ হানীফা (রহ.) কে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটা ফরয। অতঃপর তিনি তাকে ইকরামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **সর্বশ্রে'শহীদ হল হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এবং ঐ ব্যক্তি যে কোন জালিমের সামনে দাঁড়িয়ে যায় ও তাকে আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার সম্পর্কে আদেশ করে। ফলে তাকে হত্যা করা হয়।'** (আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস, সূরা বাকারা:১২৪)

নির্দেশনাঃ

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জাস্‌সাস (রহ.) বলেছেন :"জালিম ব্যক্তি শাসক হতে পারবে না।" যদিও এ ব্যাপারে ফুকাহাগণের মাঝে দ্বিমত আছে। তবে যে বিষয়টি বুঝে আসে জালিমের ব্যাপারে যদি এতো কঠোরতা হয় তাহলে কাফের-মুরতাদের ব্যাপারে কী ফায়সালা হতে পারে?

দলীল নং-২

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, **'নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি'**। (সূরা বাকারা: ৩০)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

الرابعة - هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة.ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الائمة إلا ما روي عن الاصم ...ودليلنا قول الله تعالى: " إني جاعل في الارض خليفة " [البقرة: ৩০]،وقوله تعالى: " ياداود إنا جعلنا ك خليفة في الارض[ص : ২৬]،وقال: " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض " [النور: ৫৫] أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآية.(تفسير القرطبي)

'এ ব্যাপারে এই আয়াতটিই মূল ভিত্তি যে, এমন একজন ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করতে হবে যার আদেশ শুনা হবে ও যার আনুগত্য করা হবে। যাতে

তার দ্বারা মুসলিমদের মাঝে ঐক্য তৈরি হয়। খেলাফতের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে উম্মাহ্ ও আইম্মাহ্দের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। হ্যাঁ তবে আসম আল মুতাযেলী ও তার মতানুসারীদের থেকে ভিন্নমত বর্ণিত আছে... আমাদের দলিল হল, আল্লাহ তাআলার বাণী :

১. নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি। (সূরা বাকারা:৩০)

২. হে! দাউদ, নিশ্চয় আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি। (সূরা সদঃ ২৬)

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন। (সূরা নূরঃ ৫৫) অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচন করবেন। এ ধরণের আরো অন্যান্য আয়াত সমূহ।' (তাফসীরে কুরতুবী)

দলীল নং-৩

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

'আর তাদের (কাফেরদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।' (সূরা:আনফাল,আয়াত:৩৯)

এই আয়াত দ্বারা বুঝে আসে, যখন কিছু দ্বীন হবে আল্লাহ তাআলার জন্য আর কিছু হবে গাইরুল্লাহর জন্য তখন কিতাল ওয়াজিব হবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহ তাআলার জন্য কায়েম হয়ে যায়।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন–

فإذا كان بعضُ الدين للهِ وبعضُه لغير اللهِ وَجَبَ القِتَالُ حتّى يكونَ الدينُ كُلُّه لله.

"যখন দ্বীনের কিছু অংশ হবে আল্লাহ তা'আলার জন্য আর কিছু হবে গাইরুল্লাহর জন্য, তখন কিতাল ফরজ হবে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে যায়।"

আল্লামা আবূ বাকর জাস্‌সাস রহি: ‘ফিতনা’ এর তাফসীরে বলেন:

قال ابن عباس والحسن: "حتى لا يكون شرك". وقال محمد بن إسحاق: "حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه". والفتنة ههنا جائز أن يريد بها الكفر وجائز أن يريد بها البغي والفساد; لأن الكفر إنما سمي فتنة لما فيه من الفساد، فتنتظم الآية قتال الكفار، وأهل البغي، وأهل العبث والفساد، وهي تدل على وجوب قتال الفئة الباغية. (أحكام القرآن : ٣ / ٦٥).

‘ইবনে আব্বাস ও হাসান (রাযি.) বলেছেন: “যতক্ষণ না শিরক নির্মূল হয়।” আর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহি:) বলেন: “যতক্ষণ না প্রতিটি মুমিন দ্বীনের ব্যাপারে বিপদের সম্মুখীন হওয়া থেকে নিরাপদ হয়।” এখানে ফেতনার অর্থ কুফরও ধরা যেতে পারে এবং ফাসাদ ও আনাচারও ধরা যেতে পারে। কেননা কুফরের মাঝে ভ্রান্তি থাকার কারণে তাকে ফেতনাও বলা হয়। সুতরাং আয়াতটির দাবি হল, কুফফার, দুষ্কৃতিকারী ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আয়াতটি এও প্রমাণ করে, বিদ্রোহীগোষ্ঠির বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন, খণ্ড:৩, পৃষ্টা:৬৫)

দলীল নং-৪

উবাদা বিন সামেত (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

دعانا النبي صلى الله عليه و سلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان (باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية صحيح مسلم)

‘আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তাঁর নিকট বাইআত হলাম। অতঃপর তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন: তা হল আমরা আমাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপিও শুনব ও আনুগত্য করবো এবং আমরা শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না। তিনি বললেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ বিদ্যমান থাকে।’ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

যদি শাসকদের থেকে আমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাই, তাহলে তারা আমাদের জন্য আর বৈধ শাসক থাকবে না। বরং কিতালের মাধ্যমে তাদেরকে অপসারণ করে মুসলিম শাসক নিয়োগ দিতে হবে। যদিও তারা অন্য সকল ধর্মীয় বিধান পালন করে ও দ্বীন ত্যাগের ইচ্ছা না করে। কেননা হাদীসের মাঝে বলা হয়েছে, **'যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও'** সুতরাং এখানে আমাদের দেখাই যথেষ্ট তাদের স্বীকারোক্তির প্রয়জন নেই।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এ হাদীসের আলোকে বলেন:

ودل –أي هذا الحديث- أيضاً على أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة, وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة. (إكفار الملحدين) ص٢٢ في نسخة (المجلس العلمي في كراتشي)

'এ হাদীসটিও প্রমাণ করে, আহলে কেবলাকে কাফের আখ্যায়িত করা জায়েয যদিও তারা কেবলা থেকে না ফিরে যায়। আর কুফরকে গ্রহণ ও ধর্ম ত্যাগের ইচ্ছা ব্যতিতও কুফরের বিধান প্রোযজ্য হতে পারে। (একফারুল মুলহিদীন পৃ.২২)

দলীল নং-৫

وعن عَوْفِ بنِ مالكٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خِيارُ أئمتكم الذين تُحِبُّونَهُمْ ويُحِبُّونَكُمْ، ويُصَلُّون عليكم وتُصَلُّون عليهم. وشِرارُ أئمتكمالذين تُبْغِضُونَهُم ويُبْغِضُونَكم، وتُلْعِنُوْنَهُم ويُلْعِنُوْنُكم.قِيلِ يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسيف؟ **فقال**: **لا**؛ **ما أقاموا فيكم الصلاةَ**. (صحيح مسلم. رقم الحديث:1855 دار المغني).

"আউফ বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে, তোমরা তাদের জন্য দোয়া করবে তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট শাসক হলো তারা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং তারাও তোমাদেরকে অপছন্দ করবে, যাদেরকে তোমরা লা'নত করবে এবং তারাও তোমাদেরকে লা'নত করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারি দ্বারা তাদের মোকাবেলা করবো না? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন: না, যতদিন তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে।” (মুসলিম শরীফ, অধ্যায়-খিয়ারুল আয়িম্মাহ, হাদীস নং-৪৯১০)

দলীল নং-৬

وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعْت النَّبِيَّ يَقُولُ: « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ **مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ** » .

“উম্মুল হুসাইন আল-আহমাসিয়্যাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা শোনো এবং আনুগত্য করো যদিও একজন হাবশী গোলামকে তোমাদের আমির বানিয়ে দেয়া হয়, যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৭৩০৭)

দলীল নং-৭

عن يحيى بن حَصِيْنٍ قال: سمعت جَدِّي يقولُ: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في حَجَّة الوَداعِ: ولو اُسْتُعْمِلَ عليكُم عبْدُ حَبَشِيٌّ**يَقُوْدُكُم بكتاب الله** فاسمَعُوا له وأطِيْعُوا.

“ইয়াহইয়া বিন হাসীন বলেন, আমি আমার দাদা থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি, যদি কোনো হাবশী গোলামকেও তোমাদের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়, যে তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ দিয়ে পরিচালনা করে তাহলে তার আদেশ শুনবে ও মানবে।” (সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং-৪১৯২)

উল্লেখিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

উপরোক্ত হাদীসসমূহের একটিতে বলা হয়েছে, শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই করা যাবে না, যতক্ষণ তার মাঝে কোন ‘কুফরে বাওয়াহ’ বা সুস্পষ্ট কুফর দেখা না যায়। আরেকটিতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ

কায়েম রাখে। অপর দু'টিতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহকে প্রতিষ্ঠিত রাখে; কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। পক্ষান্তরেএবিষয়ে উম্মতে মুসলিমার ইজমা রয়েছে যে, শাসক থেকে যদি 'কুফরে বাওয়াহ' বা সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায় বা কুরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা না করে, অথবা নামাযসহ ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা না করে, তাহলে সে আর মুসলমানদের শাসক হিসাবে বাকি থাকে না– তাই তাকে অপসারণ করে এমন একজন শাসক নিয়োগ দেয়া ফরজ হয়, যে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। সামনে এ বিষয়ে এক-এক করে উলামায়ে কেরামের বক্তব্যগুলো পাঠ করুন।

১. ইমাম ইবনে বাত্তাল রহ.(মৃত্যু ৪৪৯ হি.)

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন–

"قال أبو بكر بن الطيب: أجمعت الأُمَّةُ أنه **يُوجِبُ خَلْعَ الإمامِ وسُقوطَ فرضِ طاعتِه كُفرُه بعدَ الإيمانِ، وتركُه إقامةَ الصلاة والدعاءَ إليها**، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالماً غاصبًا للأموالِ".

"আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন– উম্মাহর এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ঈমান গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যায়।" (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল আহকাম, খণ্ড: ৮ পৃষ্ঠা: ২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ)

২. কাযী ইয়ায রহ.(মৃত্যু ৫৪৪ হি.)

উপরোক্ত হাদীস সমূহের আলোকে কাযী ইয়ায রহ. (মৃত্যু ৫৪৪ হি.) বলেন–

أجمع العلماءُ على أن الإمامةَ لاتنعقدُ لكافرٍ وعلى أنه لو طَرَأَ عليه الكفرُ انعزلَ، قال: وكذا لو تركِ إقامةَ الصلواتِ والدعاءَ إليها.

"উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না। এবং খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায কায়েম করা অথবা নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দেয় (তাহলেও সে অপসারিত হয়ে যাবে)।{ শরহে মুসলিম, ইমাম নববী, অধ্যায়-উজুবু ত্বআতিল উমারা, খণ্ড:১২, পৃষ্ঠা:২২৯}

৩. আল্লামা আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (মৃত্যু ৬৫৬ হি.)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন–

"فإن أَمَرَ بمعصيةٍ فلا تَجُوْزُ طاعتُه في تلكَ المعصيَة قولاً واحدًا، **ثم إنْ كانتْ تلكَ المعصيةُ كُفرًا:وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلِّهم. وكذلك: لو تَرَكَ إقامةَ قاعدةٍ من قواعدِ الدينِ؛** كإقامة الصلاةِ، وصومِ رمضانَ، وإقامة الحدودِ، ومَنَعَمن ذلكَ. وكذلك لو أباحَ شُربَ الخَمَرِ، والزِّنى، ولم يَمنَعْ منهما، **لا يُخْتَلَفُ في وُجوبِ خَلْعِهِ**". المفهم كتاب الإمارة 39/4 دار إبن كثير

"শাসক যদি গুনাহের আদেশ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে গুনাহের কাজে তার আনুগত্য করা জায়েয হবে না। এখন সেই গুনাহটা যদি কুফর হয়, তাহলে সকল মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তাকে অপসারণ করা। এমনিভাবে সে যদি নামায, রমযানের রোযা, হুদুদ তথা দণ্ডবিধির মতো দ্বীনের মৌলিক কোন বিধান প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় এবং সেগুলো পালনে বাধা দেয়, তদ্রুপ সে যদি মদপান ও যিনাকে বৈধতা দান করে এবং সেগুলো থেকে বারণ না করে, তখনও তার অপসারণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।" (আলমুফহিম, কিতাবুল ইমারাহ, খণ্ড: ৪ পৃষ্ঠা: ৩৯, দারু ইবনে কাসির)

৪. ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.)

উক্ত হাদীস সমূহের আলোকে ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) বলেন–

لا يجوز الخروجُ على الخُلفاءِ بمجرَّدِ الظلمِ أو الفسق ما لم يُغَيِّرُوْا شيئا من قَواعد الإسلام (باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، شرح مسلم للنووي)

"শুধুমাত্র জুলুম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোনো মৌলিক বিধানকে বিনষ্ট করে।" (শরহে মুসলিম, ইমাম নববী: ১২/২৪৪)

৫. ইমাম তিবি রহ. (মৃত্যু ৭৪৩ হি.)

ইমাম তিবি রহ. উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন–

" **وأجمعوا**على أن الإمامةَ لا تنعقدُ لكافر **ولو طرأ عليه الكفرُ انعزل، وكذا لو ترك إقامةَ الصلوات والدعاء إليها،** وكذا البِدْعَةُ". (الكاشف عن حقائق السنن:. ص:2560 مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة)

"আহলুস সুন্নাহ্র উলামাগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলে সে খলীফা হবে না। এবং কোনো খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে যাবে। এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও। এমনিভাবে বিদআতের হুকুমও একই।" (আল কাশেফ, পৃষ্ঠা: ২৫৬০)

তিনি আরো বলেন–

"قوله: ((ما أقاموا فيكم الصلاة)) فيه إشعارٌ بتعظيمِ أمرِ الصلاةِ،**وأنَّ تركَها مُوْجِبٌ لنَزْعِ اليدِ من الطاعة، كالكفر** على ما سبق في حديث عُبادةَ بن الصامت في قوله: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً)) (الكاشف:2562 مكتبة نزار مصطفى الباز. المكة المكرمة).

"উক্ত হাদীসে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ছালাতের বিষয়টি অনেক গুরুতর। এবং শাসক এ বিষয়টি পরিহার করলেই তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে ফেলা আবশ্যক হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি কুফরি প্রকাশ পাওয়ার

মতো। যেমনটি উবাদা বিন ছামেতের 'তবে যদি তোমরা কুফরি দেখ' শীর্ষক হাদীসে গত হয়েছে।"

৬. ইবনুল মুলাক্কিন রহ. (মৃত্যু ৮০৪ হি.)

আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. বলেন–

"وفِي هذِه الأحاديث حُجَّةٌ فِي ترك الخروج على أئمة الجَوْر ولزومِ السمع والطاعة لهم، والفقهاء يجمعون على أن الإمام المتغلِّبَ طاعتُه لازمةٌ**ما أقامَ الجماعاتِ والجهادَ**".

"যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা এবং তাদের কথা শোনা ও আনুগত্য আবশ্যক হওয়ার প্রমাণ এ হাদীস সমূহে বিদ্যমান রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যপারে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য ততদিন আবশ্যক, যতদিন তারা নামাযের জামাত এবং জিহাদ কায়েম রাখে।" (আততাউযিহ, ইবনুল মুলাক্কিন, কিতাবুল ফিতান, খণ্ড: ৩২ পৃষ্ঠা: ২৮২, ওয়াযারাতুল আওকাফ, কাতার)

তিনি আরো বলেন–

"احتجَّ بهذا الحديث الخوارجُ، فرأوا الخروجَ على أئمة الجَوْر والقيامَ عليهم عندَ ظُهُور جَوْرِهِم، والذي عليه جُمهُور الأئمة المنعُ،**إلا بكفرهم بعد إيمانهم أو تركِهم إقامةَ الصلواتِ**".

"এ হাদীস দ্বারা খারেজীরা দলিল দিয়ে থাকে, ফলে তারা জালেম শাসক থেকে জুলুম প্রকাশ পেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তাকে অপসারণ করা জায়েয মনে করে। তবে জমহুরের মত হলো তা না করা, তবে হাঁ, তারা যদি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে অথবা নামায প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।" (আত-তাউযিহ, ইবনুল মুলাক্কিন, কিতাবুল জিহাদ, খণ্ড: ১৮ পৃষ্ঠা: ৬৬, ওয়াযারাতুল আওকাফ, কাতার)

৭. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.)

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হি.) উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন–

"قال (قلنا يا رسول الله أفلا نُنابِذُهم)**أي أفلا نَعزِلُهم ولا نَطرَحُ عَهْدَهُم ولا نُحاربهم عند ذلك**، أي إذا حصل ما ذُكِرَ. قال: لا، أي لا تُنابِذُوهم **ما أقاموا فيكم الصلاةَ**، أي مُدَّة إقامتهم الصلاةَ فيما بينكم، لأنها علامةُإجتماعِ الكلِمَةِ في الأمَّةِ". المرقاة: كتاب الإمارة252/7

"সাহাবী বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সময় আমরা কি তাদেরকে সরিয়ে ফেলব না, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ছুড়ে ফেলব না, এবং তাদের সাথে লড়াই করব না? তিনি বললেন– না, অর্থাৎ যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে ছালাত কায়েম রাখে ততক্ষণ তা করো না। কেননা এটি মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য বজায় থাকার প্রমাণ বহন করে। " (মেরকাত,খণ্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৩০৩)

৮. আল্লামা ইবনে আল্লান দিমাশকী রহ.(মৃত্যু ১০৫৭ হি.)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-

"وفيه دليلُ تعظيم الصلاة. **ويُؤْخَذُ منهُ أن تركَ إقامةِ الصلاةِ كالكفر البواحِ**، لقوله في حديث عبادة «لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً» وقد تقدم في باب الأمر بالمعروف وكذا تقدم فيه من حديث أمِّ سَلَمَةَ «قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة» رواه مسلم، ". دليل الفالحين:159/5 دار الكتب العلمية

"এ হাদীস থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, ছালাতের বিষয়টি অনেক গুরুতর। এথেকে এও বোঝা যায় যে, নামায প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দেওয়া কুফরে বাওয়াহের মতই। কেননা উবাদা রাযি. এর হাদীসে এসেছে 'ততক্ষণ কিতাল করবে না, যতক্ষণ না কুফরে বাওয়াহ দেখতে পাবে'।" (দলিলুল ফালিহীন, খণ্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ১৫৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)

চার মাযহাবের ফকীহগণের ফতওয়া

১.ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর ফতওয়া:

ইমামে আজম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মত হল, কোন শাসক যদি জালেম হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কিতাল/যুদ্ধ করে তাকে অপসারণ করত: একজন আদেল মুসলিমকে খলীফা নিযুক্ত করা ওয়াজিব, যদিও বা শাসকের থেকে সুস্পষ্ট কোন কুফর প্রকাশ না পায়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছাড়া সালাফে সালেহীনের আরো অনেকে একই মত ব্যক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর কলিজার টুকরা নাতি জান্নাতী যুবকদের সরদার হুসাইন (রাযি.) এর ঘটনা তো সকলেরই জানা। তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। অথচ তৎকালীন সাহাবীগণ ইয়জিদকে কাফের মনে করতেন না। তথাপি পুরো উম্মাহ হুসাইন (রাযি.) জিহাদকে জিহাদ বলে স্বীকার করেন, তার জিহাদ নিয়ে গর্ব করেন। জান্নাতের যুবকদের সরদার হুসাইন (রাযি.)-এর উপরোক্ত আমলই এ ক্ষেত্রে অনেক বড় প্রমাণ।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

"ولا ينال عهدي الظالمين"

'জালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না'। (সূরা বাকারা: ১২৪)

ইমাম জাসসাস (রাযি.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন:

"وكان مذهبه (يعني أبا حنيفة) مشهورا في قتال الظلمة , وأئمة الجور, ولذلك قال الأوزاعي: " احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف " يعني قتال الظلمة , فلم نحتمله .... وقضيته في أمر زيد بن على مشهورة , وفي حمله المال إليه , وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه , وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن. أحكام القرآن (٧٥/١)

'অত্যাচারী ও জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে তার [ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)] মাযহাব প্রসিদ্ধ। এই কারণেই ইমাম আওঝায়ী (রহ.) বলেন, আমরা আবূ হানীফাকে সব বিষয়ে মেনে নিয়েছি যতক্ষণ না সে তরবারী (মুসলিম জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া) নিয়ে আসে। আমরা তার থেকে এটা (মুসলিম জালিম শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদ এর ফতওয়া) মেনে নিতে পারিনি। জায়েদ বিন আলী (রহ.) এর সাথে তাঁর ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি তাকে অর্থ প্রদান করেছেন। গোপনে মানুষকে ফতওয়া প্রদান করেছেন যে, তাকে সাহায্য করা ও তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব। এমনিভাবে

আব্দুল্লাহ বিন হাসানের দুই ছেলে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম এর সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টিও অজানা নয়।'

ইমাম জাস্‌সাস (রহ.) যে যায়েদ বিন আলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন হুসাইন (রাযি.) এর নাতী এবং একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। এই তাবেয়ী তৎকালীন বনু উমাইয়ার খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন আর উক্ত জিহাদে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) স্বীয় মাল দ্বারা অংশগ্রহণ করেন। লোকজনকে গোপনে ফতওয়া প্রদান করতে থাকেন যে, যায়েদ বিন আলী (রহ.) কে সাহায্য করা এবং তার সাথে মিলে কিতাল করা ওয়াজিব।

মানাকেবের মাঝে ইমাম ইবনে হাজর মাক্কী (রহ.) সহীহ সনদে উল্লেখ করেন,

كان زيد بن علي أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه , فقال أبو حنيفة لرسوله: لو عرفت أن الناس لا يخذلونه ويقومون معه قيام صدق , لكنت أتبعه وأجاهد معه من خالفه , لأنه إمام حق , ولكني أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه , لكني أعينه بمالي فيتقوى به على من خالفه , وقال لرسوله : ابسط عذري عنده , وبعث إليه بعشرة آلاف درهم-

'যায়েদ বিন আলী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে ডেকে পাঠালেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তার দূতকে বললেন, যদি আমি জানতাম লোকেরা তাকে অসম্মান করবে না, তার পাশে অবিচল ভাবে দাঁড়াবে, তাহলে অবশ্যই আমি তার অনুসারী হতাম। তার সাথে মিলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতাম। কেননা তিনি একজন হক্ব ইমাম। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা তার পিতার ন্যায় তাকেও অসম্মান করবে। আমি তাকে আমার সম্পদ দ্বারা সাহায্য করছি, যাতে তিনি তার বিরোধীদের বিপক্ষে শক্তি অর্জন করেন। অতঃপর তার দূতকে বললেন, তার নিকট গিয়ে আমার ওজর পেশ কর। আর তিনি তার নিকট দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করলেন।

অতঃপর ইবনে হাজর মাক্কী (রহ.) বলেন :

وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حتى تخلف عنه

অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, ঐসময় তিনি একটি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাই অসুস্থতার ওজর পেশ করেছেন। ফলে তার থেকে পিছনেই থেকে যেতে হয়।

অপর বর্ণনায় এসেছে :

....

سئل عن الجهاد معه , فقال: خروجه يضاهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي (২৬০/১ و২৬১).

'ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে যায়েদ বিন আলী (রহ.) এর সাথে মিলে জিহাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, তার এই জিহাদ তো বদরের দিন রাসূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর জিহাদ সাদৃশ্য।'

উপরে ইমাম জাসসাস (রহ.) যে মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম (রহ.) এর কথা উল্লেখ করেছেন তারা, হযরত হাসান রাযি. এর ছেলে আব্দুল্লাহ রহ. এর পুত্র। তারা দুই ভাই তৎকালীন খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাদের সাথে মিলে জিহাদ করার জন্য ফতওয়া প্রদান করতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। অথচ খলীফা মানসূর ইসলামের কোন অকাট্য বিধানকে পরিবর্তন করেননি। বিচার বিভাগসহ দেশের সমস্ত বিভাগ কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত ছিল। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি মানুষের উপর জুলম করেছিলেন। তার ক্ষেত্রে যদি ইমাম আজম আবূ হানীফা রহ. এর অবস্থান এই হয়, তাহলে বর্তমান শাসকদের ব্যাপারে তার ফতওয়া কী হতে পারে একটু ভেবে দেখুন?

ইবনে হাজর মাক্কী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব মানাকেবে লিখেন:

وذكر المكي في المناقب (৮৪/২):أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم و يأمرهم بإتباعه , وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة

'ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) জনসাধারণকে ইব্রাহীম (রহ.) এর পক্ষে উদ্বুদ্ধ করতেন। তার আনুগত্যের আদেশ প্রদান করতেন। ... তিনি তার সাথে মিলে যুদ্ধ করাকে ৫০টি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিতেন।'

ইমাম কুরদী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থ 'মানাকেবে' বর্ণনা করেন:

ذكر الكردي في مناقبه (২২/২) أن الإمام أباحنيفة منع الحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبدالله , ويقال: إن المنصور سم أباحنيفة من أجل هذا , حتى توفى رحمه الله-

'খলীফা মানসূরের একজন সেনাপতি ছিলেন হাসান বিন কাহতাবা। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাকে ইব্রাহীম বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে

নিষেধ করে ছিলেন। বলা হয় খলীফা মানসূর একারণেই আবূ হানীফা (রহ.) কে বিষ পান করান। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আমীন।'

নির্দেশনা :

এই ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)। যিনি জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বদর যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছন। ৫০টি হজ্বের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজে মাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। অথচ তৎকালীন শাসকরা ইসলামের কোন অকাট্য বিধান কে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি। তারা বর্তমানের শাসকদের ন্যায় জঘন্য ছিলেন না। তাদের ব্যাপারেই যদি জান্নাতী যুবকদের সরদার হুসাইন (রাযি.) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান এই হয়, তাহলে বর্তমান সময়ের আল্লাহর শরীয়তের শত্রু, মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে তাদের ফতওয়া কী হতে পারে?

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এর ফতওয়া :

وقال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه.

'দাউদী (রঃ) বলেছেন : আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম হলে যদি ফিতনা ও জুলম ছাড়া তাকে অপসারণ করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে তা ওয়াজিব। তা না হলে ধৈর্যধারণ ওয়াজিব। অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও বিদআতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে এবং পরে বিদআত ও জুলম করে তবে তার অপসারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা। **যতক্ষণ না সে কুফরী করে। যদি কুফরী করে, তাহলে তাকে অপসারণে রুখে দাঁড়ান ওয়াজিব হয়ে যায়।** (উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০)

৩. আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এর ফতওয়া :

[وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ولو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها وكذا البدعة..] (مرقاة المفاتيح : ১১ / ৩০৩)،

....

'উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, কোন কাফের শাসনভার পেতে পারে না। যদি কোনো মুসলিম শাসক হওয়ার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, তাহলে সে অপসারিত হবে। একই হুকুম বর্তাবে, যদি নামায কায়েম ও নামাযের দিকে আহ্বান ছেড়ে দেয়, অথবা বিদআত করে।' (মিরকাতুল মাফাতীহ:১১/৩০৩)

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. (মৃত্যু ১৩৫২ হি.) এর ফতওয়া:

"**نعم إذا رَأَوْا منه كفرًا بَوَاحًا لا يبقى فيه تأويلٌ، فحينئذٍ يَجِبُ عليهم أن يَخْلَعُوا رِبْقَتَهُ عن أعناقهم**، فإنَّ حقَّ اللَّهِ أَوْكَدُ. ثم هل من طاقة البشر أن لا يختار إلَّا حقًّا في جميع الأبواب، فإذا تعذَّر أخذ الحقِّ في جميع الأبواب – وإن أَمْكَنَ ذهنًا – لا بُدَّ أن يُحدَّ له حَدٌّ، وهو الإغماضُ في الفروع، **فإذا وَصَلَ الأمرُ إلى الأصول حَرُمَ السكوتُ، ووجب الخَلْعُ**. وهو معنى قوله: «وإن أُمِّرَ عليكم عبدٌ حَبَشيٌّ»، فافهم". (فيض الباري كتاب الفتن: باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم«سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»)

"হাঁ, প্রজারা যদি শাসক থেকে কোন সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পায়, যাতে তাবীলের কোন অবকাশ থাকে না, তখন তাদের উপর আবশ্যক হবে তার থেকে আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া। .....শাসকের সমস্যা যখন ইসলামের মৌলিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন চুপ থাকা হারাম হবে, এবং তাকে অপসারণ করা ফরজ হবে।" (ফয়যুল বারী, কিতাবুল ফিতান: ৪/৪৯৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ, দেওবন্দ)

কাশ্মিরী রহ. অন্যত্র বলেন−

وجملةُ الأمر فيه: أن الإِمامَ لو أَمَرَ بالكفر البَوَاح، يَجِبُ الخروجُ عليه وخَلْعُه عن الإِمارة.

"মোটকথা, ইমাম যদি কুফরে বাওয়াহের আদেশ করে, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ফরজ।" (ফয়যুল বারী, কিতাবুল আহকাম: ৪/৪৯৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যাহ)

৫. হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ফতওয়া:

তিনি শাসকদেরকে সাত প্রকারে বিভক্ত করেছেন, সপ্তম প্রকার সম্পর্কে বলেন–

قسم سابع: فسق متعدي يعني ظلم اختيار كرے اور اس كا محل مظلومين كا دين ہو يعني ان كو معاصي پر مجبور كرے ، مگر يہ فسق اسي وقت تك جبكہ اس كا منشاء استخفاف يا استقباح دين اور استحسان كفر يامعصيت نہ ہو، بلكه اغاظت مكره ہو (جيسے اكثر كسي خاص وقتي اقتضاء سے كسي خاص شخص پر اكراه كرنے ميں ايسا هي هوتا هے) ورنه يه بهي حقيقتا كفر هے، اور قسم ثالث ميں داخل هے، يا في الحال تو منشاء اكراه كا استخفاف وغيره نه هو، ليكن اكراه عام بشكل قانون ايسے طورپر هو كه ايك مدت تك اس پر عام عمل هونے سے في المآل ظن غالب هو كه طبايع ميں استخفاف پيدا هو جاوے گا تو ايسا اكراه بهي بناء بر اصل مقدمة الشيئ بحكم ذلك الشيئ بحكم كفر هوگا۔ (امداد الفتاوى، 5\130)

অতঃপর তাদের হুকুম সম্পর্কে বলেন–

قسم سابع كا حكم: يه هے كه از قبيل اكراه على المعاصي هے ....اور بعض صورتوں ميں يه اكراه حقيقة يا حكما داخل كفر هوجاتا هے،..... ان صورتو ں ميے اس كا حكم قسم ثالث كا سا هو جاو ےگا۔ (امداد الفتاوى، 5\134)

"সপ্তম প্রকারের হুকুম হল গুনাহের উপর বাধ্য করার যা হুকুম তাই... কিছু সূরতে এই বাধ্য করাটা প্রকৃত অর্থে কিংবা হুকুমগত দিক থেকে কুফরের মধ্যে দাখেল হয়ে যায়।... এসব ক্ষেত্রে তার হুকুম তৃতীয় প্রকারের হুকুমের মত হবে ।" (ইমদাদুল ফাতাওয়া:৫/১৩৪)

শাসকদের তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে বলেন–

قسم ثالث كا حكم: معزول هو جاوےگا اور اگر جدا نه هو بشرط قدرت جدا كر دينا على الاطلاق واجب هے--(امداد الفتاوى، 5\132)

"তৃতীয় প্রকারের হুকুম, (কুফরে লিপ্ত হওয়ার কারণে) শাসক অপসারিত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে যদি সে ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলে সামর্থ্য থাকার শর্তে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ওয়াজিব।" (ইমদাদুল ফাতাওয়া:৫/১৩২)

৬. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহ. (মৃত্যু ১৩৯৪ হি.) এর ফতওয়া:

اگر امام اور اس کی جماعت سے کفر صریح کا صدور ہو، تو اس کا مقابلہ کرنا اور اس کی جمعیت کو منتشر کرنا بھی جائز ہے؛ بلکہ بقدر استطاعت واجب ہے . إمداد الأحكام.(مكتبة دار العلوم كراتشي (483/4

"যদি ইমাম এবং তার জামাত থেকে স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায়, তাহলে তার মুকাবেলা করা, তার একতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া শুধু জায়েযই নয় বরং সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ।" (ইমদাদুল আহকাম, খণ্ড:৪, পৃষ্ঠা: ৪৮৩)

৭. কাযী ইয়ায শাফেয়ী রহ. (মৃত্যু ৫৪৪ হি.) এর ফতওয়া :

أجمع العلماء على أن الإمامةلا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قالوقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلوطرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر(فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ- تحفةالمحتاج شرح مسلم النووي)

'সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কোন কাফের খেলাফতের দায়িত্বযোগ্য নয় এবং কোন খলীফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায় তাহলে সে অপসারিত হবে। তিনি বলেন, এমনিভাবে শাসক যদি নামায প্রতিষ্ঠা করা অথবা নামাযের দিকে আহবান করা ছেড়ে দেয় তাহলেও সে অপসারিত হবে। তিনি আরও বলেন, জমহুরের মতে শাসক যদি বিদআত করে তবে তার হুকুম একই। কতিপয় বসরী আলেমের মত হল, বিদআতির সাশনক্ষমতা বহাল থাকবে, কেননা সে তাবিলকারী। কাজী ইয়ায (রহ.) আরও বলেন: শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়ার

কোন বিধান পরিবর্তন করে অথবা বিদআত করে, তবে তার থেকে শাসনক্ষমতা রহিত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে। মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, এবং তাকে অপসারণ করে আর একজন ন্যায়পরায়ণ খলিফা নির্ধারণ করা, যদি এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি একাজটি কোনো একটি বিশেষ বাহিনী করতে সক্ষম হয়, তবে তাদের উপরই ওয়াজিব হবে এই কাফেরকে অপসারণের জন্য রুখে দাঁড়ানো। (তুহফাতুল মুহতাজ, শারহু মুসলিম লিন নাবাবী)

৮. ইমাম নববী রহ. শাফেয়ী (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) এর ফতওয়া:

لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام (باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع شرح مسلمالنووي)

‘শুধুমাত্র জুলম ও ফিসকের কারণে খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ নয়। যতক্ষণ না তারা ইসলামের কোন মৌলিক বিধানকে পরিবর্তন করে।’ (শরহু মুসলিম লিন নাবাবী)

আমাদের শাসকরা কত শত বিধানকে পরিবর্তন করেছে তার কোনো হিসাব আছে?!

৯. ইবনে কাসীর শাফেয়ী রহ. .(মৃত্যু ৭৭৪ হি.) এর ফতওয়া :

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ...فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير[تفسير ابن كثير]

‘আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন যে আল্লাহর এমন দৃঢ় বিধানকে ছেড়ে দেয় যা সকল কল্যাণকে সমন্বিত করে, সকল ক্ষতিকারক বস্তু থেকে বাঁচায়, কুরআন-সুন্নাহ্ বাদ দিয়ে সে ফিরে যায় এমন কিছু মতামত, রীতিনীতি ও প্রথার দিকে, যা প্রণয়ন করেছে মানুষেরাই। আল্লাহর শরীয়ার সাথে যার নেই কোন সম্পর্ক। ... যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে কিতাল (যুদ্ধ) করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহর দিকে ফিরে আসে এবং কম হোক বেশী হোক কোন

অবস্থাতেই আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফয়সালা না করে। [তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড:৩, পৃষ্টা: ১৩১]

১০. ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) এর ফতওয়া :

ইবনে হাজার (রহ.) এ ব্যাপারে ইবনে বাত্তাল, ইবনে তীন, দাউদী (রহ.) সহ অন্যান্যদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন :

وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض.

“মোট কথা : তাকে (কুরআন-সুন্নাহর আইনকে প্রত্যাখ্যানকারী শাসককে) তার কুফরীর কারণে অপসারণ করতে হবে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে অবহেলা করবে সে হবে গুনাহগার। আর যে অক্ষম হবে তার উপর ওয়াজিব হল ঐ এলাকা থেকে হিজরত করা।” (ফাতহুল বারী, কিতাবুল ফিতান, ১৩/১২৩)

১১. ইমাম দাউদী মালেকী রহ. (মৃত্যু ৪০২ হি.) এর ফতওয়া:

وقال الداوُدِيُّ الذي عليه العلماءُ في أمراء الجَوْرِ أنه إن قَدَرَ على خَلعِه بغير فتنة ولا ظلم وجبَ، وإلا فالواجبُ الصبرُ، وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جَورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيحُ المنعُ**إلا أن يكفرَ فيجب الخروجُ عليه**.

“ইমাম দাউদী রহ. বলেন–উলামায়ে কেরামের মতামত হলো, শাসক জালেম হলে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করা যদি সম্ভব হয়,তাহলে তাকে অপসারণ করা ফরজ। অন্যথায় ধৈর্য ধরা ফরজ। অনেকে বলেছেন, শুরু থেকে ফাসিকের কাছে নেতৃত্ব প্রদান বৈধ নয়। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে এবং পরে জুলুম করে, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, বিদ্রোহ না করা; যতক্ষণ না সে কুফরী করে। কুফরী করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ফরজ হয়ে যাবে।” (আল মুলিম শারহু সহীহি মুসলিম: ৩/৫৩)

১২. ইমাম ইবনে বাত্তাল মালেকী রহ. (মৃত্যু ৪৪৯ হি.) এর ফতওয়া :

ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন :

قال الحافظ في الفتح (৭/১৩) (قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار . وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء , وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح , فلا تجوز طاعته في ذلك , بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.

"এই হাদীসই (উবাদা বিন সামেত রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস) প্রমাণ বহন করে, শাসক যদি জুলম করে তথাপি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ফুকাহাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষমতার জোরে শাসনের মসনদ দখল করে নিয়েছে তার আনুগত্য করা ও তার সাথে মিলে জিহাদ করা ওয়াজিব। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেয়ে আনুগত্য পোষণই উত্তম। কেননা তাতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়। জনসাধারণ স্বস্তি পায়। আর তাদের দলিল হল, উপরোক্ত হাদীসসহ সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীস। তবে তারা এ থেকে একটি বিষয়কে পৃথক করেছেন আর তা হল, যখন শাসক থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাবে। তখন আর আনুগত্য বৈধ নয়, বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হল তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

তিনি আরো বলেন–

قال أبو بكرِ بنُ الطَّيِّبِ : **أجمعت الأمةُ أنه يُوجِبُ خَلعَ الإمامِ وسقوطَ فرضِ طاعتِه كفرُه بعد الإيمان، وتركُه إقامةَ الصلاةِ والدعاءَ إليها**، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالمًا غاصبًا للأموال.(معالم السنن، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام:8-215)

"আবু বকর ইবনুত তায়্যিব বলেন– উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, ঈমান গ্রহণের পর শাসক কুফরী করলে এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও নামাযের দিকে আহ্বান করা ছেড়ে দিলে, তাকে অপসারণ করা ফরজ হয়ে যায় এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যায়।" (মাআলিমুস সুনান, কিতাবুল আহকাম: ৮/২১৫, মাকতাবাতুর রুশদ)

১৩. আল্লামা কুরতূবী মালেকী রহ. (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) এর ফতওয়া :

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة/৩০]

[هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة ... (تفسير القرطبي : ১ / ২৬৪).

'এমন একজন ইমাম ও খলীফা নিযুক্ত করা জরুরী যার আদেশ শুনা হবে ও যাকে মান্য করা হবে- এ ব্যাপারে এই আয়াতই মূল ভিত্তি, যাতে তার দ্বারা মুসলিমদের ঐক্য বহাল থাকে। খেলাফতের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে উম্মাহ্ ও আইম্মাহ্দের মাঝে কোন দ্বিমত নেই ... (তাফসীরে কুরতুবী)

১৪. ইমাম মাযিরি মালেকী রহ. (মৃত্যু ৫৩৬ হি.) এর ফতওয়া:

"والإمام إذا فسق وجارَ، **فإن كان فسقُه كفرا وجب خَلعُه**، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهبُ أهل السنةِ أنه لا يُخْلَعُ، واحتجُّوْا بظاهر الأحاديث وهي كثيرةٌ". (المعلم شرح صحيح مسلم: 53/3 تحقيق الشاذلي النيفر).

"ইমাম যখন ফাসেকি ও জুলুম করে, তখন তার ফিসকটা যদি কুফর হয়, তাহলে তাকে অপসারণ করা ফরজ। পক্ষান্তরে সেটা যদি শুধুই গুনাহ হয়, তাহলে আহলে সুন্নাতের মাযহাব হলো তাকে অপসারণ করা হবে না।..."
(উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, কিতাবুল ফিতান: ৩০/১১০)

১৫. কাযী আবূ ই'য়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যু ৪৫৮ হি.) এর ফতওয়া:

"إن حدث منه ما يَقْدَحُ في دينه نُظِرَتْ، فإن كَفَرَ بعد إيمانه فقدخَرَجَ عن الإمامة، وهذا لاإشكال فيه، لأنه خَرَجَ عن الملة ووجب قتلُه".

"যদি শাসক থেকে এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়, যা তার দ্বীনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, তাহলে লক্ষ্য করতে হবে; সে যদি ঈমানের পর কুফরী করে, তাহলে ইমামতের দায়িত্ব থেকে সে অপসারিত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। কারণ সে দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে, এবং তাকে হত্যা করা ফরজ সাব্যস্ত হয়ে গেছে।" (আলমুতামাদ ফী-উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা:২৪৩)

১৬. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (মৃত্যু ৭২৮ হি.) এর ফতওয়া:

তিনি বলেন–

"فأيما طائفةٍ امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام، أو الحج، أو عن التزامِ تحريم الدِّماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسِرِ، أو عن نكاحِ ذوات المحارِمِ، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضربِ الجزية على أهل الكتاب، وغيرِ ذلك من واجبات الدين ومُحرَّماتِه التي لا عُذرَ لأحد في جحودِها وتركِها التي يُكَفَّرُ الجاحدُ لوجوبها، فإن الطائفةَ الممتنِعَةَ تُقَاتَلُ عليها وإن كانت مُقِرَّةً بها، وهذا مما لا أعلمُ فيه خِلافا بين العلماءِ".

“মুসলমানদের কোনো দল যদি কোন ফরজ নামাজ, রোযা, হজ্জ ‘আদায় করতে’ অস্বীকৃতি জানায়, বা অন্যায় রক্তপাত, অন্যের মাল ভক্ষণ, মদ,জিনা, জুয়া, মাহরামকে বিয়ে করা– ইত্যাদিকে নিজেদের উপর হারাম সাব্যস্ত করতে সম্মত না হয়, বা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকে নিজেদের উপর আবশ্যক করে না নেয়, আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া ধার্যকরা না মানে অথবা এ ধরনের দ্বীনেরএমন আবশ্যকীয় ফরজ বা হারাম বিষয়াবলী মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে, যেগুলোকে অস্বীকার করা বা ছাড়ার ব্যাপারে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হয় না এবং যার অস্বীকারকারী কাফের বলে বিবেচিত হয়, তবে এইসব আমল পালনে অসম্মত দলের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদিও তারা এ ইবাদাতগুলোকে স্বীকার করে। এ ব্যাপারে আমার জানামতে উলামায়ে কেরামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫০২)

তিনি আরো বলেন–

"كُلُّ طَائِفَةٍ خَرَجَتْ عَنْ شَرِيعَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهَا بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛وَإِنْ تَكَلَّمَتْ بِالشَّهَادَتَيْنِ. فَإِذَا أَقَرُّوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَامْتَنَعُوا عَنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَجَبَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُصَلُّوا. وَإِنْ امْتَنَعُوا عَنْ الزَّكَاةِ وَجَبَ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُؤَدُّوا الزَّكَاةَ. وَكَذَلِكَ إنْ امْتَنَعُوا عَنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ حَجِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وَكَذَلِكَ إنْ امْتَنَعُوا عَنْ تَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ أَوْ الزِّنَا أَوْ الْمَيْسِرِ أَوْ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ الشَّرِيعَةِ. وَكَذَلِكَ

إِنْ امْتَنَعُوا عَنْ الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَبْضَاعِ وَنَحْوِهَا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ".

"মুসলমানদের কোনো দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোনো একটি স্পষ্ট মোতাওয়াতির বিধান থেকে বের হয়ে যায়, মুসলিম জাতির সকল ইমামের মতে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ফরজ হয়ে যায়; যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে। যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত স্বীকার করে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকে, তাহলে নামাজ আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। যদি যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকে, তাহলে যাকাত প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তাদের সাথে কিতাল করা ওয়াজিব। একই হুকুম রমজানের রোজা ও হজ্ব আদায় না করলেও প্রযোজ্য। একইভাবে যদি অশ্লীলতা, যিনা, জুয়া, মদ ইত্যাদির মতো হারাম বিষয়গুলোকে হারাম মনে করা থেকে বিরত থাকে। একইভাবে যদি জান, মাল, সম্মান, ইজ্জত-আব্রু ইত্যাদি ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্ দ্বারা বিচার করা থেকে বিরত থাকে তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫১০)

১৭. আল্লামা শাওকানী রহ.(মৃত্যু ১২৫০ হি.) এর ফতওয়া:

আল্লামা শাওকানী রহ. এ বিষয়ে ইবনুত তীনসহ আরো অনেক উলামায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার পর হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর বক্তব্য নিয়ে এসেছেন–

"قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاءُ على وجوب طاعة السلطان المتغلِّبِ والجهادِ معه، وأن طاعتَه خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من حَقْنِ الدماء وتسكين الدَّهْماء ولَمْ يسْتَثْنَوْا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفرُ الصَّريحُ فلا تجوز طاعتُه بل تجبُ مجاهدتُه لمن قَدَرَ عليها."

"ফাতহুল বারীতে এসেছে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্য ও তার সাথে মিলে জিহাদ আবশ্যক হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য উত্তম হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন। কেননা এতে রক্তপাত ও বিশৃঙখলা থেকে বাঁচা যায়। এ বিধান থেকে তারা

একটি বিষয়কেই শুধু পৃথক করেছেন, আর তা হলো– শাসক থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়া। তখন আর আনুগত্য বৈধ নয়; বরং সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরজ হলো তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।” (নাইলুল আওতার, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৯৮, মাকতাবায়ে মুসতাফা হালাবী)

১৮.শায়খ হামদ বিন আতীক নাজদী রহ.(মৃত্যু ১৩০১ হি.) এর ফতওয়া:

قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} وقلت: ومثل هؤلاء ماوقع فيه عامةُ البوادِ او من شابههم من تحكيمِ عاداتِ آبائِهم وما وَضَعَه أوائلُهُم من الموضوعات الملعونةِ التي يُسَمُّونَهَا "شرح الرِّفاقة" يُقَدِّمُونها على كتاب الله وسنة رسولِه، ومن فعل ذلك فإنه كافرٌ يجب قتالُه حتى يَرْجِعَ إلى حكمِ الله ورسولِه.

“আল্লাহ তাআলা বলেন– ‘তারা কি তাহলে জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে?’ আমি বলি, আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের অবস্থার মতোই হলো বর্তমান অধিকাংশ বেদুঈন ও তাদের সদৃশ অন্যান্যদের অবস্থা। অর্থাৎ যারা বিচার ফায়সালা করে তাদের বাপ-দাদার রীতি-নীতি অনুযায়ী এবং তাদের পূর্ব পুরুষ কর্তৃক বানানো, অভিশপ্ত নিয়ম নীতি দিয়ে। যার নাম তারা রেখেছে ‘আর-রিফাক্বাহ’। তারা সেটিকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ্-র উপর প্রাধান্য দেয়। আর যে ব্যক্তিই এধরনের কাজ করবে নিশ্চয় সে কাফের। তার বিরুদ্ধে কিতাল ফরজ; যতক্ষণ না সে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের দিকে ফিরে আসে।” (মাজমুয়াতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা: ৩০৬)

কিয়াস থেকে দলীল

এক. সাহাবায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াস

সাহাবায়ে কেরামের ইজমা

আবূ বকর সিদ্দীক (রাদি:) এর সীরাতের উপর দৃষ্টি দিন। ঐাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি প্রদান কারীদের বিরুদ্ধে তার আচারণ কিরূপ ছিল। যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করে নিয়েছিল। বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকে তা পালন করছিল। তারা আল্লাহ তাআলার বিধানসমূহ থেকে শুধু একটি বিধান আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল। আর তারা এটি করেছিল একটি দলীল,

একটি সংশয়ের উপর ভিত্তি করে। এর স্বপক্ষে তারা কুরআন থেকে দলীল পেশ করছিল। তথাপি আবূ বকর রাযি. তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছড়ে দেননি, বলেননি, আমরা তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে এক দিন তারা ইসলামী বিধানের দিকে ফিরে আসে। বরং তিনি তাদের বিরুদ্ধে তরবারী কোষমুক্ত করে ছিলেন, তাদের গর্দানে আঘাত করে ছিলেন। তাদের উপর আক্রমণ করে ছিলেন, তাদেরকে হত্য করেছিলেন, তাদের স্ত্রী সন্তানদেরকে বন্দি করে ছিলেন। যতক্ষণন না তারা পূর্ণরূপে ইসলামকে মেনে নেয়। আল্লাহ তাআলার সকল বিধানের সামনে আত্মসমার্পণ করে।

فعن أبي هريرة قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله] قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه.

‘আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলেন, আবূ বাকর (রাযি.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এ সময় আরবের আনেক ব্যক্তি কুফরী করলো। তখন উমর (রাযি.) বললেন, হে আবূ বকর আপনি মানুষদের সাথে কিভাবে কিতাল করবেন? অথচ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে আমি মানুষদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাল করি যতক্ষণ না তারা বলে লা-ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)। আর যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তার মাল ও জানকে আমার কাছ থেকে নিরাপদ করে নেবে তবে তার হকের কারণে, আর তার হিসাব আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যাস্ত। আবূ বাকর (রাযি.) বললেন:আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিতাল করবো যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল মালের হক্ব। আল্লাহর শপথ তারা যদি এমন একটি ছাগল ছানা দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকে যা তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো, তাহলে এই বিরত থাকার কারনে অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করব। উমর (রাযি.) বললেন, আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যক্ষ করেছি এটি একারণে হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা কিতালের ব্যাপারে আবূ বকর (রাযি.) এর বক্ষকে

উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। আর আমিও বুঝতে পেরেছি যে এ সিদ্ধান্তই হক্ব।" বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম নববী (রহঃ) উক্ত হাদীসের আলোকে বলেন:

[وفيه وجوب قتال ما نعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أو كثيرا لقوله رضى الله عنه لو منعونى عقالا أو عناقا](شرح النووي على مسلم : ১ / ২১২).

"এহাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমদাবীদার কোনো দল যদি যাকাত, নামায অথবা অন্য কোন ওয়াজিব আদায় করা থেকে বিরত থাকে চাই কম হোক কিনবা বেশি, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব।" শরহে নববী:১/২১২)

আল্লাহ তাআলার বাণী:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}

"আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন। আপনি তাদের মাগফিরাতের দুআ করুন, নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তি দায়ক" (সূরা:তাওবা, আয়াত:১০৩)

এই আয়াতের ব্যখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ:) বলেন:

ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصًا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} وقد رَدَّ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة، كما كانوا يُؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عِقالا -وفي رواية: عَناقًا -يُؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه.](تفسير ابن كثير : 8 / ২০৭)

"আয়াতের মধ্যে যেহেতু নবীজীকে সা. যাকাত গ্রহণের হুকুম দেয়া হয়েছে, তাই একারণে আরব কবীলাগুলোর মধ্য থেকে যাকাত প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপনকারী কিছু ব্যক্তির অভিমত ছিল "খলীফাকে যাকাত প্রদান করতে হবে না। বরং এটি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর জন্য খাস ছিল"। আর এর স্বপক্ষে তারা আল্লাহ তাআলার বাণী দিয়ে দলীল পেশ করেছিল: **আপনি তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যাতে আপনি এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে পারেন।। আর আপনি তাদের জন্য দোয়া**

করুন, নিঃসন্দেহ আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। আবূ বাকর (রাদিঃ) ও সকল সাহাবায়ে কেরাম তাদের এই ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত চিন্তা-ধারা খণ্ডন করেন। তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করেন যতক্ষণ না তারা খলীফাকে যাকাত প্রদান করে যেমন তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সল্লামকে প্রদান করতো। এমনকি আবূ বকর (রাযি.) ঘোষণা প্রদান করেন: যদি তারা আমাকে লাগামটি পর্যন্ত প্রদান করা থেকে বিরত থাকে (অপর রেওয়াতে এসেছে একটি ছাগল ছানা) যা তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করতো সেটি প্রদানে বিরত থাকার কারণে অবশ্য অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড:৪, পৃষ্টা:২৭০)

কিয়াসঃ সাহাবায়ে কেরাম ইজমার ভিত্তিতে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিতাল করে ছিলেন যারা ইসলামের সকল বিধান মেনে নিয়েছিল, সকল বিধান পালন করছিল শুধুমাত্র একটি বিধান তথা যাকাত আদায় করতে অস্বিকৃতী জানিয়ে ছিল, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যদি কিতাল করা ওয়াজিব হয়, তাহলে যারা ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করবে, ইসলামী বিধি-বিধান শুধু নিজেরাই আদায় করা থেকে বিরত থাকে এমনটি নয় বরং এর বিরুদ্ধে আইন পাশ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে সে গুলোকে অকার্যকর করে রাখে। মুসলিমদেরকে আল্লাহর বিধান আদায়ে বাধাঁ প্রদান করে। তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা সামর্থবান মুসলিমদের উপর যে ওয়াজিব সে ব্যপারে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না।

দুই. ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা থেকে কিয়াস।

ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা

মুসলিমদের কোন দল ইসলামের আকাট্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলীর কোন একটি যদি প্রকাশ্যভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফকীহগণ একমত পোষণ করেছেন।

সুদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে ফুকাহাগণের অভিমত:

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة/২৭৮- ২৭৯]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমাদের প্রতিও কেউ অত্যাচার করবে না। (সূরা- বাকারা, আয়াত:২৭৮/২৭৯)

আল্লামা খাযেন (রহ:) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

[قال أهل المعاني : حرب الله النار وحرب رسوله السيف واختلفوا في معنى هذه المحاربة فقيل المراد بها المبالغة في الوعيد والتهديد دون نفس الحرب ، وقيل : بل المراد منه نفس الحرب وذلك أن من أصر على أكل الربا وعلم به الإمام قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة، وإن كان آكل الربا ذا شوكة وصاحب عسكر حاربه الإمام كما يحارب الفئة الباغية، قال ابن عباس : من كان مقيماً على أكل الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع أي تاب وإلاّ ضرب عنقه](تفسير الخازن : ١ / ٣١٦]

“মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জাহান্নাম আর রাসুলের সাথে যুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল তরবারী। তারা এ যুদ্ধের অর্থের ব্যপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, বলা হয়েছে এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়নি, চরমভাবে ধমক দেয়া হয়েছে ও সতর্ক করা হয়েছে। এটিও বলা হয় এখানে যুদ্ধ দ্বারা লড়াইকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর সেটি ঐ ক্ষেত্রে, যদি কেউ সুদ খেতে থাকে আর খলীফা তার ব্যাপারে জানতে পারে, তাহলে তাকে গ্রেফতার করবে অতঃপর সে তওবা করার আগ-পর্যন্ত তার উপর আল্লাহ তাআলার বিধান জারি করবে অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করবে, আটকে রাখবে। আর যদি সুদ গ্রহণকারী শক্তি ধর হয়, সামরিক শক্তির অধিকারী হয়। তাহলে ইমাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যেমনটি করে থাকে বাগীদের বিরুদ্ধে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন: যে ব্যক্তি সুদ খেতে অভ্যস্ত, তা থেকে বিরত থাকে না। মুসলিম খলীফার দায়িত্ব হল তাকে তওবা করার আদেশ দেওয়া যাতে সে বিরত থাকে অর্থাৎ তওবা করে। আর যদি বিরত না থাকে তাহলে দেহ থেকে তার মস্তক দ্বি-খণ্ডিত করে দেবে।” (তাফসীরুল খাযেন:১/৩১৬)

ইমাম কুরতুবী (রহ:) বলেন:

[وقال ابن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: " فأذنوا بحرب من الله ورسوله".](تفسير القرطبي : ٣ / ٣٦٤).

"ইবনে খুওয়াইজ (রহ:) বলেন, কোন শহরের মানুষ যদি সুদকে হালাল মনে করে সুদি কারবার করতে থাকে, তাহলে তারা মুরতাদ হয়ে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে মুরতাদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি তারা হালাল হিসাবে এমনটি না করে, তথাপি ইমামের জন্য বৈধ হল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ তাআলা এ ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। (সূরা- বাকারা, আয়াত:২৭৮/২৭৯)

আল্লামা জাস্‌সাস (রহ:) বলেন:

আল্লামা জাসসাস (রহ:) এর উপর আল্লাহ তাআলা রহমত বর্ষণ করুন। তিনি পূর্ণ স্পষ্ট রূপে আয়াতটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন:

{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} إخبار منه بعظم معصيته وأنه يستحق بها المحاربة عليها وإن لم يكن كافرا وكان ممتنعا على الإمام، فإن لم يكن ممتنعا عاقبه الإمام بمقدار ما يستحقه من التعزير والردع، وكذلك ينبغي أن يكون حكم سائر المعاصي التي أوعد الله عليها العقاب إذا أصر الإنسان عليها وجاهر بها، وإن كان ممتنعا حورب عليها هو ومتبعوه وقوتلوا حتى ينتهوا، وإن كانوا غير ممتنعين عاقبهم الإمام بمقدار ما يرى من العقوبة.

"আল্লাহ তাআলার বাণী: আর যদি তোমরা সুদী কারবার পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা কর। (সূরা: বাকারা, আয়াত:২৭৯) আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াতে সুদী কারবারীর অপরাধের গুরুতরতা সম্মর্পকে অবগত করছেন, আর একথাও বলছেন, এই অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে যদি সে ইমামের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। আর যদি তার কোনো সামরিক শক্তি না থাকে, তাহলে তার অপরাধ অনুযায়ী সে যতটুকু শাস্তির উপযুক্ত ইমাম তাকে ততটুকু শাস্তিই প্রদান করবেন। একই হুকুম প্রযোজ্য হবে এমন সকল পাপের ক্ষেত্রে যার ব্যপারে আল্লাহ তাআলা শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন, যদি লোকেরা সেগুলো অব্যাহত ও প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে। আর যদি কেউ একটি বিধান মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। তারা বিরত হওয়ার আগপর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করা হবে। আর যদি বিধানটি মেনে নিতে অসম্মতি না জানায় তাহলে ইমাম যতটুকু ভালো মনে করে তাকে শাস্তি প্রদান করবে।

তিনি আরো বলেন:

فالمقيم على أكل الربا إن كان مستحلا له فهو كافر، وإن كان ممتنعا بجماعة تعضده سار فيهم الإمام بسيرته في أهل الردة إن كانوا قبل ذلك من جملة أهل الملة، وإن اعترفوا بتحريمه وفعلوه غير مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا ممتنعين حتى يتوبوا، وإن لم يكونوا ممتنعين ردعهم عن ذلك بالضرب والحبس حتى ينتهوا.](أحكام القرآن للجصاص :١ / ٥٧٢).

"সুদ গ্রহণকারী যদি হালাল মনে করে সুদ গ্রহণ করে তাহলে সে কাফের, আর যদি সুদগ্রহিতা এমন সামরিক শক্তিধর দলের অধিকারী হয়, যারা তাকে সহযোগিতা করে, আর তারা ইতি পূর্বে মুসলিদের অন্তর্ভুক্ত থেকে থাকে, তাহলে ইমাম তাদের সাথে সে আচারণই করবে যা করা হয় মুরতাদদের ক্ষেত্রে। আর যদি তারা মুখে তা হারাম বলে স্বীকার করে এবং হালাল মনে না করেই তা সম্পদন করে, সাথে সাথে যদি তারা সামরিক শক্তিধর হয়, তাহলে ইমাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে যতক্ষণ না তারা তাওবা করে। আর যদি তাদের সামরিক শক্তি না থাকে, তাহলে ইমাম তাদেরকে পিটুনি, কারাদণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে সুদ গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে, তাওবা করার পূর্বপর্যন্ত।" (আহকামুল কুরআন, জাস্‌সাস:১/৫৭২)

সূদী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও কর্মকর্তাদের হুকুম

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যারা সুদকে বৈধ মনে করবে এবং সুদী কারবারকে বৈধ মনে করেই সুদী ব্যাংক, বীমা, প্রতিষ্ঠা করবে, পরিচালনা করবে এবং এর বিভিন্ন দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, তারা কাফের হয়ে যাবে। এমনিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যারা সুদী কারবারকে হালাল মনে করবে, তারাও কাফের হয়ে যাবে। তাওবা করে নতুনভাবে ঈমান আনা ব্যতীত তারা আখেরাতে মুক্তি পাবে না।

কর/ ভ্যাট গ্রহণকারী শাসকদের ব্যাপারে জাস্‌সাস (রহ:) এর অভিমত:

যে সমস্ত জালিম শাসক মুসলিমদের থেকে কর গ্রহণ করে তাদের হুকুম বর্ণনা করে আল্লামা জাস্‌সাস {রহ:} বলেন:

وكذلك حكم من يأخذ أموال الناس من المتسلطين الظلمة وآخذي الضرائب واجب على كل المسلمين قتالهم وقتلهم إذا كانوا ممتنعين، وهؤلاء أعظم جرما من آكلي الربا لانتهاكهم حرمة النهي وحرمة المسلمين جميعا، وآكل الربا إنما انتهك حرمة الله تعالى في أخذ الربا ولم ينتهك لمن يعطيه ذلك حرمة; لأنه أعطاه بطيبة نفسه، وآخذو الضرائب في معنى قطاع الطريق المنتهكين لحرمة نهي الله تعالى وحرمة المسلمين; إذ كانوا يأخذونه جبرا وقهرا لا على تأويل ولا شبهة، فجائز لمن علم من

....

المسلمين إصرار هؤلاء على ما هم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضريبة أن يقتلهم كيف أمكنه قتلهم، وكذلك أتباعهم وأعوانهم الذين بهم يقومون على أخذ الأموال...

"একই ভাবে অন্যায় ক্ষমতার অধিকারী যে সমস্ত জালিমরা নিরীহ জনতার সম্পদ দখল করে, তাদের থেকে কর/ভ্যাট গ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি তারা সামরিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহলে প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাদেরকে হত্যা করা। এরা সুদ গ্রহণকারীদের চেয়েও জঘণ্য অপরাধী। কেননা এরা আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করেছে এবং মুসলিমদের অধিকারও নষ্ট করেছে। আর সুদ গ্রহণকারী সুদ গ্রহণ করে আল্লাহর আদেশের অসম্মান করেছে, তবে যার থেকে সে গ্রহণ করেছে তার হক নষ্ট করেনি, কেননা সেতো তা স্ব-ইচ্ছায় প্রদান করেছে। কর গ্রহণকারী এ ক্ষেত্রে ডাকাতদের ন্যায়, সে এক দিকে আল্লাহ তাআলার বিধান লংঘন করছে, অপর দিকে কোনো ব্যাখ্যা বা সংশয় ছাড়াই অন্যায়ভাবে শক্তি খাটিয়ে কর গ্রহণ করছে। অতএব, যে মুসলিমই জানতে পারবে যে, কিছুলোক অন্যায়ভাবে অনবরত মানুষের সম্পদ কর হিসাবে গ্রহণ করছে তার জন্যই জায়েয হবে, যেভাবেই হত্যা করা সম্ভব তাকে হত্যা করে ফেলা। একইভাবে তার অনুসারী ও যাদের মাধ্যমে তারা কর গ্রহণের কাজ সম্পাদন করে থাকে তাদেরকেও সুযোগ বুঝে হত্যা করা জায়েয।" (আহকামুল কুরআন, জাস্সাস:১/৫৭৩)

নামায রোযাসহ আন্যান্য ফরয হুকুম পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত:

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

وقال تعالى:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة/٥]،

"অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাদেরকে পাও, আর তাদেরকে বন্দী কর ও অবরোধ কর এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা:তাওবা, আয়াত:৫)

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে তার মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন তারা যাতে মুশরিকদেরকে যেখান পায় হত্যা করে তবে তিনটি শর্তে তাদেরকে নিস্তার দেয়া হবে, এক.যদি তারা তাওবা করে তথা ইসলাম গ্রহণ করে, দুই. নামায কায়েম করে, তিন.যাকাত আদায় করে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ:) বলেন:

ولهذا اعتمد الصديق، رضي الله عنه، في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام، والقيام بأداء واجباته. ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة، التي هي حق الله، عز وجل،

وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" الحديث.](تفسير ابن كثير : 8 / ১১১).

“এ কারণেই আবূ বকর সিদ্দীক [রাযি.] যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিতালের আনুমতি প্রদান করেছিলেন। এ আয়াত ও এ ধরনের অন্যান্য আয়াতের উপর ভিত্তি করেই তিনি এমনটি বলেছিলেন। আয়াতে উল্লেখিত আমলগুলো কারো থেকে পাওয়া যাওয়ার শর্তেই তার বিরুদ্ধে কিতাল নিষিদ্ধ হবে। অর্থাৎ ইসলামে প্রবেশ করা ও ইসলামের জরুরী বিষয়গুলো আদায় করার শর্তে কিতাল নিষিদ্ধ হবে। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মধ্যে সর্বোচ্চ ওয়াজিবগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য ওয়াজিবগুলোর ব্যাপারে সর্তক করেছেন। কেননা কালিমায়ে শাহাদাতের পর সর্বোত্তম ইবাদাত হল নামায। আর এটি আল্লাহ তাআলার হক্ব। আর এর পরে হল যাকাত, যার দ্বারা দরিদ্র ও অভাবীরা উপকৃত হয়। আর এটি মাখলুকের সাথে সম্পির্কত সর্বোত্তম ইবাদাত। আর এ কারণেই অনেক স্থানেই নামায ও যাকাতকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহাইনে এসেছে ইবনে উমর (রাদি:) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি আদিষ্ট হয়েছি, ততক্ষণ যাতে আমি মানুষদের সাথে কিতাল চালিয়ে যাই যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।” (ইবনে কাসীর:৪/১১১)

....

আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেনঃ

[وفي هذه الآية، دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة، فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه] (تفسير السعدي : ১ / ৩২৯]

“আর এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি নামায বা যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকবে তার বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে যতক্ষণ না সে তা আদায় করে। যেমনটি আবূ বাকর (রাযি.) এর দ্বারা দলীল পেশ করেছিলেন। ” (তাফসীরে সাদী:১/৩২৯)

আল্লামা ইবনুল আরাবী {রহঃ} বলেনঃ

[فَقَدْ اتَّفَقَتْ الْأُمَةُ عَلَى أَنْ مَنْ يَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ يُحَارَبُ ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى الْعَمَلِ بِالرِّبَا ، وَعَلَى تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.](أحكام القرآن : ২ / ১৩৪).

“উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে যে, যারা পাপ করবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যেমন কোন শহরবাসী যদি সুদী লেনদেনের ব্যাপারে একমত পোষণ করে অথবা জুম'আ ও জামাত তরকের ব্যাপারে একমত পোষণ করে। তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।” (আহকামুল কুরআন জাসসাস:২/১৩৪)

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেনঃ

[الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه](الموطأ : ২/৩৮০৯).

“আমাদের সিদ্ধান্ত হল, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ফরীজাহ সমূহের মধ্য থেকে কোন একটি ফরীজার ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, ফলে মুসলিমরা তার থেকে তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না, তাহলে মুসলিমদের দায়িত্ব হয়ে যায় তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যতক্ষণ না তার থেকে তা আদায় করা সম্ভব হয়।” (মুআত্তা:২/৩৮০৯)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া {রহঃ} বলেনঃ

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا .

“মুসলিমদের কোন দল যদি ইসলামী শরীয়তের কোন একটি স্পষ্ট মোতাওয়াতির বিধান পালন থেকে বিরত থাকে মুসলিম জাতির সকল ইমামের

মতানুসারে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব যদিও তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে। যদি তারা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় না করে তাহলে নামায আদায়ের পূর্বপর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। ”(মাজমূআতুল ফাতাওয়া:২৮/৫০২)

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ:) বলেন:

إذا امتنعوا عن إقامة الفرض، نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض وأداء الزكاة يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته، وأما السنن نحو صلاة العيد، وصلاة الجماعة والأذان فإني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والسنن.

“যদি কোন সম্প্রদায় ফরয আদায় ছেড়ে দেয়, যেমন জুমআ ও অন্যান্য সকল ফরয নামায অথবা যাকাত আদায় ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর যদি কোন একজন ছেড়ে দেয় তাহলে আমি তাকে প্রহার করবো। আর সুন্নতসমূহ যেমন, ঈদের নামায ও নামাযের জামাআত, আযান, {যদি ছেড়ে দেয়} তাহলে আমি তাদেরকে এসব আদায়ের আদেশ দেবো ও প্রহার করবো, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না, যাতে ফরয ও সুন্নতসমূহের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। ” (আল মুহীতুল বুরহানী:১/৬০)

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ:) বলেন:

إذا اجتمع أهل بلدة على ترك الأذان قاتلناهم، ولو ترك واحد ضربته وحبسته، وكذلك سائر السنن .

“যদি কোন শহরের অধিবাসীরা আযান ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করে তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো। আর যদি কোন একজন ছেড়ে দেয় আমি তাকে প্রহার করবো ও গ্রেফতার করে রাখবো। একই হুকুম অন্যান্য সকল সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।” (আল মুহীতুল বুরহানী:১/৫৩)

আল্লামা জাস্‌সাস (রহ:) বলেন:

وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة لموافقة من الصحابة إياه على شيئين أحدهما الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لأنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أدائها فانتظموا به معنيين أحدهما الامتناع من قبول أمر الله تعالى وذلك كفر والآخر الامتناع من أداء الصدقات المفروضة في أموالهم إلى الإمام فكان قتاله إياهم للأمرين جميعا ولذلك قال لو منعوني عقالا وفي بعض الأخبار عناقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ص - لقاتلتهم عليه فإنما قلنا أنهم كانوا كفارا ممتنعين من قبول فرض الزكاة لأن الصحابة سموهم أهل الردة وهذه السمة لازمة لهم إلى

يومنا هذا وكانوا سبوا نساءهم وذراريهم ولو لم يكونوا مرتدين لما سار فيهم هذه السيرة وذلك شيء لم يختلف فيه الصدر الأول ولا من بعدهم من المسلمين أعني في أن القوم الذين قاتلهم أبو بكر كانوا أهل الردة.(أحكام القرآن للجصاص :١ / ٥٧٢).

“আবূ বকর (রাযি.) সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যমতে যাকাত প্রদানে অস্বিকৃতী জ্ঞাপন কারীদের বিরুদ্ধে দু'টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কিতাল করে ছিলেন এক.কুফর দুই.যাকাত প্রদানে অস্বিকৃতী। কেননা তারা যাকাতের ফরজিয়্যাতকে কবূল করতে ও তা আদায় করতে অস্বিকৃতী জানিয়ে ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে দুটি কারণ একত্রিত হয়েছে। এক.আল্লাহ তাআলার আদেশ গ্রহন করতে অস্বিকৃতী। আর এটি কুফর। দুই. তাদের সম্পদের মধ্যে যে ফরয সদকা রয়েছে তা ইমামকে প্রদান করতে অস্বিকৃতী।

সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ উভয় কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। আর এ কারণেই তিনি বলেছিলেন: যদি তারা আমাকে একটি লাগাম দেয়া থেকে বিরত থাকে অপর রেওয়ায়েতে এসেছে একটি ছাগল ছানা দেয়া থেকে বিরত থাকে যা তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আদায় করতো, এই করণেও অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করব।

আমরা তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছি, কারণ তারা যাকাতের ফরজিয়্যাত গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই সম্বোধন আজ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে বলবৎ আছে। আর সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্ত্রী ও সন্তাদেরকে বন্দি করেছিলেন যদি তারা মুরতাদ না হত তাহলে তাদের সাথে এই আচারণ করা হত না। আর এটি এমন একটি বিষয় যার ব্যাপারে প্রথম যুগ ও তার পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ দ্বিমত পোষণ করেননি। অর্থাৎ এ বিষয়ে যে, আবূ বকর (রাযি.) যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ছিলেন তারা মুরতাদ ছিল। এই ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি।” (আহকামুল কুরআন, জাসসাস:১/৫৭২)

আল্লামা ইবনে নুজাইম {রহ:} বলেন:

[وفي الظهيرية، والولوالجية، والتجنيس وغيرها: أهل قرية اجتمعوا على ترك الوتر أدبهم الإمام وحبسهم، فإن لم يمتنعوا قاتلهم، وإن امتنعوا عن أداء السنن فجواب أئمة بخارى: بأن الإمام يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض؛ لما روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لو أن أهل بلدة أنكروا سنة السواك لقاتلتهم كما نقاتل المرتدين وَفِي الْعُمْدَةِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى تَرْكِ الْأَذَانِ يُؤَدِّبُهُمْ الْإِمَامُ وَعَلَى تَرْكِ السُّنَنِ

يُقَاتِلُهُمْ زَادَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّ هَذَا إذَا تَرَكَهَا جَفَاءً لَكِنْ رَآهَا حَقًّا فَإِنْ لَمْ يَرَهَا حَقًّا يُكَفَّرُ](البحر الرائق : ৪ / ১৯২).

“জহিরিয়্যাহ, ওলওয়ালিজিয়্যাহ, তাজনিস ইত্যাদি ফতওয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে, কোন এলাকার অধিবাসীরা যদি বিতেরের নামায ছেড়ে দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, ইমাম তাদেরকে শাস্তি দেবে এবং বন্দি করবে। যদি তারা উক্ত কর্ম থেকে বিরত না থাকে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। আর যদি তারা সুনান ছেড়ে দেয় তাহলে আয়িম্মায়ে বোখারার মত হল, তাদের বিরুদ্ধেও কিতাল করবে যেমন কিতাল করবে তারা যদি ফরয ছেড়ে দেয়। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যদি কোন শহরবাসী মিসওয়াকের সুন্নাতকে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো যেমন আমরা কিতাল করে থাকি মুরতাদদের বিরুদ্ধে। ‘উমদার’ মধ্যে এসেছে যদি কোন সম্প্রদায় আযান ছেড়ে দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, ইমাম তাদেরকে শাস্তি দেবে আর যদি সুন্নাত ছেড়ে দেবার ব্যাপারে একমত পোষণ করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। ‘খোলাসার’ মধ্যে আরো বৃদ্ধি করেছে, এই হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যখন কেউ শরীয়তের ছোট থেকে ছোট কোনো হুকুমও বিরূপভাব নিয়ে ত্যাগ করবে হুকুমটিকে সত্য জ্ঞান করা সত্ত্বেও। আর যদি কেউ হুকুমটিকে হক্বই মনে না করে, তাহলে তাকে তাকফীর করা হবে। ” (আল বাহরুর রায়েক:১/২৩০)

ফুকাহায়ে কেরামের উপরিউক্ত ফতওয়ার সারমর্মঃ

এক.যদি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সুদ গ্রহণ করে তাহলে ইমাম (মুসলিম সরকার প্রধান) তাদেরকে গ্রেফতার করে শস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তারা শক্তি ধর হয় এবং আল্লাহর বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হল তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে।

দুই. যদি কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে কোন অকাট্য ফরয ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে বন্দি করে শাস্তি প্রদান করা হবে যাতে সে তওবা করে ফিরে আসে। আর যদি কোন দল বা সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ ভাবে এমনটি করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা উম্মাহর উপর ফরয হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে, যদিও তারা মুখে উক্ত বিধান কে স্বীকার করে।

তিনি. কোন সম্প্রদায় যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন সুন্নাহ ঐক্যবদ্ধভাবে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যদিও উক্ত সুন্নাহকে সুন্নাহ হিসাবে স্বীকার করে,

তথাপি ইমাম মুহাম্মাদ [রহ:] সহ অন্যান্য অনেক ফকীহর মতে তাদের বিরুদ্ধেও কিতাল করা হবে।

চার.কোন শাসক যদি জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে মুসলিমদের থেকে 'কর' ভ্যাট/ট্রাক্স গ্রহণ করে তাহলে ইমাম জাস্সাস (রহ:) এর মতে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তাকে ও তার অনুসারী এবং টেক্স গ্রহণে সাহায্যকারীদেরকে যেখানে যেভাবে পাবে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে।

পাঁচ. কোনো মুসলিম শাসক যদি ইসলামের সমস্ত বিধান ঠিক রাখে কিন্তু শুধু মাত্র কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদী অভিযান করা ছেড়ে দেয়, তাহলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা মুসলিমদের উপর ফরয হয়ে যায়।

কিয়াস: ইমামগণের মত হল, কোন সম্প্রদায় যদি নামায আদায় না করে, ঐাকাত প্রদান না করে অথবা সুদি লেনদেন করে, মুসলিমদের থেকে 'কর' গ্রহণ করে, আর এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের শক্তি পর্যন্ত প্রয়গ করে, তাহলে উম্মাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল পরিচালনা করা।

আর কেউ যদি ইসলামের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে, ঐাকাত দেয়া থেকে শুধু নিজেরাই বিরত থাকে তা নয়, এমনিভাবে সুদ শুধু নিজেরাই খায় এমনটি নয় বরং রাষ্ট্রীয় ভাবে জাকাতের বিধানকে অকার্যকর করে, সুদ ভিত্তিক পুজিবাঁদী অর্থ-ব্যবস্থা কায়েম করে এবং এ ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা বলে দাবি করে জনগণের উপর তা চাপিয়ে দেয়, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা কী জিনিস তাই জানে না, তাহলে সে কিভাবে মুসলিম থাকে?! আর তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন যে উম্মাহর উপর ওয়াজিব সেটি তো দিবালাকের ন্যায় স্পষ্ট।

আর এটা কি শুধু এক-দুটি বিধানের ক্ষেত্রে?! শত-শত বিধানের ক্ষেত্রে তারা একই পন্থা গ্রহণ করেছে। তারা পুরো ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে ইহুদী-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের দ্বারা রচিত তাগুতী জীবন ব্যবস্থাকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এ সমস্ত তাগুত ও মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে কিতালের ব্যাপারে শুধু তাদেরই সংশয় থাকতে পারে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইলমে ওহীর নূর থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, ফলে তাদের চিন্তা শক্তি লোপ পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন।

ইতিহাস কী বলে?

সাহাবী যুগ

এক.

জান্নাতী যুবকদের সরদার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের নাতী হুসাইন (রাযি.) দউলাতে ইয়াজিদিয়্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন এবং এতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। অথচ ইয়াজিদ কাফের ছিল না। কিন্তু দ্বীনের কিছু বিষয়ে কম বেশি করে ছিল। জান্নাতের যুবকদের সরদার তা সহ্য করতে পারেননি। নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

যারা হযরত হুসাইন রাযি. এর এই কর্মপন্থাকে শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক বলে এবং হযরত হুসাইন রাযি.কে শহীদ হিসাবে গণ্য করে, তাদের কীভাবে বর্তমান মুরতাদ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ব্যাপারে সংশয় থাকতে পারে?! তারা কীভাবে নিজেদেরকে হযরত হুসাইন রাযি. এর রুহানী সন্তান বলে দাবি করতে পারে?!!

দুই.

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাযি. তৎকালিন মুসলিম বিশ্বের খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অথচ আব্দুল মালেককে কেউ কাফের বা মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেনি। তথাপি আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর {রাযি.} তার মত ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি তার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেছেন।

তাবেয়ী যুগ

তিন.

সাইদ বিন জুবাইর, আমের শা'বী, (যারা বসরার তাবেয়ীনদের মধ্যে আলেম ও ফকীহ ছিলেন) এবং কুফা নগরীর আরো অনেক উলামায়ে কেরাম রহ. হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৎকালিন অনেক আলেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কাফের বা মুরতাদ ছিল না।

চার.

আন-নাফসুস যাকিয়্যা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ. খলীফা মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইমাম আবূ হানিফা রহ. মাল দিয়ে তাকে সাহায্য করেন, নিজে স্ব-শরীরে অংশ গ্রহণ করতে না পারার কারণে ওযর পেশ করেন। এ জিহাদকে তিনি বদরের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন এবং ৫০ টি হজ্জের চেয়ে মর্যদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। মূলত এ কারণেই খলীফা মানসুর তাকে বন্দি করে এবং বিষ পান করিয়ে শহীদ করে। আল্লাহ তাআলা ইমাম আবূ হানীফার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

উপরিউক্ত পত্যেক শাসক জালিম ছিল; কাফের নয়। তথাপি উম্মাহর শ্রে'অনেক ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে ছিলেন। অস্ত্র ধারণে ফতওয়া দিয়ে ছিলেন, অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে ছিলেন। এই ইতিহাস উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এগুলোকে শরয়ী মাপকাঠিতে তুলে ওজন করা, এগুলোর পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে আলোচনা করা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। সম্মানিত পাঠকের সামনে এগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল, মুসলিম জালিম শাসকদের ব্যাপারে সালাফদের মধ্য থেকে অনেকের আমলের চিত্র হল এই।

সুতরাং শাসক যদি মুরতাদ হয়ে যায়, শাসক থেকে যদি স্পষ্ট কুফুরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উম্মার উপর কত বেশি দায়িত্ব বর্তায়? খাছ করে উম্মাহর উলামা শ্রেণীর উপর দায়িত্ব যে কী পরিমাণ বেড়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের উলামায়ে কেরামকে সত্য প্রকাশের জন্য এবং তাগুত ও তাগুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য কবুল করুন। বয়ান ও লিখনীর জিহাদের সাথে সাথে অস্ত্রের জিহাদে শরীক হওয়ার হিম্মত দান করুন এবং এ সংক্রান্ত সমস্ত সশংয় দূর করে দিন। আমীন।

মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে করণীয় সম্পর্কে সারমর্ম

এই দীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম নিম্নরূপ–

১. কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করা জায়েয নেই।

২. কাফেরকে খলীফা নিযুক্ত করলেও এই নিয়োগ কর্যকর হবে না এবং সে খলীফা হবে না। ফলে তার আনুগত্য মুসলমানদের উপর ফরজ হবে না।

৩. কোনো মুসলিম শাসক যদি শরীয়া পরিপন্থী কোনো আদেশ নিষেধ করেন, তবে তাতে তার আনুগত্য জায়েয নেই।

৪. যদি কোনো মুসলিম শাসক সুস্পষ্ট কোনো কুফুরি না করে; শুধু জুলুম অত্যাচার পর্যন্ত সীমিত থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.সহ অনেক আলেমের মতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে অপসারিত করা ওয়াজিব। তবে এক্ষেত্রে জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হল, মুসলমানদের মাঝে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে নিরাপদে যদি তাকে অপসারণ করা সম্ভব হয়, তবে তাকে অপসারণ করবে। অন্যথায় ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

৫. যদি কোনো মুসলিম শাসক ঈমান থাকা অবস্থায় খলীফা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তার থেকে সুস্পষ্ট কোনো কুফরি প্রকাশ পায় (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীয় পদ থেকে অপসারিত হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের উপর তার কোনো কর্তৃত্ব চলবে না।

৬. এ অবস্থায় মুসলমানদের করণীয় হল, তার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তাকে উক্ত পদ থেকে অপসারিত করে তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফা নিযুক্ত করা। সে যদি বল প্রয়োগ করে উক্ত পদে বহাল থাকতে চায়, তাহলে প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে হলেও তাকে অপসারণ করা ও উপযুক্ত খলীফা নিযুক্ত করা উম্মতে মুসলিমার উপর ফরজ। এবিষয়টি কোরআন, সুন্নাহ ও সর্বযুগের উলামায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে নির্ভরযোগ্য একজন আলেমও তাতে দ্বিমত পোষণ করেননি।

৭. খলীফা থেকে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রেও কেউ কেউ মনে করেন, তাকে অপসারণ করতে গেলে যদি হত্যাকণ্ড, হানাহানি,মারামারি ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শরীয়ত তা সমর্থন করে না। বরং এখানে শরীয়তের দর্শন হল, মুসলমানদের মাঝে এপর্যায়ের একটি কুফর প্রকাশিত হওয়ার চেয়ে বড় ফিতনা আর হতে পারে না। হত্যা, হানাহানি, বিশৃঙ্খলা সবকিছুর চেয়ে জঘন্য ফিতনা কুফর। কোরআনের ভাষায় কুফরের ফেতনা হত্যাকাণ্ড থেকেও অনেক জঘন্য ও গুরুতর। সুতরাং "*তোমরা জিহাদ কর, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং পূর্ণ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।*"

প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল

উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা মৌলিক ভাবে যেসব বিষয় সাব্যস্ত হল:

১. আল্লাহ তাআলার বিরোধিতায় যাদেরকে মান্য করা হয় (যেমন, বর্তমানের শাসকবর্গ) এবং কুরআন-সুন্নাহর ফায়সালা বাদ দিয়ে অন্য যাদের কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয় (যেমন, তাগুতী আদালতের বিচারক) তারা তাগুত।

২. তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত ঈমান সহীহ হয় না এবং ধর্তব্য হয় না।

৩. কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ও হুকুম আহকাম বাদ দিয়ে যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সে রাষ্ট্র তাগুতী রাষ্ট্র এবং যে আদালতে কুরআন-সুন্নাহর আইন দ্বারা ফায়সালা করা হয় না, সে আদালত তাগুতী আদালত।

৪. কাফের-মুশরিক এবং তাগুতের সাথে কোনো ধরণের বন্ধুত্ব রাখা যাবে না। তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার উপর টিকে থাকার ক্ষেত্রে কোনোরূপ

সহযোগিতা করা যাবে না। কারণ, গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা হারাম। ইরশাদ হচ্ছে,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা নেকী ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর না।" (সূরা মায়েদা:২)

৫. কাফের, মুশরিক ও তাগুত কর্তৃক সম্পাদিত আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতামূলক কাজকর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, কুফরীর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশও কুফরী বলে গণ্য হয়।

৬. মুসলিমদাবিদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা ফরযে আইন। কেউ যদি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআন দ্বারা দেশ পরিচালনা না করে, তাহলে সে ও তার সহযোগীরা কাফের হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে না, তারা কাফের" (সূরা মায়েদা:৪৪)

আরো ইরশাদ হচ্ছে, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"বিচার ফায়সালার অধিকার শুধু আল্লাহরই" (সূরা ইউসুফ:৪০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

'শুনে রেখ, সৃষ্টি তাঁর বিধানও তাঁর। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" (আরাফ:৫৪)

৭. মুসলিমদের শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব।

৮. গুনাহের কাজ যেমন নিজে করা হারাম ঠিক তেমনিভাবে অন্যকে গুনাহ তথা আল্লাহর অবাধ্যতা করতে এবং অবাধ্যতায় টিকে থাকতে সাহায্য সহযোগিতা করাও হারাম।

এসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে জরুরী কিছু মাসাইলের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

তাগুতী আদালতের বিচারকদের হুকুম

বাংলাদেশের আদালত নির্ভেজাল একটি তাগুতী আদালত। কারণ,এই আদালতের বিচারকার্য পরিচালিত হয় মানব রচিত সংবিধান অনুযায়ী; কুরআন-সুন্নাহর সংবিধান অনুযায়ী নয়। এই আদালতে যারা বিচারকের ভূমিকা পালন করে তারাও এক একজন তাগুত। কারণ, আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তাদের আইন ও হুকুম মান্য করা হয় এবং মানতে বাধ্য করা হয়। জানার বিষয় হল, তাগুতী আদালতের বিচারকদের হুকুম কী হবে?

এর উত্তর হল: ক. যেসব বিচারক মানব রচিত সংবিধানকে যুক্তিযুক্ত মনে করবে, কুরআন-সুন্নাহর সংবিধান থেকে উত্তম মনে করবে, তারা কাফের হয়ে যাবে। তাদের ঈমান-আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। আখেরাতে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

খ. যেসব বিচারক কুরআন-সুন্নাহর সংবিধানকেই উত্তম ও যুক্তিযুক্ত মনে করে, মানব রচিত সংবিধানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু দুনিয়ার মান-সম্মান, অর্থ সম্পদ অর্জনের লোভে পড়ে তাগুতী আদালতে চাকুরী করছে এবং জেনে বুঝে কোনো ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত ফায়সালা দিয়েছে, তাহলে সেও কাফের হয়ে যাবে। তার ঈমানও গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ. যদি কোনো বিচারক মানবরচিত সংবিধানকে ঘৃণা করে এবং তাগুত সরকারের শরীয়ত বিরোধী কার্যক্রমকেও ঘৃণা করে। আর এমন কোনো ফায়সালাও না করে যা ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। তাহলে সে কাফের হবে না। কিন্তু বিচার বিভাগের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাগুত সরকারকে সহযোগিতা করায় তার শ্রমটা হারাম শ্রম বলে বিবেচিত হবে, ফলশ্রুতিতে তার উপার্জনও হারাম বলে গণ্য হবে। আর সে ব্যক্তিগতভাবে ফাসিক সাব্যস্ত হবে।

বাংলাদেশের আদলতে বিচার প্রার্থনা ও বিচার প্রার্থীর হুকুম

জিজ্ঞাসা: উপরের আলোচনা দ্বারা আমরা একথা বুঝতে পারলাম যে, যারা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করে তারা কাফের এবং তাগুত। আর একথাও বুঝা গেল যে, তাগুতের কাছে যারা বিচার প্রার্থনা

করে তারাও কাফের হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ একটি তাগুতী বিচার বিভাগ। এই বিচার বিভাগ বা আদালতে যদি কেউ বিচার প্রার্থনা করে তাহলে সেও কি কাফের হয়ে যাবে?

জবাব: এ কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই যে, বাংলাদেশের আদালত/ বিচার বিভাগ একটি তাগুতী বিচার বিভাগ। কিন্তু এই আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনাকারী সকল মুসলিমকে কাফের বলা যাবে না। বরং বিচার প্রার্থনাকারীর অবস্থা ভেদে তাদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য হবে। আমরা নিম্নে বিচার প্রার্থনাকারীর কিছু অবস্থা এবং তার হুকুম তুলে ধরছি।

১. কোনো স্থানে যদি পরিপূর্ণ শরয়ী বিচার বিভাগ কায়েম থাকে এবং শরয়ী বিচারক তার ফায়সালা বাদী-বিবাদীকে মানতে বাধ্য করতে পারে অর্থাৎ বাধ্য করার ক্ষমতাও তার থাকে সেক্ষেত্রে যদি কোনো মুসলিম শরয়ী আদালতে বিচার প্রার্থনা না করে গাইরে শরয়ী কোনো আদালত বা সংস্থা কিংবা ব্যক্তি বিশেষের কাছে বিচার চায়, তাহলে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অপরাধে সে কাফের হয়ে যাবে।

২. বাংলাদেশে যেহেতু এমন ক্ষমতাশীল কোনো শরয়ী বিচার বিভাগ নেই যার বিচারক নিজের ফায়সালা মানতে বাধ্য করতে পারে, তাই বাংলাদেশী কোনো মুসলিম যদি তাগুতী আদালতের প্রতি পরিপূর্ণ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টি, অশ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করত নিজের হক উদ্ধারের জন্য এবং জালেমের জুলম থেকে বাঁচার জন্য তাগুতী আদালতে বিচার চায়, তাহলে সে কাফের হবে না।

৩. কোনো মুসলিম যদি বাংলাদেশের তাগুতী আদলতের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও সন্তুষ্টি পোষণ করত তাদের কাছে বিচার চায়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। তবে কেউ অজ্ঞতা বশত এমনটি করলে সে কাফের হবে না। কারণ এমন সূক্ষ্ম মাসআলা সাধারণ মুসলিমদের না জানা থাকাটাই স্বাভাবিক। আর সূক্ষ্ম মাসআলার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ওযরের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু মাসআলা জানার পরও যদি কেউ এমনটি করে, তাহলে সে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অপরাধে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে কাফের বলাও যাবে।

৪. যদি পারস্পরিক কোনো বিবাদ তাগুতী আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত মুফতীদের ফতওয়া অনুযায়ী শরীয়তের আইন মোতাবেক আপোষ-মীমাংসা সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও তাগুতী আদালতের শরণাপন্ন হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও মুসলিম ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে তাগুতের কাছে ফায়সালা চাওয়ার অপরাধে কাফের হয়ে যাবে। তবে এখানেও অজ্ঞতা ওযর বলে গণ্য হবে। মাসআলা জানার পর এমনটি আর করা যাবে না এবং অতীতের গুনাহের জন্য তাওবা করতে হবে।

৫. বাদী-বিবাদীর মধ্য থেকে যদি কোনো একজন তাগুতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে এবং মুফতীদের ফতওয়া অনুযায়ী শরীয়তের ফায়সালা মেনে নিতে রাজী থাকে, আর অপরজন যদি তাকে তাগুতী আদালতের কাছে যেতে বাধ্য করে, তাহলে যে বাধ্য করেছে সবগুনাহ তার হবে। যাকে বাধ্য করা হয়েছে তার কোনো গুনাহ হবে না ইনশাআল্লাহ।

৬. কৃত অন্যায়-অপরাধ, জুলম যদি সহ্য-সীমার ভিতরে থাকে, তাহলে তাগুতী আদালতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা সত্ত্বেও তাকওয়া ও দ্বীনদারীর দাবি হল, এমতাবস্থায় তাগুতী আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা না করা। বিশেষ করে আলেম-উলামা ও মুফতীদের জন্য এমতাবস্থায় তাগুতী আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ,তারা সমাজের অনুসরণীয় শ্রেণী। তারাই যদি ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তাগুতী আদালতের পিছনে ছুটতে থাকে, তাহলে সাধারণ মুসলিমগণ তাদের থেকে কী শিখবে? তাগুতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষয়টাও তখন এক পর্যায়ে উঠে যাবে। যেমনটি বর্তমানে আমাদের সমাজে ঘটছে।

(মাসআলাতুত তাহাকুম ইলাততাগুত, শাইখ আবূ বাসীর আততারতূসী)

কিছু আইন যদি শরীয়ার সাথে সংঘর্ষিক হয় তাহলে কি শাসক কাফের হবে না?

একজন বড় নায়েবে মুফতী সাহেবকে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিলেন: বাংলাদেশের অধিকাংশ আইনই শরীয়ার মুয়াফেক। কিছু আইন শরীয়ার সাথে সংঘর্ষিক হওয়ায় তেমন কঠিন কোনো হুকুম বর্তাবে না।

পাঠক আপনিই বলুন। আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে যেসব দলীল উল্লেখ করলাম সেসব দলীল এই মুফতী সাহেবের কথাকে সর্থন করে কিনা? মোটেও না। কোনো মুসলিম শাসক যদি কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত মাত্র একটি আইন তৈরি করে তাহলেও সে কাফের হয়ে যাবে। আর বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী অর্থনীতি, সমাজ নীতি, স্বরাষ্ট্র নীতি, পররাষ্ট্র নীতি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, যিনা, ধর্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদি বিষয়সমূহে কুরআন-সুন্নাহর সাংঘর্ষিক কত শত আইন প্রণয়ন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের সংবিধানটা হাতে নিলেই যার শরীয়তের সামান্য মাত্র জ্ঞান রয়েছে সেই এই বিষয়গুলো ধরতে পারবে। তারপরও একথা কীভাবে বলা সম্ভব যে, বাংলাদেশের সামান্য কিছু আইন শরীয়ার সাংঘর্ষিক?! তর্কের খাতিরে ধরে

নিলাম যে, সামান্য কিছু আইনই শরীয়ার সাংঘর্ষিক, তাথাপি বর্তমান শাসকদের যে হুকুম আমরা উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য হবে? শরীয়াসাংঘর্ষিক সামান্য কয়েকটি আইন যদি শাসকশ্রেণী প্রণয়ন করে, তাহলে কি তারা কাফের হবে না? তাদের বিরুদ্ধে কি জিহাদ ওয়াজিব হবে না?

তাগুত সরকারের সশস্ত্রবাহিনীতে চাকুরীর হুকুম

জিজ্ঞাসা: এমন ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং আখেরাতে মুক্তি পেতে চায়। পরকালে অনন্ত-অসীম সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবন আশা করে সে কি তাগুত সরকারের সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী করতে পারবে? এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কী?

জবাব: বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্রবাহিনীর যতগুলো বিভাগ রয়েছে যেমন, আর্মি, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, আনসার, পুলিশের স্পেশাল ইউনিটসমূহ এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা যেমন, ডিবি, ডিজি আই এফ, এন এস আই, সি আই ডি, ইত্যাদি কোনো বিভাগেই কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য চাকুরী করা জায়েয নেই। এই চাকুরীর উপার্জনও হালাল নয়। কারণ, তাগুত সরকারকে সার্বিকভাবে নিরাপত্তা দেওয়া, তাগুতের সমস্ত কাজকে সমর্থন করা, তাগুতের সমস্ত হুকুম পালন করা, তাগুতের টিকে থাকার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা সর্বোপরি ইসলাম কায়েমের জন্য যারা আল্লাহর হুকুম পালন করত জিহাদ করতে চায়, তাদেরকে গ্রেফতার করা, হত্যা করা, গুম করা, নির্যাতন করা সবই হারাম শ্রম। আর হারাম শ্রমের উপার্জনও হারাম।

তাছাড়া তাগুত সরকারের বাহিনীর যেসব সদস্যগণ তাগুত সরকারের কার্মকাণ্ডকে সমর্থন করবে, তাদেরকে পছন্দ করবে, তাগুত সরকারের মত তারাও কাফের হয়ে যাবে। তাদের ঈমান-আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত এমনিতেও মুরতাদ সরকারের সহযোগী হওয়ায় তাদেরকে ব্যাপকভাবে মুরতাদ বলেই গণ্য করা হবে। মুরতাদ সরকারের সহযোগিতা থেকে খালেস তাওবা করে সরে দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের উপর ইরতিদাদের হুকুম বহাল থাকবে। তবে কেউ যদি মুজাহিদদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে, মুজাহিদদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে বাহিনীর ভিতর থেকে গোপনে জিহাদের পক্ষে কাজ করতে চায়, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে।

তাগুতের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যাপকভাবে মুরতাদ গণ্য করার কারণ হল, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানুষকে শুধু নিজের জন্যই দায়বদ্ধ করেননি, বরং সে যে

দলের আনুগত্য ও সমর্থন করে, সেই দলের জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করেন। **তাই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত আমলের বিচারে মুমিন কিনা সেটাও দেখা হবে এবং সে যে দলকে সাহায্য করে, সমর্থন করে, আনুগত্য করে, যে দলের জন্য নিজের শ্রম ও অর্থ-কড়ি ব্যয় করে সেই দলের বিবেচনায়ও তার ঈমানকে যাচাই করা হবে**। এই বিবেচনায় মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে:

(ক) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান এবং দলগত ভাবেও মুসলমান:

এরা হচ্ছেন ঐ সকল মানুষ যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস রাখেন ও এর পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল করেন। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের অনুসরণ করেন। এছাড়াও তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন দলের জন্য কাজ করেন এবং সেটার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ: আনসার ও মুহাজির উভয় দলের সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)। কিংবা ঐসকল মুসলমান যারা এমন কোন খিলাফতের আনুগত্য করেন যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে, খলিফা জুলমকারী হলেও শরীয়ত পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। ১৯২৪ সালে উসমানিয়া খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে আর এই উদাহরণ উপস্থিত নেই। এখন এর উদাহরণ হচ্ছে: ঐ সকল মুসলমান যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদ করছেন। এছাড়াও যারা এই সকল মুসলমানদেরকে সাহায্য করছে, সমর্থন করছে তারাও এই দলে শামিল হবে যদিও তারা ঐ দলে শরীক হতে পারছে না। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন:

لاَ يُكَلِّفُ ا للّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ .

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।' (সূরা বাকারা:২৮৬)

(খ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের এবং দলগতভাবেও কাফের:

এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা আসলী কাফের (অর্থাৎ, যারা ইসলাম গ্রহণ করে পরে কুফরীর মাধ্যমে দ্বীন ত্যাগ করেনি, বরং পূর্ব থেকেই যারা কাফের ছিল, যেমন: ইহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) এবং যারা মুরতাদ (যারা দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে পরবর্তীতে বড় কুফর বা বড় শিরক করার মাধ্যমে দ্বীন ত্যাগ করেছে)।

(গ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের কিন্তু দলগতভাবে মুসলমান:

এর উদাহরণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে মুনাফেকীর কুফর রয়েছে এবং সে এমন একটি দলের অংশ যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের সাহায্য করছে। কিন্তু সে এই দলটিকে ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে আছে যাতে ভিতর থেকে এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সে বাহ্যিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে। এই ইবাদত-বন্দেগীর কারণ হচ্ছে যাতে সে এই দলটিতে থাকতে পারে এবং তার মুনাফেকী টিকিয়ে রাখতে পারে, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল করেছিল।

বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হচ্ছেঃ মুরতাদ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী যারা মুজাহিদীনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুজাহিদ সেজে সম্মুখ সমরে যায় এবং ইসলামের বিভিন্ন কাজ করে থাকে। বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও মিটিং এ যোগদান করে। তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। আর প্রকাশ পাবার পর তাদের উপর ইসলামী হদ জারি করা হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 'আদদুরার আসসুন্নিয়া' ৯ম খণ্ড, মুরতাদের ব্যাপরে হুকুম অধ্যায়ে আছে।

(ঘ) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান কিন্তু দলগতভাবে কাফেরঃ

এই দলের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। এটাকে ভালোভাবে না বুঝলে তাকফীরের ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যায়। খারেজী, তাকফীরী ও মুর্জিয়ারা এই দলের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। এই রকম পরিস্থিতি বা দল নতুন কিছু নয়। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর যুগেও এরকম দল ছিল, যখন রিদ্দাহ্ এর ঘটনা ঘটেছিল। তাছাড়া যখন তাতারীরা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে মেলামেশা করছিল সেই সময়েও এই রকম দল ছিল।

সত্যি কথা হলো, বর্তমান সময়েও মুসলমান উম্মাতের অধিকাংশের অবস্থাও এই দলের মতই। ব্যক্তিগত ইবাদত ও ফরয-ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে হয়তো এসব মুসলমানদের অবস্থা ভালো হতেও পারে। এমনও হতে পারে যে সে তাহাজ্জুদ গোজার, হজ্জ আদায়কারী। কিন্তু যারা শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যারা মুমিনদেরকে হত্যা করছে, যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে বাধাঁ প্রদান করছে সে ঐসব লোকদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃত কাফের অথবা মুরতাদদের আদর্শিক বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে তাদের পক্ষে

প্রচেষ্টা চালায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তায়েফের ঘটনায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে ছিল।

যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পরও সুদের ব্যবসা ছাড়তে রাজী হলো না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা এর জবাবে তলোয়ার বের করলো এবং সুদের ব্যবসা বন্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। যদিও তারা কালেমা পড়তো, আযান দিতো, নামায পড়তো কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে একুশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। তিনি তাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেললেন, তার ভিতর পাথর, আগুন ও সাপ-বিচ্ছু নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে, যদিও সেখানে নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও অক্ষমরা ছিল। তাদের সবার সাথে কুফরের একটি দল হিসেবে আচরণ করা হয়েছে যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা নামায পড়তো ও ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলতো।

এছাড়াও যেসব মুসলমান কুরাইশ কাফেরদের সাথে অবস্থান করতো তাদের ব্যাপারে আলোচনায় আল কোরআনেও এই রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় ঐ সকল মুসলমানদেরকে কুরাইশরা যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করে যারা তখনও হিজরত করেনি। এর মাধ্যমে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়ে সাহাবাদের (রাযি.) ভয় দেখাতে চেয়ে ছিল। এসব মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাসও (রাযি.) ছিলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে (রাযি.) জানিয়ে ছিলেন যে, “বনী হাশিমের কিছু মানুষকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে সামনে পেলে যেন ছেড়ে দেয়া হয়, কারণ তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।” একথা শুনে একজন সাহাবী বলেছিলেন: “ওহ! তাহলে আমরা আমাদের পরিবারকে হত্যা করবো আর আমাদের শত্রুদেরকে ছেড়ে দিবো, তাদেরকে হত্যা করবো না?!” রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিয়ে ছিলেন, “তোমার কি পছন্দ হবে যে, আমার চাচা আব্বাস (রাযি.) এর মুখে চড় মারা হোক?”

কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এসব পূর্ব-সতর্কতা বজায় রাখা সম্ভবপর হল না এবং সাহাবীদের (রাযি.) ছোঁড়া কিছু কিছু তীর ঐ সকল মুসলমানদের গায়ে লাগে যারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। মুহাজির ও আনসার (রাযি.) তখন ভয় পেয়ে বলতে থাকেন: “আমরা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছি।” তখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَيَهْتَدُونَ سَبِيلاً

" নিজের উপর জুলম করাবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ হরণ করে বলল, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলল: এই ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলল, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" (সূরা আন নিসা: ৯৭-৯৮)

এই ঘটনায় কাফের-মুরতাদদের দলকে কিভাবে দেখতে হবে, তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের পর আব্বাস (রাযি.) নিজের ও তার ভাতিজার জন্য এই বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন যে, তারা মুসলমান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ "আপনার এই যুক্তিটি বাদ দিন। আপনারা একটি যুদ্ধরত কাফের দলের সাথে এসেছেন। ফলে আপনাদের সাথে যুদ্ধরত দলের মতোই আচরণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই নিজের ও নিজের ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।"

অন্য হাদীসে এসেছে: "আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো। আপনার অন্তরের ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন।"

তারপর তিনি আব্বাস (রাযি.) কে নিজের জন্য ও তার ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًامِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم.

"হে নবী, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম কল্যাণ চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময় নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা আল আনফাল: ৭০)

অতঃপর আব্বাস (রাযি.) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। (বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী, সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর ও কিতাবুল মাগাযী দেখুন)

কুফর ও ঈমানের দলের পরিচয়

কুফরের দল এবং ঈমানের দল চেনানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন:

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষ অবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (লড়াই শুরু হওয়ার পর দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।" (সূরা আন নিসা: ৭৬)

এই আয়াত থেকে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়:

(ক) যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার রাস্তায় লড়াই করে, তারা সাধারণভাবে মুমিন যদিও ঐদলে মুনাফিক থাকতে পারে, তারপরও সেটা মুমিনদের দল।

(খ) যারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার বিরোধিতার জন্য অথবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের জন্য লড়াই করে, তারা একটি কুফরের দল যদিও সেই দলে এমন কেউ থাকতে পারে যে কাফের নয়। বাহ্যিকভাবে তাদেরকে যে রকম দেখা যায়, সে হিসাবেই দলীয়ভাবে তাদেরকে কুফরের দল গণ্য করা হবে।

(গ) এসব দলের ব্যাপারে আমাদের নীতি ও আচরণ কি হবে তা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কোন দলের সাথে আমরা থাকবো, কোন দলকে আমরা সাহায্য করবো, তাও আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলে দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনায়ই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন। কুফরের দলে অবস্থানকারী কারো অন্তরের অবস্থা যাচাই করে দেখতে বলেননি।

তাহলে এটা সুস্পষ্ট হলো যে, যে উদ্দেশ্যে কোন দল যুদ্ধ করে থাকে, সেই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সেই দলকে কুফরের দল কিংবা ঈমানদারদের দল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি কোন দল

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আইন-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তবে তারা ঈমানদারদের দল। আর যদি কোনো দল তাগুতের জন্য লড়াই করে তবে তারা কুফরের দল। আর ইসলামী শরীয়ত এর পরিবর্তে অন্য যে সকল কিছু বা যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য যায় তারাই হল তাগুত। আর সন্দেহাতীতভাবে এই প্রকার তাগুত হচ্ছে কুফরের দল।

এছাড়া নিম্নে বর্ণিত হাদীসেও একটি দলকে ঈমানের দল ও অন্য দলকে কুফরের দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "একটি বাহিনী কাবা শরীফে যুদ্ধের জন্য আসবে। তারা যখন বাইদাহ নামক স্থানে আসবে তখন তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে জমিন গিলে ফেলবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কিভাবে জমিন তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে গিলে ফেলবে অথচ সেখানে কেউ কেউ থাকবে যারা বাজার বসানোর জন্য এসেছে আরও অনেকে থাকবে যারা ঐ বাহিনীর নয়।" তিনি বললেন: "সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকেই পৃথিবী গিলে ফেলবে অতঃপর যার যার নিয়ত অনুযায়ী তারা আখিরাতে উঠবে।" (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২১১৮)

মুসনাদে আহমদ, সুনানে ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে: "সেখানে তো অনেকে এমনও থাকতে পারে যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যার যার নিয়ত অনুযায়ী তাদেরকে আখিরাতে উঠানো হবে।" সুনানে নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে: "যদি তাদের মধ্যে কোন ঈমানদার থাকে তাহলে কি হবে?" এ থেকে বুঝা যায় যে ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল যদিও এর ভিতরে কেউ কেউ ঈমানদার থাকবে।

যদিও ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল কিন্তু এর ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফের নাও বলা হতে পারে। এটাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর সুস্পষ্ট অবস্থান। আর এটাই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান। তাই সশস্ত্রবাহিনী হোক কিংবা কোন বিভ্রান্ত দল হোক, যেমন: জাহমিয়া, যে কোন দলের উপর তাকফীরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর মূলনীতি এটা নয় যে, তারা কোন দলের সকল ব্যক্তিকে একসাথে ব্যক্তিগতভাবে তাকফীর (তাকফীরুল মুয়াইয়িন) করেন। এমনও হতে পারে যে, সেখানে কোন নিরুপায় মুসলমান আছে অথবা সেখানে সাময়িক

অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য কোন ফাসেক মুসলমান আছে। এমনকি সেই দলে কোন ভালো মুমিনও থাকতে পারে, যে সেই দলের ভিতর লুকিয়ে আছে যাতে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে। যেমনঃ মিশর সেনাবাহিনীতে খালিদ আল ইস্তাম্বুলী (রাহিমাহুল্লাহ) {তিনি ছিলেন মিশরের একজন আলেম শাইখ মুহাম্মাদ ইস্তাম্বুলী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ভাই। মিশরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আহমদ আনওয়ার আসসাদাত এর শাসনামলে মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসিন হন। তার ভাইকে সত্য প্রকাশের জন্য জেলে প্রেরণ করার কিছুদিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাতকে ৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ সালে হত্যা করেন। এই নায়োকোচিত ঘটনাটি টেলিভিশনে একটি সরাসরি অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি সম্পন্ন করেন, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করে যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এখনও হাতের দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করা যায়। অতঃপর তার ভাই খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে তৎকালীন শাসকেরা ঠান্ডা মাথায় খুন করে।} ছিলেন অথবা ফেরাউনের পরিবারের সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল কোরআনে এসেছে:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْجَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

"ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে বললো, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল মুমিন:২৮)

তবে এসব দুই-একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার বিবেচনায় সামগ্রিকভাবে এই দলটির কাফের হবার সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন আসে না। ফেরাউনের পরিবারের দুই/এক জন মূসা (আঃ) কে রক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ফেরাউনের পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলে দেন নি।

তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা তাগুতের জন্য মুসলমান ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা হচ্ছে কুফরের একটি দল। এসব শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না তারা ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসে। ছোট কিংবা বড়, তুচ্ছ কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারেই যাতে এই দল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে না পারে। যদিও এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা কাফের কিংবা মুর্তাদ বলি না কিন্তু এই দলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব যারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকে আমরা তাগুত বলি।

অপরদিকে, আমাদের মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ মুসলমানরা বেশীরভাগই হচ্ছে দুর্বল ও অসহায় এবং তাদের অধিকাংশই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়তকে পছন্দ করে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা তাকফীরী / খারেজী দলগুলো ভুলে যায় এবং মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ জনগণকে কাফের/ মুশরিক মনে করে। অথচ এই দলগুলোই আবার এসব দেশকে মুর্তাদ সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করার আহবান জানায়। এখন যদি এসব দেশের বেশীরভাগ মানুষ কাফের-মুশরিকই হয়,তাহলে এসব দেশকে মুরতাদদের হাত থেকে মুক্ত করে লাভ কি? কারণ এসব দেশ মুক্ত করার পর তাদের দৃষ্টিতে এ সকল মুরতাদদের (অর্থাৎ, সাধারণ জনগণকে) হত্যা করতে হবে!! সব জনগণকেই যদি মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যা করে ফেলা হয়, তাহলে শরীয়ত কায়েমের সুফল কে ভোগ করবে?! (সূত্রঃ শাইখ আবূ হামযা আল মিসরী এর লেখা থেকে গৃহিত। আল্লাহ তাঁকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করুন। যে ভাই লেখাটির অনুবাদ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন।)

যাই হোক মূল কথা হল, আমাদের বাংলাদেশের সব রকম সশস্ত্রবাহিনী দলগতভাবে কাফের ও মুরতাদ। ইসলামী শরীয়াহ কায়েম প্রত্যাশী যেকোনো মুজাহিদ গ্রুপের জন্য এই সশস্ত্র বাহিনীর যেকোনো সদস্যকে হত্যা করা বৈধ হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোনো ঈমানদার ব্যক্তিও তাদের ভিতর থাকতে পারে, এই সন্দেহের কারণে তাদের উপর হামলার পরিমাণ সামান্যতম কমানো যাবে না। ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হল, নিজের ঈমান ও জান বাচানোর জন্য বাহিনী থেকে ইস্তফা দেওয়া। কিংবা মুজাহিদদের সাহায্য করার আশা নিয়ে ইস্তিগফারের সাথে বাহিনীতে অবস্থান করা। তবে এই অবস্থায় যদি সে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয়, তাহলে মুজাহিদদের কোনোরূপ দোষারোপ করা যাবে না। তার নিয়ত ভাল থাকলে আখেরাতে সে মুসলিম হিসাবে উত্থিত হবে।

হে ভাই! আল্লাহ তাআলা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য; তাঁর রাজ কায়েমের জন্য; তাগুতের গোলামী করার জন্য নয়। আজই তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। তাগুতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিপূর্ণ তাওহীদ গ্রহণ করুন। পরিশুদ্ধ ঈমান আনয়ন করুন। আখেরাতের ফিকিরকে প্রাধান্য দিন। দুনিয়ার তুচ্ছ অর্থকড়ি-মান ইজ্জতের উপর লাথি মারুন। আল্লাহকে ভয় করুন। আগামী কালই হয়তো আপনাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তখন তার কাছে কী জবাব দিবেন? সারা জীবন তাগুতের গোলামী করে কাটিয়ে দিলেন, আল্লাহর জন্য, মুসলিম উম্মাহর জন্য, ইসলামের বিজয় ও বুলান্দীর জন্য কিছুই করলেন না? কী জবাব দিবেন? অথচ আপনার কাছে ইসলামকে, মুসলিম উম্মাহকে দেওয়ার মত অনেক কিছুই ছিল। অস্ত্র ছিল, প্রশিক্ষণ ছিল, মেধা ছিল, আরো ছিল রণ কৌশল ছিল। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এত কিছু দিলেন কিন্তু এর কিছুই আপনি দ্বীনের তরে বিলালেন না! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন এবং তাগুতের পক্ষ ত্যাগ করার তাওফীক দান করুন। মুজাহিদীনদের পক্ষ অবলম্বন করার হিম্মত দান করুন। শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দান করুন। আমীন।

সশস্ত্র বাহিনী ব্যতীত তাগুত-মুরতাদ সরকারের অধীনে অন্যান্য চাকুরীর হুকুম

জিজ্ঞাসা: কেউ যদি তাগুত-মুরতাদ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী না করে রাষ্ট্রীয় অন্যকোনো বিভাগে চাকুরী করে যেমন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ইত্যাদিতে সেক্ষেত্রে তার কী হুকুম ?

জবাব: রাষ্ট্রীয় যেসব মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, বিভাগ ও সংস্থার উপর এই তাগুত-মুরতাদ সরকারের টিকে থাকা নির্ভর করে, (যেমন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) সেসব মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, বিভাগ ও সংস্থায় চাকুরী করাও হারাম এবং সেই চাকুরীর বেতনও হারাম। কারণ, এসব বিভাগে চাকুরী করার দ্বারা সরাসরি তাগুত সরকারকে তার তাগুতী কার্যক্রমে সহযোগিতা করা হয়। তাই এই চাকুরী এবং চাকুরীর বেতন নিঃসন্দেহে হারাম।

এসব বিভাগে চাকুরীকারী কেউ যদি তাগুত সরকারের কর্মকাণ্ড পছন্দ করে, তাদের প্রণীত শরীয়ত বিরোধী আইন-কানুনের ব্যাপারে সন্তুষ্টি জাহের করে, তাহলে সেও কাফের-মুরতাদে পরিণত হবে। তাগুতী/কুফুরী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করাও কুফর বা রিদ্দাহ। এ ব্যাপারে কোনো ফকীহর দ্বিমত নেই। তাই

যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে ভালবাসে, পরকালে বিশ্বাস করে, তারা যেন, দ্রুত ঐসব বিভাগ থেকে ইস্তফা দেয় এবং এতদিন তাগুত সরকারকে সহযোগিতা করার গুনাহের কারণে খালেস দিলে তাওবা করে নেয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

আর মুসলিম জনগণের জনজীবন সচল ও বহাল রাখার জন্য যেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ রয়েছে, (যেমনঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, পাট মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, সড়ক বিভাগ, রেল মন্ত্রণালয় ইত্যাদি) সেসব বিভাগের বিভাগীয় সংবিধানের শরীয়ত বিরোধী আইন-কানূনগুলোকে ঘৃণা করত এবং সেসব আইন পরিবর্তনে নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করত সেখানে চাকুরীর অবকাশ আছে। তবে তাকওয়ার দাবি হল, এসব বিভাগেও চাকুরী না করা।

হযরত ইউসুফ আ. এর দৃষ্টান্ত পেশ করে যারা কাফের-মুরতাদ সরকারের অধীনে চাকুরী করা জায়েয বলেন, তাদের সমীপে নিবেদন

অনেক উলামায়ে কেরাম ইউসুফ আ. এর কর্মপন্থার উপর কিয়াস করে কাফের/মুরতাদ সরকারের অধীন চাকুরী করাকে বৈধ বলে প্রচার করেন এবং তাদের অনুসারীদেরকে ঐ চাকুরী হালাল হওয়ার ফতওয়া দেন। আমরা বলতে চাই, আযীযে মিসরের অধীন হযরত ইউসুফ আ. এর অর্থ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন আর বর্তমানে কোনো কাফের-মুরতাদ সরকারের অধীন এমপি-মন্ত্রী হওয়া কিংবা অন্য কোনো দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার মধ্যে অনেক দিকে দিয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই একটাকে আরেকটার উপর কিয়াস করে উভয়ের একই হুকুম প্রদান করা বৈধ নয়। পার্থক্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ইউসুফ আ. অর্থের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। কাফের বাদশার কুফরী আইন-কানূন মানতে তাঁকে বাধ্য করা হয়নি। তিনি নিজস্ব শরীয়ত এবং ইয়াকূব আ. এর শরীয়তের আইন মোতাবেক অর্থমন্ত্রণালয় স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতেন। তিনি কখনো কাফের বাদশার কোনো কুফরী হুকুম পালন করেননি এবং তাঁকে পালন করতে বলাও হয়নি। এসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই ইরশাদ হচ্ছে:

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

“এমনিভাবে আমি **ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত।** আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পূণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।” (সূরা ইউসুফ:৫৬)

আয়াতের চিহ্নিত করা কথাগুলো ভাল করে পড়ুন। পূর্ণ ক্ষমতা দান এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত তামকীন বা প্রতিষ্ঠাদানের কী অর্থ? **“ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি”** এই অংশ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আ. কে এমনভাবে ক্ষমতা দান করেছিলেন যে, ইউসুফ আ.কে অপসারণ করার ক্ষমতা বাদশাহরও ছিল না। কারণ ইউসুফ আ. এর অপসারণের ক্ষমতা যদি বাদশাহর থাকত, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ইউসুফ আ.কে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠাদান সাব্যস্ত হয় না।

“সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত” এই বিষয়টা কার পক্ষে সম্ভব হয়? কারো কাছে কোনোরূপ অনুমতি প্রার্থনা ও জবাবদিহিতা ব্যাতিরেকে কে দেশের যেখানে খুশি বাড়ি-ঘর তৈরি করতে পারে? যা খুশি তা করতে পারে? নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভব যার পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকে। বর্তমানে যারা কাফের-মুরতাদ বাদশাহর অধীন এমপি হয়, মন্ত্রী হয়, বা অন্য কোনো সরকারী চাকুরী করে, তাদের পক্ষে কি এরূপ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব যেরূপ স্বাধীনতা ইউসুফ আ. ভোগ করেছিলেন? তাদের অবস্থা তো এতই লাঞ্ছনাজনক যে, যদি সরকারের একটা মাত্র আইনের সমালোচনা করে তাহলেই তাকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হয়! অতএব, ইউসুফ আ. এর দৃষ্টান্ত পেশ করে কাফের-মুরতাদ সরকারের অধীন চাকুরী করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

হযরত ইউসুফ আ. যে বাদশার আইন-কানূন মানতেন না,বরং নিজের শরীয়ত মত সব কিছু পরিচালনা করতেন এর প্রতি অন্য আরেকটি আয়াত নির্দেশ করে। ইরশাদ হচ্ছে:

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ

“সে বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে দিতে পারত না” (সূরা ইউসুফ:৭৬)

কারণ বাদশার আইনে চুরির অপরাধে দাসত্বের বিধান ছিল না। বরং ইয়াকূব আ.এর শরীয়তের বিধানই এমন ছিল। তাই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, ইউসুফ আ. কাফের বাদশার কুফুরী আইনের অধীন ছিলেন না। বরং তিনি নিজের শরীয়ত মত স্বাধীনভাবে অর্থবিভাগ পরিচালনা করতেন। তাই ইউসুফ

আ. এর সাথে তুলনা করে বর্তমানের কাফের-মুরতাদ শাসকদের শরীয়ত বিরোধী সংবিধানের অধীন নওকরীকে হালাল বলা সম্পূর্ণ কিয়াস মাআল ফারেক; ভুল তুলনা।

বাস্তবে ইউসুফ আ. এর কর্মপন্থার উদাহরণ হল: এক ব্যক্তির হাজার হাজার একর জমি আছে। সে জমিগুলো চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত কোনো লোক পাচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, একজন যোগ্য লোকের হাতে অর্পণ না করলে জমিগুলো বিরান ভূমিতে পরিণত হবে। তার পরিবারের বাৎসরিক খোরাকিরও ব্যবস্থা হবে না। ক্ষুৎপিপাসা তাকে ও তার পরিবারকে তাড়া করে ফিরবে। এই যখন পরিস্থিতি তখন সে, এমন একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোক পেয়ে গেল যে স্বেচ্ছায় এই জমিগুলোর চাষাবাদের দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী। তখন জমির মালিক খুশিতে আপ্লুত হয়ে তার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং জমির উন্নতির জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন পড়ে নিজের ইচ্ছামত তা করার স্বাধীন ছাড়পত্র তাকে দিয়ে দিল এবং জবাবদিহিতাহীন তাকে জমি উন্নয়নে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিল। শুধুমাত্র জমির মালিকানাই মালিকের বহাল থাকল, আর সব রকমের অধিকার চাষাবাদের দায়িত্ব গ্রহণকারীর রয়েগেল। এমনকি সে এ মর্মেও ঘোষণা দিল যে, তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার অধিকারও সে নিজ থেকে রহিত করল। এই হল, ইউসুফ আ. এর মিশরের অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালনের মূল চিত্র। ইউসুফ আ. এর অবস্থাকে আরবীতে এভাবে ব্যাক্ত করা যায় "দাওলাতুন ফী দাওলাতিন" এক দেশের ভিতর আরেক স্বাধীন দেশ। দেশের ভিতর একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, ব্যতিক্রমী নিজ সংবিধানে পরিচালিত অর্থ বিভাগ। এরকম অর্থ বিভাগের তুলনা বর্তমান বিশ্বের কোথাও পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণের হুকুম।

জিজ্ঞাসা: অনেক সরকারী দায়িত্বের ক্ষেত্রে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশ সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণের হুকুম কী?

জবাব: বাংলাদেশের সংবিধান একটি কুফরী সংবিধান। এর ছত্রে ছত্রে কুফরের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। বুঝার সুবিধার্থে আমরা এখানে সংবিধানের শুরুর অনুচ্ছেদের কয়েকটি বিধি তুলে ধরছি:

বাংলাদেশের সংবিধানের কয়েকটি ছত্র

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল **-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে** ''

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রত্যেকটি কুফরী মতবাদ। ইসলামের সাথে এসব মতবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যে এসব মতবাদে বিশ্বাসী হবে, এসব মতবাদ প্রচার করবে, এসব মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে। এব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই।

গণতন্ত্র (Democracy) কুফর কেন?

গণতন্ত্র হল জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা, যেখানে সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং এর প্রয়োগ ঘটে জনপ্রতিনিধিদের আইন প্রনয়নের মাধ্যমে। গণতন্ত্রে আল্লাহর শরীয়তের কোন মূল্য নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যরা যে আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তন করবে সেটাই আইন, সেটাই পালনীয়। আল্লাহর শরীয়ত কি বলে তা গণতন্ত্রে দেখার বিষয় নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি 'ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাওলা'- 'রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃথকীকরণ' নীতির উপর। তাই তাদের স্লোগান- 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার', 'রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই' ইত্যাদি। জনগণ কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তাদের ইচ্ছা ও খাহেশ এবং তাদের অভিব্যক্তিই চূড়ান্ত আইন। তারা তাদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে। হারামকে হালাল করে, হালালকে হারাম করে। যেমন:

ক. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চুরির শাস্তি হাত-কাটা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এর পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন।

খ. আল্লাহ তাআলা সুদ হারাম করেছেন এবং সুদখোরদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে, এর জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। গোটা অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এর উপরই স্থাপন করা হয়েছে। এ হচ্ছে হারামকে হালালকরণ।

গ. আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে একে সন্ত্রাস এবং মানবতাবিরোধি জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হচ্ছে হালালকে হারামকরণ।

এভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন কিংবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালালকরণ সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার। যেমন- কোন শাসক যদি আইন প্রবর্তন করে যে, 'আল্লাহর শরীয়তে যদিও আসরের নামায চার রাকাআত ফরয এবং আমরাও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের দেশে এখন থেকে আসরের নামায দুই রাকাত পড়তে হবে। চার রাকাআত পড়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে'- তাহলে এমন শাসক নিশ্চিত কাফের। শরীয়তের বিধান তথা 'আসরের নামায চার রাকাত ফরয' স্বীকার সত্ত্বেও সে কাফের। যারা নামায পরিবর্তন করে-তারা, আর যারা যিনা, চুরি ইত্যাদির শরীয়ত-নির্ধারিত অকাট্য শাস্তি পরিবর্তন করে-তাদের মধ্যে কোনই ব্যবধান নেই। সকলেই কাফের ও মুরতাদ।

দ্বিতীয়ত এই শাসন-ব্যবস্থায় আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য বর্জন করা হয়। তাঁর নাযিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর বিপরীতে তাগুত, শয়তান ও গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা হয়। এদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি ও খাহেশ-প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে জীবন-বিধানরূপে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর আইন পরিবর্তনের মতো তা এই মানবরচিত বিধানকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করাও সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার। ফলে:

ক. শরয়ী শাসনের বিপরীতে যারা এই শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন বা প্রবর্তন করে, তারা কাফের।

খ. শরীয়তের পরিবর্তে এই শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা যেসব শাসক রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারাও কাফের।

গ. মন্ত্রী এম.পি এবং আইন প্রণয়ন সংস্থার সদস্য- যারা এই কুফরী আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তনে লিপ্ত, তারাও কাফের।

ঘ. যেসব বাহিনী শক্তিবলে এই কুফরী শাসন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, এর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে, এর প্রহরায় নিয়োজিত আছে, তারাও কুফরে আকবারে লিপ্ত।

ঙ. এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা এর প্রতি সন্তুষ্ট, এর সমর্থক, প্রচারক এবং যারা জনশক্তি বা আর্থিক যোগান দিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এর সাহায্য-সহযোগিতা করবে, শক্তি যোগাবে, **এসব দলকে ভোট দেবে**- তারাও কুফরে আকবারে লিপ্ত।

উল্লেখ্য, এসব কারণে সুনিদৃষ্টভাবে কোন ব্যক্তির উপর কুফর ও ইরতিদাদের হুকুম আরোপ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞতা (الجهل), তাবীল (التأويل) ইত্যাদির মত موانع التكفيرতথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো লক্ষ্যনীয়। হক্কানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামই কেবল এ ব্যাপারে ফায়সালা দেয়ার অধিকার রাখেন। জনসাধারণের জন্য আবশ্যক উলামায়ে কেরামের আনুগত্য করা। সুনির্দিষ্ট তাকফীরের বিষয়টি উলামায়ে কেরামের হাতে ছেড়ে দেয়া।

সমাজতন্ত্র (Communism) কুফর কেন?

সমাজতন্ত্র একটি বস্তুবাদি মতবাদ, যা পরিপূর্ণ নাস্তিকতার উপর গড়ে উঠেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহুদী কার্ল মার্কস ও তার সাহায্যকারী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। সমগ্র মানব ইতিহাস ও কর্মকান্ডকে এরা "শ্রেণী সংগ্রামের" নিরিখে দেখে। এ মতবাদের মূলনীতি হচ্ছে- আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, সকল নবী-রাসূলকে মিথ্যারোপ করা, সকল দ্বীনের সাথে কুফরী করা, ধর্মীয় সকল আকিদা ও তার নির্দেশিত আচরণকে অস্বীকার করা। ধর্ম ও আচার-আখলাককে তারা অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় মনে করে। এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বলে আখ্যায়িত করেছে। এ মতবাদ ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করে এবং সব কিছুকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি গণ্য করে। এটি একটি কুফরী মতবাদ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই অবগত।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) কুফর কেন?

আল্লাহ তাআলা মানব জাতীকে বিভক্ত করেছেন ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে। সকল ঈমানদার-মুসলমান এক জাতি, আর সকল কাফের-অমুসলিম এক

জাতি। মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, যে জাতি-গোষ্ঠী ও রঙ-বর্ণেরই হোক, যে ভাষাতেই কথা বলুক- তারা পরস্পর ভাই ভাই। তারা পরস্পর ঈমানী বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ। তাদের পরস্পর মহব্বত, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক। একে অপরকে নুসরত করা, হেফাজত করা, কাফের-মুশরেকদের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহায়তা করা জরুরি। অপরদিকে অমুসলিমকে ভালোবাসা, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাদের সাথে শর্তসাপেক্ষে সর্বোচ্চ মানবিক সহমর্মিতার সুযোগ রয়েছে। মোটকথা, ইসলামে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' (শত্রুতা-মিত্রতা) ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। একে যদি জাতীয়তাবাদ বলা হয়, তাহলে ইসলাম এ জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি দেয়। একে বলা যেতে পারে ইসলামী জাতীয়তাবাদ, যার মূল ভিত্তি হবে ঈমান ও কুফর এর উপর।

পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে। তাদের 'ওয়ালা-বারা' তথা মহব্বত-ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ঐক্য-অনৈক্য সব কিছু এসবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ঈমান ও কুফরে তফাৎ নেই। মুসলিম অমুসলিমের কোন পার্থক্য নেই। মুসলমান-কাফের, ইয়াহুদ-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ কারো মাঝে কোন ব্যবধান নেই। যতক্ষণ তারা এক দেশ, এক জাতি কিংবা এক ভাষাভাষী হবে, ততক্ষণ তাদেরকে ভালবাসতে হবে, তাদের সাহায্য-সহায়তা করতে হবে, ন্যায়-অন্যায় সব কিছুতেই তাদের পক্ষাবলম্বন করতে হবে। তাদের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রচলন, ইচ্ছা-অভিলাষ, খাহেশ-প্রবৃত্তি সব কিছুকেই সংরক্ষণ করতে হবে। তা সঙ্গত কি অসঙ্গত, শরীয়তসম্মত কি শরীয়তবিরোধি- এসব দেখার সুযোগ নেই। এভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তিত হচ্ছে; হারাম হালাল হচ্ছে, হালাল হারাম হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে এই জাতীয়তবাদের ধ্বজাধারীদের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শাসন ও কর্তৃত্ব মুছে ফেলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের ঐক্য ও একতা বিলুপ্ত করে তাদেরকে পরস্পর বিদ্বেষী কতগুলো দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে পশ্চিমারা এ কাজটিই করতে সক্ষম হয়েছে। দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি- যেখানে যেটা সুবিধা মনে করেছে, সেটাকেই পুঁজি করে এক ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। সৌহার্দ্য-ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেছে। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে বাকি সমগ্র উম্মাহ থেকে বে-খবর বরং তাদের দুশমনে পরিণত করেছে। ফলত মুসলিম জাতি পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই জাতীয়তাবাদ ইসলামের বিপরীতে নব-উদ্ভাবিত এক কুফরী মতবাদ। যারা এই মতবাদের প্রবর্তক, প্রচারক, ভক্ত এবং এর জন্য জীবন দেয়- তারা কুফরী করে এবং কুফরের জন্য জীবন দেয় বলে আমরা মনে করি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) কুফর কেন?

‘নিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ অর্থ- ‘কোন ধর্মের পক্ষে নয়’। অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। সেক্যুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যার মূলকথা হচ্ছে- রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, যাতে বলা হয়, মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো- বিশেষত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো- কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। এক কথায়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতার সমার্থক।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় জীবনেও হতে পারে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকও হতে পারে। কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- তার শাসনব্যবস্থা ধর্মের আওতামুক্ত। ধর্মের সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক নেই এবং এসবের সাথে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে আর রাষ্ট্র পরিচালিত হবে জনগণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন দিয়ে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কিংবা তার কোন বিধান ইসলাম ধর্মের অনুযায়ী হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার” শ্লোগানটি দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।

আর কোন ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- সে কোন ধর্মের অনুসারী নয়। তার জীবন ধর্মের আওতামুক্ত। সে ইসলাম ধর্মের অনুসারিও নয়, অন্য কোন ধর্মেরও নয়।

উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলবে, তবে অন্যান্য ধর্মও তাতে শান্তিতে পালন করা যাবে- যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবর্তক ও ধারক-বাহকসহ কোনো নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকটই ধর্মনিরপেক্ষতার এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।

মানব জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে- রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক, কি ব্যক্তি জীবনে- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আমরা কুফরী বলে মনে করি। এ হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে কাফেরদের আবিষ্কৃত নতুন মতবাদসমূহের একটি। দ্বীন ইসলামে এর কোন সুযোগ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রঃ ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন- সর্বত্র অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়ত পরিচালকের আসনে থাকতে হবে। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ ইসলামী শরীয়ত।

উল্লেখ্য, এ বিশ্বাসের পাশাপাশি শরীয়তে কাফেরদের যতটুকু অধিকার দেয়া আছে, ততটুকু অধিকার দেয়া আমরা জরুরী মনে করি।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সমর্থক, প্রচারক, এর জন্য লড়াই করে তারা সবাই কুফরে আকবারে লিপ্ত বলে আমরা মনে করি। কারণ, তারা আল্লাহর দ্বীনের বিপরীতে নতুন একটি মতবাদকে বেছে নিয়েছে।

“প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।”

ইসলাম বলে জনগণ ক্ষমতার মালিক নয়; সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করেন, যার থেকে ইচ্ছা তার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নেন। যে জনগণকে সমস্ত ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

“জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।”

কত বড় স্পর্ধা! চিন্তা করা যায় এই কথাটি কত বড় ভয়ংকর!! তারা নিজেদের গলিত-দুষিত মস্তিষ্ক প্রসূত সংবিধান দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর ঐ সব বিধানকে বাতিল ঘোষণা করছে যা তাদের প্রণিত বিধানের সাংঘর্ষিক হবে!!! এই কথা বলে তারা মূলত কুরআন-সুন্নাহর হুদূদ-কেসাস (দন্ড বিধি) সংক্রান্ত সমস্ত আইনকে অস্বীকার এবং রহিত করে দিয়েছে।

“কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা

(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-

(ক) কোন কার্যকরিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-

তাহার এইরুপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।”

কেউ যদি এই সংবিধান বাতিল করে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তার এই চেষ্টা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

সংবিধানের শুরুর ৫/৬ পৃষ্ঠার ভিতর এসব কথা উল্লেখ আছে। যে সংবিধানের অবস্থা এই সেই সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণ কীভাবে বৈধ হতে পারে? কেউ যদি সংবিধানের কুফরী বিষয়গুলো জানা-বুঝার পর এর আনুগত্যের শপথ নেয়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না জেনে-না বুঝে শপথ করে, তাহলে সে কাফের হবে না বটে কিন্তু তার কবীরা গুনাহ হবে। তাই সংবিধানের আনুগত্য বা সংরক্ষণের শপথ করে দায়িত্ব গ্রহণ কোনো ক্রমেই জায়েয নেই।

....

বাংলাদেশ দারুল হারব

ইসলামী ফিকাহবিদগণ বিশ্বের দেশসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যে কোনো দেশ হয়তো দারুল ইসলাম হবে নয়তো দারুল কুফর হবে। এ ব্যাপারে জুমহুর উম্মতের ঐক্যমত বিদ্যমান। কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলামও নয় আবার দারুল কুফরও নয় তা কখনই হতে পারে না।

আল্লামা কাসানী রহ. বলেন,

تَصِيرُ الدَّارُ دَارَ إِسْلَامٍ أَوْ دَارَ كُفْرٍ

“দার” হয়ত দারুল ইসলাম হবে নয়ত দারুল কুফর হবে ...... (বাদাইউস সানায়ে’, পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়ঃ মা’নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

হ্যাঁ তবে দারুল কুফর আবার দুই ভাগে বিভক্তঃ-

(১) দারুল হারব। (যাদের সাথে মুসলিমদের কোন সন্ধি বা চুক্তি নেই)

(২) দারুল আ’হাদ। (যাদের সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে)

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

"كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه"

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের কাছে মুশরিকদের অবস্থান ছিল দু’ধরণের। কিছু মুশরিক ছিল যুদ্ধরত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। আর কিছু মুশরিক ছিল চু'িবদ্ধ। তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, অধ্যায়ঃ নিকাহু মান আসলামা মিনাল মুশরিকাত)

উপরে বর্ণিত হাদীস থেকে দারুল কুফর দু’ভাগে বিভক্ত হওয়া স্পষ্টরূপে বুঝে আসে।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেনঃ-

والكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد

“কুফফার হয়ত যুদ্ধরত হবে নয়ত চুক্তিবদ্ধ হবে।”(আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৭৫)

দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হয়?

দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হবে? এ ব্যাপারে হানাফী ফুকাহাগণের মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই। কিন্তু দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর হয় এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

আল্লামা কাসানী রহ. বলেনঃ-

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، إنَّهَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ ؟

"আমাদের ফুকাহাদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামের আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত হয়। তবে তাদের দ্বিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল কুফর হয় সে ক্ষেত্রে। (বাদাইউস সানায়ে'। পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে একই মত উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

اعْلَمْ أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ إظْهَارُ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِيهَا

"মনে রাখবে, দারুল হরব শুধুমাত্র একটি শর্তে দারুল ইসলামে পরিণত হবে, আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামের আইন বাস্তবায়িত হওয়া। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩)

আলাউদ্দীন হাসকাফী রহ. আদ-দুররুল মুখতারে বলেছেনঃ-

ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها

"দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়, সেখানে ইসলামের আইন জারি করার মাধ্যমে।" (দেখুনঃ- ফাতাওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল মুসতামিন)

এ ব্যাপারে পুরো উম্মতের ইজমা বিদ্যমান যে, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত হয়। ভারত উপমহাদেশ (যার মধ্যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও শামিল) যখন ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ইংরেজরা তাদের রচিত সংবিধান মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়, তখন হিন্দুস্তানের তৎকালিন নেককার আলেমগণ (যাদের মধ্যে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য) উপমহাদেশকে দারুল হরব বলে ফতওয়া দেন। যা সকলেই জানি। কেউ যদি সেই ফাতওয়াকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাহলে তাকে আবশ্যকীয়ভাবে এটাও

মানতে হবে যে- "পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পূর্বপর্যন্ত উপমহাদেশের কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হিসাবে পরিগণিত হবে না।"

আর বাস্তবতা স্বাক্ষী যে, সেই ফতওয়ার পরে আজ পর্যন্ত উপমহাদেশের বড় তিনটি রাষ্ট্রে (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে) এমন কিছু ঘটেনি যার কারণে এ দেশগুলোকে দরুল ইসলাম বলা যায়। অতএব, সেই ফতওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এ দেশগুলো দারুল হরব হিসাবেই বহাল রয়েছে।

নাগরিকদের ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করে 'দারুল ইসলাম/হরব' বলা হয় না

উল্লেখ্য, কোনো দেশ দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার ক্ষেত্রে সে দেশের অধিবাসীদের ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক যেহেতু ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাই বাংলাদেশ দারুল ইসলাম হবে, আর ভারতের অধিকাংশ লোক যেহেতু কাফের তাই ভারত দারুল হরব বা দারুল কুফর হবে। বরং দারুল ইসলাম বা দারুল হরব হওয়ার ভিত্তি হল, দেশ পরিচালনার বিধি-বিধান ও সংবিধান। যদি কোনো দেশের ৯৫% অধিবাসী অমুসলি হয়, কিন্তু মুসলিম শাসকবর্গ কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা দেশটি পরিচালনা করে, তাহলে ঐ দেশটি দারুল ইসলাম বলে গণ্য হবে। ঠিক এর বিপরীত আরেকটি দেশের ৯৮% অধিবাসী মুসলিম। কিন্তু শাসকবর্গ কুফুরী আইন-কানূন দ্বারা দেশটি পরিচালনা করে, তাহলে ৯৮% অধিবাসী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও দেশটি দারুল কুফর বলে বিবেচিত হবে। এবিষয়ে মুসলিম উম্মাহর নিরর্ভযোগ্য কোনো আলেমের দ্বিমত নেই।

দারুল ইসলাম যেভাবে দারুল কুফর হয়

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত:

দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর বলে গণ্য হবে, এ ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মাঝে দ্বিমত আছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেনঃ-

إِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إِلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطَ ، أَحَدُهَا : ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ.

"তিনটি শর্তে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে।

এক. তাতে কুফরী বিধান নাফেয থাকা। দুই. দারুল কুফরের পার্শ্ববর্তী হওয়া। (অর্থাৎ পাশে কোন দারুল ইসলাম না থাকা) তিন. মুসলিম ও জিম্মিরা

পূর্বে প্রদান কৃত নিরাপত্তার দ্বারা নিরাপদ না থাকা (অর্থাৎ ইসলামী শাসন থাকা অবস্থায় যেমন নিরাপদ ছিল তেমন নিরাপদ না হওয়া)। (বাদাইউস সানায়ে', পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়, মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

ইমাম আবূ হানীফা রহ. দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবার যে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন তার প্রতিটি শর্ত বাংলাদেশসহ প্রায় সকল মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পাওয়া যায়। কেননা এসমস্ত রাষ্ট্র কুফফারদের বিধান দ্বারা পরিচালিত। আর ইসলামী খিলাফাত বা শাসন থাকা অবস্থায় মুসলিমরা যে নিরাপত্তার মধ্যে ছিল তার শত ভাগের এক ভাগ নিরাপত্তার মধ্যেও মুসলিমগণ নেই। যা দিবালোকের উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট, তবে দিনের বেলা কেউ চক্ষু বন্ধ করে থাকলে তা ভিন্ন কথা। আর আমাদের পার্শ্ববর্তী এমন কোন রাষ্ট্রও নেই যা ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত। তাই কেউ যদি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতকেও গ্রহণ করে তথাপি বাংলাদেশ ও এ ধরণের অন্যান্য রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বা দারুল আমান বলার সুযোগ নেই।

আমাদের হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের মত হচ্ছে, মুসলিম মুজাহিদীন যদি কোন দারুল কুফরে আক্রমণ চালায়। অতঃপর কাফেরদের পরাজয় ঘটে, মুজাহিদীন বিজয় লাভ করে। তথাপি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না। কারণ, দারুল ইসলাম হবার এক মাত্র শর্ত হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম-আহকাম কায়েম করা; কুরআনী হুকুম বাস্তবায়ন করা। আহকামুল ইসলাম কায়েমের আগে তা দারুল ইসলাম হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ রহ. এর মতে দারুল কুফরে গনিমত বণ্টন জায়েজ নেই। কিন্তু দেখা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর সেখানেই গণিমত বণ্টন করেছেন। এই মাসআলা আলোচনা করতে গিয়ে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী রহ. বলেনঃ-

وأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه فكانت القسمة فيها بمنزلة القسمة في المدينة وقسم الغنائم فيها قبل أن يخرج منها ففي هذا دليل أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار إسلام بأجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها وقد طال مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيها فكانت من دار الإسلام.

“আর খায়বারের ব্যাপারটি হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বিজয় করেছেন। সেখানে তাঁর বিধান (ইসলামী বিধান) জারি

করেছেন। তাই সেখানে গণিমত বণ্টন মদিনায় বণ্টনের অনুরূপ। খায়বারে গণিমত বণ্টন থেকে প্রমাণিত হয়, যখন ইমাম কোন অঞ্চল বিজয় করবেন এবং ইসলামী শাসন জারি করার মাধ্যমে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করবেন, তখন ইমামের জন্য সেখানে গণিমত বণ্টন করা জায়েজ। খায়বার বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন এবং সেখানে ইসলামী বিধান জারি করেছেন। ফলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে ছিল। (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বণ্টন)

ইয়ামানের নুজাইর অঞ্চল বিজয়ের ব্যাপারে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী রহ. বলেনঃ-

إنهم فتحوا ولم تجر احكام الاسلام فيها بعد وبمجرد الفتح قبل اجراء احكام الاسلام لا تصير دار اسلام .

“সাহাবায়ে কেরাম নুজাইর বিজয় করেছেন। কিন্তু বিজয়ের পর পরেই (সাহায্যকারী অপর বাহিনী যুক্ত হবার আগে) সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করেননি। আর শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে, ইসলামী শাসন জারি করার পূর্বে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয় না।” (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বণ্টন)

নোটঃ উলামায়ে হিন্দ উপমাহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করে ছিলেন। সুতরাং দারুল হারব তখন পর্যন্ত দারুল ইসলাম হবে না যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত হয়। যদি মুসলিমগণ যুদ্ধ করে অথবা অন্য কোন ভাবে কোন অঞ্চল নিজেদের অধীনে নেয় তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। এটাই ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য মত।

জুমহুরের অভিমত:

জুমহুর ফুকাহা রহ. এর অভিমত হচ্ছে, দারুল কুফর যেভাবে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারুল ইসলাম হয়, একইভাবে দারুল ইসলাম কুফরী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারুল কুফরে পরিণত হয়। শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের মত হচ্ছে কোন রাষ্ট্র একবার দারুল ইসলাম হলে আর কখনো দারুল কুফর হবে না। সেটা দারুল ইসলাম হিসাবেই গণ্য হবে। ফিকহে শাফেয়ীর অনুসারী অন্য অনেক ফকীহ আবার তাদের এই মতের বিপরীত মতও প্রকাশ করেছেন।

জুমহুর আয়িম্মায়ে কেরামের নিকট, যে রাষ্ট্র যে আইন দ্বারা পরিচালিত হবে সেটা সেই রাষ্ট্র হিসাবেই গণ্য হবে, ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হলে দারুল ইসলাম। কুফরী আইন দ্বারা পরিচালিত হলে দারুল কুফর।

হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত:

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর অভিমত-

ইমাম কাসানী রহ. বলেনঃ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ : إنَّهَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا.

"আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. এর মত হচ্ছে, কুফরি বিধান নাফেযের মাধ্যমে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে।" (বাদাইউস সানায়ে'- কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে সাহেবাইনের এই মতকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছেঃ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - بِشَرْطٍ وَاحِدٍ لَا غَيْرَ ، وَهُوَ إظْهَارُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ

"আর আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. বলেন- "শুধুমাত্র একটা শর্তই প্রযোজ্য অন্য কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। আর তা হচ্ছে কুফরী আইন কার্যকর করা।" আর এই মতটাই যুক্তিযুক্ত।" (ফাতওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়ঃ ফী-মা তাসীরু বিহী দারুল ইসলাম ওয়া দারুল হারব)

ইমাম সারাখসী রহ. সহেবাইনের মতের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেনঃ

لان البقعة انما تنسب الينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الاسلام فالقوة فيه للمسلمين.

"কোন অঞ্চল আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ধরা হবে নাকি কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত ধরা হবে তা নির্ধারিত হবে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতি লক্ষ্য করে। কোন রাষ্ট্রে যদি শিরকের বিধান কার্যকর থাকে সেখানে মুশরিকরা শক্তিশালী বলে বিবেচিত হবে, ফলে তা দারুল হারব হবে। এমনিভাবে কোন রাষ্ট্রে যদি ইসলামী বিধান কার্যকর থাকে সেখানে মুসলিমরা শক্তিশালী বলে বিবেচিত

হবে। ফলে রাষ্ট্রটিও দারুল ইসলাম হবে।" (আল-মাবসূত, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়ঃ মুয়ামালাতু জাইশিল কুফফার)

ইমাম সারাখসী রহ. এর মতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা দিন পার করছি। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম কিন্তু বিধান চলছে শিরক ও কুফরের। যার ফলে আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইজ্জত রক্ষার্থে রাজপথে নামলে আমাদের বুকে ধেয়ে আসছে তাগুতের বুলেট। আমাদের উপর বিস্ফোরিত হয় গ্রেনেড। ১৩ দফা ইসলামী আইনের দাবি জানালে গভীর রাতে নেমে আসে গণহত্যা। ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ও নগ্ন ভাষায় মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর ইজ্জতের উপর হামলাকারীকে যখন কিছু সিংহশাবক তার যথোচিত পাওনা বুঝিয়ে দিল, তখন তাদেরকে ফাঁসির রশি উপহার দেয়া হল। আর জঘন্য সেই শাতিম, জাহান্নামের কুকুরকে "দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ" খেতাবে ভূষিত করা হল। তাই বিধান চলে যাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব বাস্তবেই তাদের।

ইমাম মালিক রহ. এর মতঃ

ইমাম মালিক রহ. মক্কা বিজয় হওয়ার পূর্বের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

وكانت الدار يومئذ دار حرب لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ.

"তখন ঐ অঞ্চল (মক্কা) দারুল হারব ছিল। কেননা তখন (মক্কায়) জাহিলিয়্যাতের বিধিবিধানই বিজয়ী ছিল।" (আল-মুদাউওনাতুল কুবরা, অধ্যায়ঃ ফী আবীদি দারিল হারব ইউসলিমুনা ফী-দারিল হারব)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইমাম মালিক রহ. মক্কাকে দারুল হারব আখ্যায়িত করছেন। আর এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করছেন 'মক্কা জাহিলিয়্যাতের বিধানের অধীনে থাকা'। ফিকহে মালেকীর অনুসারী অন্যান্য ফুকাহা রহ. একই মত ব্যক্ত করেছেন।

ফুকাহায়ে হানাবেলা রহ.

কাজী আবূ ইয়া'লা রহ. বলেনঃ-

كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفرة

"যে দেশের মধ্যে ইসলামী আইনের তুলনায় কুফরি আইন প্রাধান্য পাবে সেদেশ দারুল কুফর হিসাবে বিবেচ্য হবে।" (আল-মুতামাদ ফী উসুলিদ দ্বীন-২৭৬)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেনঃ

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل.

"জুমহুরের অভিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ রাষ্ট্র যাতে মুসলিমগণ অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তাতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত হচ্ছে। যে রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান বাস্তবায়িত নেই তা দারুল ইসলাম নয় যদিও বা তা দারুল ইসলামের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হয় না কেন। তায়েফ মক্কার অতি নিকটের একটি অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও শুধু মক্কা বিজয়ের দ্বারা তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি। সাহেল-এরও একই অবস্থা ছিল।" (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৬)

শায়েখ মানসূর আল-বুহূতী রহ. বলেনঃ

وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهى ما يغلب فيها حكم الكفر.

"দারুল হারবে যে নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করতে অক্ষম তার উপর হিজরত ওয়াজিব। আর দারুল হারব হচ্ছে যেখানে কুফরী বিধান প্রবল।" (কাশশাফুল কেনা', কিতাবুল জিহাদ-প্রথম অধ্যায়)

আল্লামা ইবনে মুফলিহ রহ. আল-হাম্বলী বলেনঃ-

فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر، ولا دار غيرهما.

"যে রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলিমদের বিধান বাস্তবায়িত তা দারুল ইসলাম আর যে রাষ্ট্রের মধ্যে কুফরী বিধান বাস্তবায়িত তা দারুল কুফর। এই দুইয়ের বাইরে কোন দার (রাষ্ট্র) নেই।" (আল-আদাবুশ শরইয়্যা, অধ্যায়ঃ ফী-তাহকীকি দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

আল্লামা আলাউদ্দীন আল-মারদাবি রহ. বলেনঃ

ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر

"দারুল হারব হচ্ছে ঐ রাষ্ট্র যা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত।" (আল-ইনসাফ, কিতাবুল জিহাদ-প্রথম অধ্যায়)

সমকালীন/ নিকট অতীতের ইসলামিক চিন্তাবিদদের অভিমত:

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. বলেনঃ

....

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين لا ثالث لهما: الأول دار إسلام، وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام، وتحكمه شريعة الإسلام سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين، أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام، ويحكمون بشريعة الإسلام .. فالمدار كله في اعتبار بلد ما دار إسلام هو تطبيقه لأحكام الإسلام، وحكمه بشريعة الإسلام.

الثاني: دار حرب، وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام، ولا يحكم بشريعة الإسلام، كائناً أهله ما كانوا، سواء قالوا: إنهم مسلمون، أو أنهم أهل كتاب أو أنهم كفار، فالمدار كله في اعتبار بلد ما دار حرب هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام، وعدم حكمه بشريعة الإسلام،

"ইসলামের দৃষ্টিতে ও মুসলিমের বিবেচনায় বিশ্ব দুভাগে বিভক্ত; তৃতীয় কোন ভাগ নেই:

এক. দারুল ইসলাম। আর তা হচ্ছে ঐ রাষ্ট্র- যেথায় ইসলামী আইন বাস্তবায়িত। ইসলামী শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত। চাই তার সকল জনগণ মুসলিম হোক। বা মুসলিম ও যিম্মি উভয় মিলিত হোক। অথবা সকল জনগণ যিম্মি হোক কিন্তু শাসক মুসলিমরা। যারা সেথায় ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করে। ইসলামী শরীয়ত দ্বারা ফায়সালা করে। দারুল ইসলাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ইসলামী আইন বাস্তবায়িত হওয়া, ইসলামী শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা করা।

দুই. দারুল হারব। আর তা হচ্ছে প্রত্যেক এমন ভূখণ্ড যেথায় ইসলামী আইন বাস্তবায়িত নয়। যা ইসলামী শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত হয় না। চাই তার জনগণ যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। অধিবাসীরা মুসলিম, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান বা অন্যকোনো কাফের হোক না কেন। কোন রাষ্ট্রকে দারুল হারব নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ইসলামী আইন বাস্তবায়িত না থাকা। ইসলামী শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা না করা। (তাফসীর ফী-যিলালিল কুরআন, সূরা মায়েদা-২৭-৪০ আয়াতের তাফসীর দেখুন)

মুহাম্মাদ কুতুব রহ. বলেনঃ (সাইয়্যেদ কুতুব রহ. এর ভাই)

والذي عليه جمهور العلماء أن الدار تأخذ وصفها من غلبة الأحكام عليها ـ أي بصرف النظر عن عقائد أهلها ـ فالأرض التي تحكمها شريعة الله فهي دار إسلام، ولو كان أغلب سكانها غير مسلمين، كما كانت الهند خلال ثمانية قرون من الحكم الإسلامي، وأغلب سكانها المجوس عباد البقر. كذلك الأرض التي لا تحكمها شريعة الله فهي دار حرب ولو كان أغلب سكانها مسلمين،

"জুমহুর উলামার মত হচ্ছে, রাষ্ট্র নির্ধারিত হবে তা কোন বিধান দ্বারা শাসিত তার প্রতি লক্ষ্য করে। অর্থাৎ ঐ ভূখণ্ডের মানুষ কোন বিশ্বাসের তা বিবেচ্য হবে না। যে রাষ্ট্রে আল্লাহ তায়ালার শরীয়তশাসিত হবে তা দারুল ইসলাম যদিও বা তার অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলিম হয়। যেমন অষ্টম শতাব্দীতে ইসলামী শাসনকালে হিন্দুস্তানের অবস্থা ছিল। অধিকাংশ জনগণ ছিল গো-পূজারী মাজুসী। অনুরূপ যে রাষ্ট্রে আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত দ্বারা শাসিত নয় তা দারুল হারব। যদিও তার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম হয়। (ওয়া'কেউনাল মুয়াসের পৃ.৪২৭)

উস্তায আব্দুল কাদের আউদাহ রহ. এর অভিমত:

دار الكفر تشمل كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطان المسلمين، أولا تظهر فيها أحكام الإسلام، سواء أكانت هذه البلاد تحكمها دولة واحدة، أو تحكمها دول متعددة، ويستوي أن يكون بين سكانها المقيمين إقامة دائمة مسلمون أولا يكون، مادام المسلمون عاجزين عن إظهار أحكام الإسلام.

"দারুল কুফর হচ্ছে এমন সকল অইসলামিক অঞ্চল যা মুসলিমদের অধীনে নেই। অথবা যেথায় ইসলামী বিধান কার্যকর নয়। চাই উক্ত অঞ্চল সমূহ কোন এক রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত হোক অথবা একাধিক রাষ্ট্র দ্বারা। চাই সেখানের স্থায়ী অধিবাসী মুসলিম হোক বা অমুসলিম। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ ইসলামী বিধান কার্যকর করা থেকে অপারগ হয়।"

(আত-তাশরি'উল জিনায়ী আল-ইসলামী-, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭৫)

মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হযরত! ইংরেজদের যামানায় হিন্দুস্তান আপনাদের মতে দারুল হরব ছিল কি ? ইংরেজদের পর বর্তমান সময়ে আগের হুকুমে কোন পার্থক্য এসেছে কি ?

হযরত জবাবে বললেন,"হ্যাঁ! আমাদের মতে হিন্দুস্তান দারুল হরব ছিল ঐ সকল দলীলের ভিত্তিতে যা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রঃ ও শাহ আব্দুল আযীয রহ. লিখে গেছেন। বর্তমান যমানায়ও হিন্দুস্তান দারুল হরব। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।" (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদীয়া খ:২০ পৃ:৩৬০)

দারুল মুআহাদাহ/ দারুল আ'হাদ ও দারুল আমান

দারুল কুফর যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয় তাহলে তা হারবী রাষ্ট্র বা দারুল হারব হিসাবেই গণ্য হবে। আর চুক্তি বা সন্ধি থাকলে তা 'দারুল

আহাদ' (চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র) বলে গণ্য হবে। ফুকাহায়ে আহনাফ মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ দারুল কুফর এর ক্ষেত্রে 'দারুল মুআহাদাহ' (সন্ধির আওতাধীন রাষ্ট্র) পরিভাষা ব্যাবহার করেছেন। (দেখুনঃ শারহু সিয়ারীল কাবীর, খণ্ড-৫, অধ্যায়ঃ বাবুল মুআহাদাহ। বাদায়েউস সানায়ে', কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ মা ইয়া'তারিদু মিনাল আসবাবিল মুহাররমাহ লিল-কিতাল)

"দারুল আমান" শব্দটি পরিভাষা হিসাবে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন মুজতাহিদ ফকীহগণ ব্যবহার করেননি। তবে বর্তমান অনেককে এই পরিভাষা ব্যাবহার করতে দেখা যায়। যদি "দারুল আমান" পরিভাষাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হয় 'দারুল মুআহাদাহ' বা ঐ দারুল কুফর যার সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে তাহলে তো তা ঠিক আছে। কিন্তু যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ভিন্ন কিছু তাহলে তাদের জন্য জরুরী হবে এর পক্ষে শরয়ী নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ করা।

মুরতাদ শাসনাধীন রাষ্ট্রও দারুল হারব

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের বাংলাদেশ যেহেতু শরয়ী আইন দ্বারা পরিচালিত নয়, তাই বাংলাদেশ দারুল হরব। তাছাড়া বাংলাদেশের শাসক সম্প্রদায় মুরতাদ হওয়ার কারণেও বাংলাদেশ দারুল হরব। কারণ, মুরতাদদের শাসনাধীন রাষ্ট্র দারুল হরব বলে বিবেচিত হয়।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেনঃ

وبعد ما غلبوا على دارهم فقد صارت دارهم دار الحرب حتى إذا وقع الظهور عليهم يكون مالهم غنيمة للمسلمين .

"মুরতাদরা যখন নিজ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে তখন তাদের অঞ্চল দারুল হারবে পরিণত হয়। আর যখন আবার তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে তখন তাদের মাল গণিমতে পরিণত হবে।" (শারহু সিয়ারীল কাবীর, বাবুল মুআদাআহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪)

নোটঃ উপরের আলোচনা দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হল, যেকোনো ভূখণ্ড হয়তো দারুল ইসলাম হবে কিংবা দারুল কুফর হবে। দারুল আমান বলতে কিছু নাই। ফুকাহায়ে মুতাকাদ্দেমীন এবং মুতাআখেখরীন কেউই 'দারুল আমান' নামে কোনো দারের কথা উল্লেখ করেননি।

১৯৪৭ সালের পর দারুল ইসলাম হওয়ার মত কি কিছু ঘটেছে?

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই উপমহাদেশকে সকলে দারুল হরব বলে স্বীকার করে। কারণ তখন ইংরেজরা তাদের কুফুরী সংবিধান দ্বারা এ দেশ পরিচালনা করত। এখন প্রশ্ন হল, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পর, কিংবা ৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে এমন কী ঘটেছে যে, আমরা ইতিপূর্বের স্বীকৃত এক দারুল হরবকে দারুল হরব বলতে দ্বিধা করছি?! বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান কোনোটাই কি নির্ভেজাল আহকামুল ইসলাম দ্বারা পরিচালিত? এই প্রশ্নের উত্তর যদি না বাচক হয়ে থাকে, তাহলে কেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দারুল হারব হবে না?

'দারুল ইসলাম' ও দারুল হরব প্রসঙ্গে মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা.এর দাবির খণ্ডন।

উপরের দালীলিক আলোচনার দ্বারা একথা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা পাওয়ার পর আল্লাহর আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে না সে মুরতাদে পরিণত হবে। আর মুরতাদের শাসনাধীন রাষ্ট্রও দারুল কুফর/ দারুল হারব। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শাইখুল ইসলাম তাকী উসমানী দা. বা. এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি উম্মাহর ইজমার বিপরীতে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক মত আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতটি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ক. তিনি কুফরী সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিমদাবীদারদেরকে মুরতাদ মনে করেন না।

খ. তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রকে তিনি দারুল ইসলাম মনে করেন। তাই তিনি পাস্তিান ও পাকিস্তানের মত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম মনে করেন।

তাঁর এই দুই দাবির কারণে উপমহাদেশে (বিশেষত বাংলাদেশে যেখানে ওলামায়ে কেরামের বড় অংশ দলীলের আলোকে কথা বলার পরিবর্তে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন) কী পরিমাণ বিভ্রান্তি যে ছড়াচ্ছে তা দ্বীনী বুঝ সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট অস্পষ্ট নয়।

আপনি আজ ওলামায়ে কেরামের কাছে এই দুই মাসআলা আলোচনা করতে গেলে তাদের অনেকে শুধু এ কথাটাই বলবেন, "তাকি উসমানী সাহেব তো এর বিপরীত বলেন!" ভাবখানা এমন যেন তারা তাদের দ্বীনের সমস্ত দায়ভার তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মতো ব্যক্তিদেরকে ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং

তারা যা বলবেন তাই দ্বীন যদিও এর পক্ষে দলীল না থাকে। আর এর বিপরীতটা অবশ্যই গোমরাহী! যদিও সেটা দলীলভিত্তিক হয়।

এমতাবস্থায় তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর উক্ত দাবিদ্বয়ের বিভ্রান্তি সচেতন সমাজের কাছে তুলে না ধরাটা উম্মাহর প্রতি খিয়ানত বলে মনে হচ্ছে। এ কারণেই এ ব্যাপারে কলম ধরা। নতুবা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর ব্যক্তিগত সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা তার যোগ্যও নই। আর এতে কোন ফায়েদাও নেই। তবে আরবীতে একটি প্রবাদ আছে:

لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة

[দ্রুতগামী অশ্ব কখনো মুখ থুবড়ে পড়ে এবং ধারালো তরবারী কখনো ভোঁতা হয়ে যায়।]

অতএব, বড়দের ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক; অস্বাভাবিক কিংবা অসম্ভব নয়। আজকাল আমরা “বড়দের ভুল হওয়া সম্ভব নয়” মর্মে একটি অঘোষিত আকীদা পোষণ করতে শুরু করেছি। এই ধ্বংসাত্মক আকীদা অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব সহজে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আম্বিয়া আ. ব্যতীত অন্য সবার থেকেই ভুল হওয়া সম্ভব। মুজতাহিদেরও ভুল হতে পারে আবার অমুজতাহিদেরও ভুল হতে পারে। তবে মুজতাহিদের ভুল হলেও তিনি একটি সাওয়াব পাবেন। আর অমুজতাহিদের ভুল হলে ভুল শুধরে নেয়া তার দায়িত্ব। ভুলকে ভুল হিসেবে ধরিয়ে দিয়ে উম্মাহকে তা থেকে রক্ষা করার পথ বাতলে দেয়াই প্রকৃত খায়েরখাহী। উম্মাহকে বিভ্রান্তির সম্মুখীন দেখেও চুপ থাকা খায়েরখাহী নয়।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. তার “ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত” নামক কিতাবে মুসলিমদাবীদার মুরতাদ শাসনাধীন রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে দাবি করেছেন। তাঁর এদাবির পক্ষে তিনি হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট তিন জন ইমামের তিনটি উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছেন।

১ম জনঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.)। যিনি ‘আল-মাবসূত’ এবং ‘শরহুস সিয়ারীল কাবীর’ এর প্রণেতা।

২য় জনঃ ‘জামিউর রুমুজ’ এর প্রণেতা আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০হি.)।

৩য় জনঃ ‘ফাতাওয়া শামী’র প্রণেতা আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.)।

তিনি এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে বুঝাতে চাচ্ছেন-

[বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্র যেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েম নেই, বরং সেসবের শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেগুলো সব 'দারুল ইসলাম' তথা 'ইসলামী রাষ্ট্র'। আইন কি চলছে সেটা দেখার বিষয় নয়। আইন ইসলামী হোক কুফরী হোক সর্বাবস্থায়ই সেগুলো 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র।]

এই তিন ইমামের উদ্ধৃতিত্রয় এনে তিনি একথাও বুঝাতে চাচ্ছেন-

[এসব রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বলা নিজস্ব মনগড়া কোন কথা নয়; বরং পূর্বসূরি ইমামগণের মতানুসারেই সেগুলো দারুল ইসলাম। তাঁদের কারো বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আর কারো বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্টই বুঝা যায়।]

অর্থাৎ প্রথম দুইজন ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

অথচ বাস্তবে এই তিন ইমামের কারো বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনভাবেই এসব রাষ্ট্র 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া বুঝা যায় না। বরং ইমামগণের বক্তব্যগুলোর পর্যালোচনা এবং সেগুলোর সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র দেখার পর এ দাবি দলীল-প্রমাণ বিহীন একটা নিজস্ব মনগড়া দাবি হিসেবেই প্রমাণিত হয়। আইম্মায়ে কেরাম এ ধরণের ভিত্তিহীন দাবি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তাদের বক্তব্য এনে এ ধরণের দাবি প্রমাণ করে তা তাদের নামে চালিয়ে দেয়া যেন তাঁদের নামে অপবাদ দেয়ার নামান্তর।

আইম্মায়ে কেরমের বক্তব্যের পর্যালোচনায় যাওয়ার আগে "ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত" থেকে তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর বক্তব্যটি তুলে ধরছি। তিনি বলেন :

"পঞ্চম অধ্যায়ঃ প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র নীতি

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কী ধরণের সম্পর্ক রাখতে পারবে?

এই মাসআলা বুঝার জন্য ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে 'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব' বা 'দারুল কুফর' নামে যে দুটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা কী উদ্দেশ্য প্রথমে তা আলোচনা করে নেয়া মুনাসিব মনে হচ্ছে।

'দারুল ইসলাম' ও 'দারুল হরব'

দারুল ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ রাষ্ট্র যা মুসলানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদের এমন পরিপূর্ণ দখলদারিত্ব কায়েম রয়েছে যে, তাতে তাদের আহকাম কার্যকরীভাবে চলে।

যেমন আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন,

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين

""দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।"

(শরহুস সিয়ারীল কাবীর: পরিচ্ছেদ-১২৭, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬)

'জামিউর-রুমুজ' এ 'আল-কাফি' এর বরাত দিয়ে এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে,

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين و كانوا فيه آمنين

""দারুল ইসলাম' ঐ ভূখণ্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"

(জামিউর-রুমুজ:খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৫৬)

যদিও মুসলমানদের হাতে থাকার ফল এই হওয়ার কথা ছিল যে, উক্ত রাষ্ট্রে সকল আইন ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলবে, কিন্তু মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যদি পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি নাও থাকে, তবুও যদি ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলামই বলা হবে।

জামিউর-রুমুজের উপরোক্ত বক্তব্যে যা বলা হয়েছে, "ঐ ভূখন্ডে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে" এ থেকে কারো কারো এই সন্দেহ হয়ে গেছে,

'এখানে হুকুম দ্বারা ইসলামী শরীয়তের সকল বিধান উদ্দেশ্য। কাজেই যদি মুসলমানদের আয়ত্বাধীন কোন রাষ্ট্রে শরীয়তের সকল বিধান জারি না থাকে তাহলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে না।'

কিন্তু এ কথা দুরস্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বলে প্রতীয়মান হওয়ার জন্য মূল বিষয় হচ্ছে তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকা এবং তাতে তাদের আহকাম জারি করার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা। এরপর যদি তারা তাদের গাফলতি এবং ত্রুটির কারণে সকল আহকাম জারি না করে তাহলে এটা তাদের জন্য মারাত্মক গুনাহ। শরীয়তের সকল আহকাম জারি করা তাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু তাদের এই আমার্জনীয় গাফলতির কারণে উক্ত রাষ্ট্র দারুল ইসলামের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে না।

উপরে তুমি দেখেছ আল্লামা সারাখসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন যে, তা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে। আর এ বিষয়টাকেই জামিউর-রুমুজের বক্তব্যে এভাবে বলা হয়েছে, "তাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে"। অর্থাৎ তার আইন কার্যকর হয়। ঐ আইন শরীয়তসম্মত কি'না তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি।

যেহেতু ঐ যামানায় 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সত্ত্বেও তার অধিবাসীরা তাতে ইসলামী আহকাম জারি করবে না' তা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল , ফলে ঐ যামনায় সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়নি যে, মুসলমানদের অধীনস্ত কোন রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ শরীয়ত জারি না থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হবে কি'না। বরং শুধু এতটুকু বলার উপর ক্ষ্যান্ত করা হয়েছে, "'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখণ্ড যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে এবং তাতে তাদেরই হুকুম চলে"।

কিন্তু পরবর্তী যামানায় মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে যখন এমন সূরত সামনে আসলো যে, 'কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের ক্ষমতাধীন কিন্তু তাতে ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ জারি নেই' তখন পরবর্তী যামানার ফুকাহাগণ তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন {যে, এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম}।

যেমন- আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلُّها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم و بعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، و لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها".

"এ থেকে বুঝে আসে যে, শামের 'তাইমুল্লাহ্' পাহাড় যাকে 'দারুয পাহাড়'ও বলা হয় এবং এর অন্তর্গত আরো কতক শহর সবগুলোই দারুল ইসলাম। কেননা সেগুলোর শাসক যদিও দারুয বা নাসারা এবং তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিচারকও রয়েছে যারা তাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে,

তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে কটূক্তি করে থাকে; কিন্তু তারা সকলেই আমাদের মুসলমান শাসকদের অধীনস্ত। দারুল ইসলাম চতুর্দিক থেকে তাদের এলাকাকে বেষ্টন করে রেখেছে। মুসলমান শাসকগণ যখনই চাইবেন তাদের উপর আমাদের আহকাম জারি করে দিতে পারবেন।"

('রদ্দুল মুহতার', কিতাবুল জিহাদ, 'বাবুল উশরি ওয়াল খারাজ' এর একটু আগে 'ইসতি'মানুল কাফের' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৬০, নতুন সংস্করণ।)

এ থেকে এ বিষয়টি আরোও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়ার জন্য মূল গুরুত্ব হলো তাতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ কব্জা ও ক্ষমতা আছে কিনা তা দেখা। যদি পরিপূর্ণ ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে ঐ রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হবে এবং তার উপর দারুল ইসলামেরই আহকাম জারি হবে। যদিও মুসলমান শাসকদের গাফলতির কারণে তাতে পরিপূর্ণরূপে শরীয়ত জারি হতে না পারে। [ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৪-৩২৭]" এ পর্যন্ত তাকী উসমানী দা.বা. এর কথা শেষ।

সামনে গিয়ে বর্তমান মুসলিম নামধারী মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর দখলে থাকা কুফরী আইন দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম দাবি করে তিনি বলেন-

"যেহেতু এ সব রাষ্ট্রের প্রত্যেকটার ক্ষমতা মুসলমানদেরই হাতে, এ কারণে এদের প্রত্যেকটার উপর দারুল ইসলামের সংজ্ঞা প্রযোজ্য।" [ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩৩১]

তাঁর এ দুই বক্তব্যে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, বর্তমান মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠী যদিও কুফরী আইন দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করছে তবুও তারা মুসলমান। তাদের ক্ষমতাধীন রাষ্ট্রগুলো 'দারুল ইসলাম' তথা ইসলামী রাষ্ট্র। শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০) এবং আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা অস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (মৃত্যুঃ ১২৫২ হি.) এর বক্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে যে তাঁর এ দাবির কোনই সমর্থন পাওয়া যায় না, বরং তা দলীল-প্রমাণ বিহীন একটা মনগড়া দাবি সাব্যস্ত হয়, ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে কেরামের প্রত্যেকটা বক্তব্য পর্যালোচনা করে তা প্রমাণ করা হবে।

সাথে সাথে তাঁদের এ বক্তব্যগুলোর প্রকৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র কী হবে তাও স্পষ্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যের পর্যালোচনার পূর্বে কয়েকটা বিষয় আত্মস্থ করে নেয়া চাই।

১. রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র মুসলানদের হাতে থাকা অসম্ভবঃ

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. অত্যন্ত জোর দিয়ে যে বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছেন তা হলো- কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় এবং সাংবিধানিকভাবে কুফরী বিধান জারি থাকলেও এবং মুসলমান জনসাধারণ ইসলামী শাসন জারি করতে না পারলেও রাষ্ট্র মুসলমানদের হাতে থাকা সম্ভব।

কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। কেননা কোন রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না কুফরী রাষ্ট্র এবং তা মুসলমানদের হাতে না কাফেরদের হাতে তা বুঝা যাবে তাতে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না এবং তা মুসলমানদের হাতে থাকতে পারে না।

কেননা কোন মুসলমান শাসক রাষ্ট্রীয়ভাবে কুফরী আইন জারি করে দিলে সে আর মুসলমান থাকে না। মুরতাদ হয়ে যায়। তাকে হটিয়ে ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসক নির্বাচন করা ওয়াজিব। যদি উক্ত মুরতাদ শাসক রাষ্ট্রে কুফরী বিধান জারি করে দেয় এবং মুসলমানরা তাকে হটিয়ে ইসলামী শাসন জারি করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্র আর দারুল ইসলাম থাকে না, দারুল কুফর হয়ে যায়। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অতএব, বিধান কুফরী হওয়াটা রাষ্ট্র কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন। যেমন শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০ হি.) বলেন,

فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب. وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوى فيه للمسلمين .

"প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড যেখানে শিরকী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা মুশরিকদের হাতে। কাজেই তা দারুল হরব। আর প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড যেখানে ইসলামী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে।" (আল-মাবসূতঃ ১০/১১৪)

আল্লামা কাসানী রহ.(মৃত্যুঃ ৫৮৭ হি.) বলেন,

أَنَّ قَوْلَنَا دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ إِضَافَةُ دَارٍ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَى الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا تُضَافُ الدَّارُ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ إِلَى الْكُفْرِ لِظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ فِيهَا... فَإِذَا ظَهَرَ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ.

"আমরা যে বলি, 'দারুল ইসলাম' 'দারুল কুফর' এর অর্থ রাষ্ট্রকে ইসলাম ও কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা। রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামের দিকে বা কুফরের দিকে সম্বন্ধিত করা হবে যখন তাতে ইসলাম বা কুফর বিজয়ী থাকবে। কাজেই যখন কোন রাষ্ট্রে কুফরী বিধান বিজয়ী হয়ে যাবে, তখন তা দারুল কুফর হয়ে যাবে।" (বাদাইউস সানায়ে': ৬/১১২)

যেহেতু বিধান কুফরী হওয়াটা রাষ্ট্র কাফেরদের হাতে থাকার নিদর্শন এ কারণে অনেক ইমাম দারুল কুফরের সংজ্ঞায় শুধু এতটুকু বলেছেন, "দারুল কুফর ঐ রাষ্ট্র যাতে কুফরী বিধান চলে।"

কাজী আবূ ইয়ালা হাম্বলী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হি.) বলেন,

كل دار كانت الغبلة فيها لأحكام الكفر فهي دار الكفر.

"প্রত্যেক ঐ রাষ্ট্র যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী তা দারুল কুফর।"

(আল-মু'তামাদ ফিল উসূলঃ ২৭৬)

পৃথিবীর অনেক বিষয় এমন আছে যা কল্পনায় আসা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব। যেমন, সূর্য উঠবে কিন্তু দিন হবে না, কিংবা রাত হবে কিন্তু সূর্য ডুববে না- এটা কল্পনায় সম্ভব হলেও বাস্তবে সম্ভব নয়।

তদ্রুপ রাষ্ট্রীয় আইন কুফরী হবে কিন্তু রাষ্ট্র হবে ইসলামী- এটা কল্পনা করা সম্ভব হলেও বাস্তবে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় বিধান কুফরী হলে রাষ্ট্র অবশ্যই দারুল কুফর এবং তা কাফেরদের হাতে। চাই আসলী কাফের হোক, বা মুরতাদ কাফের হোক।

২. ইসলামী আইন চালু না থাকা আর কুফরী আইন চালু থাকা এক নয়ঃ

একটি বিষয় খুব ভালভাবে খেয়াল রাখা চাই যে, ইসলামী শাসন পরিপূর্ণ জারি না থাকা আর কুফরী শাসন জারি থাকা এক নয়। বরং এ দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টো বিষয়। দ্বিতীয়টি কুফর, কিন্তু প্রথমটি সর্বাবস্থায় কুফর নয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি ইসলামী শরীয়তের উপর হওয়ার পর এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের সকল আইন ইসলামী হওয়ার পর যদি শাসকের গাফলতির কারণে

, কিংবা শাসক জালেম বা ফাসেক হওয়ার কারণে রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলামী পরিবেশ বজায় না থাকে; বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থী ফায়সালা দিয়ে ফেলে- তাহলে শাসক বা বিচারক কেউই কাফের হয়ে যায় না, যদি না তাদের মাঝে অন্য কোন কুফরী পাওয়া যায়।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই যদি কুফরী হয়, আল্লাহ তাআলার শরীয়ত অনুযায়ী বিচার না করে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা হয়- তাহলে কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী এসব শাসক কাফের ও মুরতাদ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, নামায-রোযা ও অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত।

যেমন, নামায না পড়া, আর গাইরুল্লার জন্য নামায পড়া এক নয়। নামায না পড়া সর্বাবস্থায় কুফর নয়। বেনামাযী সর্বাবস্থায় কাফের নয়। কিন্তু গাইরুল্লার জন্য নামায পড়া সর্বাবস্থায় কুফর এবং এ ধরণের ব্যক্তি সর্বাবস্থায় কাফের। যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে।

কিন্তু অনেকে এ দুটো বিষয়কে এক করে ফেলেন। ফলে নিজেও মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হয়, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে।

৩. খেলাফত যামানা আর বর্তমান যামানা এক নয়ঃ

ইসলামী খেলাফত যত দিন কায়েম ছিল ততদিন শাসন ব্যবস্থা ইসলামী ছিল। তবে কোনো কোনো শাসক কমবেশ জুলম করতেন। বিচারকরা কখনোও কখনোও শরীয়ত পরিপন্থি ফায়সালা দিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা কুফর নয়। আইম্মায়ে কেরাম জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ তো করেছেন, কিন্তু তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেননি।

পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাই কুফরী। সেখানে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত অনুযায়ী বিচার না করে, মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে বিচার করা হয়। আর কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরা কাফের ও মুরতাদ। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, নামায-রোযাসহ অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করে।

কিন্তু অনেকে এ দুই যামানাকে এক করে ফেলেন। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে খেলাফত যামানার শাসকদের মতো জালেম মুসলমান মনে করেন। ফলে নিজেও মারাত্মক বিভ্রান্তির শিকার হয়, অন্যকেও বিভ্রান্ত করে।

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এবং বাংলাদেশের তাঁর ছাত্র সম্প্রদায় ও ভাবশিষ্যগণ (বা বড় বড় মুফতীগণ) এই ধরণের বিভ্রান্তিতেই পড়েছেন।

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহের পর্যালোচনাঃ

সারগর্ভ পর্যালোচনাঃ

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (মৃত্যুঃ ৪৯০হি.) এর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন।

কাজেই তাঁর বক্তব্যঃ " 'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে" দ্বারা এ কথা কীভাবে বোঝা যাবে যে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! কুফরী আইন তো তাঁর যামানায় ছিলই না। বরং তাঁর যামানায় যেহেতু পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 'মুসলমানদের হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে।

অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফরী আইন দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না।

আল্লামা কুহুসতানী রহ. (মৃত্যুঃ ৯৫০ হি.) এর বক্তব্যঃ " 'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখণ্ড যাতে মুসলমানদের ইমাম (রাষ্ট্র প্রধান) এর হুকুম চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে।"

এখানে 'ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম' একটা পরিভাষা। আর পরিভাষার একটা সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। সম্ভাব্য সকল অর্থই উদ্দেশ্য হয় না।

যেমন, 'সালাত' একটা পরিভাষা। যা একটা নির্দিষ্ট ইবাদাত বোঝায়। সালাতের আভিধানিক অর্থ দোয়া। কিন্তু পরিভাষায় সকল দোয়াকেই সালাত বলে না। তদ্রুপ এখানে 'ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম' দ্বারা সকল হুকুম উদ্দেশ্য নয়। জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম, ঈমানী-কুফরী সব ধরণের হুকুম উদ্দেশ্য নয়।

বরং এখানে 'ইমামুল মুসলিমীনের হুকুম' দ্বারা ইসলামী শরীয়ত উদ্দেশ্য। কেননা ইমাম নিযুক্ত করাই হয় ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য; শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের জন্য নয়। যে ইমাম শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করে সে আর ইমাম হওয়ার যোগ্য থাকে না। তাকে সরিয়ে ফেলা উম্মতের উপর ওয়াজিব।

তদ্রুপ তাঁর বক্তব্যঃ ‘মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে’ এর দ্বারা হুদুদ কিসাসসহ দ্বীনের যাবতীয় হুকুম পালন সহ নিরাপত্তা উদ্দেশ্য। যে নিরাপত্তা লাভের জন্য দ্বীন বিসর্জন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই তা উদ্দেশ্য নয়।

অতএব, তাঁর বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ালঃ

“ ‘দারুল ইসলাম’ ঐ ভূখণ্ড যাতে ইসলামী আহকাম চলে এবং মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে তাদের দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করতে পারে।” যে রাষ্ট্রে ইসলামী আহকাম চলে না বরং কুফরী বিধান চলে এবং যেখানে হদ, কেসাস, জিহাদসহ দ্বীনের অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়, সেসব রাষ্ট্রকে এই বক্তব্যে ‘দারুল ইসলাম’ বা ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়নি।

আল্লামা শামী রহ. এর বক্তব্যের সার কথা-

ইসলামী রাষ্ট্রের একটা অংশে (যেমন, একটা বিভাগ, বা প্রদেশে) যিম্মি কাফেররা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তারা সেখানে কুফুরী করে বেড়াচ্ছে। নিজেদের ধর্মমতে বিচার ফায়সালা করছে। এমতাবস্থায় মুসলমান শাসকদের উচিৎ ছিল তাদেরকে দমন করা। শিথিলতা প্রদর্শন না করে কঠরোতা প্রদর্শন করা। কিন্তু তারা সামর্থ্য থাকা সত্তেও তাদেরকে দমন করেননি। এই দমন না করা তাদের অপরাধ।

এ থেকে বোঝা যায়, কোন ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের শিথিলতার কারণে যদি রাষ্ট্রের কোনো এক অংশে অন্যায় অপরাধ এমনকি কুফরীও চলতে থাকে তথাপি তা দারুল ইসলামরূপে বহাল থাকবে। দারুল কুফরে রূপান্তিত হবে না। কেননা সেখানে মুসলিমদের কর্তৃত্ব বহাল আছে এবং মুসলিম শাসক চাইলেই চলমান কুফুরী দমন করতে পারেন। আর সেখানকার রাষ্ট্রীয় সংবিধানও কুরআন-সুন্নাহ। কিন্তু এ থেকে কিছুতেই এ কথা বোঝা যায় না, যেসব রাষ্ট্রের শাসকরা আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত শরীয়ত বিরোধী কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে এবং সেগুলোর উপর এমন ক্ষমতাবান কোনো ইসলামী রাষ্ট্রও নেই যে রাষ্ট্রটি চাইলেই সেখানে ইসলামী আইন জারী করতে পারে সেগুলোও ‘দারুল ইসলাম’ তথা ‘ইসলামী রাষ্ট্র’। নাউযুবিল্লাহ।

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার পর এবার ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা করা হল,

তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের একটা অংশ উল্লেখ করেছেন। পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করেননি। ইমাম সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটি নিম্নরূপ-

باب : ما يقطع من الخشب ، وما يصاب من الملح وغيره
وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون ، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس.
لأن الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب ، فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين ، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون.
فإن قيل : كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان ، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه.
قلنا : نعم ، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب ، فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه . وهذا ؛ لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره ، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو فوقه ، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب . فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر ، وهو الغنيمة بعينه .اهـ
বক্তব্যের তরজমায় যাওয়ার পূর্বে ইমাম সারাখসী রহ. কোন প্রেক্ষিতে কথাটি বলেছেন তা জেনে নেয়া যাক।

ইমাম সারাখসী রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণঃ

সারাখসী রহ. গনীমতের আলোচনায় কথাটি বলেছেন। মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল দারুল হরব থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যে মাল নিয়ে আসে তাকে গনীমত বলে। গনীমতের বিধান হচ্ছে- তার খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) বাইতুল মালে জমা দিতে হবে। কোন মাল গনীমত হওয়ার জন্য তা দারুল হরব থেকে লাভ করা শর্ত। দারুল হরব থেকে লব্ধ না হলে তা গনীমত হবে না।এখন প্রশ্ন হলো, দারুল হরব বলতে কী বুঝায় ?

যেসব রাষ্ট্র সরাসরি কাফেরদের দখলে আছে সেগুলো তো দারুল হরব হওয়া স্পষ্ট। তদ্রুপ যে সব রাষ্ট্র সরাসরি মুসলমানদের হাতে আছে, মুসলমানরা সেখানে নিরাপত্তার সাথে ইসলামী শরীয়ত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগতভাবে পালন করতে পারছে, কাফেররা সেখানে মুসলমানদের থেকে আমান (নিরাপত্তা) নেয়া ব্যতীত বসবাস করতে পারে না, সেগুলো দারুল ইসলাম হওয়াও স্পষ্ট। কিন্তু যেসব ভূখণ্ড মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই সেগুলোর কী বিধান ? সেগুলো কি দারুল ইসলাম না দারুল হরব ? না কি এ দুটোর কোনটিই নয়; বরং তৃতীয় নতুন আরেকটি প্রকার ?

যদি এসব ভূখণ্ড দারুল হরব হয় তাহলে সেখান থেকে লব্ধ মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে। আর যদি দারুল হরব না হয়, তাহলে তা থেকে লব্ধ মাল গনীমত ধরা হবে না এবং তা থেকে গনীমতের খুমুসও নেয়া হবে না।

সারাখসী রহ. বলেন, এসব ভূখণ্ড দারুল হরব। কাজেই সেখান থেকে লব্ধ মাল গনীমত বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে খুমুসও নেয়া হবে। এখন এখানে আপত্তি হতে পারে, এসব ভূখণ্ড তো কাফেরদের দখলে নেই, যেমন তা মুসলমানদের দখলেও নেই। মুসলমানরা যেমন সেখানে নিরাপদ নয়, কাফেররাও তো সেখানে নিরাপদ নয়। কাফেরদের দখলে যেহেতু নেই কাজেই তা দারুল হরব হয় কীভাবে ?

সারাখসী রহ. জওয়াব দেন, এসব ভূখণ্ড কাফেরদের দখলে না থাকলেও তা দারুল হরব। কেননা, দারুল হরব হওয়ার জন্য কাফেরদের হাতে থাকা জরুরী নয়। মুসলমানদের হাতে না থাকলেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদের দখলে থাকুক বা না থাকুক। কেননা এসব ভূখণ্ড এক সময় কাফেরদের হাতে ছিল। তখন সেগুলো দারুল কুফর ছিল। মুসলমানদের হাতে না আসলে সেগুলো তার পুরাতন হুকুম দারুল কুফর হিসেবেই বহাল থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবী হয়ে আসলেন তখন সারা দুনিয়া কাফেরদের হাতে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের দ্বারা মানব জাতি ঈমানদার ও কাফের এ দুই দলে ভাগ হয়ে পড়ে। তিনি আল্লাহ তাআলার আদেশে মুমিনদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। মদীনা দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম দারুল ইসলাম। আর বাকি সারা দুনিয়া দারুল কুফর হিসেবেই রয়ে যায়।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী যামানার মুসলমানগণ তরবারী হাতে বিশ্বের সকল প্রান্তে ছুটে যান। তাঁরা যেসব এলাকা বিজয় করে সেখানে ইসলামী শাসন কায়েম করতে পেরেছেন সেগুলো দারুল ইসলাম হয়েছে। আর যেগুলোতে ইসলামী শাসন কায়েম করতে পারেননি সেগুলো আগের মতো দারুল কুফরই রয়ে গেছে। সেগুলো বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাকলেও যেমন দারুল হরব, কাফেরদের হাতে না থাকলেও আগে থেকে দারুল হরব ছিল সে হিসেবে এখনো তা দারুল হরব।

মোট কথা- ইসলামী শরীয়তের শাসনাধীন নয় এমন সকল ভূখণ্ডই দারুল হরব। চাই তা বর্তমানে কাফেরদের হাতে থাক বা না থাক।

অর্থাৎ ঐ তৃতীয় প্রকার ভূখণ্ড যা মুসলমানদের হাতেও নেই, কাফেরদের হাতেও নেই সেগুলোও যে দারুল হরব একথা বুঝানোর জন্যই তিনি বলেছেন,

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين

"'দারুল ইসলাম' ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের কব্জায় রয়েছে।"

অর্থাৎ দারুল ইসলাম হতে গেলে মুসলমানদের দখলে আসা আবশ্যক। যা মুসলমানদের দখলে নেই তা দারুল হরব। চাই তা কাফেরদর হাতে থাকুক বা না থাকুক।

যখন সাব্যস্ত হলো, যে জায়গা থেকে কাঠ আনা হয়েছে তা দারুল হরব, কাজেই উক্ত কাঠ গনীমত বিবেচিত হবে এবং তা থেকে খুমুস নেয়া হবে।

এবার উপরে উল্লেখিত সারাখসী রহ. এর পূর্ণ বক্তব্যটির প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহলেই বিষয়টি বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা উল্লেখিত বক্তব্যের তরজমা তুলে ধরছি:

"[পরিচ্ছেদঃ যে কাঠ কাটা হয় এবং লবণ বা অন্য যা কিছু লাভ হয় (তার বিধান)

ইমামের অনুমতিক্রমে কোন সারিয়্যা (দল) গাছ কাটতে বের হয়ে যদি এমন স্থানে পৌঁছে যেখানে মুসলমানরা ভয়ে থাকতে হয়, তারপর সেখান থেকে কাট কেটে নিয়ে আসে তাহলে তা গনীমত। তা থেকে (বাইতুল মালের জন্য) খুমুস (এক পঞ্চমাংম) নেয়া হবে।]

{কেননা যেখানে মুসলমানরা নিরাপদ নয় তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত। কারণ দারুল ইসলাম হচ্ছে ঐ ভূখন্ডের নাম যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর তার (অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে থাকার) আলামত হচ্ছে- সেখানে মুসলমানরা নিরাপদ।

যদি বলা হয় - ঐ ভূখন্ডে মুসলমানরা যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি দারুল হরবের অধিবাসীরাও সেখানে নিরাপদ নয় (তাহলে তা দারুল হরব হয় কীভাবে?)।

(উত্তরে) বলবো হ্যাঁ, (কথা ঠিক যে, দারুল হরবের অধিবাসীরা সেখানে নিরাপদ নয়।) কিন্তু (এর পরও তা দারুল হরবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা,) এসব ভূখণ্ড এক সময় হরবী কাফেরদের হাতে ছিল। কাজেই হরবীদের কর্তৃত্ব সর্ব দিক থেকে নি:শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলাম হবে না। এর কারণ, যা এক সময় বিদ্যমান ছিল, তার কোন নিদর্শন বাকি থাকলেও তা বিদ্যমান

রয়েছে বলেই ধরা হবে। তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু তার স্থান দখল না করে নেয়ার আগ পর্যন্ত তা দূরীভূত হবে না।

অতএব, যখন তা হরবী কাফেরদের ভূখণ্ড প্রমাণিত হলো, তখন তাতে যে কাঠ রয়েছে তা হরবীদের দখলে রয়েছে। অতএব, ইহা (অর্থাৎ কেটে আনা কাঠ) এমন মাল যা মুসলমানরা দারুল হরবের অধিবাসীদের থেকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ করেছে। আর এটাই তো গনীমত।}"

(শরহুস সিয়ারিল কাবীরঃ ৪/২৫২)

বি.দ্র. থার্ড ব্র্যাকেট [ ] যুক্ত অংশটুকু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর বক্তব্য। সেকেন্ড ব্র্যাকেট { } যুক্ত অংশটুকু ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যা। আর ফার্স্ট ব্র্যাকেট ( ) যুক্ত অংশটুকু বুঝানোর সুবিধার্থে আমরা যুক্ত করেছি।

এবার প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট আমাদের প্রশ্ন:

ইনসাফের সাথে বলুন, ইমাম সারাখসী রহ. কি এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন যে,

[যেসব রাষ্ট্র নামধারী মুসলমান শাসকদের দখলে আছে; যারা সেগুলোতে আল্লাহ তাআলার শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে মানব রচিত কুফরী আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে; মুসলমান জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে তাদের সর্বচেষ্টা ব্যয় করেও শাসকদের দিয়ে আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বাস্তবায়ন করাতে পারছে না; বরং যারা সহীহ তরীকায় শরীয়ত কায়েম করতে চাচ্ছে জঙ্গী, সন্ত্রাসী ইত্যাদী উপাধিতে ভূষিত করে তাদেরকে দমন করার জন্য সর্ব শক্তি ব্যয় করছে; তারা একা তাদেরকে দমন করতে না পেরে আন্তর্জাতিক কুফরী শক্তির সাথে জোট গঠন করেছে; নিজ দেশে ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য যেমন তারা তাদের যাবতীয় সামর্থ্য ব্যয় করছে, বিশ্বের যে কোন প্রান্তের সম্ভাব্য যে কোন ইসলামী শক্তিকে দমন করতেও তারা তেমনই তাদের সর্বসাধ্য ব্যয় করছে; মোট কথা কুফরকে টিকিয়ে রাখতে এবং ইসলামকে মিটিয়ে দিতে যা তাদের সামর্থ্যে আছে তাই তারা ব্যয় করছে’

আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি : ইমাম সারাখসী রহ. কি তাঁর এ বক্তব্যে এই ধরণের রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র বুঝাতে চাচ্ছেন ?!

কোন বিবেকবান ব্যক্তি দাবি করতে পারবে ইমাম সারাখসী রহ. এই ধরণের কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে চাচ্ছেন ??

তিনি তো শুধু তাঁর এ বক্তব্যে দারুল হরব সংক্রান্ত একটা আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন মাত্র। এসব কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলার কোন ইশারা ঈঙ্গিতও তো এতে নেই।

আর কীভাবেই বা তা সম্ভব অথচ তাঁর যামানায় কুফরী আইন দিয়ে কোনো ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। যেমনটা তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. নিজেও স্বীকার করেছেন। কাজেই তাঁর এ বক্তব্য থেকে কীভাবে বোঝা যাবে যে, কুফরী আইন দিয়ে পরিচালিত এসব রাষ্ট্র দারুল ইসলাম ?! তাঁর যামানায় তো ইসলামে রাষ্ট্রে কুফরী আইন ছিলই না।

বরং তাঁর যামানায় যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম ছিল কাজেই 'মুসলমানদের হাতে থাকা'র দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য, মুসলমানরা তাতে নিরাপত্তার সাথে শরীয়ত বাস্তবায়ন করতে পারে।

অতএব, তাঁর বক্তব্য থেকে যেসব রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ইসলাম কায়েম রয়েছে সেগুলো দারুল ইসলাম বোঝা যায়। কুফর শাসিত রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হওয়া তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় না।

বরং মাবসূতে তো তিনি পরিষ্কার বলেছেন, যে সব রাষ্ট্রে কুফরী বিধান জারি আছে সেগুলো দারুল হরব। তাঁর বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন-

فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار حرب .

"প্রত্যেক ঐ ভূখণ্ড যেখানে কুফরী বিধান বিজয়ী রয়েছে, তার ক্ষমতা কাফেরদের হাতে। কাজেই তা দারুল হরব।" (আল-মাবসূতঃ ১০/১১৪)

কাজেই সারাখসী রহ. এর বক্তব্য থেকে এসব কুফর শাসিত রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র দাবি করা তাঁর নামে অপবাদ দেয়ার নামান্তর। তাছাড়া দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের ক্ষেত্রে ইমামগণের স্পষ্ট বক্তব্য বাদ দিয়ে, অস্পষ্ট বক্তব্যকে সম্বল করে নতুন কোনো মতের অবতারণা ঘটানো কোনো ভাল কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

'দারুল আমানে'র ভ্রান্তি নিরসন

মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. এর মূল উর্দু কিতাব 'ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাত' পড়লে সেখানকার বক্তব্য থেকে মনে হয় যেন 'দারুল আমান' নামে আলাদা এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। দারুল আমান এবং দারুল হরব যেন একটি আরেকটির বিপরীত। অর্থাৎ

দারুল হরব দারুল আমান হতে পারে না, দারুল আমান দারুল হরব হতে পারে না।

মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. যদিও তা স্পষ্ট করে বলেননি তবে একজন সাধারণ পাঠক সেখান থেকে এমনটাই বুঝবেন। অর্থাৎ দারুল আমান নামে আলাদা এক প্রকার রাষ্ট্র আছে যা দারুল হরব থেকে ভিন্ন। দারুল আমান এবং দারুল হরব একটি আরেকটির বিপরীত। দারুল হরব দারুল আমান হতে পারে না, দারুল আমান দারুল হরব হতে পারে না।

যেহেতু এখানে ভুল বুঝাবুঝির প্রবল আশংকা রয়েছে কাজেই এ ব্যাপারটি খোলাসা করার প্রয়োজন রয়েছে।

কেননা কিছু জাহেল লোক রয়েছে যারা কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ছাড়াই দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকার সৃষ্টি করে সেটাকে দারুল হরবের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা দারুল আমান নামের সেসব কুফরী রাষ্ট্রে জিহাদ ও জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনা করাকে হারাম ফতোয়া দিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! আল্লাহ তাআলা এদের কবল থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন।

মূলত ইসলামী ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় দারুল আমান নামে কোন রাষ্ট্র নেই। রাষ্ট্র হয়তো দারুল ইসলাম হবে, নতুবা দারুল হরব হবে। মাঝামাঝি কোন প্রকার নেই।

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ - এখন পর্যন্ত যারা দারুল আমান নামে একটা আলাদা রাষ্ট্র আছে বলে দাবি করেছে তারা ফিকহের কোন কিতাবের রেফারেন্স দিতে পারেনি। স্বয়ং মুফতী তাকি উসমানী সাহেব দা.বা. ও ফিকহের কোন কিতাবের রেফারেন্স দিতে পারেননি। বরং শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.(জন্ম-৯৫৮হি., মৃত্যু-১০৫২হি.) এর একটা বক্তব্য উল্লেখ করেছেন মাত্র। তাও আবার ইসলামী ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কোন কিতাব থেকে নয়; দেহলবী রহ. এর লিখিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "আশি'য়াতুল লামাআত" থেকে নিয়েছেন।

শাহ সাহেব রহ. সেখানে দারুল আমান নামে তৃতীয় একটা নতুন প্রকার সৃষ্টি করে সেটাকে দারুল হরবের বিপরীতে দাঁড় করাননি। সামনে তা স্পষ্ট করবো ইনশাআল্লাহ!

কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস বাদ দিয়ে; সকল মাযহাবের সকল ফিকহের কিতাব বাদ দিয়ে এক হাজার বছর পরে আগত শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে

দেহলবী রহ. এর একটা অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য যে তাকি উসমানী দা.বা. কেন আনলেন তা আশা করি আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয়। অতএব, এটা যে একান্তই তাদের নিজস্ব আবিষ্কার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দারুল আমানের হাকীকত

প্রথমত ইসলামী ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় দারুল আমান নামে কোন রাষ্ট্র নেই।

দ্বিতীয়ত শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্য থেকে দারুল আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না। বরং তা দারুল হরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয়।

শাহ সাহেব রহ. হিজরতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

"ইসলামে দুই ধরণের হিজরত পাওয়া গেছে।

এক. দারুল খওফ থেকে দারুল আমানে প্রত্যাবর্তন।

যেমন, ইসলামের সূচনালগ্নে কতক সাহাবা (রা.) মক্কার মুশরেকদের অনিষ্ট ও ফাসাদ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য হাবশায় হিজরত করেন।

কিংবা যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করার এবং সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কতক সাহাবা (রা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন।

দুই. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন। আর তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা লাভের পর হয়েছে।"

(আশি'য়াতুল লামাআতঃ ১/৩৫, 'ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত' হাদীসের আলোচন। ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ ৩২৯ থেকে সংগৃহীত)

দেহলবী রহ. এর বক্তব্যের পর্যালোচনাঃ

১. তাঁর এ বক্তব্যটি ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কিতাবে নেই। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইসলামী বিধান ফিকহ তথা আইন শাস্ত্রের কিতাব থেকে নিতে হয়। ফিকহের কিতাবে না থাকলে (আর এমনটা খুব কমই হয়ে থাকে) তখন অন্য কোন কিতাবে যাওয়া যায়।

আমরা দেখি , ফিকহের কিতাবে এ মাসআলার সুস্পষ্ট আলোচনা আছে। সেখানে দারুল ইসলাম, দারুল কুফর বা দারুল হরব ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকার পাওয়া যায় না।

২. এ বক্তব্য রাষ্ট্রের প্রকারভেদের আলোচনায় আনা হয়নি। হিজরতের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। অথচ ইসলামী বিধান যেখানে তার সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে নিতে হয়। প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে নেয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা না থাকলে তখন প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে নেয়া যায়।

আমরা দেখি দারের আলোচনা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ফিকহের কিতাবে রয়েছে।

৩. শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.(জন্ম-৯৫৮হি., মৃত্যু-১০৫২হি.) এক হাজার বছর পরের মানুষ। অথচ ইসলামী বিধান আইম্মায়ে সালাফ তথা পূর্বসূরি ইমামগণ থেকে নিতে হয়। হ্যাঁ, যদি এমন কোন নতুন বিষয় হয় যা আইম্মায়ে সালাফ তথা পূর্বসূরি ইমামগণের যামানায় ছিল না, বরং পরে দেখা দিয়েছে- তাহলে তা পরবর্তী ইমামগণ থেকে নিতে হবে।

আমরা দেখি দার বিভক্তি নতুন কোন বিষয় নয়, বরং ইসলমের সূচনালগ্ন থেকেই ছিল। আইম্মায়ে সালাফ তার সুস্পষ্ট আলোচনাও করেছেন। কাজেই তাঁদেরকে বাদ দিয়ে এক হাজার বছর পরের কারো কথা ধর্তব্য নয়।

৪. সবকিছু যদি বাদও দেই তবুও শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্য থেকে দারুল আমান দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার দাঁড়ায় না। বরং তা দারুল হরবেরই একটা প্রকার সাব্যস্ত হয়।

কেননা দারুল হরবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. ঐ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা নেই। একে দারুল খওফ বা দারুল ফিতনা বলা যায়। উল্লেখ্য যে, খওফ অর্থ - ভীতি উদাহরণত, তখনকার মক্কা।

দুই. ঐ দারুল হরব যেখানে মুসলমানদের নিরাপত্তা রয়েছে এবং তা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িত নয়। একে দারুল আমান বলা যায়।

যেমন, তখনকার হাবশা।

আর যদি শাহ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর বক্তব্যে দারুল আমান দ্বারা এমন একটা রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নেয়া হয় যা দারুল ইসলামও নয়, আবার দারুল হরবও নয়- তাহলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখিত দারুল খওফ দ্বারাও এমন

একটা রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নিতে হবে যা দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়, দারুল আমানও নয়।

তাহলে রাষ্ট্র মোট চার প্রকার হবে-

১. দারুল ইসলাম
২. দারুল হরব
৩. দারুল খওফ
৪. দারুল আমান

আর রাষ্ট্রকে এমন চার ভাগে ভাগ করা আইম্মায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐক্যমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

মোটকথা- দারুল হরব দারুল হরবই। যতদিন না তা ইসলামী হুকুমতের অধীনে আসে। চাই তাকে অবস্থার প্রেক্ষিতে দারুল খওফ বা দারুল ফিতনা নাম দেয়া হোক, কিংবা দারুল আমান নাম দেয়া হোক।

সুহাইল উসমানী রহ. এর বক্তব্যঃ

কেউ কেউ বলে থাকেন সুহাইল উসমানী রহ. রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে হিন্দুস্তান দারুল আমান হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন আদায় করেছেন।

সুহাইল উসমানী রহ. রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে হিন্দুস্তান দারুল আমান হওয়ার যে সমর্থন নিয়েছেন বলা হচ্ছে তা থেকে 'দারুল আমান' দারুল ইসলাম ও দারুল হরব থেকে ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকার বুঝা যায় না। বরং দারুল হরবের একটা প্রকারই বুঝে আসে।

কেননা সেখানে বলা হয়েছে-

"(মদীনায়) হিজরতের পূর্বে হাবশা দারুল হরব হওয়া সত্ত্বেও যেমন দারুল আমান ছিল, এখন (ইংরেজদের দখলে থাকা) হিন্দুস্তানও তেমনি (দারুল হরব হওয়া সত্ত্বেও) দারুল আমান।" (ইসলাম আওর সিয়াসী নজরিয়্যাতঃ৩৩০)

এ বক্তব্যে হিন্দুস্তানকে দারুল হরব বহাল রেখেই দারুল আমান বলা হয়েছে। দারুল আমানকে দারুল হরবের বিপরীত কোন প্রকার বলা হয়নি।

বি.দ্র. ঐ সময় ইংরেজ আমলে যেহেতু মুসলমানরা জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ও দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে নিরাপদ ছিল এ কারণে তাকে দারুল আমান বলা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারত যখন মালাউন হিন্দুদের হাতে আসে, তখন থেকে সেখানে মুসলমানদের দুঃখের কোন অন্ত

নেই। কত লাখ মুসলমান যে হিন্দুদের হাতে অমানবিক নির্যাতনের পর শহীদ হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এখন নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন শুধু বাড়ছে। কাজেই বর্তমানে কেউ ভারতকে দারুল আমান বললে সে নিঃসন্দেহে জাহেল। ভারতের হিন্দুরা এখন খালেছ হরবী। গরুর গোশত বহন করা এবং খাওয়ার অপরাধে যে ভারতে দিনে-দুপুরে মুসলিম যুবকদের নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, সেই ভারতকে কীভাবে দারুল আমান বলা যেতে পারে? তাই বর্তমান ভারত দারুল হরব হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

দারুল আমান বলার ফায়েদা কি?

উল্লেখ্য যে, দারুল হরব দারুল আমান হওয়ার ফল শুধু এতটুকু যে, হানাফী মাযহাব মতে উক্ত দারুল হরবে যেহেতু দ্বীন পালনের সুযোগ আছে এ কারণে তা থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসা ফরয নয়। তবে অন্যান্য ইমামগণ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তবে যদি দ্বীন পালনের সুযোগ না থাকে তাহলে তা আর দারুল আমান থাকে না। তখন সকলের মতেই তা থেকে হিজরত করে দ্বীন পালন করা যায় এমন কোনো স্থানে চলে যেতে হবে।

তদ্রুপ যদি জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায় (যেমন বর্তমানে ফরযে আইন) তাহলেও সেখানে বসে থেকে জিহাদ তরক করতে পারবে না। বরং অন্যান্য মুসলমানের মত তাকেও জিহাদে শরীক হতে হবে।

ঐ দারুল আমান যদি আসলী দারুল হরব হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক জিহাদ করে তাকে ইসলামী হুকুমতের অধীনে নিয়ে আসা ফরযে কেফায়া।

আর যদি এমন হয় , মুসলমানদের হাতে ছিল পরে কাফেররা বা মুরতাদরা তা দখল করে নিয়ে গেছে তাহলে তার বিরুদ্ধে দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ করে তাকে আযাদ করা ফরযে আইন। অতএব, দারুল আমান হওয়া না হওয়ার কারণে জিহাদের মাসআলাতে পরিবর্তন আসছে না।

উল্লেখ্য যে, কোন দারুল হরবের সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেন তাহলে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য মুসলমানদের যতদিন সময় লাগে ততদিন পর্যন্ত উক্ত চুক্তি পালনীয়। কিন্তু

এ সময়ের জন্য উক্ত দারুল হরব, দারুল হরব থেকে বের হয়ে ভিন্ন কোন প্রকার হয়ে যাবে না। দারুল হরবই থেকে যাবে।

ফরায়েযী সাহেবদের খণ্ডন

মুফতী লুৎফুর রহমান ফারায়েযী ইন্টারনেটের সম্প্রচার এবং তাবলীগী মেহনতের সাথে জড়িত থাকার সুবাদে বাংলাদেশের আলেম সমাজের একজন পরিচিত মুখ। তার কিছু ভক্ত বৃন্দ তৈরি হয়েছে। এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা তার কথাকেই শরীয়ত মনে করে। দারের মাসআলার ক্ষেত্রে তিনিও বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। তিনি মূলত তাকী উসমানী দা.বা. এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাই উম্মাহর কল্যাণকামিতার আশায় তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ফারায়েযী সাহেব বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোকেও দারুল আমান বলে প্রচার করছেন। কামূসুল ফিকহের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি নিজের মত করে দারুল আমানের যে সংজ্ঞা পেশ করেছেন তা নিম্নরূপঃ

"যে সকল রাষ্ট্রে মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম। চাই তারা সংখ্যাগরিষ্ট হোক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু ইসলামের শাস্তির বিধান প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও স্বীয় ধর্ম পালনে স্বাধীন। কোন ধর্ম পালনেই রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন বিধি-নিষেধ নেই। তবে ইসলামী আইন উ৩ রাষ্ট্রে প্রচলিত নয়। আইন চলে মানবরচিত আইন বা কুফরী আইন। তাহলে উক্ত রাষ্ট্রের নাম হবে দারুল আমান। যেমন রাসূল সা. এর যুগে ছিল ডখ্রষ্টান বাদশা নাজ্জাশীর দেশ আবিসিনিয়া।

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই দারুল আমান। এমনকি আমেরিকা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও। কারণ সেখানে সকল ধর্মাবলম্বীরাই স্বীয় ধর্ম পালনে ও প্রচারে স্বাধীন। রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। যদিও সরকারী আইন ইসলামী নয়। এ হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রই দারুল আমানের অন্তর্ভুক্ত"। (সূত্রঃ তালীমুল ইসলাম উনিস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টারের মুখপত্র, আহলে হক বাংলা মিডিয়া সার্ভিস, প্রকাশ কাল, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং)

বিদগ্ধ মুফতী সাহেব!! খেয়াল করে দেখুন, সংজ্ঞায় বলা শর্তগুলো আপনার বর্ণিত দারুল আমানে বাস্তবায়িত হয় কিনা?

ক. মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম।

হ্যাঁ, আমরা অনেকগুলো ইবাদত স্বাভাবিকভাবে করতে পারি বটে কিন্তু আমরা শরীয়াতে বর্ণিত সকল ইবাদত পালন করতে পারি না। তাই, এদেশে মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম না।

আপনি কি এ সকল মুরতাদ সরকারকে জানিয়ে শুধু একাকী আফগানিস্তানে জিহাদে শরীক হবার জন্য যেতে পারবেন? এই সরকারগুলো কি আপনাকে যেতে দিবে? এই জিহাদে শরীক হওয়া কি ইবাদতের মধ্যে সামিল নয়? এটা কি ধর্ম পালনের মধ্যে পড়ে না? নাজ্জাসীর রাজ্য থেকে তো সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) চাইলে গিয়ে রাসূল (সাঃ) ও কাফিরদের মধ্যে সংগঠিত জিহাদে শরীক হতে পারতেন। সেখানে এই ইবাদতে বাঁধা ছিল বলে মনে হয় না।

আপনি কি আপনার বয়ানে ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর (যেগুলোকে আপনার কাছে শরীয়াতসম্মত মনে হয়) আলোচনা করতে পারবেন? আপনি কি সাধারণ জনগণকে ও আপনার ছাত্রদেরকে ঐসব ময়দানে ক্বিতালের শরীক হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন? মুমিনদেরকে ক্বিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করা কি একটা ইবাদত নয়? এটা কি ধর্ম পালন নয়?

আপনি কি এদেশে শরীয়াত কায়েমের জন্য আহবান জানাতে পারবেন? এই কুফরী সংবিধানকে কুফরী উল্লেখ করে এর থেকে সাধারণ জনগণকে দূরে সরে যেতে বলতে পারবেন? মানুষকে এই হক্বের দাওয়াত দেয়া কি ইবাদতের মধ্যে সামিল নয়? এটা কি ধর্মের একটা অংশ নয়?

নাকি আপনার মতে, দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ নয়? যদি দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাই বলছেন যে, একমাত্র ইসরাইল রাষ্ট্র ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোথাও আল্লাহর শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করা জায়েজ নেই!!

সুবহানাল্লাহ, যদি কেউ এই ফতোয়া দেন, তাহলে শয়তান হয়তো খুশী হয়ে তাকে গুরু মেনে নিবে! শয়তানের জন্য এত বড় খেদমত হয়তো দুনিয়ার আর কেউ করতে পারবে না!

খ. 'তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন'।

আপনার ফতওয়া মতে যেসব রাষ্ট্র দারুল আমান আমাদের জানা ও দেখা মতে সেসব রাষ্ট্রে মুসলিমগণ পরিপূর্ণ দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন নয়। ঈমান ও ইসলামের ভিত্তি যে তাওহীদের উপর সেই তাওহীদ এবং তাগুত বর্জনের বিষয়গুলো প্রচারের ক্ষেত্রেই স্বাধীন নয়। আর অন্যান্য বিষয়গুলো বলার তো অপেক্ষাই রাখে না। আসলে আপনারা সাহাবায়ে কেরামের মত বিজয়ী মন-মানসিকতা নিয়ে দ্বীনকে বুঝতে চান না। বরং পরাজিত মানসিকতার শিকার হয়ে দ্বীনকে বুঝেছেন এবং সেভাবেই দ্বীনের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। তাই দ্বীনের শীর্ষ চূড়া জিহাদের বিষয়টা আপনাদের কাছে দ্বীনের মধ্যে এবং দ্বীন পালনের মধ্যে গণ্য হয় না। জিহাদ ছাড়াই আপনারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের কথা ভাবতে পারেন। ধর্ম পালনের কথা ভাবতে পারেন। কিন্তু কুরআন-হাদীস, ইজমা কিয়াস আমাদেরকে জিহাদ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের কথা ভাবতে দেয় না। তাই যে রাষ্ট্রে থেকে তাওহীদে আমলী, তাগুত বর্জন, জিহাদের প্রশিক্ষণ, জিহাদের তাহরীয ও জিহাদের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, আপনার কথা অনুযায়ীও সেসব রাষ্ট্রকে আমরা দারুল আমান মনে করতে পারি না। কারণ সেখানে মুসলিমরা স্বীয় ধর্ম পালনে, তাওহীদের বাণী প্রচারে স্বাধীন নয়।

হ্যাঁ, দ্বীনের কিছু কিছু বিধান প্রচার ও পালনে স্বাধীন। এমন সব বিধান পালনে স্বাধীন যেগুলো এই কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে যায় না; যেগুলো এই কুফরী শাসন ব্যবস্থা নিজের জন্য ঝুকিপূর্ণ মনে করে না। তাছাড়া দ্বীনী অনেক বিধানের প্রচার ও পালনই এই মুরতাদ সরকার সহ্য করতে পারে না। এটাই বাস্তবতা।

গ. কোনো ধর্ম পালনেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো বিধি-নিষেধ নেই।

আপনি যেসব রাষ্ট্রকে দারুল আমান বলে আখ্যায়িত করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন হুকুম আহকাম পালনে বিধি-নিষেধ রয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ, ইউরোপ-আমেরিকার প্রত্যেক দেশেই ইসলামী দণ্ডবিধি পালনে বিধি-নিষেধ রয়েছে। কোনো দেশে পর্দার হুকুম পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোথাও মীরাসের হুকুম পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোথাও ফতওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোথাও সুদের সাথে জড়িত হওয়া ছাড়া কারবার করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। কোথাও ১৮ বছরের কমের মুসলিম যুবক-যুবতীদের বিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এসব নিষেধাজ্ঞা কি ইসলাম পালনে নিষেধাজ্ঞা নয়? নাকি আপনার মতে এগুলো ইসলাম পালনের মধ্যে গণ্য হয় না?

এত গেল আপনার লেখা দারুল আমানের সংজ্ঞার পর্যালোনা। এখন আপনি যে কামূসুল ফিকহের রেফারেন্সে দারুল আমানের সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন সেখানে আসলে কী আছে সেটাও দেখা উচিত।

কামুসুল ফিক্বহ-৩/৩৯৯-তে উল্লেখ আছেঃ

"দারুল আমান ঐ এলাকা, যেখানে মূল ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) কাফিরদের (গাইরে মুসলিম) হাতে থাকে, কিন্তু মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। মুসলিমরা দ্বীনি দাওয়াতের ফরজিয়াত আদায় করতে পারে, আর এমন সব ইসলামী আহকাম পালন করতে পারে যেগুলো পালন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দরকার হয় না"।

দারুল আমানের এই সংজ্ঞা যদিও সালাফুসস সালেহীনের মধ্য থেকে কারো থেকে বর্ণিত হয়নি, তথাপি এই সংজ্ঞা হিসাবে **তাদের মতানুযায়ী** বাংলাদেশ-পাকিস্তান দারুল আমান হয় না। কারণ সংজ্ঞায় যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি হল:

ক. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা কাফিরদের (গাইরে মুসলিম) হাতে থাকা।

আচ্ছা ফারায়েযী সাহেব! আপনি তো বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে অমুসলিম বা মুরতাদ মনে করেন না। কারণ, মনে করার মত কোনো কথা বা কাজ আমরা আপনার থেকে দেখি না। আর আপনি এটা স্বীকারও করেন না। তাহলে দারুল আমানের প্রথম শর্তই তো এখানে পাওয়া যায় না। তাসত্ত্বেও (আপনাদের মতানুযায়ী) কীভাবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দারুল আমান হতে পারে?

খ. দ্বিতীয় শর্তে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিমরা নিরাপদ থাকা।

আপনার কী মনে হয় বাংলাদেশ-পাকিস্তানসহ যেসব দেশকে আপনি দারুল আমান মনে করেন সেখানে এমন সব মুসলিম, যারা শত ভাগ দ্বীন পালন করতে চায়, তারা নিরাপদ আছে? অবশ্য আপনার মনে করা আর না করা বাস্তবতাকে পাল্টে দিবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল এটাই যে, এসব দেশে শতভাগ দ্বীন পালনকারী মুসলিমগণ নিরাপদ নয়। এসব দেশের অবস্থাতো এতই খারাপ যে, মুসলিগণ গুটি কয়েক শরীয়তের আইনের দাবি জানানোর অপরাধে রাতের অন্ধকারে তাদের উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো হয়। বেধড়ক পিটিয়ে, গুলি চালিয়ে শত শত মুসলিমকে হত্যা করা, হাজার হাজার মুসলিমকে আহত করা, অসংখ্য মুসলিমকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হয়। আমাদের প্রাণের স্পন্দন রাসূল সা. এর ইজ্জতের উপর আঘাতকারী হিন্দু মালাউনদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়, আর তার বিচার দাবীকারী

মুসলিমদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করা হয়। ঈমানী গায়রতের তাড়নায় শাতেমে রাসূলদের উচিত পাওনা যারা বুঝিয়ে দিল, তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়। এই তো হল, এসব দেশের মুসলিমদের নিরাপত্তার বাস্তব চিত্র। এত সুন্দর নিরাপত্তা (?) সত্ত্বেও কি আপনি এসব দেশকে দারুল আমান বলবেন?

শুধু ফিকহী উত্তম-অনুত্তম বিষয়ে মাঠ গরম করে সস্তা বাহবা পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে এই ভূমি কি দারুল আমান নাকি দারুল কুফর তার হাকীকত বুঝতে হলে জিহাদ ও কুফুরী সংবিধানের বর্জনের বিষয়ে কথা বলে দেখুন। কিতালের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের কথা বলে দেখুন। তখন প্রাক্টিকালি বুঝে আসবে এদেশ দারুল হরব নাকি দারুল আমান!

উম্মতের নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ উলামা-ফুকাহা রহ. এর কিতাব অধ্যয়নের পর, আমরা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের যে পরিচয় পাই তা দ্বারা বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের অধীন রাষ্ট্রগুলো নিশ্চিতভাবে দারুল হারব প্রমাণিত হয়। তাই আমরা এটাই গ্রহণ করি ও বিশ্বাস করি। শরয়ী কোন সিদ্ধান্ত নিজ প্রবৃত্তি থেকে আমদানি না করে শরীয়তের মাসদার থেকে আহরণ করি। আমাদের আহরণে যদি কোন ভুল হয়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের কাছে ক্ষমা চাই। প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে পানাহ চাই। কোন ভাই! যদি শরয়ী দলীল দ্বারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ আমরা প্রশস্ত হৃদয়ে তা গ্রহণ করব। কারণ আমরা কোন ব্যক্তি-মতের পুজারী নই, বরং শরীয়তের অনুসারী। আমরা ইনশাআল্লাহ হৃদয় থেকে ঐ ভাইয়ের জন্য দুয়া করব। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন। (দাওয়াহ ইল্লাহ থেকে সংগৃহিত, পরিমার্জিত)।

শরীয়তের মানদণ্ডে জাতিসংঘ

২০১৭ ইং অক্টবর মাসের পাক্ষিক, মাসিক ও দ্বিমাসিক ইসলামী পত্রিকাগুলো আরাকানী মজলুম ভাই-বোনদের নিয়ে মাশাআল্লাহ যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছে এবং তাদের নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছে। এটা বেশ প্রশংসার বিষয়। মুসলিম উম্মাহর একটা অঙ্গ হিসাবে আমাদের তাদের ব্যাথায় ব্যথিত হওয়া, বক্তৃতা ও লিখনিতে তাদের দূরাবস্থা তুলে ধরে উম্মাহর সকল সদস্যকে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে বলা আমাদের দায়িত্বের মধ্যেও বর্তায়। আলহামদুলিল্লাহ দায়িত্বের এ দিকটা আমাদের উলামাগণ ভালভাবেই আদায় করেছেন বলে জ্ঞান করি। এত এত লিখনি সত্ত্বেও যে বিষয়টা আমাকে পীড়া

দিয়েছে, তাহল রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে তাদের দেওয়া মতামত। এক্ষেত্রে লেখকগণ চলমান সংকটের কুরআনী সমাধান সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। লেখকদের প্রত্যেকেই চলমান সংকট নিরসনের জন্য জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং জাতিসংঘ উদ্যোগ নিলেই এই সংকট নিরসন সম্ভব বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেমন যেন জাতিসংঘ তাদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জাতিসংঘ কী? কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? এসব বিষয় জানা উচিত এবং এর উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হওয়া, তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো, তাদের কাছে বিচায়-ফায়সালা চাওয়া ইত্যাদির হুকুমও আলোচনার দাবি রাখে।

জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য:

জাতিসংঘ বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন, সংস্থাটি ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়|

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত বিশ্ব নেতারা যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য লিগ অব নেশন্স গঠন করেন। সংঘর্ষ ও উত্তেজনা রোধে সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা এবং সৃষ্ট মানবতার বিপর্যয় বিশ্ব নেতাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। ফলে একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা তারা আবশ্যক মনে করে। এরই ফল স্বরূপ ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টবর এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘ শব্দটির প্রবর্তক হলেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট। জাতিসংঘ একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এর ব্যাপক কর্মপ্রক্রিয়া মূলত রাজনীতির বৃত্তেই প্রস্ফুটিত। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা এবং ১নং অনুচ্ছেদে সংস্থাটির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে এভাবে- ১. বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ২. পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ৩. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী নিরসনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং জাতিসংঘকে

রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, সচিবালয়, ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল এবং আন্তর্জাতিক আদালত এ ছয়টি প্রধান সংস্থা এবং বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত।

এখানে জাতিসংঘের মৌলিক কিছু উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হল। এবার আসুন আমরা এই উদ্দেশ্যগুলোকে কুরআনী মীযানে রেখে যাঁচপরতাল করি। এরপর নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেই যে, জাতিসংঘের সদস্য হওয়া, জাতিসংঘের সাথে একমত পোষণ করা, তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করা, তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করা, তাদের রুল অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম আন্‌জাম দেয়া কুফরে আকবার নাকি কুফরে আসগার? কবীরা গুনাহ নাকি এমন কুফুরী কাজ যা মানুষকে মুরতাদ বানিয়ে দেয়?

১. এক নং উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য এই সংঘের প্রতিষ্ঠা।

পৃথিবীতে ইসলামের আগমনও একই উদ্দেশ্যে। ইসলামও পৃথিবীময় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে চায়। পৃথিবীময় কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, কীভাবে নিরাপত্তা বহাল থাকবে, তার যাবতীয় দিকনির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখ আছে। আর জাতিসংঘও নিজেদের কুফর আচ্ছাদিত জেহেন খাটিয়ে সংবিধান তৈরি করেছে। তারা তাদের কুফুরী সংবিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করতে চায়; পৃথিবীর নিরাপত্তা বহাল রাখতে চায়। এখন মুসলিম হিসাবে আমাদের করণীয় কী?

কুরআনের পরিভাষায় 'শান্তি' দ্বারা ইসলাম উদ্দেশ্য। ইরশাদ হচ্ছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে শান্তিতে (ইসলামে) প্রবেশ কর, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (আল-বাকারা:২০৮)

এখানে আল্লাহ তাআলা একদিকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে দাখেল হতে বলেছেন, অপর দিকে শয়তানের পদাংক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'পথ দুইটি হয়তো পূর্ণ ইসলাম কিংবা কুফর, হয়তো পূর্ণ ইসলাম নয় তো গোমরাহী, হয়তো আল্লাহর পথ গ্রহণ করতে হবে নয়তো শয়তানের পথ। হয়তো ইসলাম নয়তো

জাহেলিয়্যাহ। এই স্পষ্ট বচন দ্বারা মুসলিমের নিজের পথ নির্ধারণ করে নেয়া উচিত, বিভিন্ন পথ ও মতের সামনে অসহায়ভাবে চক্কর না খাওয়া উচিত। মুমিন ব্যক্তির জন্য একাধিক অপশন নেই। তার মানহাজ ও চলার পথ একটাই, তাহল আল্লাহর শরীয়ার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমার্পণ। ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণে তৈরি নতুন কোনো পথ গ্রহণের সুযোগ মুসলিমের নেই। যে কেউ পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামে দাখেল হবে না, নিজেকে আল্লাহর শরীয়তের কাছে পরিপূর্ণরূপে সঁপে দিবে না, খালেস ইসলাম ব্যতীত অন্য সব চেতনা থেকে মুক্ত হবে না, সে মূলত শয়তানের পথে আছে। শয়তান তাকে নিয়ে খেলছে। (জিলালুল কুরআন, সূরা বাকারা:২০৮)

জাতিসংঘ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য জিহাদকে বড় হুমকি মনে করে। তাই তারা ছলে বলে কৌশলে বিভিন্নভাবে মুসলিমদেরকে জিহাদ বিমুখ করার প্রাণান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা অনেকাংশে সফলও হয়ে গেছে। এখন কোনো মুসলিম রাষ্ট্রই রাষ্ট্রীয়ভাবে জিহাদের কথা বলে না। জিহাদের চিন্তাও করে না, এমনকি জিহাদের সঠিক ধারণাও তারা কেউ রাখে না। 'শান্তি কায়েম ও সন্ত্রাস দমন' শিরোনামে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তারা সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীকে জিহাদ মুক্ত করাই তাদের শান্তি কায়েমের মূল কথা। অতএব, কোনো মুসলিম বা মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ যদি জাতিসংঘ নামের এই জিহাদ নির্মূল সংঘের সদস্য হয়, তাদের উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যাবে। তারা নিশ্চিতভাবে মুরতাদে পরিণত হবে।

তাছাড়া সৃষ্ট বিভিন্ন সংকট নিরসনে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করাও কাফের হওয়ার আরেকটা কারণ। কারণ যারা জেনে, বুঝে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে গাইরুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। ইরশাদ হচ্ছে,

"أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا " (النساء ٦٠)

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও। তারা বিরোধীয় বিষয়কে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না

করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।' (নিসা:৬০)

এই আয়াত ব্যাখ্যাসহ ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আয়াতটির ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী সকল মুফাস্সিরগণ এ কথা উল্লেখ্য করেছেন যে, কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে দিয়ে তাগুত তথা গাইরুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করা কুফরে আকবার, তথা এমন কুফর যার কারণে ইসলাম / ইমান ভেঙ্গে যায় এবং মানুষ কাফের-মুরতাদে পরিণত হয়। তাই জাতিসংঘের কাছে বিচারপ্রার্থনা করাও একটা কুফরী কাজ। যারা জেনে-বুঝে, সেচ্ছায়, সাগ্রহে তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করবে তারা কাফের হয়ে যাবে।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে বলা হয়েছে, পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

শুনতে কথাটি ভালই শুনায়। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখলে দোষ কোথায়? আপনি যদি মডারেট ইসলামের চশমা পরিধান করেন তাহলে এর মধ্যে দোষের কিছুই পাবেন না। কিন্তু যদি আপনি বাস্তবেই মুসলিম হয়ে থাকেন, আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণই আপনার ব্রত হয়ে থাকে, তাহলে এই কথাটির মধ্যে ঈমান ধ্বংসকারী অনেকগুলো কারণ আপনি খুঁজে পাবেন। আসুন আপনাকে কারণগুলো ব্যাখ্যা করছি।

মুসলিমের ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা মহান আল্লাহ তাআলার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী হতে বাধ্য। মুসলিম নিজের ইচ্ছেমত যাকে খুশি তাকে বন্ধু বানাতে পারে না, আর যার সাথে খুশি তার সাথে শত্রুতাও পোষণ করতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহয় বার বার কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্টরূপে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সেও কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা তো একে অপরের বন্ধু, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সেও তাদের একজন হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।' (আল-মায়েদা:৫১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (২২)

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" (আল-মুজাদালা:২২)

ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করলে ঈমান ভেঙ্গে যাবে, যদিও সেই কাফের নিকটাত্মীয় হোকনা কেন।'

উপরের আয়াত দু'টি দ্বারা বুঝাগেল কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। অতএব, কোনো কাফের রাষ্ট্রের সাথেও বন্ধুত্ব করা যাবে না। যদি পৃথিবীর সমস্ত কাফের রাষ্ট্রের সাথে মুসলিমদের বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় আরেকটা ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাহল, জিহাদ বাতিল হয়ে যাবে। ইকদামী বা আক্রমণাত্ম জিহাদ যা ইসলামের অকাট্য ফরযের একটি তার ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পার্শ্ববর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আর তারা যেন তোমাদের ভিতর রূঢ়তা দেখতে পায় (বন্ধুত্ব নয়), আর জেনে রাখ, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (আততাওবা:১২৩)

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টরূপে পার্শ্ববর্তী কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে বলেছেন এবং তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেছেন। পার্শ্ববর্তী কাফের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার জন্য কুফর ব্যতীত অন্যকোনো দোষেরও প্রয়োজন নেই। তারা কাফের।

আল্লাহর বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর দেওয়া দ্বীনকে গ্রহণ করে না, শুধু এই কারণেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম মানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।' (তাওবা:২৯)

এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দ্বারাও একথা প্রমাণিত হল যে, যে কেউ জাতিসংঘের এই উদ্দেশ্যকে মেনে নিয়ে তাদের সদস্যপদ গ্রহণ করবে সে দুইটি কারণে কাফের হয়ে যাবে: ১. সমস্ত কাফের দেশের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে ২. পরোক্ষভাবে জিহাদে ইকদামীকে রহিত করার কারণে।

তৃতীয় উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী নিরসনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সুবিচার ও সম্মান প্রদর্শন করা **এবং জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।**

এ উদ্দেশ্যটির মধ্যে একাধারে কয়েকটি ভয়ানক বিষয় একত্রিত হয়েছে। মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুসলিম, কাফের, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য একই ধরণের অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা (যদিও তারা অধিকারের প্রশ্নে মুসলিমদেরকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না)। তারা মুসলিম-কাফের, নারী-পুরুষ সকলকে একই প্লাটফর্মে দাঁড় করাতে চায়। সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের, কাফের ও মুসলিমের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। এখন দেখার বিষয় হল, ইসলামে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি, কুরআন-সুন্নাহকে আদর্শরূপে গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি কাফের-মুসলিম এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী হতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?

কাফের সম্প্রদায় কি মুসলিমদের সমান অধিকার পেতে পারে?

যারা কাফের তথা ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাসী না, আল্লাহ তাআলার আইনে তারা কখনোই মুসলিমদের সমান অধিকার ও সমান মান-মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য

নয়। বরং আল্লাহ তাআলার ভাষায় কাফের সম্প্রদায় চতুষ্পদ প্রাণীর চেয়েও নীচ। ইসলামকে অস্বীকারকারী কাফের সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত এক প্রাণী। এদেরকে আল্লাহ তাআলা মানুষের কাতারের মধ্যে গণ্য করেন না। আর ইসলামে বিশ্বাসী মুমিন সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলার অন্যন্ত প্রিয়পাত্র। তাদের আপ্যায়নের জন্য আল্লাহ তাআলা চির সুখময় স্থান জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। আর কাফেরদের জন্য রেখেছেন চির অশান্তির জায়গা জাহান্নাম। কেনইবা এমনটি হবে না। আল্লাহতে বিশ্বাসী, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী মুমিন সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা ভালবাসবেন, তাদেরকে কাছে টানবেন। আর কাফেরদের দূরে তাড়িয়ে দিবেন এটাই স্বাভাবিক।

এক ব্যক্তি দুইটি দাস ক্রয় করেছে। একটি দাস তার সমস্ত কথা মানে। সে যা করতে বলে তা করে, যা করতে নিষেধ করে তা করে না। সব সময় সে স্বীয় মনীবের মনতুষ্টির দিকে বিশেষ খেয়াল রাখে। কোনো ক্রমেই মনীবের অবাধ্য হয় না। যদি কখনো অবাধ্যতা করে বসে তৎক্ষণাত ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে উক্ত অপরাধ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। অপর দাসটি মনীবের দেওয়া খাবার খায়, মনীবের দেওয়া কাপড় পরিধান করে, তার দেওয়া ঘরে থাকে, অসুস্থ হলে মনীব তাকে চিকিৎসা করায়। কিন্তু সে মনীবের চরম অবাধ্য। মনীব তার জন্য এত কিছু করে কিন্তু সে মনীবের কৃতজ্ঞতায় বিশ্বাসী না, মনীব যা করতে বলে তা সে করে না, মনীব যা করতে নিষেধ করে তা সে গুরুত্বের সাথে করে। সে অহংকারের সাথে অপরাধ করে। মনীবের কোনো তোয়াক্কা করে না। মনীবকে অসন্তুষ্ট করাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার আপনিই বলুন এই দুইটি দাস কি সমান হতে পারে? মনীবের কাছে উভয়ের মান-মর্যাদা ও অধিকার কি সমান হওয়া যৌক্তিক? কখনোই নয়। অথচ উভয় দাসই মানব জাতির অংশ। উভয়ে দেখতে একই রকম। উভয়ের হাত-পা, চোখ, কান, নাক একই কায়দার। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনীবের বিবেচনায় তাদের একজন মানুষ আর অপরজন অমানুষ; চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট।

তাহলে বুঝাগেল, অধিকার ও মান-মর্যাদার ভিত্তি ঈমান ও ইসলাম(বিশ্বাস ও মান্যতা) এর উপর হওয়া উচিত। মানব বংশের সন্তান হওয়াটা সমঅধিকার প্রাপ্তির ভিত্তি হতে পারে না। তাই মুসলিম-কাফের নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়ার কথা বলা ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ তাআলা পূর্ব যুগের ফকীহদের উপর রহমত নাযিল করুন। তারা মুসলিম ও কাফেরের মধ্যকার দুনিয়ার অধিকারের দিক থেকে পার্থক্যগুলো সুন্দরভাবে তুলে

ধরেছেন। যে কাফের দারুল ইসলামের নাগরিক হয়ে থাকতে চায়, সে কী কী অধিকার পাবে আর শুধু কাফের হওয়ার অপরাধে কী কী অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে তা তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সবিস্তার লিখে গেছেন। তাই কাফের-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকারের ক্ষেত্রে একমত পোষণ করত জাতিসংঘের সদস্য হওয়া স্পষ্ট কুফুরী কাজ।

নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী হওয়া

এরপর রইল নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রশ্ন। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কে তার ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীর অধিকার পুরুষকে দেয় না, আর পুরুষের অধিকারও নারীকে দেয় না। নারীকে যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ থেকে ব্যতিক্রম করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে নারীর অধিকারগুলোকেও পুরুষ থেকে ব্যতিক্রম করে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই নারী-পুরুষের অধিকারের ভিন্নতায় বিশ্বাসী না হয়ে সমঅধিকারের প্রবক্তা হওয়া, সমঅধিকারকে সমর্থন করা কুরআন-সুন্নাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। অতএব, যারা এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাথে একমত পোষণ করে তাদের সদস্যপদ গ্রহণ করবে তারাও কাফের হয়ে যাবে।

জাতিসংঘও তাগুত

তৃতীয় ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহের একটি হল, জাতিসংঘকে রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। অর্থাৎ জাতিসংঘই হবে সমস্ত রাষ্ট্রের আদর্শ। জাতিসংঘের আদর্শের বাইরে কাউকে যেতে না দেওয়া। জাতিসংঘের সংবিধানকে সকলকে মানতে বাধ্য করা।

এই উদ্দেশ্যের কারণে জাতিসংঘ তাগুতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর তাগুতকে বর্জন করা ব্যতীত যেহেতু ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হয় না এবং এমন ঈমান অর্জন হয় না যার দ্বারা আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, তাই জাতিসংঘ নামক তাগুতকে বর্জন না করলে কেউ ঈমানদারই হতে পারবে না। অতএব, জাতিসংঘ নামক এই তাগুতকে বর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদেরকে ধ্বংসের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা মুমিনদের জন্য জরুরী।

উল্লেখ্য, নবীজী সা. মদীনায় আসার পর পার্শ্ববর্তী কাফেরদের সাথে যে শান্তি চুক্তি করেছিলেন সেই চুক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে অনেকে জাতিসংঘে প্রবেশকে

হালাল করতে চায়। তাদেরকে বলছি, জাতিসংঘ যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মদীনার সেই চুক্তির কী একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া মৌলিকভাবে দুই চুক্তির মধ্যে যে বিষয়টা পার্থক্য গড়ে দেয় তাহল, মদীনার ঐ চুক্তির আহ্বায়ক ছিলেন স্বয়ং নবীজী সা.এবং ইসলামী সংবিধান অনুসারে ঐ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেখানে অনৈসলামিক কিছুই ছিল না। আর জাতিসংঘের পুরো সংবিধানই ইসলাম সাংঘর্ষিক বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ।এর আহ্বায়ক, প্রতিষ্ঠাতা, কর্মপন্থা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিচালক এবং পরিচালনা ক্ষমতা, ভেটো প্রদান ক্ষমতা সবই কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে। তাই আশাকরি কোনো জ্ঞানপাপি মদীনা চুক্তির বরাত দিয়ে জাতিসংঘকে হালাল করার চেষ্টা করবেন না।

এমনিভাবে হিলফুল ফুযুলের বরাত দিয়েও জাতিসংঘের পক্ষে কথা না বলার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, হিলফুল ফুযুল নিছক একটি সামাজিক সংগঠন। রাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও বিশ্বনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সেটি গঠিত হয়নি। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের কিতাব দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হিলফুল ফুযুলের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল শুধু একটি, তাহল: জালেম থেকে মাজলুমের হক উদ্ধার করে দেওয়া। তাই নিছক একটি সামাজিক সংঘের উপর কিয়াস করে জাতিসংঘের মত বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী কুফুরী সংঘকে হালাল করার চেষ্টা ইলমী খিয়ানত বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ সমঝ দান করেন। জাতিসংঘের আসলরূপ বোঝার তাওফীক দিন। জাতিসংঘ আরাকানী মুসলিমদের সমস্যা সমাধান করবে এমন অলীক কল্পনা না করে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিন।

আরাকানীদের সমস্যার কুরআনী সমাধান

আরাকানী মুসলিমদের চলমান সংকট নিরসের ক্ষেত্রে এসে উলামায়ে কেরাম কুরআনী যে সমাধানটি এড়িয়ে গেছেন তাহল সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াত। ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا .

‘তোমাদের কী হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না, অথচ দুর্বল নারী-পুরুষ ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ

থেকে উদ্ধার করুন যার অধিবাসীরা অত্যাচারী (রক্তখেকো), আর আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বন্ধু ও সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন।' (নিসা:৭৫)

প্রিয় পাঠক! আরাকানী মুসলিমদের সংকটের স্থায়ী সমাধানের জন্য শরীয়তের আলোকে আমাদের কী করণীয় আশা করি এই আয়াত দ্বারা তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন। যুদ্ধই সমাধান। যুদ্ধই শান্তি। অস্ত্রধারী খুনিকে হত্যা করাই 'শান্তি'। মগগুলোকে কচুকাটা করাই হল, কুরআনী সামাধান। এই সমাধানের পথে যতদিন আমরা অগ্রসর না হব, ততদিন বাস্তবে আরাকানী মুসলিম ভাইদের সমস্যার সমাধান হবে না। হয়তো কেউ বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবি সেজে সম্ভব্য নানান সমাধান পেশ করতে পারে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাই সব ভীতি ও দুর্বলতাকে ছুড়ে ফেলে আসুন আরাকানী ভাইদের সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনী সমাধানের পথে অগ্রসর হই। জিহাদের মাধ্যমে মিয়ানমারকে তার পাওনা বুঝিয়ে দেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বাংলাদেশী মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে আইন

জিজ্ঞাসা: বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে আরাকানের মুসলিমদের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয় কিনা? যদি ফরযে আইন হয়ে থাকে, তাহলে এই ফরয আদায়ের উপায় কি? অনেকে বলে থাকেন, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও যদি একজন সর্বসম্মত আমীর না পাওয়া যায়, তাহলে কার্যক্ষেত্রে জিহাদ বাস্তবায়ন করা ফরয নয়। আবার অনেকে বলে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদের ফরযিয়্যাত আদায় করা যাবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, জিহাদ ফরয হয়েছে বটে, তবে এই ফরয আদায়ের দায়িত্ব সরকারের উপর; মুসলিম জনগণের উপর নয়। এসব কথার বাস্তবতা কতটুকু? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

জবাব: আরাকানী মুসলিমদের উপর যখন সেখানকার কাফেররা হামলা করেছে, তখন সর্ব প্রথম তাদের উপরই জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। কিন্তু তারা যেহেতু শত্রুর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, তাই পার্শ্ববর্তী দেশ হিসাবে আমাদের বাংলাদেশের সকল ওযর মুক্ত মুসলিমের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমগণও যদি ভীতি কিংবা অলসতা বশত এই ফরয আদায় না করে, তাহলে পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব পাশ্ববর্তী অন্য

মুসলিমদের উপর অর্পিত হবে এবং এই ধারাবাহিকতায় এক সময় সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। অবশ্য সারা বিশ্বের মুসলিমেদের উপর অনেক পূর্ব থেকেই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে রয়েছে। কারণ, ১৪৯২ ইং সালে দারুল ইসলাম স্পেন খ্রিষ্টানদের হাতে চলে যাওয়া, ১৯৪৭ সালে নরকের কীট গো-মূত্রপায়ী হিন্দুত্ববাদী ভারত কর্তৃক ভূসর্গ খ্যাত কাশ্মীর আক্রান্ত হওয়া, ১৯৬৭ সালে অভিশপ্ত ইহুদী কর্তৃক ফিলিস্তীন আক্রান্ত হওয়া, ২০০১ সালে দাম্ভিক আমেরিকা কর্তৃক ইরাক ও আফগানের মুসলিমগণ আক্রান্ত হওয়াসহ নানাবিধ কারণে শতাধিক বছর পূর্ব থেকেই সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ঐ রকম ফরয হয়েছে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরযে আইন।

প্রমাণ:

দলীল নং ১:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমাদের উপর কিতালকে ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন আর তোমরা জান না।” (সূরা বাকারা: ২১৬)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكُفُّوا شرّ الأعداء عن حَوْزة الإسلام.

وقال الزهري: الجهادُ واجب على كلّ أحد، غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إذَا استعين أن يَعينَ، وإذا استُغيثَ أن يُغيثَ، وإذا استُنْفرَ أن ينفر، وإن لم يُحتَجْ إليه قعد.

قلت: ولهذا ثَبَت في الصحيح "من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية" . وقال عليه السلام يوم الفتح: "لا هجرة، ولكن جهاد ونيَّة، إذا استنفرتم فانفروا" .

‘এই আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিমদের উপর জিহাদকে আবশ্যক করেছে। যাতে তারা ইসলামী ভূখণ্ড থেকে শত্রুদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করে। জুহরী (রহ.) বলেছেন :“সকলের উপরই জিহাদ ওয়াজীব চাই সে জিহাদ করুক অথবা না করুক। তার কাছে যদি সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা

করা হয় তাহলে সাহায্য সহযোগিতা করা, আর যদি বের হতে বলা হয় তাহলে বের হয়ে যাওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়। আর যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে বিরত থাকবে।" আমি বলি, এ কারণেই সহীহ হাদিসে এসেছে,"যে মৃত্যুবরণ করল অথচ জিহাদ করল না অথবা কোন যুদ্ধের ইচ্ছাও পোষণ করল না সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন,"হিজরত নেই তবে জিহাদ ও নিয়াত অবশিষ্ট আছে। যখন তোমাদেরকে বের হতে বলা হবে তোমরা বের হয়ে পড়বে।"

দলীল নং ২:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"আর তোমাদের কী হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না। অথচ দুর্বল পরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আর নির্ধারণ করে দিন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"(সূরা নিসা:৭৫)

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সা'দী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها،

فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)

'এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। তার রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য উদ্বেলিত করছে। কেননা সশস্ত্র যুদ্ধ

তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে। সাথে সাথে তাদেরকে জিহাদ তরকের ব্যাপারে চরম ভৎর্সনা করছে। তিনি বলছেন: **“আর তোমাদের কী হল! তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না।”** অথচ অসহায় দুর্বল নারী, পুরুষ, শিশুরা পাচ্ছে না কোন অবলম্বন বা কোন পথ। সাথে সাথে তাদেরকে শত্রুদের থেকে ভোগ করতে হচ্ছে চরম অত্যাচার। তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করছে, তিনি যাতে তাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যান যার অধিবাসীর হর্তা-কর্তারা শিরক ও কুফর করে নিজেদের প্রতি জুলম করেছে। শাস্তি দিয়ে, আল্লাহর রাস্তা থেকে বাঁধা দিয়ে মুমিনদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। দ্বীনের দাওয়াত ও হিজরত থেকে তাদেরকে বাঁধা দিচ্ছে। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি জানাচ্ছে, তিনি যেন তাদের জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী প্রেরণ করেন। যে তাদেরকে এই অত্যাচারী শাসকের অধ্যুষিত স্থান থেকে রক্ষা করবে।

সুতরাং এটিতো সে প্রকারের জিহাদ যাতে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে। এটি তো ঐ যুদ্ধ নয় যাতে নিজেদের পক্ষ থেকে কুফ্ফারদের উপর আক্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। যদিও এই প্রকারের জিহাদে রয়েছে মহাসফলতা, তার থেকে পশ্চাৎগামীদের উপর রয়েছে চরম ভৎর্সনা। কিন্তু যে জিহাদ দুর্বলদেরকে রক্ষা করতে হয়, তাতে রয়েছে সব চেয়ে বেশি প্রতিদান ও উপকারিতা কেননা এতে শত্রুকে প্রতিরোধ করতে হয়।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা নিসা:৭৫)

দলীল নং ৩ :

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (সূরা তাওবা:৩৯)

মুহাম্মাদ আলী সবূনী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ

[إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما] أى ان لا تخرجوا الى الجهاد مع رسول الله ، يعذبكم الله عذابا اليما موجعا ، باستيلاء العدو عليكم في الدنيا ، وبالنار المحرقة في الاخرة ، وقال ابن عباس : هو حبس المطر عنهم

....

[ويستبدل قوما غيركم] اي يهلككم ويستبدل قوما اخرين خيرا منكم ، يكونون اسرع استجابة لرسوله واطوع

[ولا تضروه شيئا] اي ولا تضرون الله شيئا بتثاقلكم عن الجهاد ، فانه سبحانه غني عن العالمين

"যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন"অর্থাৎ তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জিহাদে বের না হও আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দিয়ে, আর পরকালে জ্বলন্ত আগুন দিয়ে। ইবনে আব্বাস (রাযি.)বলেন, শাস্তিটি হল তোমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন।

"এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে আনয়ন করবেন"অর্থাৎ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তোমাদের চেয়ে শ্রে'অপর এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। যারা রাসূলের আহ্বানে ক্ষিপ্রতার সাথে সাড়া দেবে এবং তার আনুগত্য করবে।

"আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না"অর্থাৎ জিহাদে অবহেলা প্রদর্শন করে তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ তাআলা জগতসমূহ থেকে অমুখাপেক্ষি।

হানাফী মুফতীগণের ফতওয়া

১.আল্লামা জাস্‌সাস (রহ.) এর ফতওয়া :

ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لاخلاف فيه بين الأمة إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين و سبي ذراريهم (أحكام القرآن : ৪ /৩১২).

"মুসলিমদের প্রসিদ্ধ আকীদা হল, যখন সীমান্তবর্তী মুসলিমরা শত্রুর আশংকা করবে, আর তাদের মাঝে শত্রু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিদ্যমান না থাকে, তারা নিজ পরিবার-পরিজন দেশ ও জানের ব্যাপারে শংকাগ্রস্থ হবে, এমতাবস্থায়

পুরো উম্মাহর প্রত্যেক সক্ষম সদস্যের উপর শত্রুদের ক্ষতি থেকে মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে জিহাদে বের হওয়া ফরয হয়ে যায়। এ ব্যাপারে উম্মাহর মাঝে কোন দ্বিমত নেই। কেননা তাদেরকে সাহায্য না করে বসে থাকা বৈধ এটা কোন মুসলিমের কথা হতে পারে না, বিশেষ করে যখন নাকি শত্রুরা মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করছে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করছে।" (আহকামুল কুরআন:৪/৩১২)

২.আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ-শামী (রহ.) এর ফতওয়া :

وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلواولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج-- حاشية ابن عابدين (٢٣٨/٣)

"যদি শত্রুরা মুসলিমদের কোন সীমানায় আক্রমণ চালায়, তাহলে তার নিকটবর্তী যুদ্ধে সক্ষম সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর ফরজে কেফায়া। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে তারা যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়, অথবা অপারগ না হয় কিন্তু অলসতাবশত জিহাদ ত্যাগ করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর নামায ও রোযার ন্যায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, যা ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। এভাবে ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।" (ফতওয়ায়ে শামী:৩/২৩৮)

৩.আল্লামা আবূ বাক্‌র আল-কাসানী (রহ.) এর ফতওয়া :

فاما إذا عم النفير بان هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا قيل نزلت في النفير وقوله سبحانه وتعالى ماكان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللهولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

"শত্রু কোন দেশে আক্রমণের কারণে যখন ব্যাপকভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রয়োজন পড়বে, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। সক্ষম প্রতিটি মুসলিমের উপর এই ফরয বর্তাবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:**"তোমরা**

হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।"(সূরা তাওবা: ৪১) এই আয়াতটি যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :**"মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসূলের জীবন অপেক্ষা নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে।"** (সূরা তাওবা :১২০)

৪. আল্লামা ইবনু নুজাইম আল-মিসরী (রহ.) এর ফতওয়া :

وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده لان المقصود عند ذلك لا يحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل فرض عين فلا يظهر ملك اليمين ورق النكاح في حقه كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل ذلك لان بغيرهما مقنعا ولا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج. وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالاولى، وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما، كذا في الذخيرة. ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف، أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد لان فيه ارهابا.

"শত্রু পক্ষের আক্রমণের কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর, গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকেই বের হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মনিবের মালিকানা ও স্বামীর বৈবাহিক অধিকার প্রকাশ পাবে না। কেননা তখন, সকলেই রুখে না দাঁড়ালে উদ্দেশ্য অনর্জিত থেকে যাবে। তাই এক্ষেত্রে জিহাদ সকলের উপরই ফরজে আইন হয়ে যাবে, যেমনটি হয় নামায ও রোজার ক্ষেত্রে। এই হুকুমটি পূর্বের অবস্থার (ফরজে কেফায়ার) বিপরীত। কেননা তখন এরা না থাকলেও সমস্যা হয় না। তাই স্বামী ও মনিবের হক নষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। এর থেকে বুঝে আসে, পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত ছেলের বেরিয়ে পড়া আরো অধিক শ্রেয়। এমনিভাবে ঋণ গ্রহীতাও ফরজে আইনের ক্ষেত্রে ঋণ দাতার অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে পড়বে। যদি স্বামী ও মনিব বাঁধা দেয়, গুনাহ্গার হবে। যেমনটি "যাখীরা"(ফিকহে হানাফীর একটি প্রসিদ্ধ কিতাব) এর মধ্যে রয়েছে। তবে ফরজে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত প্রয়োজন, আর তা হল সক্ষমতা। অন্যথায় কঠিন রুগ্ন ব্যক্তিকেও বের হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু বের হতে সক্ষম প্রতিরোধ করতে নয়, তার জন্য উচিৎ হল সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে বের হয়ে পড়া। কেননা এর মধ্যেও রয়েছে শত্রুদের জন্য ত্রাস।'

তিনি আরো লিখেন :

المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا.

'এখানে উদ্দেশ্য হল কোন একটি নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ। তাহলেই সে দেশের সকল মানুষের উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয় তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিমরাও যথেষ্ট না হয় অথবা অলসতাবশত অল্লাহর নাফরমানী করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। ক্রমানুসারে পূর্ব পশ্চিমের সকল মুসলিমদের উপর এই ওয়াজীব ব্যাপকতা লাভ করবে।'

এমনকি তিনি এই পর্যন্ত বলেন :

امرأة مسلمة سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الاسر

"যদি প্রাচ্যে একজন মুসলিম মহিলাকে বন্দি করা হয়, তাহলে পাশ্চাত্যবাসীর উপর ওয়াজিব হবে তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা।" (আল বাহরুর রায়েক, কিতাবুল জিহাদ)

৫. আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) এর ফতওয়া :

فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الدَّفْعُ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَرِقُّ النِّكَاحِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ ؛ لِأَنَّ بِغَيْرِهِمَا مَقْنَعًا فَلَا ضَرُورَةَ إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ.

"যদি শত্রুরা কোন রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালায় তখন সকল মুসলিমের উপর প্রতিরোধ ফরয হয়ে যায়। স্ত্রী তার স্বামীর আর গোলাম তার মুনিবের অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে যাবে। কেননা জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে। আর গোলামের উপর মালিকানা, স্ত্রীর উপর (স্বামীর) বৈবাহিক অধিকার ফরজে আইন জিহাদের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। যেমন নামায ও রোজার ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় না।" (ফাতহুল কাদীর, জিহাদ অধ্যায়)

ফরযে আইন জিহাদ নামায, রোযা ও হজ্জের উপর প্রাধান্য পায়

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন সেটা নামায, রোযা, হজ্জ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ, এসব ইবাদাত ব্যক্তিগত উপকারের জন্য করা হয়, কিন্তু জিহাদের উপর পুরো উম্মাহর মান-

ইজ্জত ও সফলতা নির্ভর করে। জিহাদ ছাড়া আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয় না। তাছাড়া নবীজী সা. এর সীরাত থেকেও এ বিষয়টি বুঝে আসে। কেননা তিনি সা. খন্দকের যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় লাগাতার চার ওয়াক্ত ফরয নামায কাযা করে ছিলেন। মক্কা বিজয় অভিযানের সময় সাহাবাগণকে রাযি. ফরয রোযা ভাঙ্গার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। কারণ রোযার কারণে দুর্বল হওয়ার আশংকা ছিল। তাই এই আশংকাকে দূর করার জন্য রোযা ভাঙ্গার আদেশ দিলেন এবং যারা আদেশ অমান্য করেছিল, তাদেরকে 'উসাত' বা অবাধ্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাছাড়া সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন আমল সবচেয়ে উত্তম? নবীজী সা. বললেন, ঈমান আনয়ন করা। সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন আমল সর্বোত্তম? নবীজী সা. বললেন, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। আবারও প্রশ্ন করা হল, এরপর কোন আমল উত্তম? নবীজী বললেন, হজ্জে মাবরূর।' এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টত বুঝে আসে ফরযে আইন জিহাদ ফরযে আইন হজ্জের উপর প্রাধান্য পায়। অতএব, সামগ্রীকভাবে একথা প্রমাণিত হল যে, ফরযে আইন জিহাদ ফরযে আইন নামায, রোযা ও হজ্জ থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশি ফযীলতের আমল। আমাদের বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর অনেক পূর্ব থেকেই জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে। এখন আমাদেরকে এই ফরয আদায়ের পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় আখেরাতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, একটা ফরযে আইন ইবাদাত ধারাবাহিকভাবে ছেড়ে দিলে কী পরিমাণ গুনাহ যে হবে তার কল্পনাও আমরা করতে পারব না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের ফরয বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন।

বিশ্বের বর্তমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে জিহাদ বাস্তবায়নের পন্থা

নবীজী সা. এর সীরাত থেকে যেকোনো ভূমিতে জিহাদ বাস্তবায়ন করার যে নির্দেশনা পাওয়া যায় তা চারটি মারহালা বা স্তরে বিন্যাস করা যায়। মারহালাগুলো নিম্নরূপ:

১. **দাওয়াতের মারহালা:** গোপন দাওয়াতের মাধ্যমে বিশ্বস্ত কিছু লোককে তাওহীদ, কুফর-বিততাগুত, তাওহীদুল হাকেমিয়্যাহ, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত, জরুরী মাসাইল ইত্যাদি বুঝিয়ে তাদেরকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা। আর ধীরে ধীরে তাদের উপর মেহনত চালিয়ে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের উপর উঠানো এবং তাকওয়া ও ইখলাসের গুণেগুণান্বিত করা। আল্লাহর জন্য নিজের

সর্বস্ব ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি করা। এভাবে যোগ্য কিছু লোক তৈরি করা। মক্কার ১৩ বছরের জীবনে নবীজী সা. মূলত এমনই কিছু যোগ্য লোক তৈরি করেছিলেন। প্রথম পর্যায়ে সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে, গুণগত মান বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ, প্রথম অবস্থায় যারা উত্তমরূপে তৈরি হবে, এরাই পরবর্তীতে আগমনকারীদের জন্য শিক্ষক হতে পারবে। তাই প্রথমে যাদেরকে নেওয়া হবে, যোগ্যতা যাচাই করেই তাদেরকে নেয়া হবে, যেন তারা মাসউল/ দায়িত্বশীল হতে পারে। এভাবে গোপন দাওয়াতের কাজ চলতে থাকবে।

১৬ বছরে আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ সাত হাজার আটশত চৌদ্দজন মুজাহিদ!

প্রথমে শুধু আপনি একা দায়ী ছিলেন। আপনার দাওয়াত পেয়ে যারা এগিয়ে আসবে, তাদেরকে আপনি এমনভাবে তৈরি করুন যেন বছর খানেকের মধ্যে তারাও আপনার মত দায়ী হতে পারে। এভাবে মাস ও বছর যত অতীত হতে থাকবে দায়ীর সংখ্যাও বাড়তে থাকবে। এক আস্থাভজন আরেক আস্থাভাজনকে দাওয়াত দিবে। বিশ্বস্তজন থেকে বিশ্বস্তজনের কাছে দাওয়াত পৌঁছবে। ১৬ বছর দাওয়াতের কাজ চলতে থাকলে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বছরে দুইজনকে দায়ী হিসাবে তৈরি করতে পারলে পরিসংখ্যান বলে ১৬ বছরে ২৮,৬৯৭,৮১৪ (আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ সাত হাজার আটশত চৌদ্দ) জনকে পূর্ণাঙ্গ দায়ী এবং যোগ্য মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা সম্ভব।

পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপঃ

ধরুন ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আপনি দাওয়াতী মেহনত শুরু করলেন। বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন দুইজনকে টার্গেট করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন তারা পরিপূর্ণরূপে গড়ে উঠবে তখন আপনিসহ সাথী সংখ্যা হবে মোট তিন জন। এরপর ২০ সালের জানুয়ারী মাসে তিন জন মিলে দাওয়াতী কাজ শুরু করবেন। সারা বছর মেহনত করে তিন জনের প্রত্যেকেই দুইজন করে তৈরি করবেন। এই বছর শেষে নতুন সাথী হবে ৬জন, আর আপনারা তিনজনসহ মোট হবে ৯জন। ২১ সালে নয় জনের প্রত্যেকে দুইজন করে তৈরি করবে। এভাবে নতুন সাথী হবে ১৮জন। মোট সাথী হবে ২৭জন। ২২ সালে ২৭জনের প্রত্যেকে দুইজন করে তৈরি করবে। বছর শেষে নতুন সাথী হবে ৫৪জন। মোট হবে ৮১ জন।

২৩ সালে ৮১জনের প্রত্যেকে দুইজন করে তৈরি করবে। বছর শেষে নতুন সাথী হবে ১৬২ জন। মোট সাথী সংখ্যা দাঁড়াবে ২৪৩ জনে। ২৪ সালে মোট সাথী হবে ৭২৯ জন। ২৫ সালে মোট হবে ২১৮৭ জন। ২৬ সালে সর্বোমোট সাথী হবে ৬৫৬১ জন। ২০২৭ সালে হবে ১৯,৬৮৩ জন। ২৮ সালে সাথী হবে মোট ৫৯,০৪৯ জন। ২৯ সালে সাথী হবে ১,৭৭,১৪৭ জন। ২০৩০ সালের ডিসেম্বরে সাথী হবে ৫,৩১,৪৪১ জন। ৩১ সাল শেষে মোট হবে ১,৫৯৪৩২৩ জন। ৩২ সাল শেষে হবে ৪,৭৮২৯৬৯ জন। ৩৩ সাল শেষে হবে ৯,৫৬৫,৯৩৮ জন। ১৬ তম বছর ২০৩৪ সালের ডিসেম্বরে সাথী সংখ্যা দাঁড়াবে ২৮,৬৯৭,৮১৪ (আঠাশ কোটি উনসত্তর লাখ সাত হাজার আটশত চৌদ্দ জনে।

কেউ বলতে পারে পরিসংখ্যান তো পরিসংখ্যানই বটে। কিন্তু আমি বলি এটা কোনো অসম্ভব এবং অবাস্তব পরিসংখ্যান নয়। সারা বছর মেহনত করে মাত্র দুইজন লোককে দায়ী হিসাবে তৈরি করা অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। ১৬ বছরে সরাসরি আপনার নিজের হাতে তৈরি সাথী মাত্র ৩২জন। এটাকি খুব কঠিন কোনো বিষয়? ষোল বছর মেহনত করে বত্রিশ জন লোক তৈরি করা কি অসম্ভব কাজ? হিম্মত নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওফীক চেয়ে অগ্রসর হলেই পথ খুলতে শুরু করবে ইনশা আল্লাহ।

২. দাওয়াত ও হিজরতের মারহালা: দাওয়াতের পাশাপাশি পিছুটান মুক্ত কিছু লোক যখন দ্বীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাবে, আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ভয়ে যখন তারা ভীত হবে না এবং জান্নাতের অশেষ অসীম নেয়ামত ছাড়া অন্য কিছুর লোভে যখন তারা লোভাতূর হবে না। তখন তাদেরকে হিজরত করতে বলতে হবে। তারা নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য দেশে কিংবা নিজ দেশেরই দূরবর্তী কোনো এলাকায় চলে যাবে। পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রেখে যদি পরিবারের সাথে যোগযোগ রাখা সম্ভব হয়, তাহলে যোগাযোগ রাখবে। অন্যথায় যোগাযোগ রাখবে না। আর যে ভাই হিজরত করবে সে অবশ্যই একটা নির্ভরযোগ্য আইডি তৈরি করে বের হবে, যেন পরিবার প্রাথমিকভাবে অস্থির না হয় এবং পরিচিত মহলে হৈচৈ না পড়ে যায়। আর হিজরতের সংবাদটা যেন তাগুতী বাহিনীর কাছে না পৌঁছে। হিজরতের পূর্বে দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে হিজরতকারীদের থাকা-খাওয়া ও আবশ্যকীয় ট্রেনীং এর জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. দাওয়াত ও ই'দাদ বা প্রস্তুতির মারহালা: দাওয়াতের পাশাপাশি যেসব ভাই হিজরত করবেন (জিহাদের জন্য নিজেদেরকে ফারেগ করবেন) তাদের

মানসিক, শারিরীক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সামরিক বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্যায়ে কিছু যোগ্য ভাইকে আফগান, সিরিয়াসহ অন্যান্য জিহাদের ভূমিতে পাঠানো যেতে পারে। তারা পুরো জিহাদ হাতে কলমে আমলী মশকের মাধ্যমে শিখে আসবে। এরপর তারাই দেশে ফিরে অন্য ভাইদেরকে প্রস্তুত করতে থাকবেন। এই মারহালায় যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র মজুত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নিরাপত্তা ঠিক রেখে চোরাকারবারীদের মাধ্যমে অস্ত্র ক্রয় করা যেতে পারে আবার কিছু ভাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে কিছু অস্ত্র তৈরিও করা যেতে পারে। সংগৃহিত অস্ত্র খুব সতর্কতার সাথে হেফাজত করতে হবে। অস্ত্র যেন কোনো ক্রমেই হাত ছাড়া না হয়, সে দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। অস্ত্র সংগ্রহের চেয়ে হেফাজতের প্রতি বেশি ও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৪. জিহাদ বা কিতালের মারহালাঃ যখন যথেষ্ট পরিমাণ যোদ্ধা ও অস্ত্র প্রস্তুত হবে এবং সমর বিশেষজ্ঞ মুজাহিদগণ ঐ ভূমিতে এই প্রস্তুতিকে যথেষ্ট বলে অনুমোদন করবেন, তখন ছোট ছোট অভিযানের মাধ্যমে জিহাদ ও কিতালের মারহালা শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে টার্গেট বানাতে হয়। যেমন, আইম্মাতুল কুফুরদের গুম করা। রাষ্ট্রের বড় বড় মাথা এবং তাগুতের পথে আহ্বনকারী ও সহযোগীদের কিডন্যাপ করা ও তাদের কিলিং অপারেশন চালানো।

আর মনে রাখা দরকার একটা বাহিনী কিংবা দলকে ধ্বংস করার জন্য বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে ধ্বংস করার প্রয়োজন পড়ে না। বরং বাহিনীর পরিচালকদের মধ্য থেকে কিছু লোককে হত্যা করতে পারলে বাহিনীর সাধারণ সদস্যগণ ভয়-শংকা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে থাকতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। কিছু দিন পরে তারা কাজের অযোগ্য হয়ে যায়। তারা মুজাহিদীনদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর উপযুক্ত থাকে না। একটা থানার উপর সারীর পাঁচজন কর্মকর্তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দিতে পারলে সাধারণ সিপাহীরা আতংকে এমনিতেই পরাজয় বরণ করে নিবে। কিংবা চাকুরী থেকে পলায়ন করবে। তাই মুজাহিদ ভাইদেরকে টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। শত্রুবাহিনীর মাথাগুলোকে টার্গেট করতে হবে। সর্বনিম্ন সামর্থ্য ব্যয় করে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের ফিকির করতে হবে। মনে রাখতে হবে, একশত সাধারণ ফৌজ মারার চেয়ে একজন কমান্ডার মারা অনেক বেশি ফলদায়ক। অফিসার যত বড় হবে, তাকে মারার দ্বারা ততবেশি ফল পাওয়া যাবে। একশতজন সৈনিকের অফিসারকে হত্যা করার অর্থ হল, বাকী নিরানব্বইজনের মানসিক শক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়া। এক হাজার সৈনিকের

অফিসারকে হত্যা করার অর্থ হল, এক হাজার সৈনিককে মানসিকভাবে পরাজিত করা। তাই শত্রু পক্ষের অফিসার যত বড় পদের অধিকারী হবে, সে মুজাহিদদের ততবড় লোভনীয় টার্গেট হবে।

ছোট ছোট হামলার মাধ্যমে দেশব্যাপী একটা আলোড়ন তৈরি হবে। এই সময় মিডিয়া শাখা ও দাওয়াতী শাখাকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে। জনগণকে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝাতে হবে। সাধারণ জনগণকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। মুজাহিদগণ যা কিছু করছে তা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জনগণের কল্যাণার্থেই করছে এ বিষয়গুলো তাদেরকে বুঝাতে হবে। তাগুতী শাসনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে শরীয়ার শাসন কায়েমের জন্য কিছু কুরবানী পেশ করার জন্য সাধারণ মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে, এই তাগুতী শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করে ইসলামী শরীয়ত কায়েম করতে পারলে তারা বর্তমান সমাজে চলমান সমস্ত রকমের জুলুম, অন্যায়, অনাচার-অবিচার থেকে মুক্তি পাবে।

বিভিন্ন ভূমির অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, তাগুত নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো ভূমিতে একটি গেরিলা জিহাদী আন্দোলনকে সম্মুখ সমর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য কয়েকটি বিভাগ অপরিহার্যঃ

১. আততায়েফাতুল আসাসিয়্যাহ (যোগ্য কিছু মাসউল বা দায়িত্বশীল)।
২. আজনাদ/ সৈনিক।
৩. আল-উলামাউল মুহাক্কিকীন।
৪. মুআসকার।
৫. আমওয়াল/ অর্থ-সম্পদ।
৬. আসলিহা ও আমতিআহ/ অস্ত্রশস্ত্র।
৭. ওয়াসাইলুল ই'লাম/ মিডিয়া।
৮. তাঈদুল আওয়াম/ জন সমর্থন।
ব্যাখ্যাঃ

তায়েফাতুল আসাসিয়্যাহ বা পরিচালনা পরিষদের গুণসমূহঃ

ক. প্রয়োজন অনুযায়ী ইলম, আমলসহ।
খ. ইলম বিস সিয়াসাতিশ শরয়িয়্যাহ ওয়াল আলামিয়্যাহ।
গ. তারবিয়াত।
ঘ. অন্য ভূখণ্ডের সামরিক অভিজ্ঞতা।

আজনাদ বা সৈনিকদের গুণ

ক. প্রয়োজন অনুযায়ী ইলম, আমলসহ।

খ. তাদরীব/ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

আল-উলামা:

(উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন সব উলামা যাদের জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর ইলম রয়েছে।)

তাদের থেকে তিনটি কাজ নেয়া হবে

ক. মুজাহিদদের ইলমী প্রয়োজন পূরণ করা।

খ. দলীলের আলোকে বিরোধীদের ভ্রান্তি নিরসন করা।

গ. জনসমর্থন অর্জন করা।

মুআসকার

মুআসকারের উদ্দেশ্য:

মুজাহিদদের আশ্রয়স্থল, প্রশিক্ষণস্থল, অপারেশন পরিচালনাকেন্দ্র, অস্ত্র সংরক্ষণাগার ও মশওয়ারার স্থান।

মুআসকারের উপযোগী চারটি ভূমি: ১. মরুভূমি ২. পাহাড়ীভূমি ৩. বনভূমি ৪. জনভূমি।

প্রথম তিন ভূমির জন্য দু'টি শর্ত: ১. বসবাসের উপযোগী হতে হবে ২. প্রশাসনের আওতার বাইরে হতে হবে। প্রথম তিনটি আল্লাহ প্রদত্ত ,আর জনভূমি কাসবী অর্থাৎ নিজেরা মেহনত করে তৈরি করে নিতে হবে।

জনভূমি:

জনভূমির দুই সূরত: ১. কোনো এলাকার সমস্ত অধিবাসী পূর্ণাঙ্গভাবে আনসার হয়ে যাওয়া। এটি প্রায় অসম্ভব তবে, অস্তিত্ব আছে। যেমন, ওয়াজিরিস্তান।

২. তাগুতের কোলে কোলে আনসার। অর্থাৎ তাগুত নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন এলাকায় আনসার। এই আনসার ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে:

ক. আনসারের অবস্থা এমন হওয়া যে, তিনি মুজাহিদদের জন্য ফেদা হয়ে যাবেন। নিজের পরিবারের চেয়েও মুজাহিদ ভাইদের বেশি মুহাব্বাত করবেন।

খ. আনসার হাউজ তাগুতের নজরদারী থেকে দূরে থাকা।

গ. আনসারের পরিবার মুয়াফেক হওয়া।
ঘ. গৃহটি ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া।

আমওয়াল/ অর্থ-সম্পদ

আমওয়াল আসে তিন সূরতে:

১. গনীমাহ।
২. আসীর বরায়ে গনীমাহ, অর্থাৎ তাগুতী বাহিনীর নেতাদের অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপন আদায় করা।
৩. সাদাকাতুল মুসলিমীন।

আসলিহা:

আসলিহা অর্জন হয় চার তরীকায়:

১. ক্রয়।
২. তৈরি।
৩. গনীমাহ।
৪. শত্রুর শত্রু থেকে নেয়া।

ওয়াসাইলুল ই'লাম বা মিডিয়া

বর্তমান পৃথিবীতে মিডিয়াই হল জিহাদের অর্ধেক। জিহাদের অর্ধেক সফলতা মিডিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। তাগুত যেমন তার মিডিয়া শক্তিকে আমাদের মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়, আমাদেরকেও আমাদের মিডিয়া তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে হবে। তাওহীদ, শিরক, তাগুত বর্জন, ভ্রান্তি নিরসন ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি প্রচার-প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে।

মিডিয়া তিন ধরণের

১. ওডিও ২. ভিডিও ৩. টেক্সট।

প্রচার মাধ্যম দু'টি: প্রিন্ট মিডিয়া ২. ইলিক্ট্রিক মিডিয়া।

উপাদানের চেয়ে প্রচারের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

জনসমর্থন:

তিন ভাবে হাসিল করা যায়:

১. মিডিয়ার মাধ্যমে।

২. উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে।
৩. জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে।

বি. দ্র. এখানে জিহাদের ফরয ইবাদাত বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে একটা ধারণা দেয়া হল মাত্র। উদ্যোগী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে এর সাথে আরো অন্যান্য উপকারী বিষয় যোগ করে নিতে পারে। সংগঠনকে তাগুতের সর্বগ্রাসী হামলা থেকে বাঁচানোর জন্য কাট-আউট সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে। এমনভাবে মাসউল নির্বাচন করতে হবে যেন মাসউলের আসল নাম-ঠিকানা মামূরগণ না জানেন। মামূরকে মাসউল চিনবে কিন্তু মাসউলকে মামূর চিনবে না। এমনিভাবে এক মাসউল আরেক মাসউলকে চিনবে না। তথ্যের ভিত্তি 'বিশ্বস্ততা' নয় বরং তথ্যের ভিত্তি হবে 'প্রয়োজন'। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো তথ্য কাউকে দেয়া যাবে না। তথ্য যখন যাকে যতটুকু দেয়া প্রয়োজন তখন তাকে ততটুকুই দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলেই সর্বনাশ হওয়ার আশংকা আছে। শুধুই কৌতুহল দমনের জন্য কাউকে কিছু বলা যাবে না। জিহাদী কাজের ক্ষেত্রে কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না। টর, ভিপিএন এবং এজাতীয় অন্যান্য নিরাপদ সাইট ব্যাবহার করে আপসের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। একজন মাসউলের অধীনে ৫/৭জনের অধিক সাথী রাখা যাবে না। কাট-আউট বহাল রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রত্যেকে ছদ্ম নাম-ঠিকানা ব্যবহার করবে। তাহলে কিছু ভাই গ্রেফতার হলেও কখনোই সংগঠনকে সমূলে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না ইনশা আল্লাহ।

উল্লেখ্য, যেহেতু আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ সহীহ আকীদা মানহাজের জিহাদী কাফেলা আছে (আনসার- আলইসলাম, আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখা)। তাই কেউ কোনো জিহাদী কাফেলা তৈরি করলেও ইতিপূর্বে যারা সহীহভাবে কাজ শুরু করেছে, তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে উম্মাহকে একতাবদ্ধ করতে হবে। নিজের নেতৃত্বের লালসা অন্তর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা পরিহার করতে হবে। শুধু নিজের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে উম্মাহকে শতভাগে বিভক্ত করা অবৈধ এবং হারাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইখলাস দান করুন। আমীন।

ফরযে আইন জিহাদ বা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব নেতা/খলীফা বা সর্বসম্মত আমীরের শর্ত নেই।

জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত। অন্যান্য ইবাদাতের তুলনায় এর সাওয়াব অনেক বেশি। অন্যান্য ফরয ইবাদাত (যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত) ফরয হওয়া এবং বাস্তবায়ন করা যেমন কোনো সর্বসম্মত আমীর বা খলীফার উপর নির্ভর করে না, তেমনি প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বাস্তবায়নের জন্যও কোনো সর্বসম্মত আমীর বা খলীফার প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এলাকার লোকজনকে সংগঠিত করে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী আগ্রাসী কাফেরদের প্রতিরোধ করবে। এটা তার ঈমানী ও ধর্মীয় দায়িত্ব, ফরযে আইন হুকুম। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে আশা করি।

আব্দুর রহমান একজন প্রাক্টিক্যাল মুসলিম। সে ও তার পরিবার ইসলামের সমস্ত হুকুম-আহকাম মানতে ভালবাসে। এলাকায় তারা ইসলাম প্রিয় পরিবার হিসাবে পরিচিত। ভারত ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ্য মদদে জুমন্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তীব্ররূপ ধারণ করল এবং পার্বত্য এলাকার মুসলিমদেরকে যখন গণহারে হত্যা করা শুরু হল, প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা থেকে ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদ আসতে লাগল। তখন আব্দুর রহমান নিজের ও নিজের স্ত্রী-কন্যাদের উপর আশংকা করতে শুরু করল। সে নিশ্চিত সংবাদ পেল যে, অচিরেই তাদের এলাকাতেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্যজোট বাহিনী রেইড দিবে। মুসলিম পুরুষদেরকে হত্যা করবে। তাদের চোখের সামনে তাদের মা-বোনকে উলঙ্গ করে ধর্ষণের নেশায় মেতে উঠবে। আর সেই দৃশ্য তাদেরকে দেখতে বাধ্য করা হবে। এরপর তাদের পুরো পরিবারকে হত্যা করে মূল্যবান সম্পদগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় আব্দুর রহমান এলাকার লোকদেরকে একত্রিত করে নিজেদের ধর্ম ও জান-মাল,ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের জন্য শেষ নিঃশাস পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। 'মারো কিংবা মরো' এই নীতি তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। অতঃপর যেদিন কুখ্যাত সেই কুফফার জোটের বাহিনী তাদের পাড়ায় আসল, সেদিন পাড়ার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে স্থানীয় আমীর আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে অর্তকিতভাবে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাফেরদের শতাধিক সৈন্য নিহত হল। অনেকগুলো গাড়ি ধ্বংস হল। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু ২/৪ঘন্টা পর নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তারা পাড়ার উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। এলাকার নারী-পুরুষ সকলেই লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করল। লাঞ্চনার জীবনের উপর তারা ইজ্জতের মৃত্যুকে প্রাধান্য দিল।

পাঠক! আপনিই বলুন শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে আব্দুর রহমানের এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে নাজায়েয বা হারাম বলা যায়? আচ্ছা যুক্তিগতভাবেও কি আব্দুর রহমানের এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বা অবৈধ যুদ্ধ বলার কোনো সুযোগ আছে? সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিজের জান-মাল ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার জন্য আদিষ্ট। একজন মুসলিমও যদি আরেক মুসলিমের জান-মাল, বা উজ্জত-আব্রুর উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে সেক্ষেত্রে অন্যায়কারী ঐ মুসলিমকেও হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, আগ্রাসী কাফেরের ক্ষেত্রে এই বিধান কত কঠোর হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐ পরিস্থিতিতে আব্দুর রহমান যদি একজন সর্বসম্মত আমীরকে খোঁজ করতে থাকত, আর পৃথিবীময় এমন একজন আমীর না পেয়ে সে চুপচাপ বসে থাকত, নিজে, নিজের পরিবার এবং পাড়ার মা-বোনসহ কাফেরদের হাতে অসহায় আত্মসমপর্ণ করত, কাফেরদেরকে তাদেরকে নিয়ে যা খুশি তা করার সুযোগ দিয়ে দিত। এলাকায় ১০০জন সামার্থ্যবান পুরুষ ছিল, প্রত্যের ঘরে ২/৪টা দা-বটি ছিল। তারপরও “একজন সর্বসম্মত আমীর পাওয়া যাচ্ছে না” শুধু এই অজুহাতে তারা সংঘবদ্ধ হয়নি এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শত্রুর উপর নিজেদের সাধ্যানুযায়ী হামলা করেনি। সেক্ষেত্রে তাদের এই কর্মপন্থা শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে জায়েয হত? বিজ্ঞ মুফতী সাহেবগণ কি উত্তর দিবেন? ভাল করে জেনে রাখুন, আগ্রাসী কাফেরদের প্রতিরোধ করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর কোথাও সর্বসম্মত আমীরের শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। দলীল বিহীন মনগড়া কথা পরিহার করুন। মুসলিম উম্মাহকে ইজ্জতের সাথে বাঁচার সবক দিন কিংবা ইজ্জতের মওত মরার হিম্মত যোগান।

উল্লেখ্য, বর্তমান বাংলাদেশ শত্রু কবলিত দেশ। এদেশের সাশনক্ষমতা মুরতাদ শাসকশ্রেণীর হাতে। তারা এদেশে শরীয়তের আইন জারি করতে দিচ্ছে না। মুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। অন্যায়ভাবে ট্যাক্স ও কর গ্রহণ করাসহ নানাবিধ জুলম করে যাচ্ছে। তাই এ দেশেরও কোনো এলাকায় যদি কোনো আব্দুর রহমান কিছু লোককে সংগঠিত করে মুরতাদদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে এ কর্মটি অবৈধ বা নাজায়েয হবে না। বরং এটি অত্যন্ত মহৎ ও পরিপূর্ণ বৈধ কর্ম বলে বিবেচিত হবে।

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য সার্বজনীন আমীর কিংবা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং ফরযে আইন হওয়ার সূরতে প্রত্যেক এলাকাবাসী স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে এই ফরয

আদায় করতে থাকবে এবং অন্যান্য হকপন্থীদলগুলোর সাথে একতাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে। নিম্নে এ সম্পর্কে দালীলিক আলোচনা করা হলঃ

১. রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই কিছু মুসলমান একত্রিত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দলীল হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবূ বছীর (রাযি.) এর ঘটনা। হুদাইবিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিল, মক্কা থেকে পালিয়ে কোনো মুসলমান মদীনায় গেলে মদীনাওয়ালারা তাকে মক্কায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। সন্ধির কিছু দিন পর আবূ বছীর রাযি. মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আসলেন। তার পিছে পিছে মক্কার দুইজন দূতও হাজির হল। তারা নবীজী সা.কে সন্ধির শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবূ বছীর রাযি.কে মক্কায় ফেরত দেওয়ার আবেদন জানাল। নবীজী সা. শর্ত মোতাবেক হযরত আবূ বছীর রাযি. মক্কার দূতদের হাতে তুলে দিলেন। পথিমধ্যে তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং আবার মদীনাতে ফিরে আসেন। তাঁকে দেখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَيْل أُمِّه مسْعَر حَرْب، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ

'কি আশ্চর্য ! এ তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম। যদি এর সাথে কেউ থাকতো! '

এ কথা শুনে আবূ বছীর (রাযি.) বুঝতে পারেন যে, তাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাই তিনি বের হয়ে পড়েন এবং সিফাল বাহর নামক এলাকাতে অবস্থান নেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা একেরপর এক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে আবূ বছীর (রাযি.) এর সাথে মিলিত হতে থাকেন। তারা মক্কার যে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলার কথা শুনলে তার উপর হামলা করে তাদের হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন। পরে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পত্র লিখে সন্ধির উক্ত শর্তটি বাতিল করার অনুরোধ জানায় এবং আবূ বছীরসহ তার সঙ্গীদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নিতে বলে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

এই হাদীসে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়,

বিশ্ব নেতা বা খলীফা উপস্থিত না থাকলে বা তাঁর সাথে যোগাযোগ সম্ভব না হলে স্থানীয়ভাবে আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা যায়। কেননা আবূ বছীর বা অন্য যেসব সাহাবা উক্ত স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন তাদের

কেউই খলীফা ছিলেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকতে এমন দাবি কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। আবার তারা মদীনা রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকও ছিলেন না। তাহলে তারা কুরাইশদের সাথে মদীনা রাষ্ট্রের সন্ধিকে মানতে বাধ্য থাকতেন। তারা যা করেছেন সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নির্দেশ দেন নি। এসকল সাহাবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড ছিল না। এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জিহাদ করার জন্য একজন খলীফা বা সর্বসম্মত আমীর থাকা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকা শর্ত নয়।

অনেকে বলতে পারেন, এ ঘটনা একদল সাহাবাদের আমল বর্ণনা করে এটা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বা কাজ নয়। এর উত্তর হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ খবর পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি এর নিন্দা করেননি। তাছাড়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ "যদি এর সাথে কেউ থাকতো!"

এই অংশের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল আসকালানী (রহ.) বলেন,

لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ أَيْ يَنْصُرُهُ وَيُعَاضِدُهُ وَيُنَاصِرُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ فَلُقِّنَهَا أَبُو بَصِيرٍ فَانْطَلَقَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ بِالْفِرَارِ لِئَلَّا يَرُدَّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَرَمَزَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِذَلِكَ لَا التَّصْرِيحُ كَمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

"যদি তার সাথে কেউ থাকতো অর্থাৎ যদি তাকে কেউ সাহায্য ও সহযোগিতা করতো। ইমাম আওযাঈ (রঃ) এর রেওয়ায়েতে আছে যদি তার সাথে কিছু লোক থাকতো। এই কথাটি আবূ বছীর (রাযি.) কে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি ফিরে গেছেন। এই কথার মধ্যে ইঙ্গিতে তাঁকে পালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যাতে তাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে না হয় এবং মক্কার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট এই কথা পৌঁছায় তাকে আবূ বছীরের সাথে মিলিত হওয়ারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শাফেঈ মাযহাব ও অন্যান্য বেশিরভাগ আলেমরা বলেছেন (সন্ধি থাকা অবস্থায়) এধরনের কথা আকার ইঙ্গিতে বলা যেতে পারে যেমনটি এই ঘটনায় রয়েছে তবে সরাসরি নয়।" (ফাতহুল বারী)

২. রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াও যে জিহাদ ফরয হয় এ বিষয়ে আর একটি দলীল হলো উবাদা ইবনে সমিত (রাযি.) বর্ণিত হাদীস,

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষণ না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমাণ বিদ্যমান আছে।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

এই হাদীসের ভাষ্য হলো, ক্ষমতাশীন খলীফা বা বাদশা যদি কুফরীতে লিপ্ত হয় তবে তখনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়জিব হবে।

ইমাম নববী (রঃ) বলেন,

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ

'কাজী ঈয়ায বলেছেন, 'আলেমরা ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফির মুসলিমদের ইমাম (খলীফা) হতে পারে না আর যদি পরবর্তীতে কোনো খলীফা কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।' (শরহে মুসলিম)

এখন একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন মুসলিম জাহানের একজন খলীফা রয়েছেন। মুসলিমরা তার আনুগত্য করে চলেছে। এখন যদি হঠাৎ উক্ত খলীফা কাফির হয়ে যায় এবং অস্ত্র বলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ হলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা কিন্তু উক্ত মুরতাদ শাসক ও তার সমর্থকদের দখলে আর মুসলিমরা রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন। একজন কাফিরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে হটিয়ে একজন মুসলিমকে সে স্থানে বসানোর জন্য মুসলিমরা যুদ্ধ করবে। তাহলে এ হাদীস এবং উম্মতের ইজমা থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ শুধু বৈধ নয় বরং ওয়াজিব প্রমানিত হচ্ছে।

যারা মনে করেন, হাদীসে কেবল খলীফা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে অপসারনের কথা বলা হয়েছে, তাছাড়া অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের অপসারনের প্রয়োজন নেই। এটা যেমন একদিকে হাদীসের শব্দের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক অন্যদিকে যুক্তির দিক থেকেও হাস্যকর। হাদীসে বলা হয়েছে,

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয়, যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমাণ বিদ্যমান আছে।'

প্রথমে বলা হয়েছে (وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ) আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে লড়াই করবো না। এখানে খলীফা (خليفة) বা খিলাফত (الخلافة) শব্দ ব্যবহার করা হয়নি বরং (الامر) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ ক্ষমতা আর (أهل الأمر) শব্দের অর্থ ক্ষমতাশীন। এক কথায় হাদীসের প্রথম অংশে যে কোনো ধরনের ক্ষমতাশীনদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا) যতক্ষণ না তোমরা স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও। তাহলে ক্ষমতাশীন যে কারো মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখতে পেলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হচ্ছে। সে খলীফা হোক বা বাদশা হোক, গণতান্ত্রিক প্রধান মন্ত্রী হোক বা প্রেসিডেন্ট যে কেউ হোকনা কেন। হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না।

এখন যদি কেউ বলেন হাদীসে তোমরা ক্ষমতাশীলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না বলতে ক্ষমতাশীল খলীফাকে বুঝানো হচ্ছে এবং স্পষ্ট কুফরী দেখতে পেলে যুদ্ধ করার যে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সেটাও খলীফা যখন কুফরী করে তখন প্রজোয্য, অন্য শাসকদের ক্ষেত্রে নয়। তাদের জন্য কথা হলো, যদি হাদীসের প্রথম অংশে ক্ষমতাশীলদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না বলতে শুধু খলীফাকে বুঝানো হয়, তাহলে তো খলীফা ছাড়া অন্যান্য শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ হাদীসের অর্থ হবে ক্ষমতাশীল খলীফার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না যতক্ষন না তার মধ্যে কুফরী দেখা যায়। আর অন্যান্য শাসক যারা খলীফা নয় তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো সময়ই যুদ্ধ করতে পারো। একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

৩. আমীর বা খলীফার নির্দেশ ছাড়াই যে জিহাদ করা যায় তার আরেকটি দলীল হল, গযওয়ায়ে যীকরদে (গবাহ) সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর ঘটনা। এই ঘটনা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত রূপ এমন:

নবীজী সা. এর বেশ কিছু উট মদীনার বাইরে এক চারণভূমিতে চরানো হত। উট দেখভালের জন্য নবীজী সা. একজন রাখালকে সস্ত্রীক সেখানে

রেখে দিয়েছিলেন। একদিন উয়াইনা বিন হিসন আল ফেযারী নামক এক দস্যু তার দলবলসহ ঐ চারণভূমিতে হামলা করল। তারা নবীজী সা. এর রাখালকে হত্যা করল আর তার স্ত্রীকে বন্দী করল। অতঃপর নবীজী সা. এর উটগুলো নিয়ে রওনা হল।

সালামা বিন আকওয়া রাযি. তলহা বিন উবাইদুল্লাহ রাযি. এর কাজ করতেন। তার ঘোড়াগুলোকে খরকুটো খাওয়াতেন। তিনি একদিন ফজরের পূর্বেই মদীনা থেকে বের হলেন। কর্মস্থলে পৌঁছে যখন ঘোড়াগুলোকে দানা-পানি খাওয়াচ্ছিলেন তখন রবাহ নামক এক গোলাম এসে তাঁকে ঐ ডাকাত দলের কর্মকাণ্ড জানাল। তিনি ঘোড়াগুলো রবাহকে বুঝিয়ে দিয়ে ডাকাতদলের পিছু ধাওয়া করলেন। তিনি পদাতিক ছিলেন। ডাকাতরা ঘোড়সাওয়ার ছিল। তারপরও তিনি ডাকাতদের ধরে ফেললেন। অসীম সাহসিকতার সাথে একাই ডাকাতদের সাথে লড়তে শুরু করলেন। তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ডাকাতরা তার হামলার ভয়ে তটস্থ হয়ে, নিজেদের গতি বাড়ানোর জন্য গায়ের চাদর ও হাতের বর্শ ফেলে দিয়ে ঘোড়া চালাতে লাগল। তারা ত্রিশটি চাদর ও ত্রিশটি বর্শা ফেলে গেল। আর একে একে নবীজী সা. এর সবগুলো উটও ছেড়ে দিতে লাগল। যখন সবগুলো উট তারা ছেড়ে দিল এবং হালকা হওয়ার জন্য নিজের অনেক সামানও হাত ছাড়া করল, তখন নবীজী সা. শাতাধিক সাহাবাসহ তাঁর সাহায্যে উপস্থিত হলেন। আসার পথে তাঁরা পিছনে রেখে আসা চাদর, বর্শা ও উটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসলেন। ইতিমধ্যে সালামা বিন আকওয়া রাযি. সারা দিনের পিপাসার্ত শত্রুদেরকে যীকরদ নামক কুয়া থেকেও পানি পান করতে বঞ্চিত করলেন। ঐ কুয়া থেকেও তিনি তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। এই কুয়া পর্যন্ত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করা হয়। এরপর অগ্রযাত্রা বন্ধ করা হয়। তাই এই যুদ্ধের নাম হয়ে গেল ‘যী কারদ যুদ্ধ’। এই যুদ্ধে নবীজী সা. সালামা বিন আকওয়া রাযি. এর উপর খুব খুশি হলেন। তাকে ঘোড়সাওয়ারের অংশও দিলেন এবং পাদাতিক মুজাহিদ হিসাবেও গনীমত দান করলেন। এই যুদ্ধের খুঁটিনাটি আরো অনেক বিষয় সহীহ মুসলিমে ‘গযওয়ায়ে যী কারদ’ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, শত্রু যখন আক্রমণ করে বসে, শত্রু যখন জেঁকে বসে, তখন জিহাদ শুরু করার জন্য আমীরের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন নেই, আমীরের উপস্থিতির শর্ত নেই। যদি তাই হত, তাহলে সালামাহ বিন

আকওয়া রাযি. এর জন্য মদীনার বাইরে, নবীজী সা. এর অনুপস্থিতিতে এবং তাঁর অনুমতি নেওয়া ব্যতীত একাকী ডাকাত দলের সাথে যুদ্ধে জড়ানো জায়েয হত না এবং নবীজী সা.ও তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর খুশি হতেন না। এই ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হল, রাষ্ট্র ক্ষমতা, সর্বসম্মত আমীর এবং খলীফা ছাড়াও জিহাদ ফরয হয়, জিহাদ বৈধ হয়।

যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না হয়

সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে আমরা পূর্বে কথা বলেছি। এখন প্রশ্ন হলো কোনো কারণে যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের করণীয় কী? সকলে একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, নাকি একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবে?

প্রথমতঃ এ বিষয়ে সঠিক উত্তর পূর্বে বর্ণিত আবূ বছীর (রাযি.) এর ঘটনাতে পাওয়া যাবে। যখন মক্কার কাফিরদের সাথে কৃত সন্ধির কারণে মদীনা রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হলোনা তখন তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে স্থানীয়ভাবে শত্রুর মোকাবিলা শুরু করে দিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এ কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। বর্তমানেও যদি কোন কারণে মুসলিমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের করণীয় হলো, একতাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা এবং সেই সাথে যে যেভাবে পারে স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"হে ঈমানদাগণ! তোমরা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো আর তাদের প্রতি কঠোর হও। জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" (সূরা তাওবাঃ ১২৩)

....

দ্বিতীয়তঃ যারা জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য খলীফার বিদ্যমান থাকাকে শর্ত করেন তাদের জন্য উহুদ যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে শিক্ষনীয় কাহিনী বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণিত হচ্ছে,

انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله، في رجال من المهاجرين والانصار، وقد ألقوا بأيديهم فقال: فما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل فقاتل حتى قتل

"আনাস (রাযি.) এর চাচা আনাস ইবনে নাদর (রাযি.) উমর ইবনে খত্তাব, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং অন্য কিছু মুহাজির ও আনসারদের নিকট পৌঁছলেন। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে পড়েছিলেন। তিনি বললেন তোমরা বসে আছ কেনো? তাঁরা বললেন আল্লাহর রাসূল নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কারণে জীবন দিয়েছেন তোমরাও সে কারণে জীবন দাও। তারপর তিনি চলে যান এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। (বাইহাকী দালাইলুন নুবুওয়া, সিরাতে ইবনে হিশাম, সিরাতে ইবনে কাছীর প্রমুখ গ্রন্থ থেকে উহুদ যুদ্ধের ঘটনা দ্রষ্টব্য)

একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আনাস ইবনে নাদর (রাযি.) বলেছিলেন,

يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ قُتِلَ فَرَبُّ مُحَمَّدٍ لَمْ يُقْتَلْ فَقَاتِلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ

"হে আমার সম্প্রদায়! যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েই থাকেন, তবে মুহাম্মাদের রব তো জীবিত রয়েছেন। তিনি যে বিষয়ের উপর যুদ্ধ করেছেন তোমরাও তার উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করে যাও।" (ফাতহুল বারী, তাফসীরে তাবারী)

অর্থাৎ হযরত আনাস রাযি. এর চাচার কথা থেকে একথাই বুঝে আসে যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নবীজী থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলেও জিহাদ বন্ধ করা হবে না। কারণ, আল্লাহর রাসূলের জন্য জিহাদ করা হয় না, বরং জিহাদ করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, যদি খলীফা বিদ্যমান না থাকে বা নিহত হন, তবে জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

"মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। অতএব, যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছনে ফিরে যাবে?" (আলে ইমরানঃ ১৪৪)

অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে,

إن أول من سل سيفا في الله الزبير ابن العوام، بينا هو ذات يوم قائل إذ سمع نغمة: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج متجردا بالسيف صلتا، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم كنة كنة فقال: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك قتلت، قال: فما أردت أن تصنع؟ قال: أردت والله أستعرض أهل مكة! فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير

"আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রথম যে তরবারী উত্তোলন করা হয়েছে তা যুবাইর ইবনে আওয়ামের তরবারী। একদিন তিনি দুপুরে বিশ্রামরত ছিলেন তখন একটি আওয়াজ শুনলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তিনি দ্রুত খোলা তরবারী হাতে বের হয়ে পড়লেন। পরে একস্থানে তার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখা হলে, তিনি (সাঃ) বললেন, হে যুবাইর! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি শুনলাম আপনাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে কারণে তুমি কি করতে চাচ্ছিলে? যুবাইর (রাযি.) বললেন, আমি মক্কার কাফিরদের দেখে নিতে চাচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন।" (কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়মি)

এখন খলীফা নিহত হওয়ার খবর শুনলে মুসলিমদের কি করা উচিত? যারা খলীফাকে হত্যা করে পালাচ্ছে তাদের পিছু ধাওয়া না করেই কি মুসলিমরা আরেকজন খলীফা নিয়োগে মনোনিবেশ করবে? খলীফার কারণে কি ইসলামের যাবতীয় কাজকর্মে ইস্তফা দিতে হবে? ইসলাম কি শুধু খলীফার জন্য? প্রতিরোধমূলক জিহাদের জন্যও খলীফার অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে?! আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্যও খলীফার অনুমতি লাগবে?!! এমন দলীলবিহীন অযৌক্তিক

চতুর্থতঃ যারা মনে করেন শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার পূর্বে সমগ্র মুসলিমদের একজন খলীফার নিকট বায়াত হতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়ে জিহাদ করা বৈধ হবে না, তাদের নিকট আমাদের প্রশ্নঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য নবীগণ জিহাদ করেছেন

কি না? তাঁরা জিহাদ করে থাকলে তাদের জিহাদ বৈধ ছিল কি না? কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي

আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি।

এরপর শাফায়াত, গনিমত ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করে সবার শেষে বলেন,

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

"আর আমার পূর্বে সকল নবীকে তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হতো আর আমাকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবীকে সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়নি, বরং নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক নবী তাদের অনুসারীদের নিয়ে আশপাশের কাফিরদের সাথে লড়াই করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ

"কতো নবী রয়েছেন যাদের সাথে বহু সংখ্যক নেককার বান্দা যুদ্ধ করেছে!" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৬)

এর দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, নিজ কওম ও সম্প্রদায়ের লোকজনকে সংগঠিত করে বাহিনী তৈরি করত পার্শ্ববর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয। এতে কোনো বাঁধা নেই।

পঞ্চমতঃ হুযাইফা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, 'আমরা ক্ষতির মধ্যে ছিলাম পরে আপনার মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছি। এই কল্যাণের পর আবার কোনো অকল্যাণ হবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি (রাযি.) বললেন, 'তার পর আবার কোনো কল্যাণ আসবে কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তবে তাতে কিছু ধোঁয়া থাকবে।' এভাবে কয়েকবার প্রশ্ন করার পর একসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কোন অকল্যাণ হবে কি না এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,

نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ:

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

'হ্যাঁ। একদল লোক জাহান্নামের দরজার দিকে ডাকবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদের তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।' হুযাইফা (রাযি.) বলেন, "আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাদের বৈশিষ্ট কি?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তারা আমাদের মতো হবে। আমাদের ভাষায় কথা বলবে।' আমি বললাম, 'আমি যদি সে সময় পাই, তবে আমাকে কী করতে আদেশ করেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি মুসলিমদের জামাত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরো।' 'আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, 'তবে গাছের শিকড় কামড়িয়ে হলেও মৃত্যু পর্যন্ত ঐ সকল দল হতে দূরে থাকো।'" (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৬৭৩)

হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟:

"যদি তাদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি শিকড় কামড়ে হলেও জাহান্নামের দিকে যারা ডাকছে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না।' অর্থাৎ, 'যখন মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায়' আমি আবার বলছি যদি মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায় তখন বাতিল ফিরকা থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু 'যদি মুসলিমদের কোনো জামাত পাওয়া যায়' যাদের সাথে মিলিত হয়ে দ্বীনের খেদমত করা সম্ভব, তাহলে তাই করতে হবে।

জামাত অর্থ দল। মুসলিমদের জামাত অর্থ মুসলিমদের দল। একদল মুসলিম একত্রিত হয়ে দ্বীনী কোন কাজ করতে চাইলে সেই দলটিকে মুসলিমদের জামাত বলা যেতে পারে। তাদের নাম যাই হোক, আর তাদের সংখ্যা যতই হোক। তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ হোক। তাদের কাজ ও দাওয়াত যদি সঠিক হয় এবং যারা জাহান্নামের দিকে ডাকছে তাদের মতো না হয়, তবে তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। যেমন, আল্লাহ বলেন,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

....

'যখন তোমরা পানি না পাও, তখন পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করো। (সূরা মায়েদাঃ ৬)

এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে সমস্ত আলেমরা একমত যে, পানি থাকা পর্যন্ত তায়াম্মুম করা যাবে না। তবে পানি যদি নাপাক হয় বা অন্য কোনো দোষে দুষ্ট হয় তবে ভিন্ন কথা। এখন যদি কেউ বলে, সমুদ্রের পানি দ্বারাই উযু করতে হবে কারণ, সমুদ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো পানি দ্বারা উযু করা যাবে না, তবে তার কথাটি কেমন হবে? তার কথার উত্তরে বলা হবে, উযু করার জন্য শর্ত হলো পানির প্রয়োজনীয়তা, তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হোক বা একটি হ্রদের পানিই হোক। একইভাবে সত্য পথের দিকে আহবানকারী একদল মুসলিম পাওয়া গেলে তাদের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে, তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা আসহাবে কাহফের মতো কোনো ছোট গুহাতে আশ্রিত হোক। আবূ বছীর (রাযি.) ও অন্যান্য সাহাবাদের কর্মনীতি থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

অতএব, জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, খিলাফত ইত্যাদিকে যারা শর্ত করেন, তারা সম্পূর্ণ বাড়তি বিষয় যোগ করেন যার কোনো দলীল নেই। এটা ঠিক যে, মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাফেরদের পক্ষ হতে আরোপিত বাধা-বিঘ্নের কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি তারা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হতে সক্ষম না হয়, তবে যতদিন একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন কাফেরদের সুযোগ দিতে হবে- এমনটি নয়। বরং স্থানীয়ভাবে কোনো একজন আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে কাফেরদের মুকাবিলা করতে হবে এবং সর্বদা অন্য হকপন্থীদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমনটি আবূ বছীর (রাযি.) ও তার সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তাঁরা আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাথে মিলিত হতেই চাচ্ছিলেন, কিন্তু কাফিররা তাঁদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই সেই বাধাদানকারী কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে থাকলেন।

জিহাদ নিজেই একটি ওয়াজিব দায়িত্ব। খলীফা না থাকলে যেমন নামায, রোযা পরিত্যাগ করা হয় না, তেমনি জিহাদও পরিত্যাগ করা হবে না। ইবনে কুদামা (রঃ) বলেন,

فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع.

“যদি ইমাম না থাকে, তবু জিহাদ পিছিয়ে দেওয়া হবে না। কেননা এর ফলে জিহাদের কল্যাণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। যদি কোন গনীমত পাওয়া যায়, তবে মুজাহিদগণ শরীয়ত অনুসারে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে।” (আল-মুগনী, ইবনে কুদামা)

খুলাসাঃ এই অধ্যায়ের মূল কথা হল, বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে আরাকান পরিস্থিতি হিসেবে আমাদের বাংলাদেশী প্রত্যেক সুস্থ মুসলিমের উপর জিহাদ ঐ রকম ফরয হয়েছে যেমন, নামায, রোযা ও হজ্জ ফরয। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আর এই জিহাদ প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়েছে। এই ফরয আদায়ের দায়িত্ব কাফেরদের বন্ধু মুরতাদ সরকারের উপর বর্তায় না। বরং মুরতাদ সরকারকে উৎখাতের জন্যও জিহাদ ফরয হয়েছে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের এই ফরয আদায়ের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় সে প্রকাশ্য কবীরাগুনাহকারী ফাসেক বলে গণ্য হবে।

আর প্রস্তুতি ব্যতীত যেহেতু জিহাদ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তাই বর্তমানে প্রত্যেকের উপর জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করাও ফরযে আইন। কারণ

জিহাদ সম্ভব না হলে ই‘দাদ বা প্রস্তুতি ফরয

জিহাদ ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকুক কিংবা ফরযে আইনের স্তরে উন্নীত হোক প্রস্তুতি গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় ফরযে আইন। কারণ, জিহাদের ফরয আদায় প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল। আর যে ফরয যেটার উপর মাওকূফ থাকে সেটাও ফরয হয়ে যায়। যেমন, নামায আদায় উযূর উপর মওকূফ, তাই উযূও ফরয। আরেকটা উদাহরণ হল, জানাযার নামায। আমরা জানি জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। কিন্তু জানাযার নামায আদায়ের তরীকা শিখে রাখা প্রত্যেক বালেগ মুসলিমের উপর ফরযে আইন। কারণ, এটা সম্ভব যে, কোনো মুসলিম কোনো সময় এমন অবস্থায় পতিত হবে যে, সেখানে সে ছাড়া মুসলিম মাইয়্যেতের কাফন-দাফন করার মত কেউ নেই। তখন তার উপরই এ কাজটি ফরযে আইন হয়ে যাবে। জিহাদের বিষয়টা ঠিক এমনই। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আলাদাভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিয়ে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ.

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রাস্ত করবে, তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।” (আনফাল:৬০)

বর্তমান অবস্থায় যেহেতু আমরা এখনই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না, সেরকম শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই শত্রুর উপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের প্রতি আমাদেরকে মনোনিবেশ করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যও একটা সময় নির্ধারণ করতে হবে। “আমি জীবনে পিস্তল দেখিনি, আর ছুরি ধরলেও আমার হাত কাঁপে” এজাতীয় কাপুরুষতামূলক কথা গর্বের সাথে বলা যাবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে, সাথে অস্ত্র রাখা নবীজী সা. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ।

প্রস্তুতি দুই ধরণের:

ক. ঈমানী প্রস্তুতি: অর্থাৎ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জিহাদ বুঝা। জিহাদের জরুরী মাসাইল শিক্ষা করা। শত্রু-মিত্র চেনা। জিহাদ কখন ফরযে কেফায়া, কখন ফরযে আইন তা জানা। মোট কথা যে ব্যক্তি জিহাদের যে সেক্টরে কাজ করবে তার জন্য ঐ সেক্টরের হুকুম-আহকাম জেনে নেয়া ফরয। তবে ঈমানী প্রস্তুতি বা ইলমের বাহানা দিয়ে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর স্বাভাবিকভাবে জিহাদের জন্য যে পরিমাণ ইলম প্রয়োজন তা ২/৪ মাসের মধ্যেই অর্জন করা সম্ভব। তাই ইলমের বাহানা দিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।

তবে হ্যাঁ, জিহাদের পূর্ণ কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনার জন্য জিহাদসহ শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে জ্ঞাত-বিজ্ঞ কিছু আলেমের হাজত হবে। সে ক্ষেত্রে জিহাদের আমীর সাহেব যাদেরকে ইলম অর্জনের জন্য ফারেগ করে দিবেন, তারা ইলম অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকবে। তারা ইলম শিখে অন্যদের ইলমী হাজত পুরা করবে। ঠিক সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর যামানায় যেমনটি হয়েছিল আমাদেরকেও তেমনটি করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.। তিনি ইলমের বাহানায় কখনো জিহাদ ত্যাগ করেননি। কোনো

একটি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেননি। সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ হুরাইরা রাযি.। তাঁর ইতিহাস দেখুন। তিনি যখন থেকে নবীজী সা. এর সুহবতে এসেছেন, তখন থেকে কোনো যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে তিনি পিছিয়ে থাকেননি। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর তা'লীম ও তাআল্লুম তাঁদের জিহাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আজ আমরা হতভাগারা তা'লীম-তাআল্লুমকেও জিহাদের পথে অগ্রসর না হওয়ার অজুহাত হিসাবে পেশ করছি।

যারা মনে মনে এমন চিন্তা করেন যে, আমার মত ইলমী ব্যক্তিত্ব যদি জিহাদে যায়, শহীদ হয়ে যায়, তাহলে উম্মাহ আমার ইলম থেকে মাহরুম হবে। উম্মাহ অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। আপনাকে বলছি, আল্লাহর কসম, আপনি যদি জিহাদের ময়দানে যান, তাহলে উম্মাহর আরো অনেক বেশি উপকার হবে। আপনার ইলমের চেয়ে আপনার জিহাদ দ্বারা ইম্মাহ বেশি উপকৃত হবে। উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে ইলমের চেয়ে জিহাদের প্রয়োজন খুব বেশি। ইলমে ওহী আলহামদুলিল্লাহ সংরক্ষিত হয়েগেছে। বিশ্বের আনাচে কানাচে তা'লীম ও তাআল্লুমের ধারা চলছে। আপনার মত প্রথিতযশা দু'চারজন যদি জিহাদের ময়দানে চলে আসে, তাহলে এতে ইলমী ময়দানের কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু জিহাদী ময়দানের অনেক বড় উপকার হবে। জিহাদে বের হলেই যে, হায়াত দশ বছর কমে যাবে, আর ঘরে বসে থাকলে যে হায়াত দশ বছর বেড়ে যাবে তা কিন্তু নয়। হায়াত আপনি সর্বাবস্থায় একই রকম পাবেন। যতটুকু নিয়ে এসেছেন ততটুকুই। নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট কম-বেশ হবে না। তাই মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ ও শাহাদাত অন্বেষণ থেকে পিছিয়ে থাকা নিরেট বোকামী বৈ কিছু নয়।

খ. সামরিক প্রস্তুতি: জিহাদের জন্য সামরিক প্রস্তুতির গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই এর গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম বলে আশা করি।

এই উভয় প্রকারের প্রস্তুতিই ফরযে আইন। যার যেভাবে সম্ভব হয় সে সেভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। দলবদ্ধভাবে হোক কিংবা এককভাবে হোক প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা জরুরী। কেউ যদি সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো জিহাদী তানযীম বা সংগঠন পেয়ে যায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ঐ সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কারণ জিহাদ এমন একটি ফরয ইবাদাত যা এককভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। এই ফরয আদায়ের জন্য দলবদ্ধ হতে হয়, সংগঠিত হতে হয়। সংগঠিত হওয়া ছাড়া, একাকী এই ফরয আদায় করা যায় না। যে ফরয যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, সে

বিষয়টাও ফরয হয়ে যায়। তাই জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়া, সংগঠনবদ্ধ হওয়া সকল মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। সাধারণ মুসলিম, আলেম, ছাত্র-উস্তাদ সকলের জন্য একই হুকুম প্রযোজ্য।

জিহাদী কাফেলার সদস্য হওয়ার অপরাধে (?) ছাত্র/ উস্তাদকে বহিষ্কার করা

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, জিহাদ যেহেতু একটি ইজতিমায়ী ইবাদাত, এককভাবে এই ইবাদাত আদায় সম্ভব নয়, তাই এর জন্য একতাবদ্ধ হওয়া বা সংগঠিত হওয়া জরুরী। সূরা নিসার ৭১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা সতর্কতার উপকরণ গ্রহণ কর, অতঃপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে বের হও কিংবা একত্রে সকলে যুদ্ধে বের হও।"

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআনকে) আঁকড়ে ধর, আর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে-ইমরান:১০৩)

এই দুইটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটি দ্বারা স্পষ্টরূপে জিহাদের জন্য দলবদ্ধ হওয়া জরুরী বুঝে আসে। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা পুরো মুসলিম উম্মাহর একতাবদ্ধ হয়ে থাকার গুরুত্ব বুঝে আসে। জিহাদের জন্য সংগঠিত হওয়া যেহেতু শরীয়তের হুকুম। তাই কোনো ইলমী ইদারার কোনো ছাত্র কিংবা উস্তাদ যদি নিজ তাহকীক মোতাবেক কোনো সঠিকদল পেয়ে যায়, অতঃপর সে জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য তাদের সাথে যুক্ত হয়, আর এই অপরাধে (?) তাকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়, তাহলে বহিষ্কার করণের এই কাজটি শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে বৈধ হতে পারে?! যারা এমনটি করছেন তারা একটু ভেবে দেখবেন। 'মাদরাসার সংবিধানে উস্তাদ ও ছাত্রদের জন্য কোনো সংগঠন করা নিষেধ' এই খোড়া যুক্তি দিয়ে কি আল্লাহর ফরয হুকুম পালনের জন্য একতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসী ছাত্র-উস্তাদকে বহিষ্কার করা বৈধ হবে? কোনো প্রতিষ্ঠানে কি এমন আইন তৈরি করা জায়েয আছে যে আইন আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়? যে আইন

আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সে আইন মান্য করা কি জায়েয আছে? ভর্তির সময় অঙ্গিকার নামার অধীনে ছাত্র যদি এমন কোনো আইনের উপর স্বাক্ষরও করে, তবু কি সে এই আইন মানতে বাধ্য থাকবে? “আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির হুকুম মান্য করা যায় না” এই মূলনীতি কি আমরা ভুলে গেলাম? গুনাহের অঙ্গিকার করলে সেই অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে হয় সেটা কি জানা নেই? কোনো সময় কোনো এক জিহাদী কাফেলার কিছু ভ্রষ্ট সদস্য কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত হেনেছিল কিংবা তারা অর্থনৈতিক খেয়ানত করেছিল সেই অজুহাতে কি দুনিয়ার সমস্ত জিহাদী কাফেলাকেই ভ্রষ্ট মনে করার সুযোগ আছে? একজনের অপরাধের দায় কি আরেকজনের উপর বর্তায়? “আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে” জিহাদী সব দলই যদি ভ্রষ্ট হয়, তাহলে এই দলটি কোন দল? নাকি আমরা সহীহ মুসলিমের এই হাদীসটিকেই অস্বীকার করতে বসেছি?

আমি শতভাগ বিশ্বাসের সাথে স্পষ্টরূপে বলতে চাই, যে বা যারা জিহাদকে অপছন্দ করত সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো জিহাদী কাফেলায় যুক্ত হওয়ার কারণে মাদরাসার কোনো ছাত্র-উস্তাদকে বহিষ্কার করবে, সে নিম্ন বর্ণিত কারণে পথভ্রষ্ট ও মুনাফেকে পরিণত হবে:

১. সে জিহাদকে অপছন্দকারী।
২. সে আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী।
৩. সে ফরয ইবাদাত আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়ার শরীয়তের হুকুমের উপর নিজের বানানো সংবিধানকে প্রাধান্যদানকারী।

৪. সে এমন একটি সংবিধান বানিয়েছে, যা শরীয়তের হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক।

এই বদগুণগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে নিশ্চিত মুনাফিক ও তাগুত। তার আবাসস্থল জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর। তার অজান্তেই সে এমন কঠিন গুনাহ করে ফেলছে, এমন কুফুরী কর্মকাণ্ড করে ফেলছে, যার কারণে তার ঈমান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ তার কোনো খবরই নেই। উল্টো সে ভাবছে সে অনেক ভাল কাজ করে চলছে। এসব লোকদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলছেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا .

....

“বলুন: আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে নিষ্ফল হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।” (সূরা কাহাফ:১০৩-৪)

কেউ কেউ এমন আছে, যে বিভিন্ন দ্বীনী প্রোগ্রামে সারা দিন ব্যস্ত থাকে। দ্বীনের নানাবিধ খেদমত করে। অথচ জিহাদের ক্ষেত্রে এসে সে শরীয়তের দলীল নিয়ে সামান্যতম চিন্তা না করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা তার সারা জীবনের আমলকেই ধ্বংস করে দেয়। এ ব্যাপারে তার কোনো অনুভূতিই থাকে না। সে মনে করছে, সে অনেক ভাল কাজ করে যাচ্ছে, একের পর এক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছে, ফতওয়া দিচ্ছে, হাদীসের দরস দিচ্ছে, জনসাধারণের ইসলাহের কাজ করছে, কিন্তু জিহাদের বিষয়ে বিশেষ কোনো অধ্যয়ন না করায় সে এক্ষেত্রে এসে পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। ফেতনায় নিপতিত হচ্ছে। এমন কাজ করে বসছে, এমন সব কথা বলছে যা তার ঈমানকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আবার অনেকে মাদরাসা রক্ষার বাহানায় জিহাদের সাথে যুক্ত ছাত্র-উস্তাদদেরকে বহিষ্কার করে দেয়। অথচ মাদরাসায় জিহাদী তানযীমের সাথে যুক্ত কোনো ছাত্র কিংবা উস্তাদ আছে এই খবর তখনও মুরতাদ তাগুতী বাহিনীর কাছে পৌঁছেনি, তাগুতী বাহিনী থেকে ঐ ছাত্র কিংবা উস্তাদকে বহিষ্কারের চাপও দেয়া হয়নি। মাদরাসা বন্ধের হুমকিও দেয়া হয়নি। তথাপি তাগুতের ভয়ে তটস্থ হয়ে তাগুতের কাজটা অগ্রীম নিজেরা করে দিচ্ছে। ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের কর্মী ও মুজাহিদদেরকে অপমানিত ও অপদস্ত করত প্রচলিত ধারার দালান কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ মাদরাসা রক্ষা করা শরীয়তের কোন নীতির আওতায় বৈধ হয় বলবেন কি? আল্লাহর ফরয হুকুমের তুলনায় আপনার কাছে মাদরাসার দালান-কোঠাই বড় হয়ে গেল? এই রকম শত শত মাদরাসা যদি বন্ধ হয়ে যায়, আর তার বিনিময়ে পৃথিবীময় জিহাদ জিন্দা হয়, তাহলে কিছু দিন পর কি এর চেয়েও বড় বড় হাজার হাজার মাদরাসা কায়েম হবে না? তখন আপনারা কি বর্তমানের চেয়েও শতগুণ বেশি ইজ্জত সম্মানের সাথে রিযিক প্রাপ্ত হবেন না? তাহলে হযরত এত ছোট চিন্তা করেন কেন? রিযিকের পেরেশানীর কারণে যদি এমনটি করে থাকেন, তাহলে জেনে রাখুন, যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে মাদরাসার উসীলায় খাওয়াতে পারেন সেই আল্লাহ আপনাকে জিহাদের উসীলাতেও খাওয়াতে পারেন। জিহাদের মাধ্যমে যে গনীমত হাসিল হয় তা সবচেয়ে হালাল ও ইজ্জতের রিযিক। নবীজী সা.এর রিযিকের ব্যবস্থা তো গনীমতের মাধ্যমেই হয়েছিল। নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কেউ-ই কখনো মসজিদ

মাদরাসার বেতন কিংবা ওয়াজ-মাহফিলের হাদিয়া গ্রহণ করেননি। তাঁদের অধিকাংশের স্বচ্ছলতা ফিরেছে মালে গনীমতের মাধ্যমে। নবীজী সা. বলেছেন, "আমার বল্লমের ছায়াতলে আমার রিযিক রাখা হয়েছে" (মুসনাদে আহমাদ:৭/১২২, মুহাদ্দিস আহমাদ শাকের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। নবীজী সা. এর ওয়ারিস দাবি করে আপনারা কেন রিযিকের ক্ষেত্রে জিল্লতীর পথ বেছে নিলেন? জিহাদ ও গনীমতের মত ইজ্জতের পথ কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন?

আজ তো অবস্থা এমন যে

আজ তো অবস্থা এমন যে, কেউ কেউ এমন ব্যক্তিদেরকেও খেলাফত দিচ্ছে, মাদরাসার উস্তাদ হিসাবে বহাল রাখছে, যে স্পষ্টভাবে ছাত্রদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছে, "আমরা এই মাদরাসাকে জিহাদ মুক্ত করব, জঙ্গী মুক্ত করব, জিহাদ প্রিয়দেরকে মাদরাসা থেকে বের করে ছাড়ব" কোনো ছাত্র জিহাদ বিষয়ক কোনো কিতাব পড়লে তাকে ধরে হেনস্তা করে এবং 'আর কখনো জিহাদ বিষয়ক কোনো কিতাব পড়া যাবে না' মর্মে ছাত্র থেকে লিখিত অঙ্গীকার নেয়। অঙ্গীকার না করলে বহিষ্কারের ধমকি দেয়! কত বড় স্পর্ধা!! আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টাকে ভালবাসেন। আল্লাহর হাবীব যে বিষয়কে পছন্দ করেন, যে ছাত্র সেই বিষয়কে ভালবাসবে, সেই বিষয়কে পছন্দ করবে, তাকে সে মাদরাসা থেকে বের করে দিবে! জিহাদ বিষয়ে এই যার অবস্থান সে কেন মুনাফেক হবে না? জিহাদের প্রতি যার এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ সে কেন মুনাফেক হবে না? কোনো কোনো মাদরাসার অবস্থা তো এখন এমন যে, যে উস্তাদ যত বেশি জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে পারে, যে যত বেশি জিহাদের কুৎসা রটাতে পারে, যে যত বেশি জিহাদী বই জব্দ করতে পারে, সে ততবেশি প্রোমোশন পায়! সে ততবেশি 'মুরুব্বী'র প্রিয়পাত্র হয়!

যেসব কওমী আলেম-উলামা জিহাদকে অপছন্দ করে তাদেরকে বলছি

আপনারা যদি দেওবন্দী আকাবিরদের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে জিহাদী কাজের সাথে যুক্ত ছাত্র-উস্তাদদের বহিষ্কারের দুঃসাহস আপনারা কীভাবে করেন? স্বাধীন থানাভবন রাষ্ট্রের সিপাহসালার কাসেম নানুতবী রহ. কী উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সব কি ভুলে গেলেন? সম্মুখসমরে সাময়িক পরাজয়ের পর তিনি নতুন যুদ্ধ কৌশল হিসাবেই দারুল উলূম কায়েম করেছিলেন। তিনি এমন একদল মুজাহিদ তৈরির লক্ষ্য নিয়েই দারুল উলূম কায়েম করেছিলেন যারা একদিকে যেমন ইলমী ময়দানে যোগ্য

হবে অন্য দিকে সামরিক ক্ষেত্রেও পারদর্শী হবে। আপনারা তাঁর উদ্দেশ্যের একাংশ গ্রহণ করছেন আর একাংশ পরিত্যাগ করছেন, তাথাপি নিজেদেরকে দেওবন্দী আকাবিরদের অনুসারী বলে দাবি করছেন, বিষয়টি একটু দৃষ্টিকটু হয়ে গেল না?!

আর যদি কওমী মাদারেসের নমুনা বা আদর্শ 'সুফ্ফাহ' হয়ে থাকে, তাহলে সেই 'সুফফাহর' পরিচালক, উস্তাদ ও ছাত্রদের আদর্শ কী ছিল? দয়া করে সীরাতের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব একটু সময় নিয়ে অধ্যয়ন করুন। 'সুফ্ফাহর' মুহতামিম নবীজী সা. কি জিহাদকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করতেন? তিনি কি 'সুফ্ফার' কোনো ছাত্রকে জিহাদী কর্মকাণ্ডে শরীক হওয়ার কারণে বহিষ্কার করেছিলেন? 'সুফ্ফাহর' আদর্শ তো এই ছিল যে, জিহাদী অভিযানের সময়ে ছাত্র-উস্তাদ সকলে জিহাদের ময়দানে চলে যেতেন। মাদরাসা খালি পড়ে থাকত। জিহাদের ফরয আদায়ের পর পুনরায় সুফ্ফাহ চালু হত। কখনো কখনো উস্তাদ মাদরাসায় থাকতেন কিন্তু বিভিন্ন ছাত্রকে বিভিন্ন অভিযানে পাঠিয়ে দিতেন। সুফ্ফার মুহতামিম প্রিয় নবীজী সা. এতবেশি জিহাদপ্রেমী ছিলেন যে, তিনি বলেছেন, "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু (নিঃস্ব) মুমিন না থাকত যারা আমি জিহাদে বের হয়ে যাওয়ার পর মনকষ্টে ভুগবে, অথচ আমার এমন সামর্থ্যও নেই যে, তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তাহলে আমি কোনো সারিয়া (যুদ্ধাভিযান) থেকেই পিছনে থাকতাম না। নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়টা ভালবাসি যে, আমাকে আল্লাহর রাহে শহীদ করা হবে তারপর আবার জিন্দা করা হবে আবার শহীদ করা হবে আবার জিন্দা করা হবে, পুনরায় হত্যা করা হবে এবং পুনরায় জীবিত করা হবে।" (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৭৯৯)

এই হল, আমাদের প্রাণের স্পন্দন প্রিয় নবীজী সা. এর জিহাদ ও শাহাদাত প্রীতির নমুনা। আর আজ আমরা জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করেও নবীজী সা. এর ওয়ারিস হওয়ার দাবি করি। নবীজী সা. এর মাদানী দশ বছরের যুদ্ধময় জীবনকে অস্বীকার করে, দশ বছরের কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে কীভাবে নবীজী সা. এর ওয়ারিস হওয়া যেতে পারে?!

মদীনার জীবনে নবীজী সা. ২৭টি যুদ্ধে নিজে উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর বিভিন্ন সাহাবী রাযি. এর নেতৃত্বে ৭৩টি বাহিনী অভিযানে প্রেরণ করেছেন। হিসাব করলে দেখা যায়, শেষ দশ বছরের প্রায় প্রত্যেক মাসেই নবীজী সা. একটি করে বাহিনী প্রেরণ করেছেন। জিহাদ ও যুদ্ধের

ব্যস্ততার মধ্যেই নবীজী সা. এর শেষ দশটি বছর কেটেছে। একটি বাহিনী গঠন করা, বাহিনীকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করা, তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়া, বাহিনীর সদস্যদেরকে জরুরী ইলম শিক্ষা দেওয়া, বাহিনী প্রেরণের পর তাদের খবরাখবর সংগ্রহের ফিকির করা, বাহিনীর কেউ আহত হয়ে ফিরে আসলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কেউ শহীদ হলে তার পরিবারের খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের রিযিকের সুবস্থ্যা করা, গনীমত বণ্টন করা এবং পুনরায় কোথাও বাহিনী পাঠানোর ফিকির করা এসবই ছিল মদীনার শেষ দশ বছরের নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য।

নবীজী সা. এর আমল দ্বারা প্রমাণিত সত্য হল, "তা'লীমের উপর জিহাদকে প্রাধান্য দেয়া হবে" এই মূলনীতি ঠিক রেখে জিহাদ ও তা'লীম এক সাথেই চলবে। জিহাদের জন্য যে প্রয়োজনীয় ইলমের হাজত হত, তা তিনি বাহিনী গঠন করার পর বিদায়ের সময় সংক্ষিপ্তাকারে শিক্ষা দিতেন।

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! একটু ফিকির করে দেখুন মাদরাসা কিংবা মাদরাসার আইন রক্ষার অজুহাত দিয়ে জিহাদপ্রিয় ছাত্র-উস্তাদদেরকে বহিষ্কার করণের মাধ্যমে আপনারা কোথায় চলে যাচ্ছেন? সুফ্ফাহ ও দেওবন্দ উভয় মানহাজ থেকেই আপনারা বিচ্যুত হচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈমানের সীমা অতিক্রম করে নেফাক ও কুফরের সীমায় প্রবেশ করছেন। একটু ভাবুন! প্রচলিত দালান কোঠার সীমায় আবদ্ধ মাদরাসা রক্ষা বড় নাকি আল্লাহর হুকুম পালন বড়? ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়ন বড় নাকি মাদরাসা রক্ষা বড়? ফরযে আইন পরিমাণ ইলম কি মাদরাসার দালান-কোঠায় না বসে জিহাদের ময়দানে 'সীনা বা সীনা' হাসিল করা সম্ভব নয়? বাংলাদেশের মত ছোট একটি দেশের সমস্ত বিষয় শরয়ী হুকুম অনুযায়ী পরিচালিত করার জন্য কয়জন আলেমের প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন? জামাআতুস সাহাবার মধ্যে শরীয়তের সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞ আলেম কয়জন ছিলেন? ইতিহাস তো বলে ১০/১৫ জনের বেশি নয়। তাহলে বর্তমান বাংলাদেশে হাজার হাজার শাইখুল হাদীস, মুহাদ্দিস, মুফতী, মুফাসসির, আর দাওরা পাশ মাওলানা সাহেবদের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কেন ইলম ও মাদরাসার অজুহাত দিয়ে ছাত্র-উস্তাদদেরকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে? নাকি মাদরাসা রক্ষার অজুহাতের আড়ালে অন্যকোনো উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অন্তর্যামী। আমরা কীসের জন্য কী করছি সব কিছু তিনি ভাল করে অবগত আছেন। হিসাব গ্রহণের জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। জিহাদপ্রেমী হিসাবে আমাদেরকে তাঁর সম্মুখে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অক্ষম ব্যক্তিদের হুকুম

জিহাদের আলোচনায় অক্ষম বা মা'যূরদের আলোচনা আসাও প্রাসঙ্গিক। কারণ, অক্ষমদের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরয নয়। তাই শরীয়ত কোন শ্রেণীর লোকদেরকে অক্ষম ঘোষণা করেছে তা জানা উচিত এবং অক্ষমদের কোনো করণীয় আছে কিনা তাও জানা উচিত?

অক্ষমতা বুঝার জন্য জিহাদের জন্য সক্ষমতার পরিমাণ ও পরিমাপ বুঝা জরুরী। জিহাদের সক্ষমতা দুই প্রকার: ১. জিহাদ বিল মাল তথা অর্থ দ্বারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করার সক্ষমতা ২. জিহাদ বিননফস তথা স্বশরীরে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সক্ষমতা।

ইমাম আবূ বকর জাসসাস রহ. বলেন,

وقوله: {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعا، فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو به، كما أن من له قوة وجلد، وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه، وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه، ومن قوي على القتال، وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال، ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله بقوله: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله} .اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী- "আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর"-এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা মাল ও জান উভয়টা দিয়ে জিহাদ করা ফরয করেছেন। যার মাল আছে কিন্তু সে অসুস্থ কিংবা পঙ্গু বা দুর্বল, যার ফলে সে কিতাল করার সামর্থ্য রাখে না, তার জন্য মাল দিয়ে জিহাদ করা ফরয। তা এভাবে যে, সে অন্যকে মাল দিয়ে দেবে। ঐ ব্যক্তি এ মাল দিয়ে যুদ্ধ করবে। আর যার শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আছে এবং যুদ্ধ করতে সক্ষম, সে যদি সম্পদশালী এবং প্রাচুর্যের অধিকারীনাও হয়, তবুও জিহাদে পৌঁছার মত খরচের ব্যবস্থা হয়ে গেলে তাকে যুদ্ধে শরীক হতে হবে। আর যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং তার মালও আছে, তাকে জান ও মাল উভয়টা দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আর যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও নেই, তারজন্য 'আন-নুসহুলিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা'র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: "দুর্বল লোকদের জিহাদে না যাওয়াতে কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও গুনাহ নেই, যাদের কাছে খরচ করার

মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়।" (আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১)

সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ভিত্তিতে মুসলিমগণ চার প্রকারে বিভক্ত:

১. অর্থও আছে এবং শারীরিকভাবেও সুস্থ। তাকে অর্থও দান করতে হবে এবং স্বশরীরেও জিহাদে শরীক হতে হবে।

২. অর্থ নেই কিন্তু শারীরিকভাবে সুস্থ। তাকে স্বশরীরে জিহাদ করতে হবে।

৩. অর্থ আছে কিন্তু শারীরিকভাবে এমন অসুস্থ যে, জিহাদের কোনো বিভাগেই কাজ করতে সক্ষম নয়, সে শুধু অর্থ দান করে জিহাদে শরীক হবে।

৪. অর্থও নেই আর শারীরিকভাবেও এমন অসুস্থতা যা নিয়ে জিহাদের কোনো বিভাগে কাজ করতে সক্ষম নয়। এই ব্যক্তি হল প্রকৃত মা'যূর। তাকে জান কিংবা মাল কোনোটা দিয়েই জিহাদ করতে হবে না। সে ঘরে বসে মুজাহিদ ভাইদের জন্য দুআ করতে থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর কল্যাণকামিতায় মশগুল থাকবে।

অনেক মাযূর ব্যক্তিও গেরিলা যুদ্ধে শরীক হওয়ার উপযুক্ত

উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে নতুন ধারায় নতুন পদ্ধতিতে জিহাদী কার্যক্রম চলছে। আগে যেমন সকলে একত্রিত হয়ে একটি ময়দানে জড়ো হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত, এক দিনের মধ্যেই জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যেত। বর্তমানে কিন্তু এই পদ্ধতির জিহাদ নেই। বর্তমানে যেহেতু মুজাহিদ ভাইদের বাহ্যিক শক্তি ও সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় খুবই নগণ্য, তাই এই স্বল্প শক্তি সর্বোচ্চ কার্যকর পদ্ধতিতে ব্যবহার করার জন্য গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। তবে আলহামদুলিল্লাহ কিছু কিছু এলাকায় সম্মুখ সমরও জারি আছে। আমাদের বাংলাদেশেও আমাদেরকে গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি অনুসরণ করেই জিহাদের ফরয বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আর গেরিলা যুদ্ধপদ্ধতি এমন এক যুদ্ধ যার মধ্যে একজন মা'যূর মুসলিমও শরীক হওয়ার সুযোগ পায়। যেমন: ধরুন, এক ব্যক্তির অর্থ নেই, আবার সে অন্ধ, কিন্তু তার এমন একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাট আছে (ভাড়া হলেও সমস্যা নেই) যেখানে ৫/৭জন মেহমান দু'চার দিন থাকতে পারে। তাহলে এই নিঃস্ব অন্ধ ব্যক্তিও ৫/৭জন মুজাহিদকে দু'চার দিন নিজ ঘরে থাকতে দিয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আবার কোনো মাযূর ব্যক্তি একজন মেহমানকে নিজের বাসায় ২/৩ মাস রাখতে পারে। তাহলে সেও একজন মুজাহিদকে নিজের বাসায় ২/৩ মাস আশ্রয় দিয়ে

আনসারের ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার কোনো মাযূর ব্যক্তির দুই পা নেই, কিন্তু হাত আছে, আর সে লিখতে জানে, তাহলে সে ঘরে বসে জিহাদের পক্ষে লিখনীর মাধ্যমে জিহাদে শরীক হতে পারে। এভাবে মাযূর ব্যক্তিদেরও বর্তমান গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকায়, যার যতটুকু সুযোগ রয়েছে সে ততটুকুর ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে। অন্ধ ব্যক্তির আনসার হওয়ার মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি সে তার এই সামর্থ্যটুকু আল্লাহর রাহে ব্যয় না করে তাহলে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সাধ্যের ভিতরের এই সামর্থ্যটুকু আল্লাহর রাহে ব্যয় না করার কারণে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। "আল্লাহ তাআলা কাউকে সাধ্যাতীত হুকুম দেন না" কিন্তু কেউ যদি সাধ্যের ভিতরের টুকুও না করে তাহলে তার কী হাল হবে?

অক্ষম বা মাযূর ব্যক্তিদের তালিকা নিম্নরূপঃ

১. অন্ধ।
২. খোঁড়া।
৩. অত্যাধিক রুগ্ন।
৪. অতিশয় দুর্বল।
৫. অতিবৃদ্ধ।
৬. পঙ্গু।
৭. যার হাত নেই।
৮. যার জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার মত বাহন নেই কিংবা খরচের ব্যবস্থা নেই। আর অন্যকোনোভাবে তার খরচের ব্যবস্থাও হচ্ছে না।

বি.দ্র. যেহেতু নিজ এলাকায় থেকেও গেরিলা যুদ্ধে ভূমিকা রাখা যায়, তাই বর্তমানে এই শ্রেণীর ব্যক্তি মাযূর বলে গণ্য হবে না। সে নিজের বাড়ি ও এলাকায় থেকে যতটুকু জিহাদের কাজ করা সম্ভব ততটুকু করবে।

অক্ষম ব্যক্তিদের জিহাদের দায়মুক্তির জন্য করণীয়

পূর্বোক্ত মা'যুরব্যক্তিগণ যারা ওযরের কারণে জিহাদে যেতে পারেনি, জিহাদের দায়িত্ব মুক্তির জন্য তাদের জন্য দু'টি জিনিস আবশ্যক:

১. 'আন-নুসহুলিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি'-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণ কামিতা'।

২. ইহসান-সত্যনিষ্ঠতা।

যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ .

"দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামীহয়। মুহসিন-সত্যনি'লোকদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতিক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন এই আশায় তারা আপনার নিকট আসল আর আপনি তাদেরকে বললেন, আমার কাছেতো তোমাদেরকে দেয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নাথাকার দুঃখে তারাএভাবে ফিরেগেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।"

(সূরাতাওবা: ৯১-৯২)

'আননুসহু তথা কল্যাণকামিতা'এবং 'ইহসান তথা সত্যনিষ্ঠতা' কাকে বলে?

'আন-নুসহু' বা 'আন-নসীহা' বলা হয়: কোন জিনিসকে খালেছ, বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল করা।

এখান থেকেই বলা হয়: 'তাওবায়ে নাসূহা' তথা খালেছ দিলের বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল ও আন্তরিক তাওবা।

'ইহসান' বলা হয়: কোন কিছুকে সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পাদনকরা, উত্তম ও সত্যনি'আচরণ করা।

অতএব, মা'যুর ব্যক্তিরা তখনই মুক্তি পাবে যখন তাদের আচরণ থেকে বুঝা যাবে যে, তারা জিহাদের প্রতি আন্তরিক; জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণকামী; জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি তাদের বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, একনি'ও খালেছ মুহাব্বাত রয়েছে। আর তা শুধু মুখে দাবি করলেই হবেনা, তাদের আচরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ হতে হবে।

যেসব আচরণ থেকে 'কল্যাণকামিতা' এবং 'সত্যনিষ্ঠতা' বুঝা যাবে:

....

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

وكان عذر هؤلاء ومدحهم بشريطة النصح لله ورسوله; لأن من تخلف منهم وهو غير ناصح لله ورسوله بل يريد التضريب والسعي في إفساد قلوب من بالمدينة لكان مذموما مستحقا للعقاب. ومن النصح لله تعالى حث المسلمين على الجهاد وترغيبهم فيه والسعي في إصلاح ذات بينهم ونحوه مما يعود بالنفع على الدين، ويكون مع ذلك مخلصا لعمله من الغش; لأن ذلك هو النصح، ومنه التوبة النصوح.اهـ

"তাদের ওজর কবুল করা হবে এবং তারা প্রসংশিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণ কামিতার শর্তে। কেননা, তাদের মধ্য থেকে যে জিহাদ থেকে পেছনে রয়েগেল, কিন্তু সে কল্যাণকামী নয়, বরং সে বিশৃঙখলা সৃষ্টি করতে চায়, শহরস্ত লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর প্রয়াস চালায়, সে তিরস্কৃত হবে, শাস্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

আর আল্লাহ তাআলার কল্যাণকামিতার মধ্যে এও অন্তর্ভুক্ত: মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা, তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া, তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো। এ ছাড়াও এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে তাকে কপটতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা, প্রকৃত কল্যাণকামিতা একেই বলে। আর এ থেকেই বলা হয়: 'তাওবায়ে নাসূহা' আন্তরিক ও খালেছ তাওবা।"

(আহকামুলকুরআন: ৩/১৮৬)

ইমাম রাজী রহ. বলেন:

قوله : { إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف ، وعن إثارة الفتن ، وسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين الذين سافروا ، إما بأن يقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم ، وإما بأن يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم ، فإن جملة هذه الأمور جارية مجرى الإعانة على الجهاد .اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী: "যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়" এর অর্থ: তারা শহরে অবস্থানকালে গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে এবং ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকবে। যেসব মুজাহিদ জিহাদে গিয়েছে তাদের উপকার করার চেষ্টা চালাবে। তা হতে পারে তাদের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে, কিংবা তাদের পরিবার-পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে। কেননা, এই সবগুলো বিষয় জিহাদে সহায়তার অন্তর্ভুক্ত।"(তাফসীরে রাজী: ৮/১১৯)

ইবনেকাসীর রহ. বলেন:

فليس على هؤلاء حَرَج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس، ولم يُثَبِّطوهم، وهم محسنون في حالهم هذا.اهـ

“জিহাদ থেকে বসে থাকার হালতে তাদের কোন গুনাহ হবে না যদি তারা কল্যাণকামী হয়, লোকদের মাঝে গুজবছড়িয়ে তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত না করে, তাদেরকে জিহাদে নিরুৎসাহিত না করে। সাথে সাথে যদি তারা তাদের এ অবস্থায় সত্যনি‘হয়।” (তাফসীরে ইবনেকাসীর: ৪/১৯৮)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন:

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه.اهـ

“যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়” অর্থাৎ সত্যকে জানে, সত্য পথের পথিকদেরকে মুহাব্বাত করে এবং সত্যের দুশমনদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।” (তাফসীরেকুরতুবী: ৮/২২৬)

আল্লামা সা’দী রহ. বলেন:

وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ . أي: لا يجدون زادا، ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم، فهؤلاء ليس عليهم حرج، بشرط أن ينصحوا لله ورسوله، بأن يكونوا صادقي الإيمان، وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد.اهـ

“আর সেইসব লোকেরও কোন গুনাহ নেই যারা খরচ করার মত কিছু পায় না” অর্থাৎ সফরে খরচ করার মত অর্থ বা বাহন কোনটাই তারা পায় না। এসব লোকের কোন গুনাহ নেই। তবে শর্ত হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হতে হবে। আরতা এ ভাবে হবে যে, তারা তাদের ঈমানের দাবিতে সত্যবাদীহবে, তাদের নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকবে যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে। আর এখন তাদের সামর্থ্যে যা আছে তা করে যাবে। অর্থাৎ লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ ও তারগীব দেবে। তাদেরকে জিহাদের প্রতি দৃঢ়চিত্ত এবং সাহসী করে তোলবে।” (তাফসীরে সা’দী: ৩৪৭)

আল্লামা আলূসী রহ. বলেন:

يتعهدوا أمورهم وأهلهم وإيصال خبرهم إليهم ولا يكونوا كالمنافقين الذين يشيعون الأراجيف إذا تخلفوا .اهـ

"মুজাহিদদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনের বিষয়াদী দেখাশুনা করবে। তাদের খবরাখবর তাদের নিকট পৌঁছে দেবে। মুনাফেকদের মত বসে থেকে গুজব ও মিথ্যা খবরাখবর ছড়াবে না।" (রুহুলমা'আনী: ৭/৩২৯)

মুফাসসিরীনে কেরামের পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যগুলো থেকে আমরা কল্যাণকামিতার পরিচায়ক নিম্নোক্ত পনেরটি বিষয় পেলাম:

১. হক জিহাদ কোনটি তা জানা।
২. হকপন্থী মুজাহিদদেরকে মুহাব্বাত করা।
৩. তাদের দুশমনদের প্রতিবিদ্বেষ রাখা।
৪. পাকা-পোক্তা নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা যে, যখনই সামর্থ্য পাবে জিহাদে শরীক হয়ে যাবে।
৫. মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বিষয়াশয়ের খোঁজ-খবর নিয়ে তা দেখা শুনা করা।
৬. মুজাহিদদের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনাদি পূরণ করার মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা।
৭. তাদের পরিবার-পরিজনের খুশীর সংবাদগুলো তাদের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে তাদের উপকার করার চেষ্টা করা।
৮. মুসলমানদেরকে জিহাদে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে জিহাদের জন্য তারগীব দেয়া। জিহাদের প্রতি তাদেরকে দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী করে তোলা।
৯.তাদের পারস্পরিক অবস্থার সংশোধনের প্রয়াস চালানো।
১০.এজাতীয় অন্যান্য কাজ যার দ্বারা দ্বীনের উপকার হয় সেগুলো করা।
১১. গুজব, মিথ্যা ও মনগড়া খবরাখবর ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।
১২. ফিতনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকা।
১৩. বিশৃংখলা সৃষ্টি না করা।
১৪. লোকদের অন্তরে ফাঁটল ধরানোর চেষ্টা না করা।
১৫. কাউকে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহী না করা।

কোনো মা'যূর ব্যক্তি যখন উপরিউক্ত কাজগুলো করবে কেবল তখনই সে জিহাদে না যাওয়ার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। সে যদি ঘরে বসে থেকে মুজাহিদদের কল্যাণকামিতার পরিপন্থী কোনো কাজ করে, তাহলে সে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

ফরযে আইন জিহাদে মহিলাদের করণীয়

জিহাদ যখন ফরযে কেফায়া থাকে তখন মহিলাদের উপর জিহাদ ফরয হয় না। তবে তারা যদি সে সময় নিজ স্বামী বা অন্য মাহরামের সাথে জিহাদে বের হতে চায়, তার সুযোগ আছে। নবীজী সা. এর যমানায় অনেক মহিলা সাহাবী রাযি. জিহাদের সাওয়াব লাভের আশায় জিহাদের ময়দানে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত উম্মে আম্মারা রাযি.। ওহুদের যুদ্ধে তিনি স্বামী ও ছেলেদের সাথে ময়দানে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি যোদ্ধাদের পানি পান করানো ও আহতদের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীতে যখন দেখলেন, কাফেরদের অর্তকিত আক্রমনে মুসলিম বাহিনী নবীজী সা. কে ময়দানে রেখে পলায়নে ব্যস্ত, তখন তিনি তরবারী ও তীর ধনুক নিয়ে নবীজী সা. এর কাছে চলে আসলেন। নবীজী সা. এর পাশে দাঁড়িয়ে কাফেরদের প্রতিহত করতে লাগলেন। তাঁর ছেলেও তাঁর কাছে ছিল। সবাই ময়দান থেকে চলে যাওয়ার পর যে ১০/১২জন নবীজী সা. এর সাথে ছিল তিনি ও তাঁর ছেলে তাঁদের দুইজন। ঐ যুদ্ধে নবীজী সা. এই মা-ছেলের উপর অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং তাদের জন্য দুআ করেছিলেন “হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে জান্নাতে আমার সঙ্গী বানাও” এই যুদ্ধে কাফেরদের তীর-তরবারীর ১৩টি আঘাতে উম্মে আম্মারা রাযি. মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন। একটি আঘাত খুব গভীর ছিল। ওহুদ যুদ্ধের এক বছর পর ‘হামরাউল আসাদ’ যুদ্ধের সময়ও ঐ জখম কাঁচা ছিল।

তিনি ব্যতীত আরো অনেক মহিলা সাহাবী নবীজী সা. এর সাথে যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। যেমন, উম্মে সুলাইম রাযি., হযরত আয়েশা রাযি., নবীজী সা. এর ফুফু সাফিয়্যাহ রাযি., উম্মে আতিয়্যাহ আল আনসারিয়াহ, রবী‘বিনতে মুআউয়ায প্রমুখ সাহাবিয়াগণ রাযি.। (সিয়ারু আ‘লামিননুবালা, আল ইসাবা, সিফাতুস সফওয়াহ, তবাকাতে ইবনে সাআদ ইত্যাদি কিতাব দ্রষ্টব্য।)

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়,তখন পুরুষদের মত মহিলাদের উপরও ফরযে আইন হয়। এখন যেহেতু জিহাদ ফরযে আইনের যামানা চলছে, তাই মহিলাদের উপরও জিহাদ ফরযে আইন। তবে এই ফরয বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের কর্মপন্থা এক নয়। কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান গেরিলা যুদ্ধের জমানায় মহিলাদের করণীয় পুরুষ থেকে একদমই আলাদা।

গেরিলা যুদ্ধের যমানায় মহিলাদের করণীয় নিম্নরূপ:

১. জিহাদের ফাণ্ডে অর্থ দানের মাধ্যমে 'জিহাদ বিল মাল' এর গুরুদায়িত্ব পালন করা। অর্থশীলের জন্য অর্থ দানের মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া ফরয। মুজাহিদদের যখন জিহাদের ময়দানে অর্থের প্রয়োজন পড়ে, তখন নিজের জন্য অর্থ জমা করে রাখা হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!।" (সূরা তাওবা:৪১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ.

'তারাই প্রকৃত মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং **আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ও জান দ্বারা জিহাদ করে**। তারাই সত্যনিষ্ঠ/ সাদেকীন।' (সূরা হুকুরাত:১৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

"অর্থ-কড়ি ও জান দ্বারা জিহাদকারীদেরকে, যারা ওযর ছাড়াই জিহাদে বের হয় না, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা বড় মর্যাদা দান করেছেন।" (সূরা নিসা:৯৫)

নবীজী সা. বলেছেন,

عَن أَنَسٍ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ " : جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ"

"হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, তোমরা তোমাদের অর্থ-কড়ি, জীবন ও যুবান দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।" (সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-২১২৭)

এখন প্রশ্ন হতে পারে কী পরিমাণ অর্থ দান করলে ফরয আদায় হবে? এর উত্তর হল, সাংসারিক জরুরী প্রয়োজন পূরণের পর যা বাঁচবে, যা কিছু

প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকবে তা সবই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে দান করতে হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা:২১৯) যেহেতু সংসারের খরচ মহিলাদের দায়িত্বে বর্তায় না, তাই মহিলাদের হাতে যা থাকবে তা সবই জিহাদের পথে খরচ করা বর্তমানে তাদের উপর ফরয।

বর্তমানে আমাদের মা বোনদের মধ্যে সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা ও প্রসাধন সামগ্রী বাবদ অপচয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেখানে ৪/৫টি পোশাকে বছর পার হওয়ার কথা, সেখানে তারা প্রত্যেক মাসেই ২/৪টি পোশাক ক্রয় করছে। সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন সামগ্রী ক্রয়ে প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা অপচয় করছে। অনেক দ্বীনদার মা-বোনও এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ভাবখানা এমন 'আমার টাকা আমি যেভাবে খুশি খরচ করব, তাতে কার কী যায় আসে'। না বোন! আপনার টাকা আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারবেন না। এই অধিকার আল্লাহ তাআলা আপনাকে দেননি। এই ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলা আপনাকে দিয়েছেন, তাই তা তাঁর মর্জি ও বিধান মোতাবেকই খরচ করতে হবে।

আজ যখন সারা বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম কাফেরদের আগ্রাসনের শিকার। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব, উত্তর থেকে দক্ষীণ চতুর্দিকে শুধু মুসলিমদের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অসহায় নারী, পুরুষ আর নিষ্পাপ শিশুদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। মধ্য আফরিকা, ইয়েমেন ও সিরিয়ার শত শত মুসলিম না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আরাকানের লক্ষ লক্ষ মা-বোন ও শিশুরা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। বিভিন্ন ফ্রন্টের মুজাহিদ ভাইগণ অর্থের অভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। অর্থের অভাবে তারা ইসলামের শত্রু, আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন, মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী, ঐ সিরিয়া ও আরাকানের নিষ্পাপ শিশুর হন্তারক কাফেরদেরকে তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। এই অর্থের অভাবে আমার আহত মুজাহিদ ভাইকে যখন চিকিৎসাহীন অবস্থায় তড়পাতে তড়পাতে শাহাদত বরণ করতে হয়, তখন মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য হিসাবে আপনার জন্য এটা কীভাবে বৈধ হতে পারে যে, প্রত্যেক মাসে আপনি হাত খরচের নামে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলবেন? আরাকান, কাশ্মীর, আফগান, সিরিয়ার মা-বোনেরা আজ যে দুরাবস্থার শিকার, তাদের উপর দিয়ে আজ যে ঝর বয়ে যাচ্ছে, আগামী কাল যে তা আপনার উপর দিয়ে বয়ে যাবে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? আজ আপনি আক্রান্ত মা-বোনদের প্রতি যেমন আচরণ করছেন, কাল যদি আরেকজন আপনার প্রতি

তেমন আচরণ করে তখন আপনার কেমন লাগবে? সে সময় আপনার অনুভূতি কেমন হবে?

আজ ঐ টেকনাফের পাহাড় চূড়ায়, ঝুপড়ির মধ্যে, রোদ-বৃষ্টি আর শীত উপেক্ষা করে, নিঃস্ব-অসহায় ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় সম্ভ্রান্ত ঘরের যে রমনী শত উতকণ্ঠার মধ্যে দিন গুজরান করছে, গতকাল পর্যন্ত তার অবস্থা আপনার মতই ছিল। আপনার মত সেও বাড়তি পোশাক আর সাজ-সজ্জার সামগ্রী ক্রয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলত। মৌজ, ফূর্তি আর আনন্দ ভ্রমণে হাজার টাকা উড়াত। স্রেফ রুচি বিলাসিতার জন্য উন্নত হোটেল, রেস্টুরেন্ট আর চাইনিজগুলোতে প্রতি সপ্তাহে হাজার টাকা বিল করত। সে ভাবতেও পারেনি এত অল্প সময়ে, চোখের পলকে তার সাজানো সংসার জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার এত দিনের সংগৃহিত মূল্যবান পোশাক আর গহনাগুলো তার সামনেই লুণ্ঠিত হবে। তারই সামনে তার ছেলে ও স্বামীকে জবাই করা হবে। তারই কোল থেকে টেনে নিয়ে দুধের বাচ্চাটাকে ফুটবলের মত লাথি দিয়ে মেরে ফেলা হবে। তার যুবতী মেয়েটাকে বাবা ও ভাইর সামনে ইজ্জত হারাতে হবে। এসব সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। কিন্তু আজ সবই বাস্তবতা। সে যা কল্পনাও করতে পারেনি, আজ তার চেয়ে শতগুণ নিষ্ঠুর আচরণ তার সাথে, তার স্বামী ও সন্তানের সাথে করা হয়েছে।

প্রিয় বোন! আরাকান, কাশ্মীর, আফগান, ইরাক, সিরিয়া, চেচনিয়া, বোসনিয়া, সোমালিয়া, মালি, ফিলিপাইন, জিংজিয়ান, ইয়েমেনসহ সর্বত্র আজ একই চিত্র। আল্লাহ না করুন কিছু দিনের মধ্যে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেও এমন কিছু ঘটতে পারে। তাই আসুন এই ক্ষণকালিন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ত্যাগ করি। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাদের জন্য যে নয়নাভিরাম নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন তা অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করি। অন্যান্য এলাকার মুসলিমদের রক্তাত্ব ইতিহাস দ্বারা যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ না করি এবং এখনও যদি সর্তক না হই, তাহলে সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন অসহায় ও লাঞ্ছিত হয়ে আমাদেরকেও তাদের ভাগ্য বরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আর জেনে রাখুন মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানা ইত্যাদি ভাল স্থানে দান করার চেয়ে জিহাদের ফাণ্ডে দানের সাওয়াব অনেক বেশি। নবীজী সা. বলেছেন, “একটি তীর (বর্তমানে বুলেট) এর উসীলায় আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। ১. ঐ ব্যক্তি যে তীরটি ভাল কাজে ব্যবহারের নিয়তে তৈরি করেছে ২. যে মুজাহিদ তীরটি নিক্ষেপ করেছে ৩. যে তীরটির

যোগান দিয়েছে। ” (সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-২১৫২, তিরমিযী হাদীস নং-১৫৬১, সনদ সহীহ)

আপনার দানের টাকায় যদি একটি বুলেট ক্রয় করা হয়, তাহলে একটি বুলেটই আপনার জান্নাতে যাওয়ার কারণ হতে পারে। মসজিদ-মাদরাসায় আজ ব্যাপক হারে মানুষ দান করছে। কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে কেউ দিচ্ছে না। আমাদের উলামাদের অবহেলার কারণে জিহাদও যে দানের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফাণ্ড তাও অধিকাংশ মুসলিম জানে না। আপনি আপনার দানের টাকা ও যাকাতের টাকা জিহাদের ফাণ্ডের জন্য নির্ধারণ করে রাখুন। জিহাদের ফাণ্ডে যাকাতের অর্থও দেওয়া যায়। এখন থেকেই জিহাদের ফাণ্ডে দান করার নিয়তে প্রত্যেক মাসে কিছু টাকা হেফাজত করুন। নিজের গহনাগুলোও মুজাহিদ ভাইদেরকে অস্ত্র ক্রয় করে দেয়ার নিয়তে হেফাজত করতে পারেন। যখন বিশ্বস্ত কাউকে পেয়ে যাবেন, তখন তার হাতে দানের টাকা ও গহনাগুলো তুলে দিন। এভাবে জিহাদ বিল মালের গুরু দায়িত্ব আপনি পালন করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

২. জিহাদের গুরুত্ব-ফযীলত নিজে জানা ও বুঝা অতঃপর অন্য মহিলাদের মধ্যে এর তাবলীগ করা। জিহাদের দাওয়াত দেওয়া।

৩. নিজের স্বামী, সন্তান, ভাই ও অন্যান্য মাহরামদেরকে ফরযে আইন জিহাদ পালনে উদ্বুদ্ধ করা। তাদের জিহাদে বের হতে বাধ্য করা।

৪. স্বামী সন্তানের মধ্য থেকে যারা জিহাদে বের হতে চায়, জিহাদী কাফেলার সাথে যুক্ত হয়ে ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে চায়, তাদেরকে কোনোরূপ বাঁধা প্রদান না করা।

৫. স্বামী, সন্তানের শাহাদাত কিংবা বন্দিত্বের সংবাদ শ্রবণের জন্য মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি করা। দ্বীনের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করার হিম্মত নিজের মধ্যে তৈরি করা।

৬. খঞ্জর, ছুরি, পিস্তল এই জাতীয় হালকা অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, যেন প্রয়োজনের সময় আত্মরক্ষা করা যায় এবং স্বশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা যায়। সম্ভব হলে এজাতীয় অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা।

৭. খাবারদাবার, পোশাকপরিচ্ছদসহ সর্ব ক্ষেত্রে সব ধরণের বিলাসিতা পরিহার করা।

৮. বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকেই মুজাহিদরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জিহাদের ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করা।

৯. আখেরাতের আলোচনা, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা, শহীদের মর্যাদার আলোচনা বেশি বেশি করা।

১০. জিহাদ পরিপন্থী যত অভ্যাস আছে সব ত্যাগ করা। যেমন, প্রতিদিন গোসল করার অভ্যাস ত্যাগ করা। প্রতিদিন কাপর পরিবর্তনের অভ্যাস ছেড়ে দেয়া। কারণ, যখন এদেশে জিহাদের পরিবেশ কায়েম হবে, তখন হয়তো আপনি এসবের সুযোগ পাবেন না।

১১. মাঝে মাঝে শুধু শুকনো খাবার (যেমন, চিড়া, মুড়ি, খেজুর, রুটি) খেয়ে এক/দুই দিন থাকার চেষ্টা করা।

১২. শরীর যেন জিহাদ উপযোগী হালকা-পাতলা থাকে সে ব্যাপারে যন্তবান হওয়া।

১৩. সম্ভব হলে, প্রাথমিক চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করা। কারণ, যুদ্ধের সময় অনেক মুজাহিদ ভাই আহত হবেন, তাদেরকে আপনাদেরই চিকিৎসা করতে হবে।

১৪. লিখতে জানলে জিহাদ ও মুজাদিদের পক্ষে লিখে তা ছড়িয়ে দেয়া।

১৫. প্রয়োজনীয় রান্নার কাজ শিখে রাখা, যেন হাজতের সময় মুজাহিদ ভাইদেরকে রান্না করে খাওয়ানো যায়।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুনাফিক

জিহাদের আলোচনায় স্বাভাবিক কারণেই মুনাফিকের আলোচনা চলে আসে। কারণ, আল্লাহ তাআলাও আল-কুরআনে জিহাদের আলোচনা করতে গিয়ে জায়গায় জায়গায় মুনাফিকদের আলোচনা করেছেন। সূরা তাওবা, সূরা আহযাব, সূরাতুল মুনাফিকূন, সূরা বাকারা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কুরআন-হাদীসের মধ্যে মুনাফিকদের আখলাক-চরিত্রের বিষদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যেন মুমিনগণ তাদের বাহ্যিক লেবাস-সূরত ও মিষ্টি কথায় ধোঁকা না খায়। মুনাফেক গোঁকাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট। কারণ, তারা জানা ও বুঝার পর শুধু দুনিয়ার লালসায় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিমদের আকার আকৃতি ধারণ করে, তাদের মধ্যে থেকে পিছন থেকে ছুরি বসিয়ে দেয়। তাদের বাহ্যিক লেবাস-পোশাকের কারণে, সাধারণ মুমিনগণ তাদের দ্বারা ধোঁকা খায়, পথ ভ্রষ্ট হয়। দু'চার জন মুনাফেক হাজার হাজার মুসলিমকে ঈমান হারা করতে পারে। সে জন্য সাধারণ কাফেরদের তুলনায় মুনাফিকদের আযাব বেশি হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে"

মুনাফেকের আলামতগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল। যার মধ্যে যে পরিমাণ আলামত পাওয়া যাবে সে আখেরাতে সেই পরিমাণ আযাবের সম্মুখীন হবে। আর কেউ যদি বাহ্যিকভাবে ঈমানের দাবি করে কিন্তু ভিতরগতভাবে কুফর লালন করে, তাহলে সে হল সর্ব নিকৃষ্ট মুনাফেক। সে কখনো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

মুনাফেকের লক্ষ্যণসমূহ

مرض القلب

১. তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত। অর্থাৎ ঈমানের ক্ষেত্রে তারা সন্দেহের শিকার। ঈমান কিংবা কুফর কোনোটাকেই তারা স্পষ্টরূপে গ্রহণ করে না। শুবুহাত ও শাহওয়াত এর মধ্যে তাদের অন্তর ফেঁসে থাকে। (সূরা বাকারা:১০)

التكبّر والاستكبار

২. তারা অহংকারী হয়। গৌরব ও অহংকার তাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। (আলা-মুনাফিকুন:৫)

الاستهزاء بآيات الله والجلوس إلى المستهزئين بآيات الله

৩. আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এবং আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের মজলিসে বসে।(তাওবা:৬৪)

الاستهزاء بالمؤمنين

৪. তারা মুমিনদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করে। (আল-বাকারা:১৪-১৫)

الظن السيئ بالله تعالى

৫. তারা আল্লাহ তাআলার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করে। (সূরা আল-ফাত্হ:৬)

عدم الثقة بوعد الله تعالى ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم

৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ওয়াদার ব্যাপারে আস্থা রাখে না। (আল-আহযাব:১২)

صدّ الناس عن الإنفاق في سبيل الله

৭. তারা আল্লাহর রাস্তায় দান করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। (আল-মুনাফিকুন:৭)

التستّر ببعض الأعمال المشروعة للإضرار بالمؤمنين

৮. বৈধ কাজকে মুমিনদের ক্ষতি করার জন্য ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে। যেমন, মসজিদের নামে কাফেরদের অস্ত্রের গুদাম ঘর তৈরি করে। (তাওবা:১০৭)

توسيع الإفساد في الأرض وادعاء الإصلاح

৯. মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইসলাহের দাবি করে। (বাকারা:১১)

....

السفه ورمي المؤمنين بالسفه

১০. নিজেরা নির্বোধ হওয়া সত্ত্বেও মুমিনদেরকে নির্বোধ বলে। (বাকারা:১৩)

موالاة الكافرين

১১. কাফেরদের সাথে দোস্তী ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে, কাফেরদেরকে স্বাগত জানায়।

التربص بالمؤمنين

১২. মুমিনদের ব্যাপারে অপেক্ষায় থাকে। যদি বিজয় মুমিনদের হয়, তখন গনীমত ও পদের লোভে তাদের সঙ্গ দেয়, আর বিজয় কাফেরদের হলে কাফেরদে সঙ্গ অবলম্বন করে। (নিসা:১৪১)

الاتفاق مع أهل الكتاب ضدّ المؤمنين والتولي في القتال

১৩. মুমিনদের বিপরীতে ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের সাথে একজোট হয়। আর যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছিয়ে থাকে। (আল-হাশর:১১-১২)

الطبع على القلوب فلا يفقهون

১৪. তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ তাআলা মোহর এঁটেদেন। ফলে তারা আল্লাহর বাণী বুঝতে সক্ষম হয় না, বিশেষ করে জিহাদের হুকুম বুঝতে সক্ষম হয় না। (মুহাম্মাদ:১৬)

فتنة النفس والاغترار بالأماني

১৫. তারা নিজেরা নিজেদেরকে ফেতনায় নিপতিত করে এবং অলীক আশার পিছনে বিভ্রান্ত হয়। (আল-হাদীদ:১৪)

مخادعة الله تعالى والكسل في العبادات والرياء في الطاعات وقلة ذكر الله

১৬. আল্লাহর সাথে প্রতারণা, ইবাদাতে অলসতা, আনুগত্যে রিয়া এবং আল্লাহর স্মরণের স্বল্পতা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। (সূরা নিসা:১৪২)

التّذبذب والتردّد بين المؤمنين والكافرين

১৭. তারা মুমিন ও কাফেরদের মধ্য থেকে কাদেরকে চির বন্ধুরূপে গ্রহন করবে, সে ব্যাপারে অস্থির ও দোদুল্যমান থাকে। (সূরা নিসা:১৪৩)

مخادعة المؤمنين

১৮. তারা মুমিনদের সাথে ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করে।

التحاكم إلى الطاغوت والصدود عما أنزل الله و عدم الرضا بالتحاكم إليه

১৯. তারা আল্লাহর শরীয়ত ত্যাগ করে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করে, আল্লাহর শরীয়তের কাছে বিচার প্রার্থনায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। (সূরা নিসা:৬০-৬১)

الإفساد بين المؤمنين

২০. মুমিনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। (তাওবা:৪৭)

الحلف الكاذب والخوف والجبن والهلع

২১. মিথ্যা শপথ, ভীতি ও কাপুরুষতা তাদের বিষেশ লক্ষ্যণ। (তাওবা:৫৬-৫৭, মুনাফিকুন:১-৩)

يحبون أن يحمَدوا بما لم يفعلوا

২২. কাজ না করেও কৃতিত্ব পেতে পছন্দ করে। (আলে ইমরান:১৮৮)

ظهور الرعب عليهم عند ذكر القتال في آيات الله تعالى

২৩. কুরআনের জিহাদ-কিতালের আয়াতের আলোচনাকালে তাদের মধ্যে ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। (মুহাম্মাদ:২০)

يكرهون الجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى

২৪. তারা জিহাদ ও আল্লাহর রাহে শহীদ হওয়াকে অপছন্দ করে। (আলে ইমরান:১৬৭)

الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل ونسيان الله تعالى

২৫. খারাপ কাজে উৎসাহিত করে ভাল কাজে বাঁধা দেয়, কৃপণতার আশ্রয় নেয়, আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায়। (তাওবা:৬৭)

الفرح بالتخلف وكره الجهاد والتواصي بالتخلف عنه

২৬. জিহাদে না গিয়ে খুব খুশি হয়, জিহাদকে অপছন্দ করে আর অন্যদেরকে জিহাদে না যাওয়ার ব্যাপারে ওয়াজ-নসীহত করে। (তাওবা:৮১)

ذكر العذر الكذب للتخلف عن الجهاد فى سبيل الله

২৭. জিহাদে না যাওয়ার জন্য মিথ্যা অজুহাত পেশ করে। (আল-আহযাব:১২-১৩)

البطء عن المؤمنين

২৮. জিহাদে না গিয়ে মুমিনদের ব্যাপারে খারাপ সংবাদ শোনার অপেক্ষায় থাকে। অতঃপর যখন মুমিনরা সাময়িক মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তখন সে প্রফুল্লচিত্তে বলে, মুমিনদের সাথে না থেকে অনেক ভাল হয়েছে, আল্লাহ আমার উপর অনেক দয়া করেছেন। (নিসা:৭২)

الاستئذان عن الجهاد بحجة الفتنة

২৯. (নারীদের) ফেতনায় পতিত হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। (তাওবা:৪৯)

الفرح بما يصيب المؤمنين من ضراء والاستياء بما يمكّن الله لهم

৩০. জিহাদের ময়দানে মুমিনগণ আহত কিংবা নিহত হলে অথবা সাময়িক পরাজয়ের শিকার হলে তারা খুব খুশি হয়। (আলে ইমরান:১১৮-২০)

إذا اؤتمن خان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

৩১. আমানতের খেয়ানত করে, মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, তর্কের সময় গালাগালির আশ্রয় নেয়। (বুখারী হাদীস নং-৩৪, মুসলিম হাদীস নং-৫৮)

....

تأخير الصلاة عن وقتها

৩২. সময়মত নামায পড়ে না। নামাযের শেষ সময়ে দ্রুত নামায পড়ে নেয়। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-৬২২)

البذاء والبيان

৩৩. অশালীন-অশ্লীল কথা বলে এবং অতিরিক্ত কথা বলে। (সুনানে তিরমিযী হাদীস নং-২০২৭)

মুনাফিকীর আরো অনেক আলামত হয়তো কুরআন-হাদীসে পাওয়া যেতে পারে। তবে সংক্ষেপ করণার্থে আমরা আপাতত ৩৩টির উপর ক্ষ্যান্ত করলাম। আমরা প্রত্যেকে নিজের অবস্থার সাথে আলামতগুলো মিলিয়ে দেখি। যদি আমার মধ্যে মুনাফিকীর কোনো লক্ষ্যণ থেকে থাকে তাহলে, সেটা থেকে পুতপবিত্র হয়ে খালেস মুমিন হওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করেন। আমীন।

জঙ্গিবাদের পোস্টমর্টেম

আজ সমাজের সর্বস্তরের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জঙ্গী ও জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ। সরকার পক্ষ তার মিডিয়া শক্তিকে ব্যবহার করে অধিকাংশ জনগণকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম ও সফল হয়েছে যে, জঙ্গী ও জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী তারা মুসলিম নয়, তারা নরকের কীট। আরো বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা যা করে, তা ধর্মে অনুমোদিত নয়। সরকারের অনুগ্রহ ভিখারী, শীর্ষ পর্যায়ের দরবারী আলেম, শোলাকিয়া ও শাহবাগের ইমাম আল্লামা ...'মানব কল্যাণে শান্তির ফাতওয়া' শিরোনামে এক লক্ষ স্বাক্ষর সম্বলিত জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী একটি ফতওয়াও (?) প্রকাশ করেছেন। যে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আজ সমাজ ও দেশ অস্থির সে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদটা আসলে কী? বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা ও তার গোলামরা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দ্বারা কী বুঝায়? তারা যাদেরকে জঙ্গী বলছে, যাদেরকে সন্ত্রাসী বলছে তারা বাস্তবেই ইসলামী শরীয়তের আলোকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কিনা? এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হওয়া উচিত। যদি তাদের বলা জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা ইসলামী শরীয়তের আলোকেও জঙ্গী ও সন্ত্রাসী প্রমাণিত হয়, তাহলে আমাদের আপামর মুসলিম জনসাধরণেরও তাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলা উচিত। আমেরিকা ও তার গোলামরা তাদেরকে যেমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখে আমাদেরও তাদেরকে তেমন ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখা উচিত। আর যদি আমেরিকা ও তার গোলামদের বলা জঙ্গী ও সন্ত্রাসীরা ইসলামী শরীয়তের আলোকে জঙ্গী

সন্ত্রাসী ও ঘৃণিত প্রমাণিত না হয়, তাহলে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে কমপক্ষে তাদের জন্য প্রচলিত জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলে ঘৃণা করা ও অবজ্ঞা করা জায়েয হবে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করার কারণে ঈমান ভেঙ্গে যাওয়া প্রবল আশংকা রয়েছে। তাই আসুন ইসলামী শরীয়ত ও যুক্তির আলোকে একটু তলিয়ে দেখি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের হাকীকত খুঁজে দেখি।

জঙ্গী ও সন্ত্রাসীর অর্থ

আভিধানিক অর্থ: জঙ্গী শব্দটি মূলত ফারসী 'জঙ্গ' শব্দ থেকে এসেছে। জঙ্গ এর শাব্দিক অর্থ যুদ্ধ। আর 'জঙ্গী' হল যোদ্ধা। এ অর্থে যেকোনো যোদ্ধাকেই জঙ্গী বলা যায়। কিন্তু বলা গেলেও বলা হয় না। কারণ, জঙ্গী শব্দটি বর্তমান বিশ্বে একটি বিশেষ অর্থের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাই আমাদের দেশের সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশের সদস্যরা যদিও আভিধানিক অর্থে জঙ্গী, কিন্তু জঙ্গীর পারিভাষিক সংজ্ঞার মধ্যে তারা পড়ে না, তাই সশস্ত্র যোদ্ধা হওয়ার পরও তাদেরকে জঙ্গী বলা হয় না।

'সন্ত্রাসী' এর মূল ধাতু ত্রাস। ত্রাস অর্থ ভয়-ভীতি। যে কেউ কাউকে ভীতি প্রদর্শন করে শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় তাকেই সন্ত্রাসী বলা যায়। আমাদের দেশে একটা সময় পর্যন্ত অস্ত্র ঠেকিয়ে, মত্যুর ভয় দেখিয়ে যারা ছিনতাই করত ও চাঁদাবাজী করত তাদেরকেই সন্ত্রাসী বলা হত। 'সন্ত্রাসী' বলতে আমরা বিগত ১৮/২০ বছর পূর্বেও এলাকার ছিঁচকে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদেরকে বুঝতাম। কিন্তু এখন পরিভাষা পাল্টে গেছে। এখন আর এলাকার চাঁদাবাজদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয় না। বরং তাদেরকে বিভিন্ন সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর পরিভাষায় যাদেরকে জঙ্গী বলা হয়, 'সন্ত্রাসী' শব্দটাও তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাই জঙ্গী ও সন্ত্রাসী এখন সম-অর্থবোধক শব্দে পরিণত হয়েছে। যে জঙ্গী সেই সন্ত্রাসী আর যে সন্ত্রাসী সেই জঙ্গী।

জঙ্গীর পারিভাষিক অর্থ

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা: বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতা এবং বাংলাদেশ সরকারের কর্মপন্থা মোতাবেক জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা হল, "কোনো মুসলিম কর্তৃক হাতে অস্ত্র ধারণ করা- আরেক নির্যাতিত মুসলিমকে সাহায্য করণার্থে কিংবা খিলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুয়্যাহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, অথবা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ইজ্জত রক্ষার্থে।"

জঙ্গিবাদের এই সংজ্ঞা হয়তো আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। তাই এই সংজ্ঞা হয়তো আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করে সংজ্ঞার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করছি।

প্রশ্ন: যে কেউ অস্ত্র, বোমা-বারুদ নিজের কাছে রাখে সে কি জঙ্গী?

উত্তর: না। কারণ, প্রত্যেক দেশের সশস্ত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র থাকে। তাদের কাছে অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার মজুত থাকে, এমনকি দুনিয়াকে কয়েকবার ধ্বংস করার মত বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্রও তাদের হাতে আছে তবুও তাদেরকে কেউ জঙ্গী/ সন্ত্রাসী বলে না।

প্রশ্ন: যারা অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, জীবন বিলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত সৈন্য রাখে তারা কি জঙ্গী?

জবাব: না। তারা জঙ্গী না। কারণ যারা দুনিয়াকে জঙ্গীমুক্ত করতে চায় সেই আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ও ভারতের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে সেরা অস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত, দেশের জন্য সদা জীবন বিলাতে প্রস্তুত লক্ষ লক্ষ সৈন্য রয়েছে। আর তাদেরকে কেউ জঙ্গী বলে না।

প্রশ্ন: যারা নিরাপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা কি জঙ্গী বা সন্ত্রাসী?

উত্তর: না। যারা নিরাপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে তারা জঙ্গী বা সন্ত্রাসী নয়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকা ও তার মিত্র ৪৮টা দেশের সমন্বয়ে গঠিত 'ন্যাটো জোট' আজ ১৭ বছর ধরে আফগানের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, ইরাকের লক্ষাধিক সাধারণ মানুষকে মেরেছে, চিরতরে পঙ্গু বানিয়েছে। সিরিয়াতে বিগত সাত বছর ধরে তিন লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছে, আরাকানে বৌদ্ধ সেনাবাহিনী নিরীহ মুসলিমদেরকে গণহারে কচুকাটা করছে। হিন্দুরা ভারতের কাশ্মীরে ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে মেরেছে, এরপরও কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলে না এবং জঙ্গী নির্মূলের কোনো অভিযান তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় না। তাই বুঝা গেল সাধারণ মানুষকে হত্যা করা জঙ্গী হওয়ার নির্দশন নয়।

প্রশ্ন: যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করবে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ইসলাম ব্যতীত অন্যকোনো তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা রাষ্ট্রি কায়েমের জন্য প্রতিপক্ষকে মারবে, কাটবে, ধ্বংস করবে তারা কি জঙ্গী?

উত্তর: না। যারা স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন করে তারা জঙ্গী না। কারণ, বিগত একশত বছরে পৃথিবীর বহুদেশ সহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার জন্য যারা অস্ত্র হাতে নেয় তাদেরকে পৃথিবীময় মুক্তি যোদ্ধা বলা হয়; জঙ্গী নয়। তাই ইসলাম ছাড়া অন্যকোনো তন্ত্রমন্ত্রের বিশ্বাস লালন করে যারা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তারাও জঙ্গী নয়।

জঙ্গী হওয়ার শর্ত

আচ্ছা এবার বলুন, যারা সাধারণ মানুষ মারে তারা জঙ্গী নয়, যারা ইসলাম ব্যতীত অন্যকোনো অদর্শ যেমন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ করে তারাও জঙ্গী নয়, যারা দেশের জন্য অস্ত্র মজুত করে এবং সৈন্য প্রতিপালন করে, দেশ রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে নেয় তারাও জঙ্গী নয়। তাহলে জঙ্গী করা? এই বাস্তবতা কি আমাদের সংজ্ঞাকে নির্ভুল প্রমাণিত করে না?

বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতার আলোকে জঙ্গী হওয়ার শর্তগুলে নিম্নরূপঃ

ক. মুসলমান হওয়া। (কোনো কাফের জঙ্গী হতে পারে না। সে যতবড় জালেম এবং হত্যাকারীই হোক না কেন। কারণ, বুশ, ওবামা, পুতিন, সুচি, বিনইয়ামিন, নেতানিয়াহু ও কসাই মোদি লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেও জঙ্গী হয়নি। অথচ মোল্লা ওমর রহ. শাইখ উসামা রহ. ও তাঁদের মতাদর্শীরা দু'একজন সাধারণ মানুষ হত্যা করলেও জঙ্গী হয়ে যায় (যদিও ঐ হত্যার শরীয়তগত বৈধতা থাকে)।

খ. জঙ্গী হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হল, নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করা। কেউ নির্যাতিত কাফেরদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করলে সে অনেক প্রশংসিত হবে। তাকে কখনো জঙ্গী বলা হবে না। কিন্তু আরাকান, কাশ্মীর, আফগান, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, সোমালিয়া, ফিলিপাইন, মালিসহ যেসব মুসলিম দেশের মুসলিমরা ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিয়া, নুসাইরী কাফের নামের হায়েনাদের নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, যেসব স্থানে প্রতিনিয়ত নিষ্পাপ মুসলিম শিশুদের লাশগুলো কাফেরদের বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেখান থেকে সম্ভ্রম হারা মুসলিম যুবতীর গোঙ্গানী ভেসে আসে, মুসলিম মায়েদের সন্তান হারা আর্তনাদে যেখানের আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে, যেখানে সন্তান হারা অচল বৃদ্ধ বাবা নিজের সর্বশেষ অবলম্বনকে হারিয়ে ফরিয়াদ করে বলছে 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে উদ্ধার করুন, কারণ এর অধিবাসীরা অত্যাচারী, আর আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে সাহায্যকারী বন্ধু আর উদ্ধারকারী মুজাহিদ পাঠান' কোনো মুসলিম নওজওয়ান যখন সেই নির্যাতিত নিপীড়িত, নারী-পুরুষ

আর শিশুদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদেরকে কাফেরদের জুলম থেকে বাঁচানোর জন্য, তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, তখন সেই মুসলিম যুবক জঙ্গী হয়ে যায়। ভিন দেশের কোনো মুসলিম যুবক যদি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনার্থে তাদেরকে সাহায্য করতে যেতে চায়, তাকেও জঙ্গী তকমা লাগিয়ে জিন্দান খানায় আটক করে রাখা হয়! কিছু দিন পূর্বে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিকগুলোতে 'আফগান যুদ্ধে অংশ নিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করার সময় ৫ জঙ্গীকে র‍্যাব গ্রেফতার করেছে' শিরোনামে সংবাদ ছেপেছিল। হয়তো আপনাদের মনে থাকতে পারে।

গ. আল্লাহ তাআলার শরীয়ত কায়েমের জন্য অস্ত্র ধারণ করা। কেউ যদি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র ধারণ করে তাহলে সে ভূয়সী প্রশংসার উপযুক্ত হবে। তাকে জঙ্গী ট্যাগ দেওয়া হবে না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর তৈরি পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় আমল করতে শুরু করে, তখনই সে জঙ্গী হয়ে যায়। সে চরমপন্থী, উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসীসহ আরো বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত হতে থাকে। কিন্তু সমাজ তন্ত্রীরা যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করে দিয়েছিল তখন কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলেনি। বিগত শতাব্দীর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন এর জ্বলন্ত উদাহরণ। আর আমাদের দেশের গণতন্ত্রীরা গণতন্ত্রের নামে যে এ পর্যন্ত কত শত মুসলিমকে হত্যা করল তারপরও কেউ তাদেরকে জঙ্গী বলল না! কিন্তু আফগানের তালেবান মুজাহিদগণ আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিজেদের রক্ষার জন্য, দেশকে বাঁচানোর জন্য আজ ১৭ বছর ধরে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তাদেরকে কেউ মুক্তিযোদ্ধা বলছে না, কারণ, তারা তো আল্লাহর শরীয়ত কায়েম করতে চায়। আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তাই তারা জঙ্গী। আরাকানের সর্বহারা মানুষগুলো যখন নির্যাতন সইতে না পেড়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিল, তখন ভারত, মায়ানমারসহ বিভিন্ন দেশ তাদের উপর জঙ্গী তকমা লাগিয়ে দিল। কারণ, প্রথমত তারা মুসলিম, দ্বিতীয়ত বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে স্বাধীনতার পর তারাও ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন দেখে।

ঘ. আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসূলের সম্মান রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করা। কোনো মুসলিম সিংহ শাবক যদি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রেমের তাড়নায়, কোনো শাতেমকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়, তাহলে সে জঙ্গী অভিধায় অভিহিত হবে। কিন্তু জাতির পিতা (?) বঙ্গবন্ধুকে গালিদাতাকে বঙ্গবন্ধুর প্রেমে পাগল কেউ যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে সে বীর খেতাবে ভূষিত হবে।

আল্লাহ তাআলা ও আল্লহর রাসূল সা. কি জঙ্গীদেরকে ঘৃণা করেন?

জঙ্গী হওয়ার জন্য কাফেররা অঘোষিতভাবে যেসব শর্ত নির্ধারণ করে রেখেছে, ঐ সব শর্ত যে মুসলিমের মধ্যে পাওয়া যায়, ইসলামের পরিভাষায় তাকে জঙ্গী বা সন্ত্রাসী নয় বরং মুজাহিদ বলা হয়। কাফেররা যখন কোনো মুসলিম দেশের উপর হামলা করে, মুসলিমদেরকে হত্যা করতে শুরু করে, তখন মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। তাই তখন যারা ঐ নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে মুজাহিদ বলা হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিকুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (সূরা নিসা:৭৫)

হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে:

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خير معايش الناس لهم ، رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله .ويطير على متنه . كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها . يبتغى الموت أو القتل ، مظانه . ورجل في غنيمة ، في رأس شعفة من هذه الشعاف ، أو بطن واد من هذه الاودية . يقيم الصلاة ، ويؤتى الزكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين . ليس من الناس إلا في خير "

'হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, মানুষের মধ্যে মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবন ধারণকারী ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ময়দানে নিজ অশ্বের বাগডোর ধরে রাখে। অশ্বের পিঠে চড়ে উড়ে বেড়ায়। যখনই কোনো ভয়-ভীতির আর্তনাদ বা চিৎকার তার কানে আসে তখনই সে অশ্বের পিঠে চড়ে সেখানে দ্রুত ছুটে চলে মৃত্যু বা হত্যার অন্বেষায়... (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৮৮৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৯৭৫)

....

অপর হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে,

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه.

"হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, তুমি তোমার মুসলিম ভাইকে সাহায্য কর; সে অত্যাচারী হলেও সাহায্য কর আর নির্যাতিত হলেও সাহায্য কর। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. নির্যাতনের শিকার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করব সেটা তো বুঝলাম কিন্তু অত্যাচারী মুসলিমকে কীভাবে সাহায্য করব? নবীজী সা. বললেন, অত্যাচারীর দুই হাত চেপে ধরবে যেন সে অত্যাচার করতে না পারে।" (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৩১২)

প্রিয় পাঠক! এই আয়াত ও হাদীসদ্বয় দ্বারা কী বুঝলেন? আরাকান, কাশ্মীর, আফগান, সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য স্থানের নির্যাতিত মুসলিমভাইদের পক্ষাবলম্বন করা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর হুকুম নয়? যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেই সশস্ত্র মুসলিম মুজাহিদ ভাইদেরকে কোন সাহসে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলে ঘৃণা করতে শুরু করেছেন? আল্লাহর হুকুমপালনকারী একজন মুজাহিদকে যদি আপনি জিহাদ করার কারণে ঘৃণা করেন, তাহলে আপনার ঈমান থাকবে না। আপনি কাফের হয়ে যাবেন। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এমনিভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য, কুফর ও শিরকের ফেতনা থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, পৃথিবীময় কালিমার পতাকা উড়ানোর জন্য যারা অস্ত্রধারণ করে, কাফের মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও মুজাহিদ বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আর তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না (কুফর-শিরকের) ফিতনা দূরিভূত হয় এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আনফাল:৩৯)

ইমাম তবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

فقاتلوهم حتى لا يكون شرك، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من لأرض وهو "الفتنة" "ويكون الدين كله لله"، يقول: حتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصةً دون غيره.

"কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে শিরক দূর হয়ে যায় এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করে দেয় আর সর্ব ক্ষেত্রে শুধু তাঁর হুকুম মান্য করতে শুরু করে।" (তাফসীরে তবারী, সূরা তাওবা)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর ঐসব কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর সীমা লঙ্ঘন কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা বাকারা:১৯০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

"তোমরা সম্মিলিতভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।" (তাওবা:৩৬)

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবীজী সা. এর কয়েকজন সাহাবী একত্রে বসে পরস্পর আলোচনা করছিলাম যে, আল্লাহ তাআলার কাছে কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেটা যদি আমরা জানতাম, তাহলে সেই আমলটা করতাম। তখন নাযিল হল:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।" (সূরা সাফ্ফ:৪, আসবাবুন নুযূল)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، عَصَمُوا مِنِّي ، دِمَاءَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "

"হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজী সা. বলেছেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবূদ নেই এবং আমি ও আমি যেসব হুকুম আহকাম নিয়ে এসেছি তার উপর ঈমান আনয়ন করবে। যখন তারা ঈমান আনয়ন করবে তখন তারা আমার থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা পাবে তবে তার হক ব্যতীত। আর তাদের অন্তরের হিসাব আল্লাহ তাআলা নিবেন।" (সহীহ বুখারী হাদীস নং-৩৪)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى –صلى الله عليه وسلم– فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليعرف فمن فى سبيل الله؟ فقال :« من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ».

"হযরত আবূ মূসা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীজী সা. এর নিকট এসে বলল, কেউ গনীমত লাভের আশায় যুদ্ধ করে, কেউ যশখ্যাতির আশায় যুদ্ধ করে, আর কেউ লোক দেখানো যুদ্ধ করে, এদের মধ্যে আল্লাহর রাহের মুজাহিদ কে? নবীজী সা. বললেন, (এদের কেউই আল্লাহর রাহের মুজাহিদ নয়) আল্লাহর রাহের মুজাহিদ হল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে।" (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৬৫৫)

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, যে বা যারা আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য, পৃথিবীময় আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য যুদ্ধ করবে, জিহাদ করবে তারা মুজাহিদ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহর রাসূল সা.সহ সকল সাহাবা রাযি. এই যুদ্ধ করেছেন। সেই অর্থে তাঁরাও জঙ্গী।

অতএব, প্রিয় পাঠক! এজাতীয় জঙ্গীদেরকে যদি আপনি ঘৃণা করেন, তাদেরকে তাগুতী বাহিনী র‍্যাব-পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন, তাদের সাথে শত্রুতার আচরণ করেন, তাহলে আপনার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। আপনি নিশ্চিতভাবে কাফেরে পরিণত হবেন। পরকালে চিরকালের জন্য জাহান্নামে

থাকতে হবে। তাই সাবধান হোন। সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সা. এর প্রিয়পাত্র জঙ্গী ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

আল্লাহর রাসূলের কটূক্তিকারীর বিধান

যারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কটূক্তিকারীদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অস্ত্র হাতে নেয়, তারাও মুজাহিদ। আল্লাহর রাসূল সা. কে যদি কেউ গালি দেয়, তাঁর কুৎসা রটনা করে, তাহলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ একমত। আমাদের দেশের সরকার যেহেতু তাগুতী সরকার। তাই তারা এই বিধান কার্যকর করে না। বরং তারা বাক স্বাধীনতার নামে ঐ জাহান্নামের কুকুরগুলোকে এজাতীয় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করার সুযোগ দিয়ে দেয়। যেহেতু সরকার ঐ কুকুরগুলোর যথাযথ বিচার করবে না, তাই মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মুসলিম যদি একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের একজনকে আমীর নির্ধারণ করে, আমীরের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ঐ কুকুরগুলোকে তাদের যথাযথ পাওনা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে এ কাজটি প্রশসংনীয় হবে। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণ মুজাহিদ বলে গণ্য হবে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমের উচিত অন্তর থেকে তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের জন্য দুআ করা। কারণ, তারা সমস্ত মুসলিমের পক্ষ থেকে শাতেমে রাসূলকে তার উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে। তাদের জন্য দুআ না করে, তাদেরকে ভাল না বেসে আপনি যদি ঘৃণার সূরে তাকে জঙ্গী বলেন, তাহলে আপনার ঈমান থাকবে না। আপনি কাফের হয়ে যাবেন। কারণ প্রকৃত পক্ষে আপনার অন্তরে রাসূল সা. এর ভালবাসা নেই। রাসূল সা. এর ভালবাসা যদি আপনার অন্তরে থাকত, তাহলে আপনি নিজেই সেই কটুক্তিকারীকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন।

নিম্নে দলীলের আলোকে শাতেমে রাসূল বা নবীজী সা. কে কটাক্ষকারীর বিধান বর্ণনা করা হলঃ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু সর্বকালের সর্বশ্রে'মহামানবই নন বরং তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রে'নবী ও রাসূল। মহান আল্লাহ তাআলার পর তাঁর মর্যাদার আসন, তাঁর আগমন এই বিশ্বের জন্য শান্তি ও রহমত। কোন মানুষ নিজের জান-মাল, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক তাঁকে ভালবাসা ছাড়া মুমিন হতে পারে না; পারবেও না। যাঁকে সব কিছু থেকে বেশি ভালবাসা ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না, আল্লাহ তাআলার পরই যাঁর সম্মান তাঁকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপকারীর শাস্তিও কঠিন হওয়া চাই এবং এটাই যুক্তিযুক্ত। নিম্নে

আমরা কটাক্ষ করার অর্থ ও এর বিধান নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

কটাক্ষ বলতে কী বুঝায়:

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) 'আছ ছারিমুল মাছলুল আলা শাতেমির রাসূল' কিতাবে নবীজী (সা.)এর শানে কটাক্ষের বিবরণ ও মাত্রা সম্পর্কে কাজী ইয়ায থেকে নকল করেন, তিনি বলেন, কটাক্ষ বলতে বুঝায়, মহানবী (সা.)কে গাল মন্দ করা, তাঁর দোষ চর্চা করা, ব্যঙ্গ চিত্র করা, তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা, তাঁর মহান আদর্শময় জীবনের কোন দিক নিয়ে বিদ্রুপ করা, তাঁর বংশ নিয়ে সমালোচনা করা। তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিমিত্তে তাঁর আনিত ধর্ম নিয়ে উপহাস করা, তাঁর প্রতি লানত ও বদ দুআ করা, তাঁর অমঙ্গল কামনা করা, তাঁর সাথে বেআদবি করা, তাঁর শানে অশালীন কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি সবই কটাক্ষ হিসেবে বিবেচিত।

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর সাজা:

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী চারও মাযহাবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, যদি কোন নামধারি মুসলমান প্রিয় নবী (সা.)কে কটাক্ষ বা বিদ্রুপ করে, তাহলে সে সম্পূর্ণ কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং তার একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা মুসলিম শাসকের উপর কর্তব্য (আমাদের দেশে যেহেতু মুসলিম শাসক নেই, তাই মুসলিমদের একটি সশস্ত্র দলও এই সাজা বাস্তবায়ন করতে পারবে)। উল্লিখিত বিষয়টি কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

কুরআনের আলোকে

১. এক মুনাফেক রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিদ্রুপপূর্ণ কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.

"আর যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, (তাদের বিদ্রুপ পূর্ণ আচরণের বিষয়ে) তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলেছিলাম এবং কৌতুক

করেছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে। ছলনা করনা, তোমরা কাফের হয়ে গেছ, ঈমান প্রকাশ করার পর।" (সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন, আয়াতটি আলোচ্যবিষয়ে সুস্পষ্ট, এতে রাসূল (সা.)এর কটাক্ষ করার কারণে তাদের কৃত্রিম ওজর গ্রহণ না করে কুফরী আখ্যা দেয়া হয়েছে। (আছ ছারিমুল মাসলূল: ৩৩)

২. অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।" (সূরা আহযাব: ৫৭)

আয়াতটির ভাষ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, রাসূলকে (সা.) কষ্টদাতার জন্য কঠোর শাস্তি ও জাহান্নাম অবধারিত। আর সাধারণ থেকে সাধারণ কটাক্ষও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩১৬)

এখানে আরও প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সা.) কে কটাক্ষ বা বিদ্রুপকারীর শাস্তি আল্লাহ নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর রাসূল (সা.) মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তি প্রয়োগ করেছেন, যার বিবরণ সামনে আসছে।

হাদীসের আলোকে

১. ইমাম নাসাঈ (রাহ.) হযরত আনাস (রাযি.) এর সূত্রে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন-

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.

"নবী করীম (সা.) (মক্কা বিজয়ের সময়) মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রান ছিলো। তাঁকে সংবাদ দেয়া হলো, ইবনে খতল (যে রাসূল (সা.)কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো) কাবার গিলাফ জড়িয়ে আছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাকে ওখানেই হত্যা কর।" (সুনানে নাসাঈ: হাদীস নং ২৮৬৭)

কটাক্ষকারীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করা

২. ইমাম আবূ দাউদ (রাহ.) হযরত আলী (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه ، فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها.

قال العلامة ابن تيمية في الصارم المسلول هذا الحديث جيد.

"এক ইয়াহুদী নারী নবী করীম (সা.)কে গাল-মন্দ করতো এবং তাঁর সমালোচনা করতো। একদিন এক ব্যক্তি তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে। তখন রাসূল (সা.) তার রক্ত মূল্য বাতিল ঘোষণা করেন।" (সুনানে আবূ দাউদ: হাদীস নং ৪৩৬৪, ইবনে তাইমিয়া রহ. হাদীসের সনদকে জায়্যিদ বলেছেন। নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইরওয়াউল গলীল:৫/৯১)

৩.ইমাম আবূ দাউদ ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন:

عن عكرمة ، قال : ثنا ابن عباس ، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهى، ويزجرها فلا تنزجر ، قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه ، فأخذ المغول فوضعه في بطنها ، واتكأ عليها فقتلها ، فوقع بين رجليها طفل ، فلطخت ما هناك بالدم ، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمع الناس فقال : (أنشد الله رجلا فعل ما فعل لى عليه حق إلا قام) فقام الاعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يارسول الله ، أنا صاحبها ، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى، وأزجرها فلا تنزجر ، ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بى رفيقة ، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ألا اشهدوا أن دمها هدر) .

'এক অন্ধ সাহাবীর এমন এক দাসি ছিল যার থেকে তার সন্তান হয়েছিল। ঐ দাসি নবীজী সা. কে গালি দিত ও কটাক্ষ করত। সাহাবী তাকে নিষেধ করত কিন্তু দাসি অমান্য করত। তাকে ধমকাতো তারপরও সে বিরত থাকত না। একদিন রাতে দাসি পুনরায় নবীজী সা. কে গালি দিল ও কটাক্ষ করল। তখন অন্ধ সাহাবী খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে দাসিকে মেরে ফেললেন। সকালে তিনি

রাতের ঘটনা নবীজী সা. এর কাছে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে নবীজী সা. অন্যান্য সহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন এবং অন্ধ সাহাবীকে ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। অন্ধ সাহাবী ঘটনা বর্ণনা করার পর নবীজী সা. বললেন, 'তোমরা সকলে সাক্ষী থেক, এই দাসিকে হত্যা করা কোনো অন্যায় হয়নি; তার রক্ত বৃথা গেল।' (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং-৪৩৬১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে কোনভাবে কষ্ট দিবে তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। প্রথম হাদীসে রাসূল (সা.) হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসও আলোচ্যবিষয়ে সুস্পষ্ট। তাছাড়া শেষের দু'টি হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সা. এর কটাক্ষকারীকে যদি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত্যা করে ফেলে তাহলে সেটা নাজায়েয বা অবৈধ হবে না। কারণ, এক ইহুদী কাফের নারী নবীজী সা. কে গালি দেওয়ায় এক মুসলিম ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে হত্যা করেন। আর নবীজী সা. তার কাজকে সমর্থন করেন। হত্যাকারীকে কোনো গালমন্দ করেননি এবং ইহুদী নারী জন্য কোনো রক্তপণ বা দিয়তও সাব্যস্ত করেননি। এমনিভাবে নিজের দাসিকে হত্যা করার কারণেও নবীজী সা. অন্ধ সাহাবীকে কোনোরূপ দোষারোপ করলেন না। উল্টো দাসির রক্ত বৃথা বলে ঘোষণা দিলেন।

ইজমা

রাসূল (সা.) কে কটাক্ষকারীর মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে প্রায় প্রথম যুগ থেকেই একাধিক ইমাম ইজমা (সকল উম্মতের ঐক্যমত) নকল করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) 'আছ ছারিমুল মাসলূল'কিতাবে অনেকের নাম ও বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সুহনূন (রাহ.) বলেন-

أجمع الأمة أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر.

"সমস্ত উম্মত এব্যাপারে একমত যে, মহানবী (সা.)কে গাল-মন্দকারী ও তাঁকে কটাক্ষকারী কাফের। তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর নিকট তার বিধান হলো,

মৃত্যুদণ্ডএবং যে তার কাফের হওয়া ও শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে, সেও কাফের হয়ে যাবে।”

২.আবূ বকর ইবনুল মুনযির (রাহ.) বলেন-

أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل.

“যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালি দিবে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এ সিদ্ধান্তের উপর সকল ওলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন।”(আছ ছারিমুল মাছলুল: পৃ.৫)

৩. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহবিয়াহ (রাহ.) বলেন-

أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله.

“সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা বা তাঁর রাসূলকে গাল-মন্দ করবে অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোন বিষয়কে অস্বীকার করবে কিংবা আল্লাহ তাআলার কোন নবীকে হত্যা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অন্য সব বিষয়কে স্বীকার করে।” (আছ ছারিমুল মাছলুল: পৃ.৫)

উল্লেখিত ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মুসলমান যদি রাসূল (সা.)কে কটাক্ষ করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডদেয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) ইজমার আলোচনা করে বলেন-

ولا عبرة بما أشار إليه ابن حزم الظاهري من الخلاف في تكفير المستخف به، فإنه شيئ لا يعرف لأحد من العلماء، و من استقرأ سير الصحابة تحقق إجماعهم على ذلك فإنه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض نقلها ولم ينكره أحد.

“আল্লামা ইবনে হাযম (রাহ.) বিদ্রুপকারী কাফের হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্যের যে দাবি করেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এমন দাবি অন্য কোন আলেম থেকে পাওয়া যায় না। (আর কাফের হওয়ার বিষয়টি এতস্পষ্ট যে,) কেউ সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ করলে,এ ব্যাপারে ঐক্যমতের বিষয়টি জানতে পারবে। কারণ এটি তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিচারের রায়ে ব্যাপকভাবে বর্ণিত রয়েছে, যা কেউ অস্বীকার করেনি।”

মোটকথা, রাসূল (সা.)এর সমালোচনাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এটি নতুন কোন দাবি নয় বা মুসলমানদের উদ্ভাবিতির নয় বরং তার মৃত্যুদণ্ডের সাজা আল্লাহ

কর্তৃক স্বীকৃত, যা পূর্ব যুগ থেকে চলে আসছে। আর বলা বাহুল্য যে, কোন একজনকে এমন শাস্তি দিলে পরবর্তীতে অন্য কেউ এরূপ ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস পাবে না। অন্যথায় এ ধরনের সমালোচনাকারীরা প্রশ্রয় পেয়ে বারবার দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করবে। তাই অন্যায়কে আশ্রয় না দিয়ে নির্মূল করাই অপরিহার্য কর্তব্য।

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর তওবা

মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারী নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে, আশা করা যায় পরকালের জন্য আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন এবং তার আখেরাতের সাজা মাফ করে দিবেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু দুনিয়াতে তওবার কারণে মৃত্যুদণ্ড রহিত হবে কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে।

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবঃ

মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত হলো, তওবার কারণে তার মৃত্যুদণ্ড রহিত হবে না। চাই সে বন্দী হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে। কারণ এটা 'হদ'(শরীআতের একটি বিশেষ শাস্তি) যা তওবার কারণে মাফ হয় না। ইমাম আহমদ (রাহ.) বলেন-

كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب.

'যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)কে গালমন্দ করে, কটাক্ষ করে, চাই সে মুসলমান হোক বা কাফির, তার শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। তার তওবা গ্রহণ করা হবে না।

আল্লামা কাজী ইয়াজ (রাহ.) এর ব্যাখ্যা এভাবে পেশ করেন-

لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان حق لله وحق لآدمي والعقوبة إذا تعلق بها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة.

"এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)এর সাথে দু'টি 'হক'সম্পৃক্ত। আল্লাহর 'হক'ও বান্দার 'হক'। আর যখন কোন সাজা বা অপরাধের সম্পর্ক আল্লাহ ও বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন সেই সাজা তওবা দ্বারা মাফ হয় না।" (আছ ছারেমুল মাসলূল: পৃ.৩৯৭)

আল্লামা শামী (রাহ.) মালেকী মাযহাব সম্পর্কে বলেন-

وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا، إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفع استقالته، وحكمه حكم الزنديق، سواء كانت توبته بعد القدرة عليه أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة.

"ইমাম মালেক (রাহ.) সহ আরো অনেক ওলামায়ে কেরামের প্রসিদ্ধ মত হলো, মহানবী (সা.) কে কটাক্ষকারীর সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড যদিও সে তওবা প্রকাশ করে। এ সাজা 'হদ' হিসেবে প্রয়োগ করা হবে, কুফরী হিসেবে নয়। তাই তাদের নিকট তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করার দ্বারাও কোন লাভ হবে না। তার সাজা ও নাস্তিকের সাজা এক ও অভিন্ন। চাই সে আটক হওয়ার পূর্বে তওবা করুক বা পরে। কেননা, এটা 'হদ'যা তওবা দ্বারা রহিত হয় না।" (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩২০)

শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাব:

শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের মতামত হলো, কটাক্ষকারী ও মুরতাদের হুকুম এক ও অভিন্ন। অতএব যদি সে নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তওবা করে, তবে তার তওবা কবুল করা হবে। তার মৃত্যুদণ্ডরহিত হবে। আর যদি তওবা না করে, তাহলে মুরতাদের ন্যায় তাকেও তিন দিন বন্দী রেখে তওবা করতে বলা হবে। তার কোন সন্দেহ থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করা হবে, তবে এটা আবশ্যক নয় বরং উত্তম। তাই কাজী ইচ্ছা করলে তাকে তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ডদিতে পারেন, আর যদি কটাক্ষকারী বা মুরতাদ মহিলা হয়, তবে তাকে হত্যা করা যাবে না বরং তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে।

আল্লামা সুবকী (রাহ.) বলেন-

ولكن المشهور على الألسنة وعند الحكام وما زالوا يحكمون به على أن مذهب الشافعي قبول التوبة.

"সর্বসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ মতামত যা দ্বারা শাফেয়ী মাযহাবের বিচারকগণ বিচার করে থাকেন, তাহলো, মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারীর তওবা কবুল করা হবে।" (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩২৩)

আল্লামা শামী (রাহ.) বলেন-

أنه تقبل توبته ويندرئ عنه القتل بها وأنه يستتاب كما هو رواية الوليد عن مالك وهو المنقول عن أبي حنيفة وأصحابه كما صرح به علماء المذاهب الثلاثة كالقاضي عياض في الشفا ذكر أن الإمام الطبري نقله عنه أيضا وكذا صرح به

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا شيخ الإسلام التقي السبكي وهو الموافق لما صرح به الحنفية كالإمام أبي يوسف في كتابه الخراج حيث قال: أيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته فإن تاب وإلا قتل وكذلك المرأة إلا أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام. علق قتله على عدم التوبة فدل على أنه لا يقتل بعدها.

ولما صرح به في النتف ونقلوه في عدة كتب عن شرح الطحاوي من أنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد ولما صرح به في الحاوي من أنه ليس له توبة سوى تجديد الإسلام وهو الموافق أيضا لإطلاق عبارات المتون كافة.

"তার তওবা কবুল করা হবে এবং তওবার দ্বারা তার মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়ে যাবে ও তাকে তওবা করতে বলা হবে। এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) ও তাঁর শাগরেদগণ থেকে বর্ণিত আছে। যেমনটি মাযহাবত্রয়ের ওলামায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন কাজী ইয়ায 'আশশিফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তবরী (রাহ.) ও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) থেকে উক্ত মতামতটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বর্ণানা করেছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহ.) এবং শায়খুল ইসলাম তাকি আস সুবকী (রাহ.) যা হানাফীদের বর্ণিত মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমনটি ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ.)এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি 'কিতাবুল খারাজ'এ বলেন, যে কোন মুসলমান রাসূল (সা.)কে গালি দিবে, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাঁর সমালোচনা করবে বা কটাক্ষ করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। যদি সে তওবা করে, তবে মাফ করা হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। এমনিভাবে মহিলারও একই শাস্তি, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.) বলেন, মহিলাকে হত্যা করা যাবে না। ইসলাম কবুল করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। মৃত্যুদন্ডকে তওবা না করার সাথে শর্ত করা হয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, তওবার পর তাকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম ত্বাহাবী (রাহ.) এর বরাত দিয়ে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.)কে কটাক্ষকারী মুরতাদ। তার হুকুম ও মুরতাদের হুকুম এক ও অভিন্ন। ফলে মুরতাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তার সাথেও তাই করা হবে। 'হাবী'গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুনভাবে ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তার কোন তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।" (রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩৪৩)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) উভয় মতের দলীল বিশ্লেষণ করে এ মতটিকে শক্তিশালী বলেছেন। (বিস্তারিত দেখুন, রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩৪২-৩৪৭)

এই অধ্যায়ের সারাংশ:

উপরিউক্ত সবিস্তার আলোচনা দ্বারা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের মাধ্যমে এ কথা সুপ্রমাণিত হল যে, আন্তর্জাতি কাফের গোষ্ঠী এবং আমাদের দেশীয় মুরতাদ সরকার নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধ করা, আল্লাহর তৈরি পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ কায়েমের জন্য যুদ্ধ করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইজ্জত রক্ষার্থে যুদ্ধ করা এসব অপরাধের (?) কারণে যাদেরকে জঙ্গী বলে তারা মূলত জঙ্গী বা সন্ত্রাসী নয় বরং তারা আল্লাহর রাহের মুজাহিদ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। মুসলিমদের ঈমানী দায়িত্ব হল, জঙ্গী নামের এই মুজাহিদ ভাইদেরকে নিজের সর্বস্ব উজার করে দিয়ে সাহায্য করা। তাগুতী বাহিনীর গ্রেফতারী থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করা। অর্থ কড়ি দিয়ে তাদের হাজত পূরণ করা। যদি মুসলিমদের কেউ তার ঈমানী দায়িত্ব পালন না করে, বরং র‍্যাব-পুলিশকে সহযোগিতা করে, জঙ্গীদেরকে ধরিয়ে দেয়, তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

দেশ বড় নয়; ঈমান বড় : সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি খোলা চিঠি

আদি পিতা-মাতা এক হওয়ার সূত্রে আপনারা আমার রক্তের সম্পর্কের ভাই। প্রিয় ভাই! একটু ভাবুন। আপনি একদা এই পৃথিবীতে ছিলেন না। আপনার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে এই ধরায় পাঠিয়েছেন। এখন আপনি পৃথিবীতে আছেন। কিছু দিন পর আপনি এখানে থাকবেন না। আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যাবেন। তিনি আপনাকে আপনার কর্মের ফলাফল দান করবেন। যদি আপনি দুনিয়ায় থেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে মুক্তি পাওয়ার মত কিছু নেক আমল করে গিয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে মহাপুরষ্কারে পুরষ্কিত করবেন। আর যদি আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা ও তাঁর অবাধ্যতায় জীবনটা কাটিয়ে যান তাহলে প্রজ্জলিত অগ্নির যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপনার অপেক্ষা করছে। এটা এমন এক মহাতস্য যা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল, এই যে ৬০-৭০ বছরের হায়াত দিয়ে আল্লাহ তাআলা আপনাকে পৃথিবীতে পাঠালেন এর উদ্দেশ্য কী? সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যই যদি না জানেন তাহলে তো আপনি তাকে খুশি করতে পারবেন না। যেমন, আপনি যে বাহিনীর সদস্য সে বাহিনী সরকার কী জন্য তৈরি করেছে? ঐ বাহিনীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী? তা যদি না জানেন, তাহলে আপনি এমন কোনো কাজ করে বসবেন যা আপনার বাহিনীর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। সেক্ষেত্রে আপনার চাকুরী তো যাবেই, অনেক ক্ষেত্রে জীবনও যেতে পারে। তাই

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ আপনাকে কী উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা জানা উচিত এবং সে অনুযায়ী চলা উচিত। আশা করি আপনি বুদ্ধিমান। আপনাকে এ বিষয়টা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। জীবনের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে তাঁর হুকুমকে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী চলাই হল তাঁর ইবাদত। আল্লাহ তাআলা আপনার মনীব। আপনি তার গোলাম। মনীব গোলামকে যখন যা আদেশ করে গোলামকে তা মান্য করতে হয়। ঠিক তেমনি আপনাকে আল্লাহ যখন যা আদেশ করবেন তা মান্য করতে হবে। আদেশগুলো আপনার মনপুত হলেও মানতে হবে, মনপুত না হলেও মানতে হবে। এর নামই দাসত্ব।

ইবাদাত শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতই শুধু ইবাদত নয়। সমাজকে ইসলামের বিধান মত পরিচালনা করা, রাষ্ট্রকে ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করা। রাষ্ট্রে আল্লাহর দেওয়া দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা। চোরের হাত কেটে দেওয়া, ডাকাতের ডান হাত ডান পা কেটে দেওয়া, যিনাকারীকে বেত্রাঘাত করা, মদখোরকে শাস্তি দেওয়া। সুদি কারবার বন্ধ করা এসবও ইবাদাত। আপনি যেমন ব্যক্তি জীবনে ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট, তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট। কারণ, ইসলাম শুধু ব্যক্তি জীবনে পালনীয় ধর্ম নয়। মুসলমানের জন্য ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিধর্মী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামে যেমন, ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিধান লেখা আছে, তেমনি ইসলামে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত হুকুমও লিপিবদ্ধ আছে। যে মুসলিম শুধু ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করে কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে ধর্ম পালন করে না। বরং রাষ্ট্রকে ধর্মের উর্ধ্বে মনে করে। সে আসলে মুসলিম নয়। বরং সে মুশরিক। সে আল্লাহর কিছু বিধানকে মেনে নিয়েছে আর বিধানের বড় অংশকে অস্বীকার করেছে। তাই সে মুসলিম হতে পারেনি। তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

আপনি যদি নিজেকে মুসলিম মনে করে থাকেন। পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন। জান্নাত ও জাহান্নামে ঈমান রেখে থাকেন। আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করে চির সুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে চান, তাহলে ভাই আপনাকে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে হবে। আপনাকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখেল হতে হবে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করতে পারবেন না। আপনাকে ব্যক্তি জীবনেও ধার্মিক হতে হবে, আর রাষ্ট্রীয় জীবনেও ধার্মিক হতে হবে।

যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করতে বলেছেন এবং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যে বা যারা তাঁর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করবে না, তারা কাফের। আর যারা আল্লাহর কোনো বিধানকে অপছন্দ করবে তাদের কাফের হওয়ার মধ্যেতো কোনো সন্দেহ-ই নেই। তাই আপনি পরকালে মুক্তি পেতে চাইলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে নিতে হবে। যারা আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে কুফরী সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে কোনোভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবেন না। আপনি অস্ত্র হাতে যখন কুফরী সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের পক্ষে দাঁড়ান, তাদেরকে সেল্টার দেন। তাদেরকে নিরাপত্তা দেন। তাদের আদেশকে আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য দেন। তাদের হুকুমে নির্দোশ মুসলিমদেরকে হত্যা করেন। যারা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করতে চায়, তাদের উপর নির্যাতন চালান, তখন আপনার ঈমানটা ভেঙ্গে যায়। খোদাদ্রোহী তাগুত সরকারকে প্রকাশ্য সহযোগিতা করায় আপনিও তাগুতের একজন গোলামে পরিণত হয়ে যান। দুনিয়ার সামান্য কিছু অর্থের লোভে পড়ে চিরস্থায়ী আখেরাতকে হাত ছাড়া করে ফেলেন।

তারা আপনাদেরকে বুঝায় 'মাতৃভূমির ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ'। মাতৃভূমির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে হবে। দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একথাগুলো ইসলাম সমর্থন করে না। মাতৃভূমির ভালবাসা কখনো ঈমানের অঙ্গ নয়। এ কথাটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। অথচ এটি হাদীস নয়। হাদীস বিশারদগণ এটাকে জাল ও বানোয়াট বলেছেন। তাছাড়া জন্মভূমি বা মাতৃভূমির প্রেম সব প্রাণীর অন্তরেই স্বভাবগতভাবে থাকে। ইতর শ্রেণীর প্রাণী কুকুরও তার জন্মস্থানকে ভালবাসে। মুসলিম-কাফের ও মানব-দানব নির্বিশেষে সবার ভিতরেই যে বিষয়টি পাওয়া যায়, সে বিষয়টি কোন যুক্তিতে ঈমানের অংশ হতে পারে?! এই ভিত্তিহীন একটা কথার উপর ভিত্তি করে আপনি উৎসাহিত হচ্ছেন। আর নিজেদের তৈরি কারা জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার সীমানা রক্ষার জন্য নিজেকে কুরবান করে দিচ্ছেন। যে দেশ আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত নয় সে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে আপনার রব আপনাকে আদেশ দেননি। বরং ঐ দেশের বিরোধিতার হুকুম দিয়েছেন। আপনি আপনার রবের অবাধ্য হয়ে রবের কোনো মাখলুকের বাধ্য হতে পারেন না। এর কোনো অধিকার আপনার নেই। কারণ, আপনি কচুরীপানার মত ভেসে আসেননি। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীনভাবে আপনাকে এ ধরার বুকে প্রেরণ করা হয়নি। আপনি এক

মহাপরাক্রমশালী সত্তার দাস। আপনাকে তাঁর হুকুমকেই সর্বত্র প্রাধান্য দিতে হবে। দুনিয়ার মান-ইজ্জত ও অর্থ কড়ির লোভে পড়ে যা ইচ্ছা তা করার অধিকার আপনার নেই। যদি এমন কিছু করেন, তাহলে আখেরাতে তো আপনাকে এর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবেই। আর দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ নির্বাচিত বান্দাদের দ্বারা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন। তাই সতর্ক হোন। দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর নেককার বান্দাদের সাথে যোগ দিন। জিহাদের পথে এগিয়ে আসুন। আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করে দিন। দেশের ভালবাসার উপর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল সা. এবং তাঁর পথে জিহাদের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিন। আপনার রব আপনাকে বলছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" সূরা তাওবা:২৩-২৪

মনে রাখবেন একজন মুমিনের কাছে ঈমান সবচেয়ে বড় সম্পদ। ঈমানের কাছে দেশ কিছুই নয়। এই দেশ এবং দেশের নেতারা একদিন আপনার কোনো কাজে আসবে না। আজ যাদের নির্দেশে আপনি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর হাত তুলছেন, যাদের হুকুমকে আল্লাহর হুকুমের সমতুল্য বানিয়ে তাদের কথায় আল্লাহর বান্দাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে শহীদ করে দিচ্ছেন, কাল কিয়ামাতের দিন তারা আপনার সামান্যতম উপকার করতে পারবে না। আল্লাহ পাক আপনাদের মত ব্যক্তিদের পরকালীন চিত্র আল-কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। স্মরণ কর সেই সময়ে কথা, অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে

এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক। তখন অনুসারীরা বলবে, কতই না ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।" (সূরা বাকারা:৬৫-৬৭)

অতএব, হে ভাই ফিরে আসুন। আল্লাহর পথে ফিরে আসুন। দরবারী আলেমদের অপব্যাখ্যার মারপ্যাঁচে পড়ে নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করবেন না। এখনও সময় আছে আল্লাহর বড়ত্বকে, আল্লাহর রাজত্বকে এবং আল্লাহর হুকুমাতকে মেনেনিন। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর হুকুমাত ও রাজত্ব কায়েম করা আপনারও দায়িত্ব। তাই এই দায়িত্ব পালনের দিকে ফিরে আসুন। মুজাহিদ ভাইদের সহযোগিতা করুন। আখেরাত ও ঈমানকে হেফাজত করুন। আল্লাহ তাআলা প্রতিনিয়ত অগণিত মাখলুককে খাওয়াচ্ছেন। আপনার এই চাকুরী না থাকলেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে খাওয়াবেন। তাই তাগুতের গোলামী ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদদের সাথে যোগ দিন। জিহাদ ও শাহাদাতের অশেষ মর্যাদা হাসিল করুন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

দুনিয়াপ্রীতি-মৃত্যুভীতি

আল্লাহর হাবীব সা. এর বাণী যে মহাসত্য, মহাবাস্তব তা মুসলিম উম্মাহর সাথে কাফেরদের বর্তমান আচরণ এবং মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতি নামের ধ্বংসাত্মক রোগের বিস্তার দ্বারাও প্রমাণিত হয়। সেই দেড় হাজার বছর পূর্বে নবীজী সা. বলেছেন:

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الآكلة على قصعتها قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال قلنا وما الوهن قال حب الحياة وكراهية الموت.

নবীজী সা. এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সা. বলেছেন, "(রকমারি) খাবারে সজ্জিত প্লেটের প্রতি ক্ষুধার্ত খাদকগণ যেমন একে অপরকে আহ্বান করতে থাকে ঠিক তেমন অচিরেই এমন একটা সময় আসবে, যখন দুনিয়ার সব দিক থেকে কাফের সম্প্রদায়ের

এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে তোমাদের (মুসলিম উম্মাহর) বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. সে সময় কি আমাদের মুসলিম উম্মাহর সদস্য সংখ্যা কম হবে? নবীজী সা. বললেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে কিন্তু তোমরা বানের পানির সাথে ভেসে যাওয়া ফেনা ও খড়কুটার মত হয়ে যাবে। তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতি দূর করে দেয়া হবে আর তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' ঢেলে দেয়া হবে। এতদশ্রবণে আমরা বললাম, ওয়াহান দ্বারা উদ্দেশ্য কী? নবীজী সা. বললেন, জীবন প্রীতি ও মৃত্যুভীতি"(মুসনাদে আহমাদ:৫/২৭৮) এই হাদীসের অপর বর্ণনায়, জীবন প্রীতির স্থলে দুনিয়াপ্রীতির কথা উল্লেখ আছে। অবশ্য শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থ একই; মৌলিকভাবে উভয়টার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

দুনিয়াপ্রীতি-মৃত্যু ভীতি, মাত্র দু'টি শব্দ। কিন্তু এই দুই শব্দেই নবীজী সা. আমাদের চলমান বাস্তবতার চিত্রায়ন করে গেছেন। দেড় হাজার বছর পূর্বের পৃথিবী যেখানে নবীজী সা. এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত কিছু স্বর্ণমানব বাস করতেন। যাঁদের মধ্যে দুনিয়ার প্রেম ও মৃত্যুর ভয়ের মত ভয়ংকর রোগের কল্পনাও করা যেত না। যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ওয়াদার উপর এতটাই আস্থাশীল ছিলেন যে, নিজের 'সম্পূর্ণ দুনিয়া' জিহাদের ফাণ্ডে দান করতে কুণ্ঠিত হতেন না, মৃত্যুর খোঁজে, শাহাদাত অন্বেষায় এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, বর্মহীন উদোম শরীরে জিহাদের ময়দানে চলে যেতেন। নববধূর সাথে রাত্রি যাপন করে গোসলের জন্য দেরি করতেও প্রস্তুত ছিলেন না, গোসল না করেই যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হতেন। মদীনার সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারীর সাথে বিবাহের সব রকম ব্যবস্থা হওয়ার পরও বিবাহের জন্য সংগ্রহিত টাকা দিয়ে ঘোরা ও তরবারি ক্রয় করে জিহাদে চলে যেতেন, আর বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যেতেন। এমন একটা পরিবেশে থেকে নবীজী সা. কীভাবে দেড় হাজার বছর পরের পৃথিবীর চিত্র নির্ভুলভাবে চিত্রিত করলেন! এটা মুজেযা বৈ কিছু নয়। বস্তুত আমরা প্রত্যেকেই নবীজী সা. এর জীবন্ত মুজেযার স্বাক্ষী।

১৯২৪ সালে উসমানিয়া খেলাফতের পতনের পর আজ প্রায় একশত বছর হতে চলল। এ সময়ে ধীরে ধীরে এ হাদীসের বাস্তবতা স্পষ্ট হতে লাগল। মুসলিমগণ খেলাফত হারিয়ে অভিভাকশূণ্য হয়ে গেল। রাখাল বিহীন মেষপালের যে অবস্থা হয়, নেকড়ের দল মহোৎসবে মেষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেটাকে খুশি সেটাকে ধরে নিয়ে রসনা-লিপ্সা মিটায়। খলীফাহীন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা তেমনই। বিভিন্ন নামে কাফের সম্প্রদায় ও মুসলিমদের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুরা জোটবদ্ধ হয়েছে। তারা একে অপরকে সঙ্গে নিয়ে

মহাবিক্রমে মুসলিম উম্মাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ফিলিস্তীন, বসনিয়া, চেচনিয়া, সোমালিয়া, মালি, ফিলিপাইন, ঝিংজিয়াং, কাশ্মীর, আফগান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, ওয়াজিরিস্তান, মধ্য আফরিকা, আরাকানসহ দুনিয়ার আনাচে কানাচে সর্বত্র আজ মুসলিম উম্মাহ কাফের নামের নেকড়ের নখরাঘাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ। এসব এলাকায় লাখ লাখ মুসলিমকে শহীদ করা হয়েছে। লাখ লাখ মা-বোনের বেহুরমতি করা হয়েছে। হাজার হাজার বোনকে জারজ সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করা হয়েছে। লাখ লাখ মাসূম বাচ্চাকে কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করানো হয়েছে। আরো লক্ষাধিক শিশুকে পিতা-মাতা হারিয়ে এতীম হতে হয়েছে। হাজার হাজার পরিবারকে নির্মমভাবে নিঃশেষ করে দেয়া হয়েছে। লাখ লাখ পরিবারকে মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ছোট-বড়, মূল্যবান-মূল্যহীন সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিয়ে কোটি কোটি মুসলিমকে সম্বলহীন করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বময় মুসলিমদেরকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করা হচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ সর্ব ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে। "পূর্ণাঙ্গ মুসলিম" পরিচয়ে ইজ্জতের সাথে বাঁচতে দেয়া হচ্ছে না। প্রকৃত মুসলিমের জন্য দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলিমগণ প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। বদলা নেওয়া ও পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার ফিকির করছে না। একটা জাতির আরেকটা জাতি থেকে প্রতিশোধ ও বদলা গ্রহণের যতগুলো উপলক্ষ হতে পারে আজ সব উপলক্ষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলিমগণ প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের পথে অগ্রসর হচ্ছে না। আল্লাহর হুকুম না হলেও স্বভাবজাত ক্রোধের তাড়নায় তাড়িত হয়েও কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু কৈ? পৃথিবীময় মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যতীত কারো মধ্যেই কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় না। সকলে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার জীবনকেই স্বাভাবিক জীবন বলে মেনে নিয়েছে। অন্যায়, গুম, খুন, হত্য, নির্যাতনের বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দটি করার হিম্মত করছে না। সবাই জানে, সকলে বুঝে আজ সে লাঞ্ছিত, সে বঞ্চিত, সে নিপিড়ীত, সে নির্যাতিত, সে লুণ্ঠিত, তার সব কিছু অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়া হচ্ছে, কিন্তু তারপরও সে উঠে দাঁড়াচ্ছে না। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করত এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে না। কেন? কী এর রহস্য ?

এর উত্তরই উল্লেখিত হাদীসে দেওয়া হয়েছে। কারণ একটাই। মুসলিম উম্মাহ আজ ব্যাপকভাবে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতির মধ্যে ফেঁসে গেছে। দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয় এমন দুইটি জিনিস যা একটি অপরটির জন্য আবশ্যক। কারো মধ্যে একটি পাওয়া গেলে অপরটি আবশ্যকভাবে তার মধ্যে পাওয়া

যাবে। যে মৃত্যুকে ভয় পায়, আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যেতে অপছন্দ করে, সে অবশ্যই দুনিয়াকে ভালবাসে, জীবনকে প্রিয় মনে করে। আর যে জীবনকে ভালবাসে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, সে আবশ্যকীয়ভাবে মৃত্যুকে ভয় করে। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে, সে আল্লাহর শত্রু, মুসলিম উম্মাহর শত্রু কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। জিহাদে যাওয়ার মত শক্তি, মনোবল, মানসিকতা সে হারিয়ে ফেলে। সে কাপুরুষ হয়ে যায়। সে তার উপর, অসহায় মুসলিম নর-নারীর উপর, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর কৃত সব সীমালঙ্ঘনকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। সে অপমান, অপদস্থতা আর লাঞ্ছনার সাথে বাঁচতে শিখে। মুসলিম ভাই-বোনের উপর নির্যাতন তার মধ্যে সাড়া জাগায় না। এমনকি নিজ মা বোনের উপরকৃত ঘৃণিত অপরাধও সে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে।

আজ আমরা একেকজন একেকভাবে দুনিয়াপ্রীতির মধ্যে ফেঁসে গেছি। কেউ জেনে বুঝে দুনিয়াকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে দুনিয়ার পিছে ছুটছি। আর কেউ দুনিয়াপ্রীতির অপকারিতা না জেনে না বুঝে দুনিয়ার পিছনে ছুটছি। আবার কেউ অলক্ষ্যেই দ্বীনের আবরণে দুনিয়াকে লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি।

আমাদের সমাজের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ভাইয়েরা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ, মান-ইজ্জত হাসিলের জন্যই পড়ালেখা করে। ছোটবেলা থেকে যারা দুনিয়ার বাড়ি-গাড়ি আর অর্থ সম্পদের স্বপ্ন দেখেই বড় হয়, তাদের জন্য দুনিয়ার মহব্বতে ফেঁসে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ মানুষগুলের সারাটা দিন রিযিকের ধান্ধাতেই কেটে যায়। দিন শেষে যে যে পরিমাণ অর্থ নিয়ে ঘরে ফেরে পরবর্তী দিন তার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই সে ঘর থেকে বের হয়। এভাবে অর্থের মার-পেচে তার জীবনটা কেটে যায়। দ্বীন, সমাজ, উম্মাহ কোনোটা নিয়ে ভাবার মত সুযোগই তার হয় না। সে অর্থের গোলামে পরিণত হয়।

উলামায়ে রব্বানী / হক্কানী

দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক. শুধু আখেরাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তারা শিক্ষা অর্জন করে। কর্ম জীবনেও এই উদ্দেশ্যের উপর অটল অবিচল থাকে। আলেমে রব্বানী হিসাবে তার দায়িত্ব সে পূর্ণমাত্রায় আদায় করে। আল্লাহর শরীয়তকে খুলে খুলে মানুষের সামনে বয়ান করে দেয়। কোনো কিছু গোপন করে না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলায় না। অর্থের লোভ, সম্মানের হাঁতছানি তাকে টলাতে পারে না। মাদরাসায় ছাত্রদের

সামনে, মসজিদে মুসল্লীদের সামনে, ওয়াজের ময়দানে জনতার সামনে, লেখনীর মধ্যে পাঠকের সামনে খুলে খুলে স্পষ্টভাবে সত্যকে বলে দেয়। সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কারো চোখ রাঙ্গানিকে পরওয়া করে না, জালিমের জুলমকে ভয় করে না। অর্থ কিংবা সম্মানহানির ভয়ে সে ভীত হয় না। চাকুরী কিংবা খেদমত ছুটে যাওয়ার শংকায় সে শংকিত হয় না। মাদরাসা রক্ষা, খেদমত রক্ষা, হেকমত, মাসলাহাত ইত্যাদি অজুহাতে ফরযে আইন ইবাদাত জিহাদের আলোচনা বন্ধ করে না। জিহাদপ্রেমী ছাত্র-উস্তাদকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করে না। নিজের সাধ্যানুযায়ী জিহাদের পথে অগ্রসর হয় এবং নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট জনতাকেও এপথে অগ্রসর হতে বলে। নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর জন্য দুআ করে। মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য কায়মনোবাক্যে মুনাজাত করে। জিহাদ ও মুজাহিদীনদের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ও মুহাব্বতে তাদের অন্তর পূর্ণ থাকে। সর্বোপরি “দুনিয়ার মহব্বত সব অপরাধের মূল” এই হাদীস সব সময় তাকে দুনিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সে আখেরাত মুখী জিন্দেগী গড়ে। পরিমিত পরিমাণ সম্পদের উপরই সে সন্তুষ্ট থাকে।

আলেমে রব্বানীর করণীয় সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘তোমরা মিথ্যার সাথে সত্যের মিশ্রণ ঘটাইও না, আর তোমরা জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করছ’ (আল বাকারা:৪২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ .

“আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা।” (আলে ইমরান:১৮৭)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ .

"নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত।" (আল বাকারা:১৫৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

"নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।" (আল-বাকারা:১৭৪)

আলেম নামের যেসব জালেমগণ তাগুতের মর্জিতে ফতওয়া লেখে এবং সেই ফতওয়ায় যারা স্বাক্ষর করার মাধ্যমে তাগুতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহজ করে দেয়, তাদের জন্য বর্ণিত হচ্ছে,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ .

"অতএব তাদের জন্যে ধ্বংস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।" (আল-বাকারা:৭৯)

মুসলিম উম্মাহর হাজতের সময়, প্রয়োজনের সময় শরীয়তের জরুরী কোনো হুকুম যদি কোনো আলেম গোপন করে, মুসলিম জনগণকে না জানায়, তাহলে তার সম্পর্কে হাদীসে কঠিন ধমকি এসেছে, বর্ণিত হচ্ছে,

روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كتم علما يَعلمه جاء يوم القيامة مُلْجَمًا بِلِجَام من نار . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح.

"যে ব্যক্তি (শরীয়তের) এমন কোনো বিষয় (প্রয়োজনের মুহূর্তে) গোপন করবে, যা সে জানে, সে কিয়ামাত দিবসে আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে।" (হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ ও মুস্তাদরাকে হাকেমে বর্ণিত হয়েছে। মান: সহীহ)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা আলেমে রব্বানীর মৌলিক যে গুণটি বুঝে আসল তাহল, কোনো অবস্থাতেই সত্যকে গোপন না করা রবং সত্যকে খুলেখুলে বয়ান করা। মুসলিম উম্মাহর কাছে শরীয়তের বাণী স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া। আলেমে রব্বানীর আরেকটি প্রধানগুণ হল, মুত্তাকী হওয়া। আল্লাহর ভীতি তার মধ্যে গালেব থাকা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সে ভয় করবে না। কারো ভয়ে বা চাপে হক থেকে সড়ে দাঁড়াবে না। কোনো ধরণের জুলম, নির্যাতন,বন্দিত্ব, নির্বাসন তাকে হক বলা থেকে, হক প্রচার করা থেকে টলাতে পারবে না।

দুনিয়াকে সে মাছির পাখা বরাবরও মূল্যায়ন করে না। প্রয়োজন পূরণের জন্য যতটুকু ধন-সম্পদ দরকার ততটুকুর উপর সে সন্তুষ্ট থাকে। দুনিয়ার মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। যেসব জিনিস অজান্তেই দুনিয়াপ্রীতি অন্তরে ঢুকিয়ে দেয়, দুনিয়ায় দীর্ঘ হায়াতের তামান্না অন্তরে প্রথিত করে দেয়, সেসব থেকে সে দূরত্ব অবলম্বন করে চলে। যেমন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট ইত্যাদি ক্রয় বা নির্মাণ, জাঁকজমকপূর্ণ আসবাবপত্র ক্রয়। ধন-দৌলত বাড়ানোর জন্য বিশেষ ফিকির। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

দুনিয়াপ্রীতি বুঝার উপায়

নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দুনিয়ার ধন-সম্পদ গ্রহণ করেছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছেন। অনেক সাহাবী ব্যবসা বাণিজ্যও করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যু ভীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, কারো মধ্যে দুনিয়া প্রীতি আছে কি নেই সেটা প্রমাণিত হওয়ার উপায় কী? কেউ দশটি বাড়ির মালিক। মাসে কোটি টাকা তার ইনকাম। সে আরো টাকা বাড়ানোর ফিকিরে আছে। কিন্তু সে দাবি করছে তার মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত নেই। যেহেতু মহব্বত থাকা না থাকার বিষয়টা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তাই তার দাবিকে তো খণ্ডন করার উপায়ও নেই। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো মূলনীতি বলে দিয়েছেন কিনা যার দ্বারা দুনিয়া প্রীতি-মৃত্যু ভীতি এবং মৃত্যুপ্রীতি ও দুনিয়া ভীতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে?

জি, হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের সূরা তাওবার মধ্যে এমন একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন, যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হবে যে, কে দুনিয়ার মহব্বতে ফেঁসে গেছে? আর কে মৃত্যু ভয়ে কাপুরুষ বনে গেছে? কে দুনিয়ার

মহব্বত মুক্ত যাহেদ আর কে মৃত্যু ভীতি মুক্ত মরদে মুমিন? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান (শাস্তি) আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (তাওবা:২৪)

মানুষ স্বভাবগতভাবে যে আটটি বস্তুর মহব্বতে আক্রান্ত হয় এই আয়াতের মধ্যে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: ১. পিতা-মাতা ২. সন্তান-সন্ততি ৩. ভাই-বোন ৪. স্বামী-স্ত্রী ৫.গোত্র-সম্প্রদায় ৬.সঞ্চিত অর্থ-কড়ি ৭. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-বাণিজ্য ৮.পছন্দনীয় ঘর-বাড়ি। মূলত এই আটটি জিনিসের মহব্বতের সমষ্টিই হল, দুনিয়া প্রীতি বা দুনিয়ার মহব্বত। আর আই আট বস্তুর মহব্বত যখন কারো মাঝে বাসা বাঁধে তখন সে স্বাভাবিক কারণেই মৃত্যুকে ভয় করতে থাকে এবং দীর্ঘ হায়াতের তামান্না করে।

মহব্বত দুই ধরণের। এক. তবয়ী বা স্বভাবগত মহব্বত, তথা উল্লেখিত আট বস্তুর মহব্বত দুই. আকলী বা যুক্তিগত মহব্বত, তথা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ পথে জিহাদের মহব্বত। তবয়ী মহব্বাতের দাবি হল, উপরিউক্ত আট বস্তুর মহব্বতকে যুক্তিগত মহব্বতের উপর প্রাধান্য দেওয়া। আর যুক্তিগত মহব্বতের দাবি হল, তবয়ী ও আকলী মহব্বতের মাঝে সংঘর্ষের সময় আকলী/যুক্তিগত মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া। এই মূলনীতি বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তবয়ী মহব্বতের সীমারেখা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান, ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি ইত্যাদির মহব্বত কতক্ষণ পর্যন্ত লালন করা যাবে, প্রাধান্য দেওয়া যাবে তার সীমা বর্ণনা করে দিয়েছেন। এসবের মহব্বত যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাহে চলতে, আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে গ্রহণ করতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতে প্রতিবন্ধক হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এসবের মহব্বত অন্তরে ধারণ করা যাবে। কিন্তু যখন এসবের মহব্বত আল্লাহর রাহে চলতে, আল্লাহর রাসূলের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে এবং আল্লাহর পথে জিহাদে বের হতে বাঁধা হয়ে দাড়াবে,

প্রতিবন্ধক হবে, তখন কোনো ভাবেই এসবের মহব্বতকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। বরং সেক্ষেত্রে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের মহব্বতকে প্রাধান্য দিয়ে বের হয়ে পড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে এসে পরীক্ষা হয়ে যাবে যে, কে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্ত? আর কে 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্ত নয়? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. মধ্যে হযরত উসমান রাযি. এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ রাযি. অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধনসম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য জিহাদে বের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়নি। কুরআন-সুন্নাহকে পূর্ণ মাত্রায় আঁকড়ে ধরতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ফরযে কেফায়ার জিহাদেও তাঁরা অগ্রগামী থাকতেন। তাঁদের জীবন চরিত এর উপর স্পষ্ট স্বাক্ষ্য বহন করে। আমরা যারা তাঁদের উদাহরণ টেনে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়াচ্ছি, সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছি তারা নিজেকে প্রশ্ন করে দেখি, এখনই যদি বাংলাদেশে পূর্ণমাত্রায় জিহাদের পরিবেশ কায়েম হয়ে যায়, তাহলে আমি আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে জিহাদে বের হতে পারব কিনা? আমার অর্জিত সম্পদ জিহাদের ফাণ্ডে অকাতরে দান করে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর নজীর কায়েম করতে পারব কিনা?

উলামায়ে সূ বা দরবারী আলেম

দুই. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বিতীয় প্রকার হল, যারা শুরু থেকেই দুনিয়া অর্জনের নিয়তে দ্বীন শিখে। কিংবা শিক্ষার সময় তো নিয়ত খাঁটি ছিল কিন্তু পরবর্তীতে যশ-খ্যাতি, অর্থ-কড়ি ও মান-ইজ্জতের লোভে পড়ে দ্বীনী ইলমকে দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। তাগুতের এমপি, মন্ত্রীদের নেকদৃষ্টি (?) লাভের আশায় নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দেয়। ইমামতি, খেতাবত এবং দ্বীনী ও দুনিয়াবী বড় বড় পদের অন্বেষায় তাগুতের দরবারে নিজেকে কুরবান করে দেয়। তাগুতের ইশারা ও মর্জি মোতাবেক তাগুতকে খুশি করার নিমিত্তে 'শান্তির ফতওয়া'র আড়ালে জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আর কেউ কেউ নিজেকে 'শান্তির দূত' প্রমাণ করার জন্য জিহাদ বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগে। তারই ঘনি'কেউ একজন সুন্নতের মাহফিলে তাগুতের বড় মাপের মন্ত্রীর উপস্থিতির কারণে খুশিতে আপ্লুত হয়ে (সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতকে অস্বীকা করে, জিহাদ চলমান থাকার হাদীসগুলোকে অস্বীকার করে) বলে ওঠে "সুন্নত ও শান্তির মাধ্যমেই দ্বীন কায়েম হবে, দ্বীন কায়েমের জন্য এ যুগে ট্যাংক-কামানের কোনো দরকার নেই"। আর কেউ কেউ দ্বীনের লেবাসে,

দ্বীনের খেদমতের নামে দুনিয়ার ধান্ধায় লিপ্ত থাকে। এদের একেক জনের একেক হালত। নিম্নে তাদের কিছু বিশেষ নিদর্শন উল্লেখ করা হল।

দরবারী আলেমের কয়েকটি নিদর্শন নিম্নরূপ;

১. সত্য গোপন করা।
২. সত্যকে মিথ্যার সাথে শংমিশ্রণ করে ফতওয়া দেওয়া।
৩. জিহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করা।
৪. মুজাহিদ ভাইদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।
৫. জিহাদে না যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কল্পিত ওযর পেশ করা।
৬. মুসলিম জনতাকে জিহাদের বিরুদ্ধে উষ্কে দেওয়া।
৭. শরীয়তের দলীল বাদ দিয়ে মনমত বিচার-ফায়সালা করা।
৮. সন্তুষ্টচিত্তে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা।
৯. সাৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকে দায়িত্ব মনে না করা।
১০. দুনিয়ার অর্থ-কড়ি ও মান-ইজ্জতের বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করা।
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উলামায়ে সূদের কাতারে শামিল হওয়া থেকে হেফাজত করেন এবং উলামায়ে রব্বানী ও হক্কানীদের কাতারে শামিল হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মাদরাসার দালান-কোঠার উপরও জিহাদকে প্রাধান্য দিতে হবে

সব কিছুর মহব্বতের উপর যেহেতু আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ রাহে জিহাদের মহব্বতকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাই মাদরাসার উপরও জিহাদকে প্রাধান্য দিতে হবে। 'মাদরাসা' আরবী শব্দ। অর্থ হল, দরসের স্থান, পড়া-লেখার জায়গা। দরস-তাদরীসের যেকোনো স্থানকে ও পড়া-লেখার যেকোনো জায়গাকে মাদরাসা বলা হয়। চাই স্থানটি স্থায়ী হোক কিংবা অস্থায়ী হোক, ছোট হোক কিংবা বড় হোক, পাকা হোক কিংবা কাঁচা হোক, ঝুঁপড়ি হোক কিংবা গাছতলা হোক, ছাত্র কম হোক কিংবা বেশি হোক সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। কোনো স্থানে এক ঘন্টার জন্যও যদি দরস-তাদরীস চালু হয়, তাহলে ঐ স্থানটি এক ঘন্টার জন্য মাদরাসায় রূপ নিবে। মাদরাসা হওয়ার জন্য ৫/১০ তলা বিল্ডিং হওয়া শর্ত নয়। শত শত কিংবা হাজার হাজার ছাত্র উস্তাদের উপস্থিতি শর্ত নয়। শর্ত শুধু তিনটি। এক. বসার উপযোগী একটি স্থান। দুই. ইলম বিতরণের জন্য একজন উস্তাদ। তিন. ইলম গ্রহণের জন্য একজন ছাত্র। বর্তমান কওমী মাদারেসের মডেল 'দারুল উলূম দেওবন্দ'-এর যাত্রা একটি ডালিম বৃক্ষের নিচে একজন উস্তাদ ও একজন ছাত্রের মাধ্যমেই

শুরু হয়েছিল। আরো পিছনে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই, সুফ্‌ফার যাত্রা খেজুর বৃক্ষের পত্র-পল্লব দ্বারা নির্মিত 'ঝুঁপড়ি' তেই শুরু হয়েছিল। মাদরাসা দ্বারা যেহেতু তা'লীম তাআল্লুম মাকসাদ। শরীয়তের ইলমের প্রচার ও হেফাজত উদ্দেশ্য। তাই এই উদ্দেশ্য যেভাবেই অর্জিত হবে, যেখানেই অর্জিত হবে সেটাই মাদরাসা বলে গণ্য হবে। চাই সেটা দশ তলা শানদার ইমারাত হোক কিংবা জীর্ণ কুটির হোক, গাছ তলা হোক অথবা খোলা ময়দান হোক।

প্রচলিত ধারার বড় বড় ইমারাত সমৃদ্ধ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা শরীয়তের জরুরী কোনো বিধান নয়। বরং শরীয়তের মূল বিধান হল, কোনো আলেমের কাছে গিয়ে ইলম অর্জন করা। কোনো রব্বানী আলেমকে জিজ্ঞেস করে, দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করে নেয়া। বিশাল বিশাল দালান-কোঠার মাদরাসা তৈরি করা যেহেতু শরীয়তের জরুরী (ফরয-ওয়াজিব) কোনো হুকুম নয়। অথচ জিহাদ এখন ফরযে আইন। তাই মাদরাসা নামের দালান-কোঠাকে তালাবদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচানোর বাহানায় জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন ইবাদাতের আলোচনা বন্ধ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। মাদরাসা রক্ষার নামে জিহাদপ্রেমী ছাত্র-উস্তাদদেরকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। যারা এমনটি করছেন, তাদেরকে বারবার ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। ফরযে আইন ইবাদাতের বাস্তবায়ন প্রাধান্য পাবে নাকি মাদরাসার দালান-কোঠা প্রাধান্য পাবে? দয়া করে একটু ভেবে দেখুন।

ধরুন, তাগুত সরকার আপনার কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করল যে, হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ছাড়বেন কিংবা মাদরাসা নিয়ে আরামে বসবাস করবেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে মাদরাসা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর মাদরাসা বাঁচাতে চাইলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ছাড়তে হবে। এই দুইটি অপশনের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে হবে। এই দুইটি অপশন যদি আপনাকে দেয়া হয় তাহলে আপনি কী করবেন? মাদরাসা বাঁচানোর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরযে আইন নামায ছেড়ে দিবেন? নাকি মাদরাসা ছেড়ে দিয়ে নামাযের ফরযে আইন হুকুমের উপর আমল করবেন? শরীয়ত কী বলে এবং আপনার যুক্তি কী বলে? শুনে রাখুন, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন সেটা ফরয নামায, রোযা ও হজ্জের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার পায়। জিহাদের প্রয়োজনে নামায, রোযা ও হজ্জকে পিছিয়ে দেয়ার অনুমতি আছে। নামাযের প্রশ্নে যদি আপনি মাদরাসার পরওয়া না করেন, নামায ঠিক রেখে মাদরাসা বন্ধ হওয়াকে মেনে নেন। তাহলে ফরযে আইন জিহাদের প্রশ্নে আপনাকে কী করতে হবে? তখনও কি জিহাদকে মাদরাসার উপর প্রাধান্য দিতে হবে না?

তখনও কি জিহাদকে গ্রহণ করে মাদরাসার সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়াকে মেনে নিতে হবে না?

লাঞ্ছনার জীবন থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী?

এ কথা তো অনস্বীকার্য যে, আজ আমরা মুসলিগণ দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতির কারণে পৃথিবীব্যাপী লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নির্যাতন, নিপীড়ন ও গণহত্যার শিকার হচ্ছি। একজন আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম অবশ্যই এ অবস্থা থেকে বেড় হয়ে আসার উপায় খুঁজবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যার অনুভূতি মরে গেছে, যার হৃদয় মোহরাংকিত হয়েগেছে, যে লাঞ্ছনাকেই সম্মান মনে করতে শুরু করেছে তার কথা ভিন্ন। এখন প্রশ্ন হল, এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী? মুসলিমদের অতীতের সেই স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়ার পথ ও পন্থা কী? শরীয়ত এ ব্যাপারে কী বলে? আল্লাহর হাবীব সা. আমাদেরকে এ সম্পর্কে কী দিকনির্দেশনা দিয়েছেন? আসুন একটু দেখি।

হাদীসের আলোকে উম্মাহর জাগরণের পথ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. (الحديث رواه أحمد (৪৯৮৭) وأبو داود (৩৪৬২) وصححه الألباني في صحيح أبي داود)

“হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী সা.কে বলতে শুনেছি “যখন তোমরা ঈনা নামক সূদী কারবার করবে, বলদের লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর ঐ লাঞ্ছনা তোমাদের থেকে দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।” (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৪৯৮৭, সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-৩৪৬২, শাইখ আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেনছেন।)

হাদীসের ব্যাখ্যা: (যখন তোমরা ঈনা নামক সূদী কারবার করবে) এই নিষিদ্ধ কারবারটি মূলত সূদকে হালাল করার বাহানা স্বরূপ করা হয়ে থাকে। যেমন: সান্টু মিয়া তিন মাস পরে টাকা দেয়ার শর্তে বল্টু মিয়ার কাছে দশ হাজার টাকায় একটি মোবাইল বিক্রি করল। এই বিক্রির কিছুক্ষণ পর সান্টু মিয়া পুনরায় মোবাইলটি বল্টু মিয়া থেকে নগদ নয় হাজার টাকায় ক্রয় করল। এখন

এই কারবারের সারাংশ এই দাঁড়াল যে, সান্টু মিয়া বল্টু মিয়াকে নয় হাজার টাকা দিয়েছে। কিন্তু সে তিন মাস পরে তার থেকে দশ হাজার টাকা ফেরত নিবে। এজাতীয় কারবার সম্পূর্ণ হারাম এবং অবৈধ। আজকাল আমাদের সমাজে এই হাদীসের বাস্তব নমুনা দেখা যাচ্ছে। আমরা বিভিন্নভাবে সূদী কারবারের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি এবং সূদকে হালাল করার জন্য নানা রকম বাহানা ও কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছি।

(বলদের লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে) এ কথা দ্বারা কৃষিকাজ ও কৃষকদেরকে নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং কৃষিসহ অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে যাওয়ার নিন্দা উদ্দেশ্য যে, ব্যবসার ফিকির ও ব্যবসার উন্নতিই তার জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। কৃষি ও ব্যবসাকে আখেরাতের উপর, আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর এবং সবিশেষ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর প্রাধান্য দেয়। যার ফলে কৃষি ও ব্যবসা তার মধ্যে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ইরশাদ হচ্ছে, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল! যখন আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর (অলসতা প্রদর্শন কর এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়), তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" (সূরা তাওবা:৩৮)

(জিহাদ ছেড়ে দিবে) অর্থাৎ দ্বীনের বিজয়ের পথ, ইজ্জতের পথ ছেড়ে দিবে এবং জান,মাল ও যবান দ্বারা জিহাদ করা পরিহার করবে।

(আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন) অর্থাৎ বাহানা অবম্বন করে সূদী কারবারে জড়িত হওয়া, দুনিয়ার কাজ-কর্মকে, ব্যবসা-বাণিজ্যকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং জিহাদ পরিত্যাগ করার কারণে তোমাদেরকে দুনিয়ার সমস্ত জাতির সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

(যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে) অর্থাৎ এই অপমান ও লাঞ্ছনা ততদিন তোমাদের উপর বহাল থাকবে যত দিন না তোমরা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য, আল্লাহর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা পরিহার, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্যদান এবং জিহাদের হুকুমের উপর আমলের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের পথে ফিরে আসবে।

হাদীসের শিক্ষা: সার্বিকভাবে হাদীসটি হাদীসে উল্লেখিত কর্মের উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা ও বজ্র ধমকি আরোপ করছে। কেননা নবীজী সা. সূদী কারবারে

যুক্ত হওয়া, নিন্দিত পন্থায় কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে যাওয়া, দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং জিহাদ পরিত্যাগ করাকে ধর্ম পরিত্যাগ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মত গণ্য করেছেন। তাই বলেছেন, "যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে" যে ব্যক্তি ধর্মের উপর বহাল তবীয়তে আছে, তার তো আর ধর্মে ফিরে আসার প্রয়োজন পড়ে না। যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে বের হয়ে যায়, ধর্ম থেকে সরে দাঁড়ায় তাকেই ধর্মে ফিরে আসতে বলা হয়। তাছাড়া হাদীসে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, জিহাদ পরিত্যাগই এই উম্মাহর লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। আর জিহাদের হুকুম আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই এই উম্মাহ পুনরায় মান-ইজ্জত ও উন্নতীর শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছতে পারবে। (হাদীসটির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: সুবুলুস সালাম, সনআনী:৩/৬৩, নাইলুল আওতার, শাওকানী:৬/২৯৭, শরহু বুলুগিল মারাম, ইবনে উসাইমীন:৪/৩৬)

বর্তমান আমরা হাদীসের বাস্তব চিত্র হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করছি। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এই লাঞ্ছনা ও অপদস্ততার জীবন থেকে আশ্রয় চাই এবং দুআ করি যেন আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহর প্রত্যেক শ্রেণীকে বিশেষ করে উলামা শ্রেণীকে জিহাদের জন্য কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা যেন উলামায়ে কেরামের অন্তরকে জিহাদের ফরযিয়্যাত এবং গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাঁদেরকে যেন ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝে চিরস্থায়ী আখেরাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। জিহাদ ও শাহাদাতের মর্যাদা লাভের মাধ্যমে আখেরাতে সবচেয়ে বেশি সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন।

এই উম্মাহর লাঞ্ছনার অবস্থা কাটিয়ে ইজ্জতের পথে ফিরে আসার একমাত্র পন্থা যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তা নিম্নের আয়াত-হাদীস দ্বারাও বুঝে আসে।

কুরআনের আলোকে উম্মাহর জাগরণের পথ

আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা একটি লাঞ্ছিত ও অপমানিত জাতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে ইজ্জতের পথে ফিরে আসার কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। আসুন আমরা সেই কাহিনীটি পড়ি এবং সেখান থেকে কর্মপন্থা ও শিক্ষা গ্রহণ করি। ইরশাদ হচ্ছে:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (২৪৬) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (২৪৭) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (২৪৮) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (২৪৯) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (২৫০) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (২৫১) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.

সরল অনুবাদঃ মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন।

আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন,-নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন,-নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তূতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।

বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে।

অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন।

আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে।

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।

এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে কুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।” (বাকারা:১৪৬-১৫১)

বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে শিক্ষা

মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে ফেরআউন এর হাত থেকে উদ্ধার করে মিশর থেকে ফিলিস্তীন নিয়ে এলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস তখন এক অত্যাচারী সম্প্রদায়ের

অধীনে ছিল। মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে ঐ অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ দিলেন। জিহাদের মাধ্যমে তাদের দখলদারিত্ব থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র ভূমি উদ্ধারের হুকুম দিলেন। কিন্তু খুব সামান্য কিছু লোক ব্যতীত সকলে জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা বলল, 'হে মূসা তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে রইলাম।' জিহাদ করতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাদেরকে চল্লিশ বছর শাস্তি দিলেন। ঐ পবিত্র শহরের বাইরে একটি ময়দানে তাদেরকে চল্লিশ বছর আবদ্ধ করে রাখলেন। প্রতিদিন সকালে তারা ময়দান ছেড়ে শহরে প্রবেশের ইচ্ছায় পথ চলত, কিন্তু সন্ধায় দেখত, সকালে যেখান থেকে হাঁটা শুরু করেছিল সেখানেই তারা ফিরে এসেছে। এভাবে উদ্ভ্রান্তের মত, দিকবিদিক ঘুরতে ঘুরতে তাদের চল্লিশ বছর কেটেছে। এদিকে যে সামান্য সংখ্যক লোক মূসা আ. এর সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, তাদের মাধ্যমে মূসা আ. ফিলিস্তীনকে কাফের অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে আযাদ করলেন। চল্লিশ বছর শেষে বনী ইসরাঈলের বাকী অংশও বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে এসে বসতি স্থাপন করার সুযোগ পেল।

মূসা আ. এর ইন্তেকালের শতাধিক বছর পর কালপরিক্রমায় এক সময় বাইতুল মুকাদ্দাসের অধিবাসী বনী ইসরাঈলগণ আমালেকা নামক এক দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক নিপীড়ন-নির্যাতন ও লুণ্ঠনের শিকার হল। তারা বনী ইসরাঈলের নারী ও শিশুদেরকে জোর-জবরদস্তী করে দাস-দাসীরূপে ব্যবহার করত। যখন তখন তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করত। তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছে করে দিত। উদ্বাস্তু হিসাবে থাকতে তাদেরকে বাধ্য করত। মোট কথা আমালেকা সম্প্রদায় কর্তৃক তারা সব রকম অত্যাচার, অবিচার আর লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার শিকার হচ্ছিল। এমনই এক অবস্থায় বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নেতাগণ এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে ছিল। 'শক্তিমানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগই একমাত্র সমাধান' এই স্বাভাবিক যুক্তিযুক্ত নীতি তাদের বুঝে আসল। ফলে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করত তৎকালীন নবী হযরত শামবীল আ. এর কাছে আবেদন জানাল, যেন তিনি তাদের জন্য একজন সামরিক নেতা ও রাজা নির্ধারণ করেদেন। তখন তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে 'তালূত' নামক এক ব্যক্তিকে সামরিক নেতা ও বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করলেন। আর এ ঘোষণা তিনি ওহীর মাধ্যমেই করেছেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেকই তালূতকে সামরিক নেতা ও বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল প্রাথমিক দিকে তালূতকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার

বাদশাহীর ব্যাপারে বেশ কিছু নিদর্শন প্রেরণ করায় তারা এক পর্যায়ে তাঁকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নিল।

এবার আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হল। সব দিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। জুলম-নির্যাতনের নিকশ কালো রজনী শেষ হতে চলছে, ন্যায় ও ইনসাফের রবীর উদ্ভাস ঘনিয়ে আসছে মর্মে আনন্দে আপ্লুত হয়ে দলে দলে লোক যুদ্ধাভিযানে শরীক হওয়ার জন্য নাম লেখাল। এক বর্ণনা মতে আশি হাজারের বিশাল বাহিনী তালূতের সাথে যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। জোশ ও জযবার উপর নির্ভর করে তৈরি হওয়া এই বাহিনী সম্মুখ সমরে অস্ত্রেসস্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত এক বাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে কিনা সে জন্য তাদের **ধৈর্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও সাহসের** পরীক্ষা হওয়া ছিল সময়ের দাবি। আল্লাহ তাআলা তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ওহীর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থাপত্র জানিয়ে দিলেন। বাহিনী যখন আমালেকা সম্প্রদায়ের ঘাটিভিমুখ রওনা হল, তখন সামরিক সর্বাধিনায়ক তালূত ঘোষণা দিলেন, (জর্ডান) নদ পার হওয়ার সময় কেউ যেন এক কোষের বেশি পানি পান না করে। যারা এক কোষের বেশি পানি পান করবে তারা যুদ্ধের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর দীর্ঘ পথ পারি দেয়ার পর যখন জর্ডান নদ আসল, আর পিপাসার্ত মানুষগুলো যখন স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির নদ প্রবাহিত হতে দেখল, তখন তারা ধৈর্য ধরতে পারল না, কমান্ডারের হুকুম অমান্য করে অধিকাংশ লোক যে যেভাবে পারল পানি পান করল। সামান্য কিছু লোক কমান্ডারের হুকুম মত এক কোষ পানি পান করে বিরত রইল। আল্লাহ তাআলা এই এক কোষের মধ্যেই বারাকাহ দান করলেন। এক কোষ দ্বারাই তারা পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হল। যারা হুকুম অমান্য করল, তারা নদী পার হতে পারল না। তারা নদীর এ পারেই রয়েগেল। যুদ্ধে শরীক হওয়ার খোশনসীব তাদের হল না। সহীহ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, নদী পার হয়ে যারা যুদ্ধে শরীক হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। বদর যুদ্ধের মুজাহিদ সংখ্যা এবং তালূতের বাহিনীর খাঁটি মুজাহিদ সংখ্যা একই ছিল।

এই অল্প সংখ্যক লোক যখন নদী পার হয়ে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াল তখন তারা দেখতে পেল এক পরাক্রমশালী শত্রু বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায় আছে। এই অবস্থা দৃষ্টে অধিকাংশ লোক ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, আমরা জালূত (আমালেকা সম্প্রদায়ে বাদশা) ও তার সেনাবাহিনীর সাথে লড়ার মত শক্তি এখন রাখি না। তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী পরীক্ষায় সফল হওয়ায় আল্লাহ

তাআলা এই যাত্রায় তাদেরকে রক্ষা করলেন। বাহিনীর মধ্য থেকে যারা ঈমান-আমল, তাকওয়া ও আখেরাত প্রীতিতে অগ্রসর ছিল এবং প্রিয় মাওলার সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির ছিল, তারা বলল, 'ভ্রাতাগণ! পৃথিবীর ইতিহাসে আল্লাহর রহমতে ছোট ছোট অনেক বাহিনী বড় বড় অনেক বাহিনীর উপর জয় লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। তোমরা ধৈর্যের সাথে অটল-অবিচল থাক। আল্লাহর সাহায্যে আমরাই জয়যুক্ত হব।' এই নসীহত তাদেরকে যারপর নাই উপকৃত করল। তারা ময়দান ছেড়ে পলায়নের চিন্তা বাদ দিল। তাদের অন্তরে পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার উপর আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা তৈরি হল। এরপর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল, তখন তারা দুআ করল 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ-আর আমাদের সাহায্য কর এই কাফের জাতির বিরুদ্ধে।'

শুরু হল যুদ্ধ। এক অসম যুদ্ধ। এক পক্ষে মাত্র ৩১৩জন মুজাহিদ। তাদের হাতে উল্লেখ্যযোগ্য অস্ত্রও নেই। অপর পক্ষে হাজার হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা। সব রকম আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এক বাহিনী। দম্ভ-অহংকারে পরিপূর্ণ এক সেনাদল। তারা পদপিষ্ট করেই এই ৩১৩জনকে চিরতরে খতম করে দিতে চায়। কিন্তু না, দুনিয়া বদরের পূর্বে আরেক বদরের চিত্র অবলোকন করল। আসলে বদরের বাহিনী এবং এই বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সেনা সংখ্যা কোনো দিক দিয়েই কোনো পার্থক্য করা যায় না। উভয় বাহিনীই আল্লাহর মনোনীত বাহিনী। উভয় বাহিনীই আল্লাহর প্রেরিত বান্দাদের দিকনির্দেশনায় সুষ্ঠ-সুচারু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। উভয় বাহিনীর লক্ষ্য একই ছিল, নির্যাতিত-নিপিড়ীত, ঘরদোর থেকে বহিষ্কৃত উম্মাহকে কাফের-জালেমদের হাত থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এক ইনসাফপূর্ণ, আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা পরিচালিত পৃথিবী উপহার দেয়া। আল্লাহর দ্বীনকে ইজ্জত ও সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই বাহিনীর উপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়া ছিল অবধারিত বিষয়। আর ঘটেছেও তাই।

দাউদ আ. তখন যুবক। নবুয়তপ্রাপ্ত হননি। তিনিও ৩১৩-এর একজন ছিলেন। যখন যুদ্ধ শুরু হল। উভয় দল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন দাম্ভিক জালূত অগ্রসর হয়ে মল্ল যুদ্ধের আহ্বান জানাল। বনী ইসরাঈলদের পক্ষ থেকে হযরত দাউদ আ. অগ্রসর হলেন। তিনি তাঁর নিজের হাতে তৈরি বিশেষ অস্ত্র জালূতের ললাট লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। এক আঘাতেই জালূত ধরাশায়ী হল। জালূতের সেনাবাহিনী জালূতের করুণ অবস্থা দেখে সাহস হারিয়ে ফেলল। তারা আর দেরি না করে তখনই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। আমালেকা সম্প্রদায় পরাজিত হল। বনী ইসরাঈল লাঞ্ছিত ও

বঞ্চিত জীবন থেকে মুক্তি পেল। তারা ইজ্জত ও বাহাদুরীর জীবনে ফিরে আসল। তাদের এই সম্মানজনক অবস্থা বহু দিন বহাল থাকল। দাউদ আ. এবং তাঁর পরবর্তীতে সুলাইমান আ. এর যমানার ইতিহাসই এর সাক্ষ্য বহন করে।

ঘটনার মৌলিক শিক্ষা:

এই ঘটনা থেকে বহু শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার আছে। আল্লাহ তাআলা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যই ঘটনাটি কুরআনে বর্ণনা করেছেন। তবে আমরা আমাদের অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগুলো নিয়েই আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

একটি জাতি যখন অপরাপর শক্তিমান জাতিগোষ্ঠী দ্বারা নিপীড়িত, নির্যাতিত, লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপদস্থতার শিকার হবে, তখন তারা ঐ অপমান ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হয়ে কী ভাবে ইজ্জত ও সম্মানের জীবন ফিরে পাবে, তার অব্যর্থ ফরমূলা এই ঘটনার মধ্যে উল্লেখ আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি হারানো ঐতিজ্য, ইজ্জত-সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য শক্তি মানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। জিহাদ ও কিতালের পথই বেছে নেয়া হয়েছে। আর এই জিহাদের পথেই হারানো ঐতিজ্য, লুণ্ঠিত সম্মান ও সম্পদ, হৃত ইজ্জত ফিরে পাওয়া গেছে।

শিক্ষা নং ১: শুধু মাত্র জিহাদ ও কিতালের পথেই কুফফারদের শক্তি ধ্বংস করা সম্ভব। আর কুফফারদের শক্তি ধ্বংস করার মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলিমদের উত্থান সম্ভব। আর এভাবে ও এ পথেই মুসলিম উম্মাহর সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব। জিহাদ ও কিতাল বাদ দিয়ে অন্যান্য আমল কস্মিনকালেও মুসলিম উম্মাহকে তাদের এই করুণ দূরাবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। তাবলীগ, দাওয়াতুল হক, দাওয়াতুল ইসলাম, তাযকিয়ায়ে নফস এসব শিরোনামে যেসব নেক আমল চলছে তার সাথে জিহাদ ও কিতালকে সমন্বয় করতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, কুফরী শক্তিকে শুধু দাওয়াত দ্বারা পরাজিত করা যায় না। কুফরী শক্তির তরবারীর বিরুদ্ধে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে পাল্টা তরবারী চালালেই কুফরী শক্তির দম্ভ-অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। যদি শুধু দাওয়াত-তাবলীগ দ্বারাই দ্বীন কায়েম হয়ে যেত, কুফরী শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত, তাহলে নবীজী সা. এর দাওয়াত দ্বারাই এসব হত। কারণ, তাঁর চেয়ে বড় কোনো দায়ী পৃথিবীতে আসবেন বলে তো কল্পনাও করা যায় না। আর শেষ জমানায় খেলাফত কায়েমের জন্য যে ইমাম মাহদী এবং ঈসা আ. আসবেন

তাঁরাও দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ও কিতালের পথকেই বেছে নিবেন। হাদীসে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা আছে।

শিক্ষা নং ২: সবর ও তাকওয়ার গুণে গুনান্বিত অল্প সংখ্যক মুমিনও যদি তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাঁতে দাঁড়িয়ে যায়, নিজেদের সাধ্যানুযায়ী রুখে দাঁড়ায়, তখন অবধারিতভাবে তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হবে। আল্লাহ তাআলা নিজস্ব আসমানী বাহিনী দ্বারা এমন কিছু ঘটিয়ে দিবেন যার কারণে কাফেরদের বিশাল বাহিনীও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হবে।

শিক্ষা নং ৩: আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয়কে ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন; সেনা সংখ্যার আধিক্য কিংবা অস্ত্রের আধুনিকতার সাথে মুসলিমদের বিজয়কে শর্তযুক্ত করেননি। ইরশাদ হচ্ছে: "তোমরা হিনবল হয়ো না, পেরেশান হয়ো না, **তোমরাই হবে জয়ী যদি তোমরা মুমিন হও"** (আলে ইমরান:১৩৯)

ঈমান, তাকওয়া ও সবরের গুণসম্পন্ন একশত সদস্যের মুজাহিদ বাহিনীর সাথে তাগুতের বিশ হাজারের বাহিনীও পেরে উঠবে না। কারণ, চোখের দেখায় তো মুজাহিদদেরকে একশত জন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই শতজনের পিছনে যে না-দেখা এক বিশাল 'মালাইকা বাহিনী' তৎপর রয়েছে তার কি কেউ খবর রাখে? সেই না দেখা স্পেশাল বাহিনীর আঘাতে তাগুতের সমস্ত শক্তি, দম্ভ-অহংকার মাটিতে মিশে যাবে ইনশাআল্লাহ। মুমিনদের জন্য বিজয় সুনিশ্চিত। তাগুত ও কাফেরদের জন্য পরাজয় অবধারিত। আল্লাহ তাআলার মনোনীত বাহিনীর সাথে তাগুতী বাহিনী কখনোই পেরে উঠবে না। কস্মিনকালেও তাগুত সফলকাম হবে না। সাময়িক সফলতায় তারা আনন্দিত হলেও অচিরেই তাদের দুঃখের সময় আসছে। গযওয়াতুল হিন্দের চূড়ান্ত অবস্থা ঘনিয়ে আসছে। হিন্দুস্তানের ভূমি থেকে কাফের ও তাগুতী শক্তির নিঃশেষ হওয়ার সময়ও এগিয়ে আসছে। খুরাসান ও অনান্য অঞ্চলের মুজাহিদ ভাইগণ হিন্দুস্তানের প্রতি শুভদৃষ্টি দিচ্ছেন। তাঁরা হিন্দুস্তান নিয়ে ফিকির করছেন। 'আলমী মুজাহিদগণ' বিভিন্ন ইস্যুতে হিন্দুস্তান নিয়ে কথা বলছেন। এসব আমাদের অন্তরে আশার আলো জাগায়।

বাংলায়ও পরিবর্তন শুরু হয়েছে

আমাদের বাংলায়ও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। 'হলি আর্টিজানের' মত কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ড যদিও আমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু এ ঘটনা দ্বারা একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তা হল, বাংলার দামাল ছেলেরা, বাংলাদেশী

যুবকরা আল্লাহকে ভালবাসতে শিখছে। আল্লাহর জন্য জান-মাল উৎসর্গ করার সবক অর্জন করতে শিখছে। দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ, যশ-খ্যাতির উপর লাথি মেরে আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে শিখছে। 'শাহাদাত পিয়াসা'র মত বিরোচিত সাহাবাগুণে গুনান্বিত হতে তৈরি হচ্ছে। মৃত্যুপ্রীতি ও দুনিয়াভীতির মত মহানগুণ অর্জনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যে জাতি মৃতুপ্রীতি ও দুনিয়াভীতির মত মহানগুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে, সেই জাতিকে দুনিয়ার কোনো শক্তি-পরাশক্তি দমাতে পারবে না। তাদের বিজয় কেউ রুখতে পারবে না। এর প্রকিষ্ট উদাহরণ হল, আফগান তালেবান। তালেবান ভাইদের দেখে এখনও যারা শিখছে না, তাদের মত নির্বোধ আর কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না।

ও আমার প্রিয় যুবক ভাই! তুমি কী করছ? তুমি কি দেখছ না আরাকান, কাশ্মীর, আফগান, সিরিয়া, ফিলিস্তীনে তোমার মুসলিম মা-বোন কাফেরদের দ্বারা ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে! তুমি কি দেখছ না নরখাদক বৌদ্ধগুলো নিষ্পাপ শিশুটিকে আগুনে ঝলসে গোশত ভক্ষণ করছে? তুমি কি দেখছ না ওরা তোমার ভাইকে পুড়ে গ্রীল বানাচ্ছে! তোমার ভাই বোনদের বাড়িগুলো জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দিচ্ছে! তাদের সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে! টনকে টন বোমা ফেলে আধুনিক শহরগুলোকে হাজার বছরের পুরোনো ভৌতিক রাজ্যে পরিণত করছে! মসজিদ-মাদরাসাগুলোকে বিরান ভূমিতে পরিণত করছে! প্রতিদিন প্রতিনিয়ত দুনিয়ার কোনো না কোনো প্রান্ত থেকে মাজলুমানের আহাজারী ও আর্তনাদ ভেসে আসছে তা কি তুমি শুনছ না? বন্ধু! যদি শুনে থাক, যদি দেখে থাক, তুমি যদি উম্মাহর একজন দরদী সদস্য হয়ে থাক, তাহলে তোমার রব তোমাকে মজলুমানদের উদ্ধারের যে দায়িত্ব দিয়েছেন সে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হচ্ছ না কেন? আল্লাহর দ্বীন কায়েমের ফরয দায়িত্ব কেন তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ? শুধু নামায, রোযা আর হজ্জ-যাকাত আদায় করেই তুমি পার পেয়ে যাবে ভাবছ? না বন্ধু, কখনোই এটা সম্ভব নয়। ফরযে আইন জিহাদকে অবহেলা করে কখনো পার পাওয়া যাবে না।

প্রিয় বন্ধু! অগ্রসর হও। এমন জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হও যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মত। এই ক্ষণস্থায়ী মান-সম্মান ও সম্পদের মায়া ত্যাগ কর। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের মহব্বতকে সব কিছুর উর্ধ্বে রাখ। মুজাহিদদের জন্য তৈরিকৃত এমন একশত তলা সুরম্য অট্টালিকার মালিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, যার প্রত্যেক তলার ব্যাপ্তি আসমান ও জমিনের ব্যাপ্তির মত হবে। তোমার জন্য অস্থির চিত্তে অপেক্ষমান (৭২জন) হুরে ঈনার সঙ্গ অবলম্বনের পথে অগ্রসর হও। এমন হুরে ঈনার বিবাহের জন্য

প্রস্তুতি গ্রহণ কর, যার মাথার উড়নাটাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে মূল্যবান। যার মুখের লালার মিষ্টতায় সমুদ্রের পানিও মিষ্টি হয়ে যাবে। যে দুনিয়ায় উঁকি দিলে তেজস্বী সূর্যের আলো আক্ষরিক অর্থেই ম্লান হয়ে যাবে। প্রিয় ভ্রাতা! আল্লাহর প্রকাশ্য রহমত ও মাগফিরাতের পথে অগ্রসর হও। এমন এক মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হও যার আকাঙখা স্বয়ং নবীজী সা. করেছেন। এমন এক মৃত্যুর পথ বেছে নাও, যার মাধ্যমে তুমি চির হায়াত লাভ করবে। তোমাকে 'মৃত' বলার উপর আসমানী নিষেধাজ্ঞা জারি হবে। মনে রেখ বন্ধু! তুমি জিহাদে বের হলে তোমার হায়াত যে দশ বছর কমে যাবে তা নয়, আর ঘরে বসে কাতরাতে কাতরাতে কাপুরুষের মৃত্যুর অপেক্ষা করলে তোমার হায়াত যে দশ বছর বেড়ে যাবে তাও কিন্তু নয়। তাহলে হে প্রিয়! কেন তুমি শাহাদাতের মত মর্যাদাময় মৃত্যুর অন্বেষায় বের হবে না? আসো, ইজ্জতের পথে আস। সম্মানের পথে আসো। জিহাদ ও শাহাদাতের পথে আসো। তোমার মত যুবাদের আজ উম্মাহর খুব দরকার। আরাকান, আফগান, কাশ্মীর, সিরিয়া, ফিলিস্তীনে উম্মাহর অবলা, অসহায় নারী-শিশুগণ তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। তুমি তাদেরকে আশাহত কর না। তোমার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দগুলো উম্মাহর অবলা-অসহায় নারী-শিশুদের জন্য কুরবান করে দেও। বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অশেষ অসীম জান্নাত হাসিল করে নেও। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আল্লাহর রাহে জান-মাল বিলানোর মত হিম্মত দান করুন। আমীন।

বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হক কি বড় দলের সাথে?

"عليكم بالسواد الاعظم " "لايجتمع امتى على ضلالة يدالله على الجماعة"

'তোমরা বড় দলের সাথে থেক' 'আমার উম্মত গোমরাহীর উপর একত্রিত হবে না, জামাআতের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে' অনেক ভাইকে দেখা যায় উল্লেখিত হাদীসের বরাত দিয়ে সত্যের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করছে। হাদীসের অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য না জেনে না বুঝেই তারা এমনটি করে। যদি তারা এই হাদীসগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য জানত তাহলে হয়তো হকের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত না। যেহেতু অনেকেই এই হাদীসগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য নাজেনেই এই হাদীসগুলোর কথা বলে হকের দাওয়াতকে এড়িয়ে যাচ্ছে, সেহেতু তাদের জন্য উল্লেখিত হাদীসগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা জরুরী মনে করছি।

'সাওয়াদুল আ'জম' এর সঙ্গে থাকার নিদের্শ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হক ও হকপন্থীদের সাথে থাকা। আর হক হল, ঐ জিনিস যা কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমাউস সালাফের মুয়াফেক হয়। দল বড় হওয়া, মানুষ বেশি হওয়া ও সংখ্যায় অধিক হওয়া কখনো হক ও সত্যের আলামত বহন করে না। প্রত্যেক যুগে সত্যাশ্রয়ী ও হকপন্থীদের সংখ্যা কমই ছিল। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর যুগে এক থেকে সোয়ালাখ সাহাবীই হকের উপর ছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ তখন কুফর ও অসত্যের উপর ছিল। তাবেয়ীনদের যুগে কায়েক লাখ তাবেয়ী হকের উপর ছিল। পৃথিবীর বাকী মানুষ কুফর ও অসত্যের উপর ছিল। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের যুগে খলকে কুরআনের মাসআলায় ইমাম আহমাদ ও তাঁর কিছু অনুসারী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালীন খলীফা ও খলীফার অনুসারী মুসলিমদের সিংহভাগই তখন অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইরত মিশর ও শামের অল্প কিছু মুজাহিদই তাতাড়ি ফেতনার সময় হকের সঙ্গী ছিল। তখন মুসলিম উম্মাহর বড় অংশই তাতারিদের সঙ্গে অন্যায় সন্ধি ও আঁতাত করার মাধ্যমে হক থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ দখল করার পর হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ মুসলিমদের বড় একটা অংশ ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। তারা তখন অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী ও জিহাদের প্রবক্তা অল্প সংখ্যক মুসলিমই তখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোট কথা যখন যারাই 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন তারাই আহলে হক। চাই তাদের সংখ্যা কম হোক বা বেশি হোক, চাই তারা আহলে দেওবন্দ হোক কিংবা সাধারণ জনতা হোক, চাই তারা নির্ধারিত কোনো মাযহাবের অনুসারী হোক কিংবা সালাফের অনুসারী হোক, চাই তারা উপমহাদেশের মানুষ হোক কিংবা আরব, আফরীকা অথবা ইউরোপের অধিবাসী হোক। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, আর একজন যদি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকে তখন ঐ একজনই আহলে হক এবং ঐ একজনই 'সাওয়াদে আ'জম' ঐ একজনই 'জামাআত'। তখন অন্যান্যরা এই একজনের অনুসরণের ব্যাপারে আদিষ্ট। এই একজনের সঙ্গ অবম্বনের নির্দেশপ্রাপ্ত।

হযরত আমর বিন মাইমূন আল-আওদী রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْأَوْدِيُّ: صَحِبْت مُعَاذًا بِالْيَمَنِ، فَمَا فَارَقْته حَتَّى وَارَيْته فِي التُّرَابِ بِالشَّامِ، ثُمَّ صَحِبْت مِنْ بَعْدِهِ أَفْقَهَ النَّاسِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود فَسَمِعْته يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ سَمِعْته يَوْمًا مِنْ الْأَيَّامِ وَهُوَ يَقُولُ:

سَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ وُلَاةٌ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، فَهِيَ الْفَرِيضَةُ، وَصَلُّوا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ، قَالَ: قُلْت: يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَا أَدْرِي مَا تُحَدِّثُونَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْت: تَأْمُرُنِي بِالْجَمَاعَةِ وَتَحُضُّنِي عَلَيْهَا ثُمَّ تَقُولُ لِي: صَلِّ الصَّلَاةَ وَحْدَك وَهِيَ الْفَرِيضَةُ، وَصَلِّ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَهِيَ نَافِلَةٌ، قَالَ: يَا عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ قَدْ كُنْت أَظُنُّك مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، أَتَدْرِي مَا الْجَمَاعَةُ؟ قُلْت: لَا، قَالَ: إنَّ جُمْهُورَ الْجَمَاعَةِ هُمْ الَّذِينَ فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ، الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْت وَحْدَك،

"আমি ইয়ামানে মুআয বিন জাবাল রাযি. এর সঙ্গ অবলম্বন করেছি। শামে তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সঙ্গ ত্যাগ করিনি। অতঃপর 'আফকহুননাস' আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। আমি তাকে একদিন বলতে শুনলাম 'তোমরা জামাআতের সাথে থাক, কেননা জামাআতের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে।' এরপর আরেক দিন আমি তাকে বলতে শুনলাম 'অচিরেই এমন সব লোকজন তোমাদের আমীর হবে যারা নামাযকে বিলম্বিত করবে। তখন তোমরা নিজেরা একাকী সময়মত নামায আদায় করে নিবে, সেটা হবে ফরয। আর তাদের সাথেও নামাযে শরীক হবে, সেটা হবে নফল।' এ কথা শুনে আমি বললাম, আপনি কী বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। তিনি বললেন, কী বুঝতে পারছ না? আমি বললাম, আপনি আমাকে মুসলিমদের জামাআতের সাথে থাকতে বলছেন, জামাআতকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করছেন, অপরদিকে আমাকে একাকী নামায পড়তে বলছেন, আবার বলছেন, সেটাই হবে ফরয। আর মুসলিমদের জামাআতের সাথে যে নামায পড়ব সেটা হবে নফল?! বিষয়টা আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তখন তিনি বললেন, হে আমর! আমি তোমাকে অত্র এলাকার সবচেয়ে বড় ফকীহ মনে করতাম অথচ তুমি এই সহজ বিষয়টা বুঝতে পারলে না?! মুসলিমদের জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য কী তুমি জান? আমি বললাম না, দয়াকরে আমাকে রাহবারী করুন। তখন তিনি বললেন, যে বা যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তারাই জামাআত, যদিও তুমি একা হওনা কেন, আর অধিকাংশ মানুষ আজ জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়েগেছে।" (এ'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন)

লোক বেশি হওয়া, দল বড় হওয়া যে হক্কানিয়াতের লক্ষণ নয়, সে ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে:

আয়াত নং-১:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

“যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে। (আনআম:১১৬)

আয়াত নং-২: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ “কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না” (হুদ:১৭)

আয়াত নং-৩: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ“কিন্তু অধিকাংশ মানুষই শুকরিয়া আদায় করে না” (আল-বাকারা:২৪৩)

আয়াত নং-৪: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ“আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ বান্দা খুবই কম” (সাবা:১৩)

দ্বিতীয় হাদীস: ‘আমার উম্মত গোমরাহির উপর একমত হবে না, আর আল্লাহর সাহায্য জামাআতের সাথে রয়েছে’ এই হাদীসের মধ্যে উম্মত দ্বারা উম্মতের সর্বশ্রেণীর সদস্য উদ্দেশ্য নয়। বরং উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মতের উলামা, ফুকাহা ও মুজতাহিদগণ। অর্থাৎ কোনো যুগেই এই উম্মতের সমস্ত আলেম কোনো বাতিল বিষয়ের উপর একমত হবে না। তবে কোনো কোনো আলেম বাতিলের উপর একমত হতে পারে। ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন,

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي في سننه : " وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ."

“এই হাদীসে জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ফকীহ, আলেম ও মুহাদ্দিসগণ’

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেছেন,

قال الملا علي القاري : " الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق ، والمراد إجماع العلماء ، ولا عبرة بإجماع العوام ؛ لأنه لا يكون عن علم ". انتهى

“এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে মুসলিমগণ যে বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছবেন সেটা হক। আর মুসলিমদের ঐক্যমত দ্বারা উলামাদের ইজমা উদ্দেশ্য। সাধারণ মুসলিমদের ঐক্যমতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ, তাদের ইজমা বা ঐক্যমত ইলমের ভিত্তিতে হয় না।” (মিরকাত:২/৬১)

আল্লামা শাতেবী রহ. বলেছেন, “সাধারণ মুসলিমদের ইজমা গ্রহণযোগ্য না হওয়া ব্যাপারে কোনো ফকীহর দ্বিমত নেই” (আল-ইতিসাম:১/৩৫৪)

আবূ শামাহ আল-মাকদিসী রহ. বলেছেন,

قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى : " حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعة ، وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والمخالف كثيراً ؛ لأن الحق

....

الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ". انتهى "الباعث على إنكار البدع والحوادث" صـ ٢٢.

“কুরআন-সুন্নাহর যেখানেই মুসলিমদের জামাআতের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানেই জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সত্যের সঙ্গে থাকা, হকের সঙ্গ অবলম্বন করা। যদিও সত্য পথের পথিক কম এবং বিরোধী বেশি হোকনা কেন। কারণ, মূলত হক বা সত্য হল ঐ আকীদা ও মানহাজ যার উপর মুসলিমদের প্রথম জামাআত তথা নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদের আকীদা-মানহাজের উপর চলার পর বাতিলপন্থীদের আধিক্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।”(আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদেস পৃ.২২)

আল্লামা সা’দী রহ. পূর্বে উল্লেখিত সূরা আনআমের ১১৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে:

" ودلت هذه الآية ، على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله ، ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق ، بل الواقع بخلاف ذلك ، فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً ، الأعظمون عند الله قدراً وأجراً ، بل الواجب أن يستدل على الحق والباطل ، بالطرق الموصلة إليه ". انتهى "تفسير السعدي" (١ / ٢٧٠)

“এই আয়াত দ্বারা বুঝে আসে, কোনো দল বা মতবাদের অনুসারী বেশি হওয়া হক হওয়ার লক্ষণ নয়। এমনিভাবে কোনো দল বা মতবাদের অনুসারী কম হওয়া সেই দল বা মতবাদ বাতিল হওয়ার আলামত নয়। বরং বাস্তবতা এর বিপরীত। কারণ, বাস্তবতার আলোকে প্রমাণিত, হকের অনুসারীরা পৃথিবীতে সংখ্যায় কম হয় আর আখেরাতে আল্লাহর কাছে মর্যাদায় বেশি হয়। হক বা বাতিল প্রমাণ করার জন্য এমন দলীল পেশ করা জরুরী যা হক বা বাতিলকে স্পষ্ট করে দিবে।” (তাফসীরে সা’দী, সূরা আনআম:১১৬)

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ফুযাইল বিন ইয়ায রহ. বলেছেন,

الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ، وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ". انتهى وينظر: "الأذكار" للنووي صـ٢٢١،

“সত্যের পথ আঁকড়ে ধর, সত্যপথের পথিকের স্বল্পতায় তুমি বিষন্ন হয়ো না, গোমরাহীর পথ থেকে বেঁচে থাক, গোমরাহদের আধিক্যে তুমি ধোঁকা খেয়ো না।” (আল আযাকার, নববী পৃ.২২১)

হে ভাই! কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের দলীল সমৃদ্ধ কোনো বিষয় যখন আপনার সামনে পেশ করা হয়, তখন 'আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ তো এটা বলে না' 'আমাদের মরুব্বী উলামাগণ তো এ ব্যাপারে কিছু বলছেন না' 'আপনাদের পক্ষে তো উল্লেখযোগ্য কেউ নেই' 'যদি আপনাদের মতামত সত্যই হতো তাহলে কেন বাংলাদেশের লাখ লাখ আলেম এ ব্যাপারে নিশ্চুপ' 'কেন ওমুক ওমুক আলেম এর উল্টো বলেছেন' এ জাতীয় কথা বলে হকের দাওয়াতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। হকের অনুসারীর সংখ্যা সবসময় কম ছিল এবং কিয়ামত তক কমই থাকবে। যা কিছু কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাউস সাহাবার মুয়াফেক তাই হক। যা কিছু কুরআন, সুন্নাহ, কিংবা ইজমাউস সাহাবার খেলাফ তা-ই না হক, তা-ই পরিত্যাজ্য। অতএব, দলীল সমৃদ্ধ কোনো আলোচনাকে 'সাওয়াদে আ'জমের' সাথে থাকার কিংবা 'জমাআতের' সাথে থাকার বাহানায় ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে আদিষ্ট। কোনো আলেম বা আল্লামার অনুসরণের জন্য আদিষ্ট নই। হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله

' বড় ব্যক্তিদের মাধ্যমে হক চেনা যায় না। তুমি প্রথমে হক কী তা জান, তাহলে আহলে হক কারা তাও জানতে পারবে'। (ফায়যুল কাদীর:১/১৭, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন:১/৫৩)

বি.দ্র. হক জানার ক্ষেত্রে আল্লাহভীরু হক্কানী আলেমদের সহযোগিতা নিতে হবে। অন্যথায় গোমরাহীর আশংকা আছে। ইলম অর্জনের মাধ্যম হিসাবে আমরা উলামায়ে কেরামকে গ্রহণ করবো এবং উপযুক্ত শ্রদ্ধা করব। কিন্তু তাঁদের কাউকে দলীলহীন অন্ধঅনুসরণ করব না।

তাই মূল বিষয় জানতে শিখুন। শিকড়ে ফিরে আসার চেষ্টা করুন। গতানুগতিক ধারা থেকে বেড়িয়ে আসুন। আপনার আখেরাতকে বরবাদীর হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনার। শাইখ, উস্তাদ বা পীর কর্তৃক হক প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পরও, শাইখের বিভিন্ন আচরণ দ্বারা শাইখ তাগুতের হাতে বিকিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হওয়ার পরও আপনি কীভাবে ঐ শাইখ বা উস্তাদের অনুসরণ করছেন? আপনার শাইখ/পীর কি আপনার আখেরাতের জিম্মাদারি নিবেন? তার নিজেরই তো মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। এমনটা মনে করার সুযোগ নেই যে, অমুক আল্লামা যেহেতু হাজার হাজার উলামা-তলাবার শাইখ, অমুক পীরের যেহেতু হাজার হাজার মুরীদ আছে, তাই তার

হকের উপর অবিচল থাকাও নিশ্চিত। মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি দ্বারা হক মাপা একটি ভুল চিন্তা ধারা। হক দ্বারা ব্যক্তিকে মাপতে শিখুন। তাহলেই হকের উপর টিকে থাকা যাবে ইনশা আল্লাহ।

এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী

প্রিয় বন্ধু! এই শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী। পুরো পৃথিবীময় ইসলামের বিজয়কে নিশ্চিত করে সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়ের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়ন করবেন ইনশাআল্লাহ। চক্ষু যাদের আছে তাদের দেখিয়ে দিতে হয় না। আমেরিকার আবিষ্কৃত গালি 'জঙ্গী আর সন্ত্রাসী' দ্বারা যেসব মুজাহিদীনদেরকে গালি দেয়া হচ্ছে দিন দিন তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে না বৃদ্ধি পাচ্ছে? ২০০১ সাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কত হাজার কোটি ডলার জঙ্গী নিধনে ব্যয় করা হয়েছে তার কোনো হিসাব আছে? এখন সতের বছর পর এসে ফলাফলটা কী দাঁড়াল? জঙ্গী সব ধ্বংস হয়েগেছে? সন্ত্রাস নির্মূল হয়েগেছে? নাকি জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের শক্তি ২০০১ এর তুলনায় আরো দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে? বাস্তবতা তো বলে জঙ্গীদের সব রকম শক্তি ও সক্ষমত বৃদ্ধি পেয়েছে আপনার কী মনে হয়? পৃথিবীর সমস্ত কুফরী শক্তি তাদের অত্যাধুনিক সব মারাণাস্ত্র ব্যবহার করেও বিগত ১৭ বছরের দীর্ঘ লড়াইয়ে নিঃস, অসহায় জঙ্গীদের দমন করতে পারে নি। আপনি কী মনে করছেন তারা আর পারবে? মোটেও না। দ্বীন বিজয়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। দেশে দেশে জিহাদের পতাকা উড্ডীন হচ্ছে। সমস্ত বিশ্বকে নিয়ে একটা খেলাফত কায়েমের বিড়াট উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তালেবান ও আলকায়েদা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। জুলম ও অত্যাচারের রজনী যত গভীর হচ্ছে, ইনসাফের সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্ত ততো ঘনিয়ে আসছে। হয়তো আগামী এক দশকের ভিতরই পৃথিবীর মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন হবে। আফগানে আমেরিকার কবর রচিত হয়ে গেছে প্রায়। এখন কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুঁকে দেয়ার বাকি মাত্র। তালেবান ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই যে উপমহাদেশের চিত্র পাল্টে যাবে, উপমহাদেশের মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন উপমহাদেশের জিহাদী শক্তিগুলো যে প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্রসর হবে সেটা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

তুমি হতভাগ্যদের দলভুক্ত হয়ো না

বন্ধু! তোমার সামনে গযওয়াতুল হিন্দের বাহিনী হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। খুরাসানের বাহিনী ইমাম মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ করে

দেয়ার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছে, তারা তাদের তরবারীর ধার শেষ বারের জন্য পরীক্ষা করে নিচ্ছে। শামের বাহিনী 'আল-গুতায়' ইমাম মাহদীর হেডকোয়ার্টার তৈরির কাজ করছে। ইয়েমেনে ১২ হাজারের বাহিনীও প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। তোমার সামনে ইসলাম তার সর্বশেষ বিজয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে, আর তুমি কিনা শাইখ আর পীর পূজার বাহানা দিয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করছ! প্রিয় ভাই আমার! ইতিহাসের দর্শক ও শ্রোতা না হয়ে ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের একজন হও। ইসলামের এই সর্বশেষ বিজয়ে তুমি কিছুটা হলেও অবদান রাখ। তুমি অংশগ্রহণ কর আর না কর ইসলাম ঠিকই দুনিয়াব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এই মহানবিজয়ে তুমি যদি কিছুটা ভূমিকা রাখতে পার, তাহলে তুমি হবে ধন্য, সম্মানিত, সৌভাগ্য মণ্ডিত। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে,'যখন পুরো পৃথিবী আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল, আল্লাহর দ্বীনের আলোকে দুনিয়া থেকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে হামলে পড়েছিল, তখন আল্লাহর রহমতে আমি ঐ সব কাফেলার সঙ্গী হতে পেরে ছিলাম যারা নিভু নিভু প্রদীপ হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিল। যারা নিজেদের ঈমানী তাকাত আর সমর শক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কুফুরী শক্তিকে পরাস্ত করেছিল, সেদিন যে কাফেলা দ্বীনের বিজয় সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল আমি ছিলাম তাদের একজন।' আর যদি তুমি দর্শক কিংবা বিরোধীদের ভুমিকা পালন কর, তাহলে তুমি হবে হতভাগ্য, লাঞ্ছিত অপমানিত ও তিরষ্কৃত। তাই বন্ধু সমস্ত দ্বিধা-দন্ধ কাটিয়ে অগ্রসর হও। বিজয়ের পথে অগ্রসর হও। দাওয়াত-জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অগ্রসর হও। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

না জেনে, যাচাই না করে জিহাদী কাফেলার বিরুদ্ধাচরণ

সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলাম। কারণ, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, শরীয়ত সম্পর্কে জানে না। কিন্তু বড় আফসূস লাগে যখন দেখি আমাদের সমাজের বড় বড় আল্লামা ও মুফতীগণ না জেনে, যাচাই না করেই জিহাদী কাফেলাগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছেন। কেউ আল-কায়েদা, তালেবানসহ সমস্ত জিহাদী কাফেলাকেই না হক, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী গোষ্ঠী বলে প্রচার করে। আবার কেউ কেউ তালেবানকে হক মনে করে, কিন্তু আল-কায়েদাকে না হক ভাবে। আবার কেউ নাহক মনে করেই ক্ষ্যান্ত থাকে না, বরং আল-কায়েদাকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের চর, এজেন্ট ও দালাল মনে করে। তাদের এই সব মনে করা-না করার ভিত্তি হল, কাফের, ফাসেক ও মিথ্যুক সংবাদিকদের লিখিত সংবাদ। তারা জানে তারা অনলাইন কিংবা অফলাইনে যেসব সংবাদপত্র পড়ে, যেসব

....

সংবাদপত্রের উপর তারা নির্ভর করে, তার সম্পাদক, সহসম্পাদক, সংবাদ সংগ্রাহক, সংবাদ লেখক ও পরিবেশক সকলেই হয়তো কাফের নয়তো ফাসেক-ফাজের। তারা একথাও জানে কাফের বা ফাসেকের সংবাদ যাচাই বাছাই না করে গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। যাচাই নাকরেই ফাসেকদের সংবাদ গ্রহণ করা, বিশ্বাস করা নাজায়েয। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

"হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক-পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।" (সূরা হুজুরাত:৬)

নিছক ফাসেকদের লিখিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে এমন এক মুসলিম সম্প্রদায় যারা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য, মজলুম উম্মাহকে কাফেরদের জুলম থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে দ্বীন ও উম্মাহর জন্য কুরবান করে দিচ্ছে, তাদেরকে কীভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানদের চর বা এজেন্ট আখ্যায়িত করা যেতে পারে? কোনো মুসলিমকে কাফেরদের চর বা এজেন্ট বলা আর তাকে কাফের বলা কি এক জিনিস নয়? যে মুসলিম কাফেরদের চর হবে, তাদের এজেন্ট হবে, তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে কি কাফের হয়ে যাবে না? তাহলে কীভাবে কাফের ও ফাসেকদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে আল-কায়েদা তালেবানের মত প্রসিদ্ধ জিহাদী সংগঠনকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের চর আখ্যা দিয়ে পরোক্ষভাবে তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করার সাহস করা হয়?! আমরা এবং সারা দুনিয়ার মানুষ বাহ্যিকভাবে এটাই দেখছি যে, আল-কায়েদা ও তালেবান পৃথিবীর বিভিন্ন ফ্রন্টে কাফের ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। ইসলামের একটি মূলনীতি হল, 'বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে ফায়সালা করা হবে'। আপনাকে যখন কেউ আল-কায়েদা, তালেবান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন আপনি ইসলামের সর্বস্বীকৃত এই নীতির উপর ভিত্তি করে হলেও তো, তাদের সম্পর্কে ভাল কথা বলতে পারেন কিংবা চুপ থাকতে পারেন। আপনি জিহাদ বিরোধিতায় আপনার পারদর্শিতা দেখানোর জন্য কুরআনের আয়াত এবং ইসলামের সর্বস্বীকৃত নীতি লংঘনেও দ্বিধা করছেন না। কেন? জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন?

শাইখ উসামা রহ. এর শাহাদাতের পরে একজন বড় মুফতী সাহেবকে ভরা মজলিসে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, শাইখ উসামা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তখন তিনি বললেন, 'আমি তাকে জমানার শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ এবং শ্রেষ্ঠ শহীদ মনে করি।' এরপর ২০১৭ সালে এসে এই মুফতী সাহেবই শহীদ শাইখের নিজ হাতে গড়া সংগঠন আল-কায়েদা সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করছেন। ছাত্রদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, আল-কায়েদা ইহুদী নাসারাদের এজেন্ট! তারা মুসলিমদের সাথে ধোঁকাবাজী করছে ইত্যাকার আরো অনেক কথা। কী দ্বিমুখী নীতি! সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘদিনের পরিচালককে মুজাহিদ ও শহীদ বলে স্বীকৃতি দেয় আবার কিছু দিন পর একই সংগঠনকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের এজেন্ট বলে! তাও আবার শরীয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কোনো দলীল ছাড়াই।

হে শ্রদ্ধেয়! আপনাদের থেকেই তো আমরা জেনেছি যে, দলীল ছাড়া কোনো মুসলিম সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কোনো মুসলিম সম্পর্কে দলীল ছাড়া খারাপ ধারণা বা বদজন পোষণ করা কবীরা গুনাহ। আপনারাই আজ অহরহ এই কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হচ্ছেন কেন? নাকি আপনারা করলে 'গুনাহ আর গুনাহ' থাকে না! সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, "সন্দেহ এসেগেলে দণ্ডবিধি প্রয়োগ কর না, কেননা ইমামের জন্য শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে মাফের ক্ষেত্রে ভুল করা উত্তম।" (আবূ দাউদ, কিতাবুল হুদুদ) এই হাদীস দ্বারা বুঝে আসে, কোনো মুসলিম সম্পর্কে দলীল ছাড়া ভাল মন্তব্য করতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু দলীল ছাড়া খারাপ মন্তব্য করা যাবে না। ভাল মান্তব্য করতে গিয়ে ভুল করা, মন্দ মন্তব্য করতে গিয়ে ভুল করার চেয়ে শ্রেয়।

যারা তালেবানকে হক মনে করে কিন্তু আল-কায়েদাকে নাহক মনে করে তাদেরকে বলছি, আপনারা কি জানেন যে, আল-কায়েদা আফগান তালেবানেরই একটি অংশ? শাইখ উসামা রহ. তাঁর জীবদ্দশায় আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. এর হাতে বাইয়াতবদ্ধ ছিলেন। তিনি মোল্লাহ উমর রহ. এর দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক আল-কায়েদা পরিচালনা করতেন। শাইখের শাহাদাতের পর আল-কায়েদার বর্তমান মাসউলে আম শাইখ আইমান আযযাওয়াহেরী হাফিজাহুল্লাহ প্রথমে মোল্লা উমর রহ. এর হাতে বাইয়াতবদ্ধ হন। তাঁর ইন্তেকালের পর মোল্লা আখতার মানসূর রহ. এর হাতে বাইয়াত হন। তাঁর শাহাদাতের পর তালেবানের বর্তমান আমীর শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মোল্লা হেবাতুল্লাহ আখন্দ যাদাহ হাফিজাহুল্লাহ এর হাতে বাইয়াতবদ্ধ হন। মোট কথা আল-কায়েদা আফগান তালেবানের একটা

স্পেশাল ইউনিট। তালেবান আফগানকে শত্রুমুক্ত করে সেখানে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা চালাচ্ছে। আর আল-কায়েদা তালেবানের নেতৃত্বে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে মজলুমদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা জাগিয়ে জিহাদের পরিবেশ কায়েম করছে। আল-কায়েদা তালেবান ভাই ভাই। তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। দুনিয়া ব্যাপী ইসলামী খিলাফত কায়েমের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তারা একত্রে মিলেমিশে কাজ করে যাচ্ছে। উভয়ের আকীদ-মানহাজ এক ও অভিন্ন। অতএব, তালেবানকে হক মনে করলে অপরিহার্যভাবে আল-কায়দাকেও হক মনে করতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ নেই। তবে হ্যাঁ, এই এস বা ইরাকের ইসলামিক স্টেটের সাথে আল-কায়েদা ও তালেবানের কোনো সম্পর্ক নেই। রবং আই এস, আল-কায়েদা, তালেবানের শত শত মুজাহিদকে বিভিন্ন ফ্রন্টে হত্যা করেছে। তাই অতীতযুগের খারেজীদের গুণেগুণান্বিত আই এস কে আল-কায়েদা, তালেবান নিজেদের শত্রু জ্ঞান করে।

আর যারা আল-কায়েদা তালেবানসহ পৃথিবীর সমস্ত জিহাদী কাফেলাকেই নাহক, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী মনে করছে, তাদের কে বলছি, আপনি কি জানেন নবীজী সা. বলেছেন,

عن جابر بن سمرة عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابةٌ من المسلمين حتى تقوم الساعة عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال : قال رسولُ الله –صلى الله عليه وسلم– : « لا تَزالُ طائفة من أُمّتي يقاتِلون على الحق ظاهرين إِلى يوم القيامة ، فينزل عيسى ، فيقول أميرُهم : تعالَ صَلِّ لنا ، فيقول : لا ، إِنَّ بعضَكم على بعض أمراءُ ، تكرمةَ الله هذه الأمةَ ».

হযরত জাবের বিন সামুরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, এই দ্বীন কায়েম থাকবে আর কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত এই দ্বীনের উপর মুসলিমদের একটি দল যুদ্ধ করতে থাকবে।" সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯২২

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজী সা.কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একটি দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। এক সময় ঈসা আ. নেমে আসবেন। তখন মুজাহিদীনদের আমীর (ইমাম মাহদী) তাঁকে বলবেন, আসুন নামাযের ইমামতি করুন। ঈসা আ. বলবেন, না, আপনি-ই ইমামতি করেন...' (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯২৩)

আর সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

“কাফেররা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে, যদি তারা সক্ষম হয়।”

এই আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীস দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, কিয়ামত অবধি কাফেরদের সাথে মুসলিমদের কিতাল তথা যুদ্ধ চলতে থাকবে। অতএব, নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মুজাহিদ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এই জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাবেন।

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে একটি কাফেলা জিহাদের উপর অটল-অবিচল থাকবে এই মর্মে কুরআনের আয়াত এবং মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা আলোচনা সংক্ষিপ্ত করণার্থে একটি আয়াত ও দুইটি সহীহ হাদীসের উপর ক্ষ্যান্ত করলাম। আপনি যদি কুরআনে বিশ্বাসী হয়ে থাকেন, নবীজী সা. এর হাদীসকে বিশ্বাস করে থাকেন, যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এমন একটি দল আছে যারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সেই দলটি যদি আল-কায়েদা, তালেবান না হয়ে থাকে, তাহলে সেটি কোন দল? আল-কায়েদা, তালেবান ব্যতীত এমন কোন দল আছে যারা যুগ যুগ ধরে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং বিজয়ী অবস্থান ধরে রেখেছে? বর্তমান বিশ্বে যদি আল-কায়েদা তালেবান ছাড়া সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যকোনো জিহাদী কাফেলা আপনার জানামতে থেকে থাকে, তাহলে তাদের কথা মুসলিম উম্মাহকে জানান এবং উম্মাহর দরদী সেই দলটিকে সব রকম সহযোগিতা করার জন্য উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাদের সাথে বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ পরিহার করুন। কিন্তু আপনাদের থেকে তো এমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাহলে কি এই আশংকাই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকারের জিহাদ ও মুজাহিদীনদের অস্তিত্ব বহাল থাকা সংক্রান্ত আয়াত ও মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসগুলোকেই আপনি অস্বীকার করেন? যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তাহলে আপনি কি পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হবেন না? আপনার ঈমান কি ধ্বংসের সম্মুখীন হবে না? নাকি আপনি ‘আল্লামা’ ‘শাইখুল হাদীস’ ‘মুহিউস সুন্নাহ’ ‘আমীরুল উমারা’ ‘আমীরুল মুজাহিদীন (?)’ ‘প্রধান মুফতী’ ‘নায়েবে মুফতী’ ‘মহা পরিচালক’ ইত্যাদি লকবধারী হওয়ায় চিরজীবন হেদায়াতের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার সনদ পেয়ে গেছেন? আপনি শত শত উলামা-তলাবার মুরুব্বী হওয়ায়

আপনার কর্ম, মন্তব্য ও চিন্তাধারা কুরআনের আয়াত, সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবে-এমন নিশ্চিয়তা আপনি কোথায় পেলেন? দয়া করে দলীলসহ আমাদেরকে জানালে বাধিত হব।

হক ও নাহক দল কীভাবে চিনবেন?

যেকোনো দল ও কাফেলা তারা হক নাকি নাহক তা চিনার উপায় কী? আমি কি আমার মস্তিষ্ক, ইচ্ছা ও খাহেশাতের উপর নির্ভর করেই যেকোনো দলকে হক বা নাহকের সনদ দিয়ে দিব, নাকি ইসলামে হক নাহক বুঝার কোনো মাপকাঠি আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই যেকোনো দল, গ্রুপ, তায়েফা ও কাফেলার হক ও নাহক হওয়ার মাপকাঠি আছে। আর তা হল 'আকীদা ও মানহাজ'। যেকোনো দলের হক্কানিয়াত নির্ভর করে সহীহ আকীদা ও মানহাজের উপর। ঈমান ও আকীদাই মূল জিনিস। ঈমান আকীদাকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর মানুষ শতধা বিভক্ত। কাফেরকে কাফের বলি তার কুফরী আকীদার কারণেই। মুসলিমকে মুসলিম বলা হয় সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের কারণেই। তাই বুঝাগেল হক ও নাহকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় হল আকীদা ও মানহাজ। যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবিহী' এর অনুরূপ হবে, যাদের ঈমান ও আমল সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর ঈমান-আমলের সাথে মিলবে শুধু তারাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হবে। এ কথা আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি।

যাদের আকীদাও সহীহ মানহাজও সহীহ তারা পরিপূর্ণ হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর যাদের আদীকা সহীহ কিন্তু মানহাজ বা কর্মপন্থা ভুল তারা পরিপূর্ণভাবে হকের উপর নেই। বরং ক্ষেত্র বিশেষ তারা গোমরাহ। যেমন, আমাদের এদেশে অনেকে ইসলামের নামে গণতন্ত্র করে, তাদের অনেকের আকীদা সহীহ। কিন্তু মানহাজ ভুল। কারণ, তারা গণতন্ত্রের কুফুরী পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখছে। গণতন্ত্রকে কুফরী স্বীকার করার পরও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনকে শরীয়তের দলীল ছাড়াই তারা জায়েয মনে করে। যে নির্বাচনে আলেম-জাহেল, অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ, নারী-পুরুষ, মুসলিম-কাফের সবার ভোট এক পাল্লায় মাপা হয়, দ্বীন কায়েমের নামে সেই পূতিগন্ধময় নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? যেন তারা এ কথা ভুলেই গেছে যে, এই দ্বীন যে পবিত্র সত্তা সপ্ত আসমানের

উপর থেকে পাঠিয়েছেন, সেই একই সত্তা এই দ্বীন কায়েমের পদ্ধতিও আসমান থেকে পাঠিয়েছেন। যেই পদ্ধতির উপর মাত্র ২৩ বছর আমল করে নবীজী সা. পুরো আরব উপদ্বীপের মত বিশাল ভূখণ্ডকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছিলেন, সেটা কখনোই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছিল না। সেটা ছিল দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি। এই দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমেই যুগে যুগে দ্বীন কায়েম হয়েছে, দ্বীন বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কোথাও দ্বীনের বিজয় সূচিত হয়নি। গণতন্ত্রী উলামাদের সামনে আলজেরিয়া ও মিশরের ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না। বরং তাদের কেউ কেউ নতুন করে স্বঘোষিত সেক্যুলার আফগান, সোমালিয়া এবং সিরিয়ায় আমাদের মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে সৈন্য ও অস্ত্র দ্বারা কাফের-মুরতাদদের মদদকারী এরদোগানের মধ্যে আশার আলো (?) দেখছে । তার দু'একটি ভাল কথা ও কাজ দ্বারা নুতন করে খেলাফত কায়েমের ধোঁকা খাচ্ছে। যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, তাদের উপর নির্দয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা খুবই সংগত ও স্বাভাবিক। আমাদের দেশে যেসব উলামায়ে কেরাম গণতন্ত্রের পিছনে ছুটছেন এবং বিভিন্ন বাহানা ও অজুহাত দেখিয়ে গণতন্ত্রকে হালাল করার অপচেষ্টা করছেন, তাদেরকে আমি দাওয়াত ও জিহাদের শাশ্বত পথে ফিরে আসার উদাত্ব আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

আমাদের জানামতে আল-কায়েদা, তালেবান পূর্ণাঙ্গরূপে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা-মানহাজই লালন করে। যেহেতু আল-কায়েদা সম্পর্কে আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম মোটেই জানে না, সিংহভাগ উলামায়ে কেরাম নাজেনেই আল-কায়েদাকে নাহক ও গোমরাহ বলে থাকে, তাই আমরা আল-কায়েদা উপমহাদেশের বাংলাদেশ শাখা 'আনসার আল-ইসলাম'-এর ওয়েব সাইট থেকে নেয়া তাদের 'আচারণবিধি' এখানে পেশ করা ভাল মনে করছি। যেন সত্যসন্ধানীগণ 'আচরণবিধির' মাধ্যমে আল-কায়েদার স্বচ্ছ আকীদা-মানহাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে এবং 'আচরণবিধিতে' লিখিত নীতিগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করে আল-কায়েদার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায়। কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই আমি আল-কায়েদা উপমহাদেশের 'আচরণবিধি'টা হুবহু তুলে ধরলাম।

(এই 'আচরণবিধি' আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখার বাংলাদেশ বিভাগ 'আনসার আল-ইসলাম' তাদের ওয়েব সাইট www.dawahilallah.com-**এ প্রকাশ করেছে।)**

আচরণবিধি

(আল-কায়েদা উপমহাদেশ)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণ, তাঁর বংশধর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর।

প্রথম কথা

জুলম, ফাসাদ এবং ফেতনার যে আঁধার রাত্রি সব দিকে থেকে ছেয়ে আছে, তার সমাপ্তি আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাঝে রেখেছেন। এই জিহাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদাত এবং বর্তমান সময়ের চাহিদাও বটে। আবার এটাও পরিষ্কার যে, জিহাদের একটি লক্ষ্য কুফরের শক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা; সাথে সাথে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল, মুসলমানদের পথপ্রদর্শন, রক্ষা ও তাদের কল্যাণকামিতা। এই দুইটি লক্ষ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী এবং একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল। কোনো একটি লক্ষ্য অর্জ ত্রুটিবিচ্যুতি রেখে অন্য লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আজ এই ভূখণ্ডে এমন জিহাদী আন্দোলন আগের থেকে আরো বেশি প্রয়োজন যা উল্লেখিত দুইটি লক্ষ্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হবে। এমন আন্দোলন নিঃসন্দেহে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ হবে এবং জুলম ও ফাসাদের এই কালো রাত্রিকে শরীয়তের আলোকিত ভোরে পরিণত করার মাধ্যম হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং, সব মুজাহিদ এবং জিহাদী জামা'আতের শরয়ী ফরয এটাই যে, তারা নিজেদের সব কার্যক্রম এই দুই লক্ষ্যের চারপাশে আবর্তিত রাখবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিহাদের কর্মপদ্ধতি কী হওয়া উচিত? জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের এই 'আচরণবিধি' এই কর্মপদ্ধতিকে পরিষ্কার করার এক প্রচেষ্টা। আমরা এখানে এটা উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি যে, জিহাদ একটি সম্মিলিত ইবাদাত এবং এতে কোনো একজন মানুষ বা জামা'আতের কার্যক্রম বিশেষভাবে শুধু ঐ মানুষ বা জামা'আতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি ময়দানে থাকা সমস্ত মুজাহিদ এবং পুরো উম্মতকে প্রভাবিত করে। এ জন্য আমরা যেমন জামা'আতের সাথে সর্ম্পকিত একজন মুজাহিদকে এই আচরণবিধির পুরোপুরী অনুসারী বানাই, তেমনিভাবে

ভ্রতৃস্থানীয় অন্য জামা'আতগুলোর কাছেও আমাদের আবেদন তারা যেন সবাই মিলে জিহাদের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য নিজেদের শরয়ী দায়িত্ব আদায় করে। যাতে এই বরকতময় কাজে আমরা একজন আরেকজনের সহযোগী হই এবং সকলে মিলে এমন সব বিষয়গুলোকে বন্ধ করতে পারি যা এই পুরো ভূখণ্ডে জিহাদী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর। যদি আমরা সততার সাথে এই সম্মিলিত দায়িত্ব পূরণ করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের এই জিহাদী সফর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপযুক্ত হবে এবং এই ভূখণ্ডে নির্যাতিত উম্মতের নুসরত, মুসলমানদের হেদায়েত এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদের কারণ হবে ইনশাআল্লাহ।

ভূমিকা

'জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ' 'জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ' (যা আল-কায়েদা নামে পরিচিত) এর একটি শাখা। এটি হিজরী ১৪৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে বেশিরভাগ ঐ সব মাজমূয়া জামাআতের সাথে সংযুক্ত হয়েছে যেগুলো বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদের অধীন জিহাদরত ছিল। এই জামা'আত কেন্দ্রীয় জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদের আমীরের আনুগত্যের অধীন। এর পরিসর বার্মাসহ ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পূর্ণ ভূখণ্ড যার মাঝে বিশেষভাবে তিনটি বড় দেশ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই জামা'আত জামাআত কায়েদাতুল জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনা মোতাবেক জিহাদ করছে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক মোতাবেক এখন জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের বিস্তারিত আচরণবিধি প্রকাশ করা হচ্ছে।

জামাআত কায়েদাতুল জিহাদের আমীর শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ এর পক্ষ থেকে কার্যকর 'জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশিকা' কে মূল ভিত্তি রেখে এই আচরণবিধিকে প্রস্তুত করা হয়েছে। একইভাবে, অন্যান্য জিহাদী আলেমদের ফতওয়া এবং অর্ধশতাব্দীর চেয়েও বেশি জিহাদের অভিজ্ঞতা থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই ডকুমেন্টে কোথাও কোথাও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে। জামাআতের শুরা সদস্যদের সম্মতিক্রমে এই পরিবতন জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের আমীর করতে পারবেন। জামা'আতের সাথে সংযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি হোক সে কোনো সাধারণ মুজাহিদ কিংবা কোনো দায়িত্বশীল- এই আচরণবিধি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবে। এর বিপরীত কোনো কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে, তাতে জামাআতের

আমীর ও শুরা সদস্যগণ কৈফিয়ত চাওয়া বা হিসাব নেওয়ার অধিকার রাখবেন।

আচরণবিধিতে ব্যবহৃত পরিভাষার ব্যাখ্যা:

জামা'আত: এই পরিভাষা থেকে এখানে উদ্দেশ্য জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ। যাকে সংক্ষেপে 'আলা-কায়েদা উপমহাদেশ' বলা হয়ে থাকে। যেখানে জামা'আতের সাথে আমীর, নায়েবে আমীর এবং শুরা সদস্য ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে জামাআত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের আমীর, নায়েবে আমীর ও শুরা সদস্য উদ্দেশ্য।

শরীয়াহ বিভাগ: এর দ্বারা উদ্দেশ্য জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশের ঐ বিভাগ যা উলামায়ে কেরামদের নিয়ে গঠিত এবং যার দায়িত্ব শরয়ী বিষয়ের দিকনির্দেশনা।

আচরণবিধির উদ্দেশ্য

এই আচরণবিধির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল,

১. জামা'আতের সাথে সংযুক্ত মুজাহিদদেরকে জিহাদী আমলের গণ্ডী দেওয়া এবং এমন কিছুকে টার্গেট বানানো থেকে তাদেরকে দূরে রাখা যা শরীয়তে জায়েয হতে পারে কিন্তু জিহাদী আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর অথবা অলাভজনক।
২. জিহাদের ময়দানে সমস্ত মুজাহিদদের টার্গেট বাছাই করণ এবং পদ্ধতির ঐক্যসাধনের জন্য খোলাখুলি আহ্বান জানানো।
৩. সাধারণ মুসলমানদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অবহিত করে তাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেওয়া।

প্রথম অনুচ্ছেদ: জামা'আতের লক্ষ্য

১. তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া অর্থাৎ ইবাদাত থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার জন্য খাঁটি করার ডাক দেওয়া।
২. শরীয়তে মুহাম্মাদী সা. ও নবুয়্যাতী পদ্ধতির খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা ও একে শক্তিশারী করা এই লক্ষ্যেরই অংশ।
৩. সমস্ত অধিকৃত ইসলামী ভূখণ্ড এবং বাইতুল মুকাদ্দাসসহ সব ইসলামী পবিত্র স্থানগুলোকে কাফেরদের দখল থেকে মুক্ত করা।

৪. অত্যাচার, অধিকার হনন এবং শোষণের রাস্তা বন্ধ করা এবং এমন ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা, ন্যায়পরায়ণতা ও কল্যাণ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে।
৫. মুসলমানদের দ্বীন, জান, ইজ্জত ও সম্পদের হেফাজত ও রক্ষা করা। একইভাবে দুনিয়ার সমস্ত মাজলুমদেরকে সাহায্য করা।
৬. কাফের ও তাগুতদের জেলে বন্দী সকল মুসলিম ভাই ও বোনদের মুক্ত করা।
৭. উম্মতের ধনসম্পদকে লুটেরা শক্তীর হাত থেকে মুক্ত করা এবং মুসলমান জনসাধারণের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ছড়িয়ে দেওয়া।
৮. দেশ, জাতী ও ভাষার প্রতিমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে আলোকিত করা এবং এক উম্মতের ধারণাকে জাগরিত করা।
৯. আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জান্নাত অর্জন যাকে আল্লাহ তাআলা জিহাদের পথে দৃঢ় থাকার সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, 'তোমাদের কি ধারণা তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।' সূরা আলে ইমরান-১৪২

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জামা'আতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি

১. আল-কায়েদা উপমহাদেশ বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং শরীয়তকে কার্যকর করার জন্য কিতাল ফী সাবীলিল্লাহকে ফরয মনে করে এবং এই জামাআত কিতাল করতে গিয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করে না।
২. জামা'আত শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য দাওয়াত ও কিতালকে আবশ্যকীয় মনে করে এবং চেষ্টা করে যে, এই দুইটি যাতে একটি আরেকটিকে শক্তিশালী ও উন্নত করার কারণ হয়।
৩. জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য জামা'আত নিজেকে শরীয়তের ঐসব স্পষ্ট নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে যা সালাফে সালেহীন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। ফল স্বরূপ: (ক) জামাআত শরীয়তের শত্রুদেরকে হত্যা করা, এদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা এদের সম্পদকে গনিমত বানানোর জন্য কোনো তা'ওয়ীল বা অস্পষ্ট কোনো অভিব্যক্তিকে ভিত্তি বানায় না। বরং শরীয়তের সুস্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত দলীলকে ভিত্তি বানায়। (খ) জামা'আত সরাসরি যুদ্ধ ময়দানে নিয়োজিত নিজস্ব মুজাহিদদের এই সীমায় সীমাবদ্ধ রাখে যে, তারা যেন শত্রুর সাথে

আচরণের জন্যও শরীয়তের মূলনীতি অনুসরণ করে এবং অসঙ্গত তা'ওয়ীল এর ভিত্তিতে কোনো সন্দেহ জনক বিষয়ের অনুসরণ থেকে দূরে থাকে। কাজেই কোনো ব্যক্তির জান ও মাল সন্দেহজনক অবস্থায় থাকলে জামা'আত নিজ সাথীদেরকে উম্মতের ফকীহ আলেমদের বিবৃত প্রতিষ্ঠিত নীতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার আদেশ দেয়।

৪. জামা'আত প্রত্যেক ঐসব লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানানো অথবা হত্যা করা থেকে বিরত রাখে যাকে মারা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে জিহাদের ক্ষতি বেশি হয় এবং লাভ কম হয় অথবা যা মুসলিম উম্মাহর উপলব্ধির বাইরে এবং মুসলিম উম্মাহকে জিহাদ থেকে দূর করে দেয়।

৫. জামা'আত প্রত্যেক ঐসব পন্থায় অর্থ-কড়ি নেওয়া থেকে বিরত রাখে যার কারণে জিহাদ ও মুজাহিদদে বদনাম হয়। ফলে (ক) জামা'আত এমন কাফের ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া থেকে বিরত রাখে যা শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয কিন্তু ঐ ব্যক্তি গরীব এবং মাজলুম শ্রেণীর মানুষ; যার অর্থ-সম্পদ নেওয়ার ফলে ইসলাম ও জিহাদের ভাবমূর্তি বিকৃত হওয়ার আশংকা থাকে। কারণ, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্য গরীব, অভাবী এবং মাজলুম শ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর জুলম থেকে মুক্ত করে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা। (খ) জামা'আত গনিমতের তালিকায় সুস্পষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা বানায়, যার মাল নেওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ হয় না।

৬. একইভাবে মুখে কালিমা উচ্চারণ করা কোনো ব্যক্তিকে তাকফীর করা, তার সাথে যুদ্ধ করা, তাকে হত্যা করার ব্যাপারে জামা'আত নিজেকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত নীতির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে। এবং প্রত্যেক এমন অপব্যাখ্যা থেকে নিজেকে বাঁচায়, যা শরীয়তের ভারসাম্যপূর্ণ রাস্তা থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে। একইভাবে জামা'আতের সাধারণ সাথীদেরকেও এরকম স্পর্শকাতর বিষয়ের উপর কথা বলা থেকে বিরত রাখে এবং এসব বিষয়ে তাদেরকে হক উলামায়ে কেরামের দেওয়া গণ্ডীর ভিতর রাখে।

৭. জামা'আত শরয়ী বিষয়গুলোতে স্থানীয় আহলুল হক আলেমদের অনুসরণ করে এবং সমকালীন ঐসব আলেমদের থেকে ফায়দা নেওয়া জরুরী মনে করে, যাদের তাকওয়া, ইলম ও অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে নবউদ্ভাবিত বিষয়গুলোতে তাদের ফায়সালার দিকে ফিরে যাওয়ার মত পোষণ করে।

৮. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের নীতি হল, সম্পূর্ণ মনযোগ এই জালেম কুফরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উপর রাখা এবং এটি ছাড়া অন্য কোনো পার্শ্বীয় যুদ্ধে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো।
৯. জামা'আত যেসব লক্ষ্যবস্তুর উপর কাজ করে প্রকাশ্যে তার দায়িত্ব স্বীকার করে এবং যে লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা করা ভুল মনে করে তার ঘোষণা এই আচরণবিধিতে উল্লেখ করা হল। এরপরও যদি কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলার সামনে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং জাতীর সামনেও এই ভুল স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। কারণ, আখেরাতের পাকড়াও দুনিয়ার পাকড়াও থেকে বহুগুণ বেশি কঠিন।
১০. উম্মতের হিতসাধক শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সময় থেকে আল-কায়েদা নিজেদের অপারেশনে সামরিক কৌশলের উপর বিশেষ মনযোগ দেয়। ফলস্বরূপ; লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা করার ব্যাপারে জায়গার নির্বাচন, সময় ও উপলক্ষ্যের যথার্থতার উপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়। নবীজী সা. এর সীরাত মোবারাকের আলোকে আমরা এমন কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করি, যাতে কম সাজসরঞ্জামের মাধ্যমে ভাল থেকে ভাল ফলাফল অর্জন করা যায়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক

১. জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. শ্রদ্ধাস্পদ আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর রহ. এর হাতে বাইয়াত করে ছিলেন। উসামা বিন লাদেন রহ. এর শাহাদাতের পর শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ এই বাইয়াতের নবায়ন করেন এবং আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর রহ. এর ইন্তেকালের পর আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মানসূর রহ এর হাতে, তাঁর শাহাদাতের পর আমীরুল মুমিনীন শাইখ হেবাতুল্লাহ আখন্দজাদাহ হাফিজাহুল্লাহ এর হাতে বাইয়াত হন।
২. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের আমীর মাওলানা আসেম উরমও (হাফিজাহুল্লাহ) শাইখ আইমান আজজাওয়াহিরীর মাধ্যমে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের বর্তমান আমীর শ্রদ্ধাস্পদ আমীরুল মুমিনীন শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মৌলভী হেবাতুল্লাহ আখন্দজাদাহ এর হাতে বাইয়াত হন। আর আল-কায়েদা উপমহাদেশ এই বাইয়াতের অধীনে পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

৩. জামা'আত আল-কায়েদা উপমহাদেশের লক্ষ্যসমূহের মধ্য থেকে এক বড় লক্ষ্য ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করা, এর প্রতিরক্ষা করা এবং একে স্থায়িত্ব দেওয়া। এই লক্ষ্যে জামা'আত আফগানিস্তানের বাইরে যেখানে ইসলামী ইমারাতের শত্রু সেখানে লড়াই করে এবং আফগানিস্তানের ভিতরেও ইমারাতের সাথে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর উপমহাদেশের মুসলমানদের ইসলামী ইমারাতের বাইয়াত ও নুসরতের দাওয়াত দেয়।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ মুসলিম উম্মাহর সাথে আমাদের আচরণনীতি

১. মুসলমান জনসাধারণ আমাদের ভাই। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করি। কাজেই তাদের জান, মাল ও ইজ্জতে অন্যায় হস্তক্ষেপ আমরা আমাদের জন্য হারাম মনে করি। গুনাহগার মুসলিমদের ক্ষেত্রেও আমরা এই নীতি মেনে চলি। মুসলিম জনসাধারণের হক পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার ক্ষেত্রে আমরা বদ্ধপরিকর।

২. আমাদের অথাব আমাদের কোনো সাথীর থেকে (আল্লাহ না করুন) যদি কোনো মুসলিমের উপর অন্যায় বা অবিচার হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদেরকে শরীয়তের সিদ্ধান্তের অধীন মনে করি।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে সরকারী ও বেসরকারী জালেমদের থেকে রক্ষা করা আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করি এবং মাজাহিদদেরকে এই দায়িত্ব সাধ্যমত আদায় করার তাগিদ দেই।

৪. মুসলিম জনসাধরণের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের। দাওয়াত, ইসলাহ, আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে দ্বীনের পথে আগ্রহী করে তুলতে চেষ্টা করি। তাদের মাঝে বিদ্যমান শরীয়ত বিরোধী বিষয়গুলো সংশোধন করতে সচেষ্ট হই এবং তাদেরকে জিহাদী কাফেলার সাথে যুক্ত করার জন্যও আমরা চেষ্টা চালাই।

৫. যেহেতু ইলামায়ে কেরাম এই উম্মতের প্রকৃত নেতা, তাদের মাধ্যমেই সমাজের ইসলাহ, তালীম ও তরবিয়তের কাজ সম্পাদিত হয়, কাজেই তাঁদের চারপাশে জনসাধারণকে জড়ো করে আমরা সমাজে উলামায়ে কেরামের সম্মান ও গুরুত্ব বাড়ানো এবং তাঁদের ভূমিকাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন করতে চাই।

৬. আমাদের চেষ্টা হল, থানা, কোর্ট এবং অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার ফাসাদ থেকে জনতাকে দূর করে মসজিদ ও দারুল ইফতার হক্কানী আলেমদের

সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করা। কোর্টের পরিবর্তে মসজিদ ও দারুল ইফতা থেকে ফায়সালা নিতে আগ্রহী করে তোলা।

৭. আমরা কবিলাভুক্ত তথা গোত্রীয় ব্যবস্থাধীন জনপদকে অত্যাচারী কালাকানুন এবং কুফরী গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে মুহাম্মাদ সা. এর নিয়ে আসা নিরাপদ ও ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। এ জন্য কাবায়েলী আলেমগণ ও সরদারদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং তাদের মাধ্যমে কবীলা বা গোত্রগুলোতে ইসলামী বসন্ত নিয়ে আসার পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করি।

৮. যেখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সামর্থ্য দেন, সেখানে মুসলিমদের দ্বীনী ও দুনিয়াবী ফায়দা হয় এমন কাজে احب الناس الى الله انفعهم للناس অর্থাৎ 'মানব জাতির মাঝে তারাই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় যারা মানুষের জন্য সব চেয়ে বেশি কল্যাণকর' এই নীতির উপর আমরা পুরোপুরী সচেষ্ট হই।

৯. আল্লাহর দিকে আহ্বান, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের বিষয়ে রাসূল সা. এর আদর্শের দিকে আমরা সাধ্যমত লক্ষ্য রাখি, যাতে জনসাধারণকে দ্বীনের সাথে যুক্ত করা যায়। যার ফলস্বরূপ সৎ কাজের প্রসার ঘটে এবং অসৎ কাজের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

১০. জনসাধারণের মধ্য থেকে কোনো দল, গোত্র বা জামাআত মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অবস্থায় আমরা নিজেদেরকে নিম্ন বর্ণিত নীতির মাঝে সীমাবদ্ধ রাখি:

ক. দাওয়াত ও আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার সম্ভব্য সকল চেষ্টা করা, কেননা প্রকৃত লড়াই ছেড়ে পার্শ্বীয় অন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে আমরা কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে ফায়দা লুটার সুযোগ দিতে চাই না।

খ. যদি দাওয়াত ও আপোস মীমাংসার মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কেবল এতটুকু শক্তিই প্রয়োগ করা যাতে তাদের জুলমকে মুজাহিদদের থেকে দূরে রাখা যায়।

গ. উল্লেখিত গ্রুপের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সময়, তাদের মধ্য থেকে যারা সরাসরি লড়াইয়ে জড়িত এবং যারা জড়িত নয়, এই দুই দলের পার্থক্যের দিকে পরিপূর্ণ খেয়াল রাখা হয়। অতএব, যারা সরাসরি লড়াইয়ে জড়িত নয়, তাদের সাথে সরাসরি লড়াইয়ে জড়িতদের মত আচরণ করা হয় না। আর তাদের অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে জামা'আতের শরয়ী বিভাগ যে ফায়সালা দেয়, তাই আমরা মেনে নেই।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: শত্রুর বিশদ বিবরণ ও সামরিক কার্যকলাপ

আমরা শত্রুর প্রকৃতি এবং লক্ষ্যবস্তুকে তিন ভাগে বিভক্ত করি:

১ম ভাগ: ইসলামী ইমারাতের প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ।

২য় ভাগ: পাকিস্তানে আমাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু।

৩য় ভাগ: ভারত, বাংলাদেশ ও আরাকানে (বার্মায়) শত্রু ও লক্ষ্যবস্তু।

১ম ভাগ ইসলামী ইমরাতের প্রতিরক্ষার জন্য আফগানিস্তানে যুদ্ধ

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-কায়েদা উপমহাদেশ ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানকে শক্তিশালী করা এবং এর প্রতিরক্ষাকে নিজেদের মৌলিক লক্ষ্য মনে করে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আফগানিস্তানের ভূমিতে যেখানে আমেরিকার তত্ত্বাবধানে বৈশ্বিক কুফরের শয়তানরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইরত, সেখানে ইসলামী ইমারাতের স্বরূপে রহমানের সেনাবাহিনী শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধে লিপ্ত। আল-কায়েদা উপমহাদেশের মুজাহিদরাও ইসলামী ইমারাতের পতাকাতলে যুদ্ধের ময়দানে তৎপর এবং শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ইসলামী ইমারাতের হাতে আমেরিকা এবং এর দাসদের পরাজয় পুরো এই হিন্দুস্তানের ভূমিতে দ্বীনী শক্তিগুলোর জন্য বিজয় নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

২য় ভাগ: পাকিস্তানে আমাদের সামরিক লক্ষ্যবস্তু।

এটা পরিষ্কার যে, শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সময় থেকেই জামা'আত কায়েদাতুল জিহাদ ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে কুরআনের এই নীতি: فقاتلوا ائمة الكفر 'কুফর প্রধানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর' কে ভিত্তি বানায়; যাকে শাইখ উসামা বিন লাদেন শহীদ রহ. সাপের মাথায় আঘাত করা বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সব ধরণের শত্রুদের ব্যাপারে জামা'আতের প্রথম মনোনিবেশ হল, এদের উর্ধ্বতন নেতা এবং ঐ সব মেধা যাদের মাঝে দ্বীনের শত্রুতার পরিকল্পনা তৈরি হয়ে থাকে। এই নীতি অনুযায়ী পাকিস্তানে ঐ সব শক্তি জামা'আতের প্রথম লক্ষ্যবস্তু যা সাপের মাথা আমেরিকা ও বৈশ্বিক কুফরী শক্তির বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং যে শক্তি যুগ যুগ ধরে বৈশ্বিক কুফরী শক্তির ফায়দার জন্য পাকিস্তানের মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। কারণ, স্থানীয় ক্ষেত্রে এদের শক্তি ধ্বংস করা ছাড়া পাকিস্তানের মুসলিমদেরকে

আমেরিকা ও বৈশ্বিক কুফরী শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা এক অধরা স্বপ্নই থেকে যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'আতের লক্ষ্যবস্তু নিম্নোক্ত ক্রম অনুসারে হবে:

১. পাকিস্তানে আমেরিকান কাফের এবং সুস্পষ্ট স্বার্থ আমাদের সবচেয়ে অগ্রগণ্য লক্ষ্যবস্তু। কারণ: ক. আমেরিকা পুরো দুনিয়াতে মুসলিমদের উপর জুলম ও বলপ্রয়োগকারীদের সরাসরি সাহায্যকারী।
খ. বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করার পথে প্রথম অন্তরায়।
গ. বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার সরদার।
ঘ. ইসলামী ও জিহাদী জাগরণের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় শত্রু।

২. পাকিস্তানে দ্বিতীয় ক্রমে ঐসব কাফের দেশের কাফের কর্মচারীরা লক্ষ্যবস্তু যারা পাকিস্তানের অধিবাসীদের লুটপাট করে বৈশ্বিক কুফরী শক্তির দাস বানিয়ে রাখে, পাকিস্তানী মুসলিমদের গণহত্যার জন্য অর্থ জমা করে রাখে, যারা আফগানিস্তান থেকে কাশ্মীর এবং সিরিয়া থেকে ফিলিস্তীন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর উপর হামলাকারী। অর্থাৎ ভারত এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তিতে যুদ্ধ করতে থাকা পশ্চিমা দেশগুলো।

৩. পাকিস্তানকে কব্জা করে থাকা অত্যাচারী বৃটিশ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের কাছে অত্যন্ত অগ্রগণ্য বিষয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানকে কব্জা করে থাকা অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত না অত্যাচারী সূদী ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, আর না কাশ্মীর ও ভারতের মজলুম মুসলিমদের সাহায্য করা সম্ভব, আর না এই ভূখণ্ডে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন পূরণ হওয়া সম্ভব। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর গোপন ষড়যন্ত্র এবং সশস্ত্রবাহিনীর খোলাখুলি যুদ্ধের মোকাবেলায় দ্বীনের অনুসারীদের কাছে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। বরং বাস্তবতা হল, শরীয়তের এই দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদই আসলে 'গযওয়ায়ে হিন্দের দরজা।' পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সশস্ত্র বাহিনী শরীয়তের প্রথম শত্রু আমেরিকা এবং বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার উত্তম সুরক্ষক। এ কারণেই এই সশস্ত্র বাহিনী সব সময় বৈশ্বিক কুফরের ফায়দার জন্য ইসলামী আন্দোলনের পিঠে ছুরি মারে; ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই সশস্ত্র বাহিনী সম্মুখ বাহিনীর ভূমিকা পালন করে। আমেরিকার হাতে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পতন এই পাকিস্তানের সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। জিহাদের নুসরত এবং শরীয়তের আইন দাবি করার অপরাধে গোত্রীয় এলাকা সোয়াত এবং জামিআ

....

হাফসার নিরাপরাধ ছাত্রীদের উপর এই সশস্ত্র বাহিনীই আগুন ও বারুদের বৃষ্টি বর্ষণ করে। হাজার হাজার মুসলিমদেরকে বন্দী করে শহীদ করে। শত শত মুসলিমকে ফাঁসিতে ঝুলায়। কাজেই মুজাহিদদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শুধু পাকিস্তান নয় পুরো এই হিন্দের ভূমিতে ইসলামী আন্দোলনের সফলতার জন্য পাকিস্তানকে কব্জা করে রাখা কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী। কাজেই উপরে উল্লেখিত টার্গেটের পর পাকিস্তানের আমাদের টার্গেটগুলো নিম্নরূপঃ

ক. শরীয়ত প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক এবং আমেরিকার আধিপত্য বজায় রাখা রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র শক্তি; যা গুরুত্বের ক্রমানাসারে নিম্নরূপঃ

* গোপন গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষভাবে এই এস আই, এম আই, এফ এই এ, সি আই ডি, আই বি ইত্যাদির অফিসার ও কর্মীরা।

* সশস্ত্র বাহিনীর (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, এফসির) উচ্চ পর্যায়ের অফিসাররা।

* আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (রেঞ্জার্স, কাউন্টার টেরিরিজম ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ) এর উচ্চা পর্যায়ের অফিসাররা।

খ. মন্ত্রী এবং উচ্চ পর্যায়ের ঐসব ব্যুরোক্র্যাট অফিসাররা যারা আমেরিকার এই যুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে মুহাম্মাদ সা. এর দ্বীনের বিরুদ্ধে রয়েছে।

গ. অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার এবং ঐসব সাবেক শাসক যারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের পক্ষে খোলাখুলিভাবে অংশ নিয়েছে।

ঘ. নবীজী সা. এর অবমাননাকারী (নবীজী সা. এর সম্মানের জন্য আমাদের বাবা-মা কোরবান হোক) আমাদের প্রিয় নবীজী সা. এর সম্মানের জন্য যদি নিজেদের সবকিছুও কুরবানী করতে হয়, তাহলে তাতেও আমরা দ্বিধা করব না এবং সব রকম মূল্য দিয়ে আমারা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সা. এর সম্মান রক্ষা করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ঙ. বন্দী ভাই-বোনদের মুক্ত করার জন্য-

* কারাগারে হামলা।

* জেলখানার আইজি, সামরিক প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের এবং পশ্চিমা দেশের নাগরিকদের অপহরণ।

চ. ধর্মহিনতার প্রচারকারী মুলহিদ (ইসলামের বিরোধিতাকারী ঐসব ব্যক্তি যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে), কেননা আমাদের সমাজকে ধর্মহীনতা

থেকে বাঁচানো আমরা আমাদের উপর ফরয মনে করি। যদিও আমাদের সাথে সম্পর্কিত মুজাহিদদের নিজেদের থেকে এমন অপারেশনের অনুমতি আমরা দেই না। বরং কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের অনুমতি নেওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। জামা'আত এমন বিষয়ে উলামায়ে হক্কানী-রব্বানী থেকে ফতওয়া নেওয়া আবশ্যক মনে করে এবং এরপর মাসলাহা-মাফসাদা (লাভ-ক্ষতি) দেখে লক্ষ্যবস্তুরে ক্ষেত্রে ফায়সালা দেয়।

ছ. দ্বীনদার শ্রেণীর শত্রু এবং হত্যাকারীরা। কেননা, দ্বীনদার শ্রেণী এবং উলামায়ে হক্কানীকে রক্ষা করা আমরা আমাদের বিশেষ দায়িত্ব মনে করি; যদিও এখানেও লক্ষ্যবস্তুকে বাছাই করার জন্য জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে আমীরের অনুমতি জরুরী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত সদস্য আমাদের লক্ষ্যবস্তু। এসব সদস্যরা যুদ্ধরত এলাকায় হোক অথবা ব্যারাকে কিংবা ছাউনিতে থাকুক। ছুটিতে থাকা সদস্যরাও এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মোকাবেলায় যুদ্ধরত হওয়া এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার প্রতিরক্ষক হওয়ার কারণে শরীয়ত মতে সকলের হুকুম একই। তবে যে ব্যক্তি মুজাহিদদের কাছ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, তার বিষয়টি ব্যতিক্রম।

২. সিপাহীকে হত্যা করার চেয়ে আমরা অফিসারদেরকে হত্যার উপর জোর দেই। কারণ, যেই লক্ষ্য একজন অফিসারকে মারার দ্বারা অর্জিত হয়, শত সিপাহীকে মেরেও তা অর্জিত হয় না। কাজেই সিপাহীকে নিশানা বানানোর পরিবর্তে অফিসারকে নিশানা বানানোর চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ। শত্রুর অফিসার যত বড় পদমর্যাদার অধিকারী হবে, তাকে মারা আমাদের কাছে ততবেশি অগ্রগণ্য হবে। সরকারী সশস্ত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অফিসারদের নিশানা বানানো আমাদের কাছে সবয়েচে বেশি অগ্রগণ্য। এরপরে সেনাবাহিনী, এফসি, সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী, রেঞ্জাস, পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী গুরুত্বানুসারে অগ্রগণ্য হবে।

৩. যেসব রাজনীতিবিদ এবং অফিসারেরা জনসাধারণ, মুজাহিদ এবং দ্বীনদার শ্রেণীর পরিবারের উপর জুলম করছে, তাদেরকে টার্গেট বানানো আমাদের অগ্রগণ্যতার মধ্যে শামিল।

৩য় ভাগ: ভারত, বাংলাদেশ এবং আরাকানে (বার্মায়) আমাদের লক্ষ্যবস্তু

১. ভারতে এবং বাংলাদেশে আমেরিকা ও ইজরাইল সংশ্লিষ্ট টার্গেটের পর আমাদের অগ্রগণ্য টার্গেট হল, ভারতীয় সরকার। এর কারণ নিম্নরূপ:

- ভারত সরকার কাশ্মীর ও ভারতের মুসলিমদের উপর অত্যাচার, তাদের বসতবাড়ি ধ্বংস, তাদেরকে শ্রেণী বৈষম্যের মাধ্যমে দুর্বল করা এবং তাদেরকে জোরপূর্বক হিন্দু বানানোর কৌশল শুরু করেছে। কাশ্মীর এবং ভারতে মুসলিমদের উপর বিভিন্ন উস্যুতে জুলম-নির্যাতন এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।
- ধর্মহীনতা, ইসলামের প্রতি অন্ধ শত্রুতা এবং ইসলামের শত্রুতার পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র নীতির বড় অংশ। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারতের এই অপকৌশলের প্রভাব পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।
- ভারত হিন্দুস্তানের পুরো ভূখণ্ডে ইসলামী ও জিহাদী জাগরণের বিরুদ্ধে আমেরিকা, রাশিয়া ও ইজরাইলের বিশ্বস্ত মিত্র।
- ভারত বাংলাদেশে ধর্মহীন সরকার এবং ধর্মহীন আন্দোলনগুলোর সবচেয়ে বড় রক্ষক। আর রাসূল সা. এর অবমাননাকারী এবং মুলহিদদের সব ধরণের সহযোগিতাকারী।
- ভারত বাংলাদেশের মুসলিমদের পানি কব্জা করে তাদের চাষাবাদকে ধ্বংস করা এবং বাংলার মুসলিমদের কারখানা ও ব্যবসাকে দখল করার মত অপরাধ করে যাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারত সব সময় এটাই চায় যে, বাংলাদেশের মুসলিমরা তার দাস হয়ে থাকুক।
- ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ইসলামী ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধক। ভারতবর্ষে এক হাজার বছর ইসলামী শাসনব্যবস্থা ছিল। তাই এই ইসলামী ভূখণ্ডকে আবার ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসা এবং এখানে তাওহীদী শাসন কায়েম করা আমাদের উপর ফরয।

কাজেই ভারত ও বাংলাদেশে আমাদের লক্ষ্যবস্তু নিম্নরূপ:

ক. ভারতে ঐসব রাষ্ট্রীয় সংস্থা যেগুলো ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর মুসলিম নিধনের কৌশল অব্যাহত রেখেছে। যেমন, ভারতের পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনী। বিশেষভাবে এসব বাহিনীর অফিসাররা আমাদের প্রধান টার্গেট।

খ. কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংস্থার ঐসব নেতা যারা মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়া, মুসলিমদেরকে হত্যা করা, তাদের সম্পদ ধ্বংস করাসহ মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক হিন্দুবানানোতে জড়িত।

গ. ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ঐসব অফিসার যাদের হাত আমাদের কাশ্মীরী ভাইদের রক্তে রঙিন হয়েছে।

ঘ. রাসূল সা. এর অবমাননাকারী।

২. বার্মায় মুসলিমদের উপর নির্যাতনকারী সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র বৌদ্ধ গ্রুপগুলো আমাদের লক্ষ্যবস্তু; যার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক. বার্মার মাজলুম মুসলিমদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের প্রতিরক্ষা করা।

খ. বার্মার জালেম সরকারের উপর মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া।

গ. ইসলামী আরাকানকে বার্মার সশস্ত্রবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা।

৩. ভূখণ্ডের কোনো জায়গায় হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসাধারণ, বসতবাড়ি এবং উপসনালয় আমাদের টার্গেট নয়। এটা এ জন্য যে, আমাদের যুদ্ধ এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীর সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সাথে যারা মুসলিমদের উপর নির্যাতন করছে।

ষ'অনুচ্ছেদ: ঐসব অপারেশন যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী এবং এর সাথে সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক

১. আমরা প্রত্যেক ঐসব অপারেশন থেকে বেঁচে থাকি যা মুসলিম জনসাধারণকে মুজাহিদদের থেকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা যেগুলো তাদের উপলব্ধির বাইরে। এ ক্ষেত্রে আমরা নবীজী সা. কর্তৃক মুনাফিকদের হত্যা না করার আদর্শ গ্রহণ করি। কারণ, নবীজী সা. সাধারণ জনতা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশংকাতেই মুনাফিকদের হত্যা করা থেকে বিরত ছিলেন।

২. আমরা সাধারণভাবে এমনসব মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকি যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না এবং অস্ত্রধারীদের সাহায্যও করে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের সমস্ত মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু হল, শরীয়তের দুশমন এবং কুফরী শাসনব্যবস্থার রক্ষক বৃন্দ।

৩. মসজিদ, জানাযা, বাজার এবং আদালতসহ জনসমাগমস্থলে বোমা বিষ্ফোরণ ঘটানোকে আমরা পুরোপুরি ভুল মনে করি। কারণ, এতে

মুসলিম জনসাধারণের ক্ষতির আশংকা আছে। উল্লেখিত স্থানসমূহে জায়েয লক্ষ্যবস্তুর উপর হামলা করা থেকে বেঁচে থাকাকেও আমরা আবশ্যক মনে করি। কেনন, এমন অপারেশন থেকে সাধারণ মুসলিমরা ক্ষতির শিকার হতে পারে। তাছাড়া এতে আল্লাহর পাকড়াওয়ের আশংকাও আছে। এসব অপারেশনের কারণে যেহেতু মুজাহিদদের দাওয়াত কলুষিত হয়, তাই এধরণের আপারেশন থেকে ইসলামের উপকার হওয়ার তুলনায় কুফরী শাসনব্যবস্থার বেশি উপকার হয়। কারণ, তারা এ ধরণের অপারেশনকে পুঁজি করে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানোর সুযোগ পায়।

৪. আমরা শত্রুদের সাথে সম্পর্ক রাখা নিরস্ত্র লোকদেরকে (অর্থাৎ ঐসব লোক যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, যেমনঃ নারী ও শিশু) নিশানা বানানো থেকে দূরে থাকি।

৫. আমরা পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্ত্রী এবং প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে হত্যা করা শরীয়তের আলোকে ভুল মনে করি। কুফরী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কারণে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মুরতাদ ও হারবী (যুদ্ধরত)। কিন্তু তাদের স্ত্রী-সন্তানরা শুধু রক্তের সম্পর্কের কারণে মুরতাদ বা হারবী হিসাবে প্রমাণিত হয় না। বরং এদের ব্যাপারে আসল হুকুম হল, এরাও মুসলিম। নবীজী সা. এর বাণী:

لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه

৬. 'কোনো ব্যক্তিকে তার পিতা কিংবা ভাইয়ের অপরাধের কারণে অভিযুক্ত করা যায় না' (সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)। তবে যদি এদের মধ্য থেকে কারো সম্পর্কে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রমাণিত হয়, তাহলে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কারণে সে হত্যার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

৭. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা দুষিত এবং কাফেরকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এতদসত্ত্বেও আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হামলা করা অত্যন্ত বড় ভুল এবং শরীয়ত বিরোধী মনে করি। কারণ, মুসলিম দেশেগুলো এবং মুসলিম সংখ্যাগরি'এলাকাগুলোতে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লোকজন সাধারণভাবে মুসলমান। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা না করে আমরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের উপর জোর দেই। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই কলুষিত শিক্ষা ব্যবস্থার শংসোধন সম্ভব।

৮. মাজার ও এজাতীয় অন্যান্য স্থানে বোমা বিষ্ফোরণকে আমরা ভুল মনে করি। পবিত্র শরীয়তের আলোকে কবরের শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে

এখন আমরা দাওয়া ও তরবিয়তের অস্ত্র ব্যবহার করি। বিজয়ের পর উলামায়ে কেরামের তত্বাবধানে এই বিষয়গুলোর তদারকির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

৯. আমাদের জামা'আতের ভুলের কারণে যদি কোনো অপারেশনে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে, নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো আমরা করি:

ক. নিঃসংকোচে নিজেদের ভুল স্বীকার করি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ক্ষমা চাই। এরপর মুসলিমদের কাছে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খ. অপারেশন সম্পাদনকারী মুজাহিদ থেকে জবাবদিহিতা তলব করি। যদি ভুলের ক্ষেত্রে মুজাহিদের ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে শরীয়াহ বিভাগের কাছে এই মামলাটি পেশ করা হয়। সেক্ষেত্রে ক্রুটি প্রমাণিত হলে অপারেশন সম্পাদনকারী মুজাহিদকে শাস্তি দেওয়া হয়।

গ. যে মুসলিম ভাইয়েরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে তাদের কাছে আমাদের আবেদন হল, আপনারা ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ জামা'আতের জিম্মাদারদের কাছে পৌঁছে দিবেন। যখনই জামা'আতের সামর্থ্য হবে তখনই দিয়ত তথা রক্তপণ বা আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

৯. যেহেতু আমরা কুফরী শানসব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো পার্শ্বীয় সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকি, তাই আমরা অন্য ধর্মাবলম্বী সাধারণ নাগরিক যেমন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান যারা শত শত বছর ধরে পাকিস্তা, বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরি' দেশে বসবাস করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে জড়াই না। তবে যদি কোনো জায়গার অমুসলিমগণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, অথবা এদের মধ্য থেকে কেউ রাসূল সা. কে অবমাননা করে অথবা কুরআনকে অপদস্থ করে সেক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট বসতীর অমুসলিমদের ক্ষতি থেকে মুসলিমদের বাঁচানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

১০. জামা'আত খ্রিষ্টানদের গির্জাকে নিশানা বানায় না। আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ের পরে উলামায়ে কেরামের ফতওয়ার আলোকে বিধর্মীদের উপসনালয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ: রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদের ব্যাপারে পদক্ষেপ

১. রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদেরকে জামা'আত শরীয়তের আলোকে কাফের মনে করে এবং মুসলিমদের মাঝে এসব ফেরকার গোমরাহীকে স্পষ্টকরে তুলে ধরে।
২. জামা'আতের কৌশল হল, জালেম কুফরী শাসনব্যবস্থা এবং এর রক্ষক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া কোনো পার্শ্বীয় লড়াইয়ে জড়িত না হওয়া। এজন্য উল্লেখিত ফেরকাগুলো যদি কার্যত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে জামা'আও যুদ্ধে জড়িত হয় না। বরং নিজেদের সমস্ত মনযোগ কুফরী শাসনব্যবস্থার উপর রাখে। কারণ, মূলত কুফরী শাসনব্যবস্থাই এইসব ফেরকাসহ দ্বীনের সব রকমের শত্রুদের প্রতিরক্ষা করে এবং তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সহায্য-সহযোগিতা করে।
৩. রাফেদী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈলীদের মধ্য থেকে কেউ যদি আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে আগ্রসনে লিপ্ত হয়, তাহলে এই আগ্রাসনকে বন্ধ করার জন্য এদের যোদ্ধা ও নেতাদেরকে যথোচিত জবাব দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। এই জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রেও কুরআনের বাণী 'কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর'র মূলনীতি ঠিক রাখা হবে। অতএব, প্রতিরক্ষা সংস্থা এবং ক্ষমতায় থাকা রাফেদী ও কাদিয়ানী নেতৃত্ব যারা আহলুস সুন্নাহর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক জবাব দেওয়া হবে।
৪. যতক্ষণ পর্যন্ত বিজয় অর্জিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা উল্লেখিত ফেরকাগুলোর ব্যাপারে বর্ণিত পদক্ষেপের ভিত্তিতে কাজ করব। কিন্তু বিজয়ের পরে উম্মতের উলামায়ে কেরাম এদের ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত নিবেন, তার উপরই আমল করা হবে ইনশাআল্লাহ।
৫. রাফেযী, কাদিয়ানী এবং ইসমাঈরীদের ঐসব লোক যারা পঞ্চম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত জামা'আতের মূল লক্ষ্যবস্তুর মধ্য থেকে কোনো লক্ষ্যবস্তু অন্তর্ভুক্ত তাদের আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের কারণে নিশানা বানানো হবে।

অষ্টম অনুচ্ছেদঃ ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে আচরণ নীতি

১. ব্যাখ্যাঃ ধর্মনিরপেক্ষ (সেক্যুলার) দল দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐসবদল যারা নিজেদের অভিব্যক্তিতে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়াদি থেকে বিচ্ছিন্ন করায় বিশ্বাসী। ধর্মনিরপেক্ষ দল ক্ষমতায়ও থাকতে পারে আবার ক্ষমতার বাইরেও থাকতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছু দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের প্রেরণা দেয়। আবার

কিছু দল এমনও আছে, যারা যুদ্ধে অংশ নেয় না। একইভাবে কিছু দল রাজনৈতিক লক্ষ্যের জন্য কখনও কখনও সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। এদের সবাইকে একই পাল্লায় মাপা সম্ভব নয়। রবং প্রত্যেক দলের সাথে তাদের কার্যকলাপ অনুযায়ী আচরণ করা হবে।

২. ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন) দলগুলোর ঊর্ধ্বতন নেতা যারা খোলাখুলিভাবে শরীয়তের প্রতি নিজেদের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং কুরআনের আইনের পরিবর্তে কুফরী আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তাদেরকে আমরা শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে মুরতাদ গণ্য করি। তাদেরকে হত্যা করাও জায়েয মনে করি। যদিও এদের মধ্য থেকে কাকে হত্যা করা হবে? কখন হত্যা করা হবে? এবং কাকে হত্যা করা হবে না- এসব জামা'আতের উর্ধ্বতন নেতাগণ নির্ধারণ করবেন। জামা'আতের নেতৃত্ব মাসলাহা-মাফসাদা (লাভ-লোকসান) বিবেচনা করে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৩. যে ধর্মনিরপেক্ষ দল মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অথবা লড়াইয়ে সহযোগিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আমরা অগ্রাধিকার দেই।

৪. শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে থাকা ধর্মনিরপেক্ষ দলে নেতাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য। চাই তারা বর্তমানে ক্ষমতায় থাকুক বা অতীতে থাকুক।

৫. কোনো ধর্মনিরপেক্ষ দলের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এমন যুদ্ধ হবে না যে, এর প্রত্যেক ভোটার এবং ছোট-বড় সকল কর্মীকে টার্গেট বানানো হবে। রবং শুধু ঐসব নেতা এবং ঐসব ব্যক্তিকে টার্গেট বানানো হবে যারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এদের অবশিষ্ট নারী, শিশু, আত্মীয় এবং সাধারণকর্মীরা কখনোই আমাদের টার্গেট নয়।

৬. ধর্মনিরপেক্ষ দলের সাধারণ ভোটার যারা ধোঁকায় পড়ে রুটি, কাপড়, গাড়ি, বাড়ি, চাকুরী বা এজাতীয় অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তি বা প্রতিশ্রুতির কারণে ধর্মহীন দলগুলোর সঙ্গদেয়, তাদেরকে আমরা তাকফীরও করি না এবং হত্যার চেষ্টাও করি না। তবে তাদের এসব দলগুলোকে সহযোগিতা করা গুনাহ। তাই তাদেরকে আমরা বুঝানোর মাধ্যমে এই দলগুলোর সহযোগিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

৭. আমরা আমাদের দাওয়াতে এটা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করি যে, ধর্মনিরপেক্ষ এই দলগুলোর সাথে আমাদের শত্রুতার কারণ, ভাষা, জাতীয়তাবাদ বা অন্য শ্লোগানের জন্য নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষ দলকর্তৃক ইসলামের প্রতি শত্রুতাপোষণই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ।

৮. যেখানে এসব দলগুলোকে নিশানো বানানোতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হওয়ার আশংকা থাকে, অথবা মুসলিম জনসাধারণের সামনে ইসলামের বিরুদ্ধে এদের শত্রুতা পরিষ্কার নয়, সেখানে রাসূল সা. কর্তৃক মুনাফিকদের ব্যাপারে গৃহিত কৌশল অবলম্বন করত যতক্ষণ না এদের ব্যাপারগুলো জনতার সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সম্ভব্য ক্ষতির কারণ দূর হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের নিশানা বানানোর ব্যাপারে আমরা বিলম্ব করব।

নবম অনুচ্ছেদঃ শত্রুর বন্দী এবং আত্মসমর্পণকারীদের বিষয়াদি

১. শত্রু পক্ষের বন্দী এবং আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে আমীরের জন্য সংরক্ষিত। তাঁরা ছাড়া আর কারো এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। তবে জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে আমীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে শরীয়াহ বিভাগের দায়িত্বশীল এবং সামরিক বিভাগের দায়িত্বশীলের সাথে মশওয়ারা করবেন।

২. আসলী হারবী কাফেরদের (যেমনঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী) মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কয়েদী হয়ে আসবে, তার জন্য জামা'আতের কাছে নিম্নোক্ত পথ আছেঃ
 ক. এসব বন্দীদের দ্বারা মুসলিম বন্দীদের বিনিময় করা যেতে পারে।
 খ. অথবা এসব বন্দীদের বিনিময়ে মুক্তিপণ নেওয়া যেতে পারে।
 গ. কিংবা এসব বন্দীদের প্রতি ইহসান করে ছেড়েও দেওয়া যেতে পারে।
ঘ. অথবা তাদেরকে হত্যাও করা যেতে পারে।

৩. হারবী আসলী কাফের বন্দী যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে এই অবস্থায় তাকে হত্যা করা জায়েয নয় এবং তাকে হস্তান্তরের মাধ্যমে অন্য মুসিলম বন্দীদের ছাড়ানো তখনই জায়েয হবে, যদি বন্দী নিজে সম্মত হয় সাথে সাথে তার পুনরায় কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে।

৪. মুরতাদদের মধ্য থেকে যারা গ্রেফতার হবে, তাদের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত যেকোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক. তার বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের ছাড়ানো যেতে পারে।

খ. তাকে 'তা'যীর' (শাস্তি) বা 'হদ' (দণ্ড) স্বরূপ হত্যা করা যেতে পারে।

গ. তাকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে তার সম্পদ নেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, এসব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জামা'আতের আমীর এবং নায়েবে আমীরের ইচ্ছাধীন। অন্য কারো সিদ্ধান্ত এখানে কার্যকর নয়।

৫. যখন শরীয়তের শত্রু সারির অন্তর্ভুক্ত লোকেরা জামা'আতের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বীনের শত্রুদের থেকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন জাম'আত তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। মুসলিমদেরকে আমরা আহ্বান করছি, আপনারা শত্রুদের সারিতে থাকা আপনাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে দাওয়াত দিন যেন তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছেড়ে দেয়। শত্রু সারিতে থাকা কোনো লোক যদি জামা'আতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাহলে জামা'আত তার মাধ্যমে জিহাদী কাজ করাতে পারে।

৬. যারা শত্রুদের সারিতে থাকে এবং জামা'আতের হাতে আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথে শত্রুদের মাঝেও অবস্থান করে, তারা জামা'আতের পক্ষ থেকে বিশেষ নিরাপত্তা পাবে এবং তাদের তথ্য গোপন রাখা হবে।

দশম অনুচ্ছেদঃ জিহাদী দলগুলোর ব্যাপারে আমাদের নীতি

১. ঐসব দল বা জামা'আত যেগুলো উপমহাদেশে কুফরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুরোপুরী সক্রিয় এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে যাচ্ছে, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হল, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং সৎকাজে একে অপরকে সহযোগিতার। আমরা তাদেরকে আমাদের শরীরের অংশ মনে করি। তাদের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই এবং তাদের সুখে আমরা খুশি হই।

২. জামা'আতের প্রচেষ্টা হল, 'মঙ্গল কামনাই দ্বীন' এই হাদীসের আলোকে জিহাদী দলগুলোর সাথে পরস্পরে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা এবং সংশোধনের এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যের গোপন দোষ-ত্রুটির সংশোধনের জন্য গোপনে চেষ্টা করা হবে এবং প্রকাশ্য ভুলের জন্য সব মুজাহিদ ও সাধারণ মুসলিমদেরকে ঐ বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য ঘোষণা দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। একইভাবে শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড অথবা এমন অপারেশন যার ক্ষতি এর ফায়দার তুলনায় বেশি কিংবা এমন অপারেশন যা শরয়ী রাজনীতির স্পষ্ট বিপরীত- এগুলোর সাথে নিজেদের সম্পর্ক না থাকার স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হবে।

৩. পাকিস্তানে পূর্ণ উদ্যমে সক্রিয় জিহাদী দলগুলো সামরিক অপারেশনে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের ব্যাপারে কিছু সুস্পষ্ট নীতির উপর একমত হলেই

কেবল এতদ অঞ্চলের জিহাদ এক সুন্দর আকৃতি পাবে। কাঙ্ক্ষিত এই ঐক্যমত্য তৈরি করার জন্য সংগঠন আলাদা হওয়ার পরও তাদের এক নীতির উপর একত্রিত করার জন্য জামা'আতের পক্ষ থেকে সবিনয় নিবেদন করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় জামা'আত ভ্রাতৃস্থানীয় অন্য জিহাদী দলগুলোর সাথে সম্মত নীতিগুলোর উপর চুক্তির আওতায় জোট গঠন করতে চেষ্টারত এবং তাদেরকে সব ধরণের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

৪. বিবৃত পয়েন্ট নাম্বার ৩ এর পরিপূর্ণতায় আমরা উপমহাদেশের ভিতরে কর্মরত জিহাদী জামা'আতগুলোকে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের বাইয়াতের দাওয়াত দেই। কারণ, এই ভূখণ্ডে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের বাইয়াতের মাধ্যমে জিহাদী বিষয়াদিতে শরীয়তের অনুসরণ সহজ হবে এবং শরয়ী রাজনীতির ভিত্তিতেও এটি লাভজনক হবে। তাছাড়া এর দ্বারা সুসংগঠিত একটি জিহদী জোট গঠনও সম্ভবপর হবে।

৫. জামা'আত ভ্রাতৃস্থানীয় অন্য জিহাদী সংগঠনগুলোকে উল্লেখিত নিজ 'আচরণবিধি' মোতাবেক সম্মিলিত অপারেশনেরও দাওয়াত দেয়। এই বিষয়ে জামা'আত প্রত্যেক সংগঠনকে দ্বীনের বিজয় এবং জিহাদকে শক্তিশালী করার জন্য উদার দিলে সাহায্য করবে।

৬. বিবৃত পয়েন্ট নাম্বার তিন এর আওতায় সব জামা'আত বা দলের মাধ্যে দাওয়াতী, আদর্শিক, তরবিয়াতী, শরয়ী এবং সামরিক বিষয়গুলোতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে।

৭. সমস্যা এবং প্রতিকূল অবস্থায় এসব জামা'আতগুলোর সাথে সব ধরণের সহানুভূতি এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে।

৮. সব জামা'আতকে সমানভাবে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আমাদের মশওয়ারার দরজা খোলা থাকবে এবং প্রত্যেক এমন সিদ্ধান্তে সব জামা'আতকে সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৯. যদি কোনো দল বা সংগঠন মানহাজ বা পদ্ধতিগত ঐক্যের ভিত্তিতে আলা-কায়েদা উপমহাদেশের সাথে একত্রিত হতে চায়, তাহলে তাদের জন্য আমাদের দরজা খোলা।

১০. কাশ্মীর,ভারত, বাংলাদেশ এবং আরাকানেও জিহাদী জামা'আতগুলোর (যেগুলো সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাবমুক্ত) সাথে এসব নীতির ভিত্তিতেই কাজ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

১১. ঐসব জিহাদী জামা'আত যা শরীয়তের শত্রু গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে কোনো ভূখণ্ডে কর্মরত, আমরা তাদেরকে দাওয়াত দেই, যেন তারা নিজেদেরকে এসব সংস্থার নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করে, যাতে মাজলুম জনতাকে সাহায্য করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিকার পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধরণের জামা'আতের জিহাদী ফলাফলকে তাগুতী সশস্ত্রবাহিনী পরিশেষে ধ্বংস করে দেয়। কাশ্মীর জিহাদ এর সুস্পষ্ট উদাহরণ।

একাদশ অনুচ্ছেদ: দ্বীনী গণতান্ত্রিক দলগুলোর ব্যাপারে আমাদের নীতি

১. গণতন্ত্রকে আমরা শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে কুফরী মনে করি। গণতন্ত্রে যেকোনো দলের যেকোনো আদর্শের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সাহায্যের পরিবর্তে কুফরী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করে। কিন্তু তারপরও আমরা গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কাফের মনে করি না।

২. গণতন্ত্রে অংশ নেওয়া দ্বীনী দলগুলো 'দ্বীনী ফায়দা'র জন্য গণতন্ত্রে অংশ নেওয়ার অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়। যেমন, মাদরাসাগুলোর সুরক্ষা, পার্লামেন্টের মাধ্যমে ধর্মহীনতার বন্যায় বাঁধ দেওয়া অথবা গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি... দ্বীনের সেবা বা শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টে বসার এসব ব্যাখ্যাকে আমরা বাতিল মনে করি। কিন্তু এসব কারণে না আমরা তাদেরকে তাকফীর করি, আর না তাদেরকে টার্গেট বানানো আমরা জায়েয মনে করি। তা সত্ত্বেও যেহেতু তাদের কাজ কুফরী শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, তাই আমরা তাদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে এই হারাম কাজ থেকে দূরে রাখার সব ধরণের চেষ্টা করব।

৩. এসব দলের সৎকাজের আদেশ এবং অৎস কাজের নিষেধের মত নেক কাজে আমরা খোলাখুলি পৃষ্ঠপোষকতা করব এবং গণতান্ত্রিক খেলতামাশা এবং অন্যান্য ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে প্রকাশ্য সমালোচনা ও নসীহা করব।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ: সাধারণ দ্বীনী সংগঠনগুলোর সাথে আচারণ নীতি

এমন দ্বীনী জামাআত যারা সমাজে দাওয়াত-তাবলীগ ও ইসলাহের কাজ করছে:-

১. তাদের সাথীদেরকে আমরা নিজেদের ভাই এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের সাথী মনে করি।

২. তাদের সমস্ত ভালকাজের আমরা প্রশংসা করি এবং যখনই সামর্থ্য হয়, তাদের ভাল কাজে সহযোগিতা করার প্রত্যাশা রাখি।
৩. সাথে সাথে আমরা তাদেরকে জিহাদে সহযোগিতা এবং নুসরতের দাওয়াত দেই এবং প্রেরণা যোগাই। আর শরীয়তের সমস্ত ফরয আদায়ের জন্য আহ্বান করি।
৪. আমাদের প্রচেষ্টা হল, এই ভূখণ্ডে থাকা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সব আদর্শিক চিন্তাধারাকে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পতাকাতলে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য শরীয়তের শত্রুদের বিরুদ্ধে একত্রিত করা। তাদেরকে ফুরূয়ী বা শাখাগত ইখতিলাফ থেকে বের করে উম্মতের সামগ্রিক এবং বুনিয়াদী বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে শরীয়তের শত্রুদের মোকাবেলায় এই উম্মত সীসাঢালা প্রাচীর তুল্য হয়ে যায়।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ: উলামায়ে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এবং আচরণনীতি

এই ভূখণ্ডে অবস্থিত উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসাগুলোকে জামা'আত কুফরী সাশনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের মূল শক্তি মনে করে এবং তাদের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলোকে নিজেদের জন্য আবশ্যক মনে করে:

১. উলামায়ে কেরাম ইসলামী সমাজের নেতা। তাদের আনুগত্য ও নির্দেশনার মাধ্যমেই শরীয়ত এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। তাঁদের সম্মান করা এবং সমাজে তাঁদের সম্মান দেওয়া আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করি, যাতে তাঁরা আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর কিতাবের কার্যকরিতাকে পার্লামেন্টের মুখাপেক্ষী না বানায়।
২. আল-কায়েদা উপমহাদেশ উলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে হকপন্থী উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসাগুলোর প্রতিরক্ষা নিজের অগ্রগণ্য দায়িত্ব মনে করে। এরই ধারাবাহিকতায় জামা'আত তাদের উপর সরকারি বা বেসরকারি সব ধরণের আগ্রাসন বন্ধ করবে এবং নিজেদের সামার্থ্যানুযায়ী তাদের উপর হওয়া যেকোনো ধরণের জুলমের প্রতিশোধ নিবে ইনশাআল্লাহ।
৩. আমরা আমাদের সমস্ত জিহাদী সফর হকপন্থী উলামায়ে কেরামের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করব। এ জন্য উলামায়ে কেরামের সাথে মজবুত যোগাযোগ বহাল রাখব এবং ইলমী সমস্যায় তাদের সাথে মশওয়ারা করতে থাকব ইনশাআল্লাহ।

৪. জামা'আত উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসাগুলোর শক্তি হয়ে তাঁদেরকে কুফরী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মজবুত ভূমিকা পালনের জন্য শক্তি যোগাবে ইনশাআল্লাহ।
৫. যেসব আলেম সমাজে কোনো ধরণের ইসলাহ ও তরবিয়াতের কাজ সম্পাদন করছেন জামা'আত তাদেরকে সম্ভব্য সব রকমের সহযোগিতা করবে এবং জামা'আতের হাতে বিজিত এলাকায় এসব উত্তম কাজের রাজনৈতিক এবং আর্থিক সহযোগিতা করা হবে ইনশাআল্লাহ।
৬. জামা'আত আলেম এবং তালিবুল ইলমদেরকে জিহাদের সারিতে শামিল করার ইচ্ছা করে, যাতে তারা এই জিহাদকে দ্বীনী এবং দুনিয়াবী সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।
৭. উলামায়ে সূ ঐসব আলেম যারা দুনিয়ার তুচ্ছ ধন-সম্পদের জন্য নিজেদের ইলমকে পদদলিত করে নিজেদের পেট জাহান্নামের আগুন দিয়ে ভরে এবং লোকদেরকে মুহাম্মাদ সা. এর শরীয়ত থেকে দূরে রাখে। এদের বাস্তবতা আমরা মুসলিমদের সামনে সুস্পষ্ট করব। এদের সরকারি ফতওয়ার জবাব আমরা জ্ঞানের আলোকে দিব ইনশাআল্লাহ। যদিও আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের অন্তর কাফের ও মুরতাদদের তুলনায় এরাই বেশি জখম করে, তথাপি তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা থেকে আমরা বিরত থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কাছে এমন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকে যে, তারা শরীয়ত প্রতিষ্ঠা বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে।

চতুর্দশ অধ্যায়: মাযহাবী ও ফিকহী পার্থক্যের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান

১. আকীদা ও ফিকহ বিষয়ক মাযহাবী সংকীর্ণতা (হানাফী, সালাফী, হায়াতী, মামাতী ইত্যাদি) এবং এর উপর ভিত্তি করে তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি ও মতবিরোধকে আমরা মুসলিম উম্মতের ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। এ জন্য আমাদের প্রচেষ্টা হল, উম্মতকে ফুরূয়ী ইখতাফ থেকে দূরে সরিয়ে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সামগ্রিক এবং বুনিয়াদী বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে শরীয়তের শত্রুদের মোকাবেলায় এই উম্মত সীসাঢালা প্রাচীর তুল্য হয়ে যায়।
২. এই বিষয়ে প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীদেরকে নিজ মাযহাবের হকপন্থী এবং ভারসাম্যপূর্ণ উলামায়ে কেরামের সাথে লেগে থাকা, তাঁদের নির্দেশনা নেওয়া এবং তাঁদের রচিত কিতাবাদি থেকে ফায়দা নেওয়াকে

আমরা জরুরী মনে করি। যাতে ইলমী সমস্যায় নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিজে নিজে ইজতিহাদ করার মত ধ্বংসাত্মক ব্যধি থেকে বাঁচা যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের হক আদায় করার তাওফীক দিন। আমাদেরকে এবং আমাদের জিহাদকে দ্বীনের দুশমনদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কারণ আর মুসলিমদের জন্য কল্যাণ ও রহমতের কারণ বানিয়ে দিন। আমীন।

আল্লাহই সব কল্যাণের তাওফীকদাতা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবীজী সা., তাঁর বংশধর এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

‘জামা‘আত কায়েদাতুল জিহাদ উপমহাদেশ’

শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরী, মোতাবেক জুন ২০১৭ ঈসায়ী।

এই হল আল-কায়েদার ‘আচরণবিধি’। এটি এমন একটি বিষয় যার দ্বারা ঈমান-আকীদা ও কর্মপন্থাসহ সর্বক্ষেত্রে আল-কায়েদার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের তাহকীক মতে এই আচরণবিধির প্রত্যেকটি ছত্র নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরামের আকীদা-মানহাজের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ‘আচরণবিধি’ পূর্ণরূপে আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকাদী-মানহাজের সাথে সামনযশ্যপূর্ণ। এর মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই।

যে জামাআতের আকীদা-মানহাজ তথা ঈমান-বিশ্বাস ও কর্মপন্থা ‘মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী’ এর প্রতিচ্ছবি। আহলুস সুন্নাহর ওয়াল জামাআতের আকীদাই যাদের আকীদা, তাদের মানহাজই যাদের মানহাজ। তাদেরকে কীভাবে ফাসেক-ফাজেরদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের চর বা এজেন্ট বলার দু:সাহস দেখানো যেতে পারে?! তাদেরকে কীভাবে নাহক, গোমরাহ, জঙ্গী বা সন্ত্রাসী হিসাবে গালি দেয়া যেতে পারে? মুসলিমদের ইজ্জত-সম্মানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। ‘যা কিছু শুনা হয়, তা বর্ণনা করাই মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট’ (সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামা হাদীস নং-৬)এই সহীহ হাদীসের প্রতিও খেয়াল রাখুন।

হুদহুদের ঘটনায় রয়েছে শিক্ষা

সর্বশেষ একটি আয়াত ও তার শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানছি। সূরা নামলে উল্লেখিত সুলাইমান আ. এবং হুদহুদ পাখির কথোপকথনের ইতিহাস উলামা হযরতদের ভালই জানা থাকার কথা। ঘটনাটি সূরা নামলের ২০-৪৪ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যতটুকু উদ্দেশ্য তা নিম্নরূপ:

একদা হুদহুদ পাখি সুলাইমান আ.কে নাজানিয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। সুলাইমান আ. তাঁর বাহিনীর হাজিরা নিয়ে শুধু হুদহুদকে অনুপস্থিত পেলেন। তখন তিনি গ্রহণযোগ্য ওযর পেশ করতে না পারলে হুদহুদকে কঠিন শাস্তি দিবেন বলে ঘোষণা করলেন। এর কিছুক্ষণ পরই হুদহুদ এসে কওমে সাবা এবং রাণী বিলকিস ও তার রাজত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল। সুলাইমান আ. হুদহুদ পাখির মত এক বে-গুনাহ প্রাণীর তথ্যও তৎক্ষণাত গ্রহণ করলেন না। তিনি হুদহুদ পাখির প্রতিউত্তরে বললেন,

سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখব তুমি সত্য বলছ নাকি তুমি মিথ্যুকদের একজন"।

মুফাসসিরগণ বিশেষ করে আল্লামা শাওকানী রহ. বলেছেন, এই আয়াতের শিক্ষা হল, যখন যাচাইয়ের কোনো উপায় থাকে, তখন অন্ধের মত সংবাদদাতার সংবাদকে গ্রহণ করে নেয়া উচিত নয়। বরং যথাসাধ্য তাহকীক ও যাচাইয়ের পর সংবাদ গ্রহণ করা উচিত।

আখেরী গুজারেশ:

উইকিপিডিয়া একটি উন্মুক্ত বিশ্বকোষ। আপনি আরবী উইকিপিডিয়ায় আল-কায়েদা লেখে সার্চ করলেই আল-কায়েদার যাবতীয় তথ্য চলে আসবে। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অবদানসহ যা কিছু জানতে চান সব কিছু চলে আসবে। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন ফ্রন্টে তারা আল্লাহর শত্রুদের উপর উল্লেখযোগ্য কী কী অভিযান পরিচালনা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তাই ইহুদি-নাসারাদের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হবেন না। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সেবায় নিয়োজিত ফাসেক-ফাজের সাংবাদিকদের কথায় বিশ্বাস করে মুসলিম উম্মাহর কৃতি সন্তানদের ব্যাপারে বদজন পোষণ করবেন না।

আল-কায়েদার বাংলাদেশ শাখা 'আনসার আল-ইসলাম' সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে নিম্নের ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করার অনুরোধ রইল:

মানুষমাত্রই ভুল। যেকেউ ভুল করতে পারে। শরীয়তের আলোকে আল-কায়দার কোনো ভুল যদি আপনার কাছে ধরা পড়ে, তাহলে সহমর্মিতার সাথে ভুলের ব্যাপারে সর্তক করা আপনার ঈমানী দায়িত্ব। কারণ, "কল্যাণকামিতাই তো দ্বীন"। উম্মাহর নির্বাচিত সন্তানরা উম্মাহর কল্যাণকামনায়, কাফেরদের মোকাবেলায় তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছে, দুনিয়ার তাবৎ মানুষ তাদেরকে জঙ্গী-সন্ত্রাসী ট্যাগ দিয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে। উম্মাহর অভিভাবক উলামায়ে কেরামও যদি তাদের সাথে শত্রুদের মত আচরণ করে, তাহলে তারা কার কাছে গিয়ে সান্তনার বাণী শুনবে! আপনারা তো নবীজী সা. এর ওয়ারিশ। নবীজী সা. যেমন বিভিন্ন জায়গায় বাহিনী পাঠিয়ে তাদের কল্যাণমানায় দুআয় মশগুল থাকতেন, আপনাদেরও উচিত আল-কায়েদা, তালেবানসহ অন্যান্য হকপন্থী জিহাদী কাফেলার মুজাহিদ ভাইদের কল্যাণকামনায় রত থাকা। তাদের উন্নতি ও সফলতার দুআ করা এবং নিজেদের সাধ্যানুযায়ী তাদের হাজতগুলো পূরণের ব্যবস্থা করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

এক তরুণ আলেমের দলীল বিহীন যুক্তির সরল খণ্ডন

১. জিহাদ ফরযে আইন হওয়াকে তিনিও স্বীকার করেন। ইফতায় তামরীন করা কালে তিনি নিজেও বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার উপর ফতওয়া লিখেছেন। এখন তার কথা হল, জিহাদের মত ফরয আরো অনেক বিষয় আছে। যেমন, নামায, রোযা,

তালীম, তাযকিয়া ইত্যাদি। তাই উলামাদের মধ্য থেকে যারা যে ফরয নিয়ে আছেন, যারা যে ফরযের উপর মেহনত করছেন, তাদেরকে সেই ফরয নিয়ে থাকতে দেন। যারা তালীম-তাআল্লুম, তাবলীগ, তাযকিয়া, নামায, রোযা ইত্যাদির ফরয আঞ্জামের কাজে ব্যস্ত আছে তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দিন। আর আপনারা যারা জিহাদের যাওক-শাওক রাখেন তারা জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য অগ্রসর হন। সবার যাওক শাওক এক রকম হবে না। যারা অন্য কাজের যাওক রাখে তাদেরকে সেই কাজের জন্য ছেড়ে দেন। সবগুলোই যেহেতু দ্বীনের কাজ, তাই যারা জিহাদ করতে চায় তারা করুক,

অন্যরা তাদের মুঈন হবে। আর যারা জিহাদ করবে তারাও অন্যদেরকে মুঈন মনে করবে।

২. তবে জিহাদের কাজ করতে গিয়ে কোনো অবস্থাতেই কোনো ফেরকা তৈরি করা যাবে না। অতীতে যারা জিহাদের কাজ করেছে তারাও ফেরকা তৈরি করেছে, আর এখনও যারা করছে যতটুকু জানি তারাও ফেরকা তৈরি করে, শুধু নিজেদেরকে সহীহ মনে করে, অন্যদেরকে ভুল পথে আছে বলে মনে করে। তাছাড়া আপনাদের দীক্ষায় দীক্ষিত একাধিক ছাত্রের সাথে আমি কথা বলেছি, তারা নিজেদেরকে আলেম মনে করে, আর নিজের উস্তাদকেও জাহেল মনে করে।'

যতটুকু মনে পড়ে এসব কথাই তিনি বলেছিলেন। যদি নাও বলে থাকেন, তবুও এমন কথা আরো অনেকেই বলে থাকে। তাই শরয়ী দলীলের আলোকে এসব কথার সিহ্হাত যাচাই করা উচিত।

যে দ্বীনের যে কাজ নিয়ে আছে সে কি সেই কাজেই থাকবে?

১. জিহাদ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার উপর দ্বীনে ইসলামের ই'লা-বুলান্দীর সাথে সাথে এই উম্মাহর ইজ্জত-সম্মানও নির্ভর করে। এই উম্মাহর দুনিয়া-আখেরাতের সব ধরণের সফলতা জিহাদ ও কিতালের উপর নির্ভরশীল। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ অন্যান্য ফরয ইবাদাত ব্যক্তিগত উপকারের জন্য করা হয়। কিন্তু জিহাদের উপর পুরো উম্মাহর ফায়েদা ও মান-ইজ্জত নির্ভর করে। তাই চার মাযহাবের সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যাবে, তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এই ফরয আদায়ের জন্য বের হতে হবে। কারণ, এমন শত্রু যে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টাই ধ্বংস করে দেয়, তাকে প্রতিহত করার চেয়ে অন্য কোনো কাজ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। রবং ঈমান আনার পরেই মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা সবচেয়ে বড় ফরয। নিম্নে এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.সহ চার মাযহাবের ফকীহগণের উক্তি বর্ণিত হল:

قال الشيخ ابن تيمية: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعًا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه" (من كتاب الإختيارات العلمية لابن تيمية ملحق بالفتوى الكبرى [৬০৮/4]).

وإليك نصوص مذاهب الفقهاء الأربعة التي تجمع على هذه القضية:

....

أولا: فقهاء الحنفية: قال ابن عابدين (حاشية ابن عابدين [৩/২৩৮]): "وفرض عين إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقًا وغربًا على هذا التدريج"، وبمثل هذا أفتى الكاساني (بدائع الصنائع [৭/৭২])، ابن نجيم (البحر الرائق لابن نجيم [৫/১৯১])، وابن الهمام (فتح القدير لابن الهمام [৫/১৯১]).

ثانيا: عند المالكية: جاء في حاشية الدسوقي: "ويتعين الجهاد بفجء العدو"، قال الدسوقي: "أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأةً أو عبدًا أو صبيًا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج ورب الدَّين" (حاشية الدسوقي [২/১৭৪]).

ثالثا: عند الشافعية: جاء في نهاية المحتاج للرملي: "فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم دون مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم، من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة" (نهاية المحتاج [৮/৫৮]).

رابعا: عند الحنابلة: جاء في (المغني) لابن قدامة: "ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: ১. إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. ২. إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. ৩. إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير" (المغني [৮/৩৪৫]). ويقول ابن تيمية: "إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا" (الفتاوى الكبرى- 4/৬০৮.

(যেহেতু এ অধ্যায়টি মূলত উলামাদের লক্ষ্য করে লেখা তাই, এটার অনুবাদের প্রয়োজন মনে করিনি।)

নবীজী সা. ফরযে আইন জিহাদের প্রয়োজনে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ফরযে আইনকে ছেড়ে দিয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় চার ওয়াক্ত নামায তিনি জিহাদের প্রয়োজনে কাযা করেছেন। মক্কা বিজয়ের যুদ্ধের সময় রমযানের সিয়ামের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইনকে নিজেও পরিত্যাগ করেছেন এবং নিজের সাথীবর্গকেও পরিত্যাগ করতে বলেছেন। যারা সে দিন রোযা ভাঙ্গতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদেরকে তিনি ‘অবাধ্য’ বলে আখ্যায়িত করে ছিলেন। অথচ মক্কা বিজয়ের সময় শত্রু পক্ষের সাথে তেমন কোনো সংঘাতই হয়নি। মক্কার মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় গুপ্তচর মারেফত এ সংবাদও তিনি জানতেন। তারপরও ‘যদি সংঘাত হয় সেক্ষেত্রে কেউ যেন ফরয রোযার কারণে দুর্বল না হয়ে পড়ে’ শুধু এই শংকার উপর ভিত্তি করেই নবীজী সা.

রোযা ভাঙ্গতে বলে ছিলেন। আর জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে ফরয হজ্জে যেতেও ফুকাহায়ে কেরাম নিষেধ করেছেন।

যে কেউ নিজেকে আহলে হক দাবি করবে তাকে অবশ্যই 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর সীমার ভিতর থাকতে হবে। ঐ সীমা অতিক্রম করে কেউ নিজেকে হক দাবি করলেও সে 'বাতিল' বলে বিবেচিত হবে। আমরা যেসব ফরয ইবাদাত আদায় করি সে সব ফরয ইবাদাত কি সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর যুগে ছিল না? নবীজী সা. এর উপস্থিতিতে কি সে সব ফরয আদায় করা হয়নি? দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়াসহ অন্যান্য সব ফরয কাজ ও ইবাদাতই নবীজী সা. এর জমানায় বিদ্যমান ছিল। আমরা যদি 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর উপর থাকার দাবি করি, তাহলে আমাদের দেখতে হবে, গযওয়াতুল খন্দকে যখন তখনকার পুরো মুসলিম উম্মাহর উপর এখনকার মত সমস্ত কাফেররা এক জোট হয়ে আক্রামণ করার জন্য মদীনাকে ঘিরে ধরেছিল, যার ফলে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়ে ছিল, তখন নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর কর্মপন্থা বা মানহাজ কী ছিল? হাদীস ও তারিখের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে আমরা কী পাই? নবীজী সা. কি তখন জিহাদ বাদ দিয়ে অন্যান্য ফরয আমল ঠিক রাখার জন্য 'তাকসীমে আমল' করে ছিলেন? তিনি কি তখন কিছু সাহাবীকে তালীম-তাআল্লুমের কাজে ব্যস্ত থাকতে বলেছিলেন? কিছু সাহাবীকে তাযকিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? কিছু সাহাবীকে তাবলীগে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন? কিছু সাহাবীকে আযান, ইকামাত ও নামাযের আমলী মশকে ব্যস্ত রেখে ছিলেন? কিছু সাহাবীকে মুআমালাত-মুআশারাত অধ্যায়ের ব্যাপক ইলম অর্জনের জন্য রেখে দিয়েছিলেন? নাকি মদীনাবাসী প্রত্যেক মুসলিমকেই জিহাদের ময়দানে বের করে নিয়ে এসে ছিলেন?

হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই আলেম-গাইরে আলেম নির্বিশেষে মদীনার প্রত্যেক পুরুষ মুসলিমকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে এসেছিলেন। নারীদের দ্বারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। ফরযে আইন জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য এবং মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়ার উপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য তিনি নিজেও যেমন জিহাদের ময়দানে চলে এসেছিলেন, তেমনিভাবে প্রত্যেক সাহাবীকেও আসতে বলেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, ফরযে আইন জিহাদ চলাকালীন নবীজী সা. অন্যান্য সব কাজ স্থগিত রেখে জিহাদকে জারি রাখলেন। জিহাদের প্রয়োজনে নামাযও কাযা করে ফেললেন। মদীনার মাদরাসা 'সুফ্‌ফা' তখন খালি পড়েছিল। মদীনার মসজিদেও তখন

নামায হত না। নামায জিহাদের ময়দানেই আদায় করা হত। জিহাদের ময়দানেই তাযকিয়ার চর্চা হত।

এই যখন অবস্থা তখন 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর অনুসারীরা কিভাবে নিজেদের মনগড়া 'তাকসীমে আমল' এর দোহাই দিয়ে ফরযে আইন জিহাদ থেকে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে? 'তাকসীমে আমল' এর নীতিতো তখন প্রযোজ্য হবে যখন দ্বীন বিজয়ী হবে। দ্বীনে ইসলামের অনুসারীরা ইজ্জত ও সম্মানের সাথে, শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ পাবে। যত দিন পর্যন্ত দ্বীনের বিজয় সাধন হবে না, আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা যাবে না, ততদিন পর্যন্ত 'তাকসীমে আমলে'র নীতিকে পরিহার করতে হবে। ততদিন পর্যন্ত কেউ এমন কোনো কাজ করতে পারবে না, এমন কোনো কাজে জড়াতে পারবে না, যে কাজে জড়ালে ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নে নিজের সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রাখা তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আলেম-গায়রে আলেম নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যকেই ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ, তখন যদি 'তাকসীমে আমল' করতে হয়, তা করতে হবে দ্বীনের বিজয় সাধনের জন্য, ফরযে আইন জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য। সেক্ষেত্রে তাকসীমে আমলের চিত্র এমন হবে যে, কিছু লোককে জিহাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা হবে। কিছু উলামাকে ইলমের ময়দানে রাখা হবে যেন তারা মুজাহিদদের ইলমের প্রয়োজন মিটাতে পারে, বয়ান-বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ ও জিহাদ বুঝাতে পারে, জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝিয়ে মুসলিম জনতাকে মুজাহিদদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে। জিহাদের ব্যাপারে ভ্রান্তিগুলো নিরসন করতে পারে। কিছু লোককে শুধু সৈনিক হওয়ার জন্য বাছুনী করা হবে। কিছু লোক, আমওয়াল, আসলিহা ও আমতিআর ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকবে। কিছু লোক মুআসকারের জন্য উপযুক্ত আনসার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকবে। কিছু লোক মিডিয়ায় জিহাদের কাজ করবে। মুজাহিদদের সংবাদ পরিবেশন করবে। দরবারী আলেমদের মতামতের খণ্ডন প্রকাশ করবে। জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় 'তাকসীমে আমলের' এই চিত্রটাই শরীয়তসম্মত ও যুক্তিযুক্ত। যাদের জিহাদের যাওক-শাওক আছে কেবল তারাই জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য আদিষ্ট, তাদেরই অগ্রসর হতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয় জনাব! যাওক-শাওক থাকুক কিংবা না থাকুক, মন চাক কিংবা না চাক, ভাল লাগুক কিংবা না লাগুক সকলেই ফরযে আইন জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হতে বাধ্য। অন্য কোনো ফরয ইবাদাতের বাহানা দিয়ে এই ফরয পালন থেকে পিছিয়ে থাকার

কোনো সুযোগ নেই। জিহাদ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীসগুলো ব্যাখ্যাসহ পুনরায় অধ্যয়ন করার অনুরোধ রইল। আশা করি সেক্ষেত্রে আপনি নিজেই নিজের কথার অসারতা অনুধাবন করতে পারবেন।

ফেরকা সৃষ্টি হওয়ার দায়ভার কার উপর বর্তায়?

২. একথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জিহাদ এমন একটি ইবাদাত যা সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়া ব্যতীত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যে মুসলিমগণ জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য সংগঠিত হবেন, তারা কিসের ভিত্তিতে সংগঠিত হবে? মুসলিমদের মধ্যে তো আজকাল বিভিন্ন ভ্রষ্ট আকীদা ওয়ালা মুসলিমও আছে। ভ্রষ্ট আকীদাওয়ালা কেউ যদি নিজ মতবাদের উপর অটল থেকে জিহাদ বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে তাকে কিসের ভিত্তিতে অস্বীকার করা হবে? যে দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাদের 'আকীদায়ে কিতালিয়া' কী হবে? যারা ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যই জরুরী ভিত্তিতে উপরের বিষয়গুলো ক্লিয়ার করতে হবে। অতএব, তাদেরকে তাদের আকীদার কথা স্পষ্টভাবে বলতে হবে। তাদেরকে তাদের মানহাজের কথা কোনো অস্পষ্টতা ছাড়াই সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। তারা কোন আকীদার ভিত্তিতে শত্রুদের সাথে কিতালের পথে অগ্রসর হতে চায়, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী সেটাও পরিষ্কার করতে হবে।

যে দল যুদ্ধের জন্য একতাবদ্ধ হচ্ছে, তাদের আকীদা-মানহাজ যখন 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'- এর ফটোকপি হবে। কোনোরূপ ছাড় দেয়া ব্যতীত নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আদর্শকে যখন তারা পূর্ণাঙ্গরূপে আঁকড়ে ধরবে, এমতাবস্থায় কেউ গ্রহণযোগ্য দলীল ব্যাতীত তাদের বিরোধিতা করলে, তাদের আকীদা-মানহাজ নিয়ে দলীলহীন সমালোচনা করলে পরোক্ষভাবে 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর-ই সমালোচনা করা হয়। তো যারা গ্রহণযোগ্য দলীল ছাড়াই 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী'-এর আকীদা-মানহাজ এর সমালোচনা করবে, তাদেরকে যদি যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হওয়া মুসলিমগণ 'ভুলের উপর আছে' বলে মনে করে, তাহলে এই মনে করাটা শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে ভ্রষ্ট বলে প্রমাণিত হয়? আর এই মনে করার কারণেই যদি 'ফেরকা' তৈরি হয়ে যায়, তাহলে যাদেরকে দলীল প্রমাণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, আপনারা 'কিছুটা হলেও ভুলের উপর আছেন' তাদের উপর কি এই দায়িত্ব বর্তায় না যে, তারা নিজেদের ভুলটা ছেড়ে দিয়ে মুজাহিদীনদের উপস্থাপনকৃত সঠিকটা কবুল করে নিবে? সহমর্মিতা, ইখলাস ও হিম্মতের সাথে এই কাজটা করলেই তো আর ফেরকা

তৈরি হয় না, যখন হকের দাবিদার সবার আকীদা-মানহাজ এক ও অভিন্ন হবে তখন তো ফেরকা তৈরি হবে না। যখন আহলে হক সকলে এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে যাবে, বাতিল আলাদা হয়ে যাবে, তখন সত্যের ঝাণ্ডাবাহীরা অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাবে। দ্বীন কায়েম সহজতর হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজেদের দায়িত্ব আদায় না করে সহীহ আকীদা-মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত দলকেই তাদের আকীদা-মানহাজ পরিবর্তন করতে বলে, তাও আবার শরীয়তের দলীল ছাড়াই, তাহলে কি সমস্যার সমাধান হবে? নাকি ফেরকা তৈরি হবে? তখন যদি ফেরকা তৈরি হয়, তাহলে এর জন্য কে দায়ী? মুজাহিদগণ দায়ী? নাকি দলীল ছাড়া সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য সে নিজেই দায়ী? গভীরভাবে একটু ভাবুন। দলান্ধতা, মতান্ধতা ও বিভিন্ন শাইখদের অন্ধ অনুকরণ থেকে বের হয়ে এসে আকলে সালীম নিয়ে কুরআন-সুন্নাহর সরীহ বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখুন, আমাদের কোনো কাজ, কোনো কথা শরীয়তের বিরোধী পাবেন না ইনশা আল্লাহ।

জিহাদের জন্য যারা সংগঠিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই যে মুখলিস ও মুত্তাকী পরহেযগার হবে বিষয়টি এমন নয়। গোপন ফিসকে লিপ্ত কোনো ফাসেকও এই দলের মধ্যে এসে যেতে পারে। আবার বাহ্যিক কোনো মুত্তাকী ব্যক্তি জিহাদী কাফেলায় আসার পর, তার দ্বারাও শয়তানের ধোঁকায় কোনো গুনাহ বা ফিসকের কাজ হয়ে যেতে পারে। কারণ, তারা সকলেই মানুষ। তাদের থেকে ভুল-ত্রুটি হতেই পারে। নবীজী সা. এর সাথে যে জিহাদী কাফেলা ছিল, তাদের কারো কারো থেকেও মাঝে মাঝে ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত। তাই জিহাদী কাফেলার বিশেষ কোনো ব্যক্তির পদস্খলন দ্বারা জিহাদী কাফেলাকে মাপা যাবে না। বরং জিহাদী কাফেলাকে মাপতে হবে তাদের আকীদা-মানহাজ দিয়ে। আকীদা-মানহাজ যদি সহীহ হয়, তাহলে কাফেলাকেও সহীহ মানতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোনো জিহাদী কাফেলার সদস্যদের অধিকাংশ থেকেই যদি ধারাবাহিক শরীয়ত বিরোধী কাজ প্রকাশ পেতে থাকে, কিংবা তাদের অধিকাংশ থেকে সঠিক প্রমাণিত তাদের আকীদা-মানহাজের উল্টো কাজ পরিলক্ষিত হতে থাকে, তখন তাদের ভ্রষ্ট হওয়ার ব্যাপারে গালেবে গুমান করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার সদস্যের মধ্য থেকে ২/৪জন অশিক্ষিত কিংবা অর্ধ শিক্ষিত সদস্যের সাথে কথা বলেই আপনি একটি মুজাহিদ কাফেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবেন, এমন শিক্ষা আপনি শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে গ্রহণ করলেন? ২/৪জন বরং তার চেয়েও বেশি বেয়াদব তো তাবলীগ, দাওয়াতুল হক, হেফাজত এবং কওমী মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যেও আছে, সেই বেয়াদবগুলোর অবাঞ্ছিত আচরণের কারণে তো

আপনাদেরকে ঐ দলগুলোকে না হক মনে করতে দেখা যায় না। তো জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায়ের জন্য যারা একত্রিত হচ্ছে, তাদের সামান্য ভুল ত্রুটি দেখলেই আপনারা বিগড়ে যান কেন? সহমর্মিতা ও হিতকামনার শিক্ষা তখন আপনারা ভুলে যান কেন? শত্রুতার মনোভাব নিয়ে বসে থাকেন কেন? জনাব! ইনসাফ করতে শিখুন। না জেনে না বুঝে দূর থেকে কারো আচরণ দেখে প্রভাবিত না হয়ে, হিম্মত নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করুন। তাহকীকের উদ্দেশ্যে হলেও ঘরের ভিতর ঢুকে দেখুন সেখানে কারা অবস্থান করছে, কী তাদের আকীদ-মানহাজ, কী তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য? কেমন তাদের আচার-আখলাক? যেখানে মুআয়ানা ও মুশাহাদার সুযোগ রয়েছে সেখানে অন্যের উপর নির্ভর না করে একটু সাহস করে নিজেই তাহকীক করে ফেলুন। তাহকীকের পর ইস্তেখারাও করুন। এরপর যদি শরয়ী দলীলের আলোকে আপনার কাছে প্রমাণিত হয় যে, আল-কায়েদার নিসবতে বাংলাদেশে যারা কাজ করছে তারা ভুলের উপর আছে, তাহলে আল-কায়েদা তাদের ভুল সংশোধন করে নিবে।

ছাত্র যদি এমন কোনো বিষয়ে ইলম অর্জন করে যে বিষয়ে তার জানা মতে তার উস্তাদের ইলম নেই। তাহলে সেক্ষেত্রে ছাত্র ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজেকে জ্ঞানী মনে করলে আর উস্তাদকে অজ্ঞ মনে করলে বাস্তবে দোষের কিছু নেই। আর উস্তাদেরও বিশেষ কোনো বিষয়ে অজ্ঞতা থাকা দোষের কিছু নয়। কারণ, এক জন উস্তাদের সর্ববিষয়ে ইলম থাকা আবশ্যক নয়। শরীয়তের জরুরী ইলমের সাথে সাথে সে যে বিষয় পড়ায় সে বিষয়ের ইলম থাকাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে বিষয় পড়ায় না, বা যে বিষয়ে তার পড়াশুনা নেই, জানাশোনা নেই, সে বিষয়ে কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে 'লা-আদরী'র সরল স্বীকারোক্তিই কল্যাণকর। নিজের বড়ত্ব ও কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য সে বিষয়ে মুখ খোলা কোনোক্রমেই জায়েয নেই। এমতাবস্থায় ছাত্র তাকে ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞ বা জাহেল মনে করলে মনে হয় না, তার মনে করাটা শরীয়তের খেলাফ হবে। আর এতে উস্তাদেরও কোনো ধরণের মানহানি হয় না।

তবে আমি বাংলাদেশ আল-কায়েদার একজন হিতাকাঙ্খীরূপে আমাদের সমস্ত ছাত্র ভাইদেরকে 'উলামায়ে রব্বানী'র সাথে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আচরণ করতে অনুরোধ করছি। তাদের সাথে সবধরণের বেয়াদবীমূলক কর্মকাণ্ড পরিহারের নসীহত করছি। মনে রাখবেন, আপনার সুন্দর আচরণে প্রভাবিত হয়ে এমন একজন রব্বানী আলেম জিহাদী কাফেলার সঙ্গী হতে পারে, যার দ্বারা উম্মাহর ব্যাপক উপকার হবে। আবার আপনার কঠোর আচরণের কারণে উম্মাহ শত শত রব্বানী আলেমের জিহাদের উপকারিতা থেকে মহরূমও হতে পারে। তাই

দাওয়াহর ক্ষেত্রে আখলাকে হাসানাহ গ্রহণ করুন। দায়ীর গুণাবলী বারবার অধ্যয়ন করুন। আপনি যেন জিহাদী কাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ান, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি শরীয়ত মতে নিষিদ্ধ পদ্ধতি

৩. ইসলামী দলগুলোর গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে একসময়ের সহকর্মী তরুণ আলেমে দ্বীন বললেন, ইসলামী দলগুলো যেহেতু গণতন্ত্রের আকীদা লালন করে না। তাই তারা কাফের নয়। এমনিভাবে তারা শুধু গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতিকে গ্রহণ করায় পথভ্রষ্টও হবে না। যেমন ধরুন, কোনো একটা সমিতির সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ভোট হল, সেখানে ৫০০জন সদস্য ভোটে শরীক হল। ৩০০জন একজনকে ভোট দিল। ফলে সে সভাপতি নির্বাচিত হল। তো এই নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নেই। এই পদ্ধতি শরীয়তের খেলাফ নয়।

তিনি আরো বলেন, 'খেলাফত কায়েমের পদ্ধতি কী হবে? এটা একটা ইজতেহাদী বিষয়। যে যে পদ্ধতিকে উপযুক্ত মনে করবে সে সেটা গ্রহণ করতে পারে যদি শরীয়তে ঐ পদ্ধতির উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকে।' গণতন্ত্রী নির্বাচন পদ্ধতিতে সবার ভোট এক পাল্লায় মাপা হয়, সবার ভোটকে সমান মনে করা হয়, এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বললেন, 'শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে তো কোনো সমস্যা নেই। সবার ভোটকে সমান মনে করা শরীয়তের খেলাফ নয়।'

এ ক্ষেত্রে তার মূল কথা হল, ইসলামী গণতন্ত্রীদের উদ্দেশ্য খুব ভাল, তারা নবুওয়াতের আদলে খিলাফত কায়েম করতে চায়। কিন্তু তারা মুযতর বা বাধ্য হয়ে চলমান নির্বাচন পদ্ধতিকে খেলাফত কায়েমের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর চলমান নির্বাচন পদ্ধতিও শরীয়তের খেলাফ নয়। তাই ইসলামী গণতন্ত্রীগণ কোনোরূপ ভুল পথে নেই, ভ্রষ্টতার উপর নেই। তাদের আকীদাও সহীহ, নির্বাচন পদ্ধতিও সহীহ। অতএব, তারা পথভ্রষ্টতার উপর আছে তা বলার কোনো সুযোগ নেই।

গণতন্ত্রের চেতনায় যারা বিশ্বাসী হবে তাদের কাফের হওয়ার মধ্যে যেমন কোনো সন্দেহ নেই, এমনিভাবে গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি যারা দ্বীন কায়েমের জন্য গ্রহণ করবে, তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যেও কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু গণতন্ত্রের চেতনা বিশ্বাসকে উলামাগণ কুফুরী বলে স্বীকার করেন, তাই সে

ব্যাপারে কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করছি না। দ্বীন কায়েমের জন্য, খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চলমান নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ কিনা আমরা দলীলের আলোকে সে বিষয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

'নবুওয়াতের আলোকে খেলাফত' কায়েমের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কেন জায়েয নয় নিম্নে তা বিধিত হল:

১. আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। যেকোনো সমস্যার সমাধান এই দ্বীনের মধ্যে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতের ধারাও পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পছন্দ করলাম।" (মায়েদা:৩)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর মুসলমানদের জন্যে হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ।" (নাহল:১৬)

এই দুই আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, সব কিছুর মৌলিক সমাধান ইসলামের মধ্যে আছে। খেলাফত কায়েমের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামে থাকবে না এটা কীভাবে চিন্তা করা যায়? নবীজী সা. এর এবং তাঁর পরর্বতীতে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দাওয়াত ও জিহাদ এর মাধ্যমে খেলাফত কায়েম করেছেন। খেলাফত কায়েমের ক্ষেত্রে এটাই হল আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পদ্ধতি। ইরশাদ হচ্ছে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'ফেতনা দূরিভূত হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর জন্য হওয়ার পূর্বপর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক' (আনফাল:৩৯)

এই আয়াতের মধ্যে কি দ্বীন কায়েমের পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি? দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতি এবং নবীজী সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আমলকৃত পন্থা পরিহার করে কাফের-মুশরিকদের আবিষ্কৃত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হবে? আল্লাহ তাআলা কি নবীজী সা. কে পরিপূর্ণরূপে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে আদেশ দেননি? নবীজী সা. কি কিতাব ও

....

সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেননি? তাহলে কিতাব সুন্নাহ থেকে বের হয়ে গিয়ে আব্রাহাম লিংকনের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কীভাবে বৈধ হবে? আহলে জাহের না হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন।

২. গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতির আবিষ্কারক ও প্রচারক আল্লাহ তাআলা শত্রুদের মধ্য থেকে বড় একজন শত্রু এবং কাফেরদের মধ্য থেকে বড় একজন কাফের। দ্বীন কায়েমের জন্য তার আবিষ্কৃত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা শরীয়তের খেলাফ নয়, এ কথাটা কোন সাহসে বলা হল! যেখানে দ্বীন-ধর্ম, চাল-চলন, আচার-আখলাকসহ সব ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা নিষেধ, সেখানে দ্বীন কায়েমের মেহনতের মত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব এর ক্ষেত্রে কি করে আল্লাহর শত্রু কাফের-মুশরিকদের তৈরি নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা বৈধ হতে পারে? শরীয়তের খেলাফ না হয়ে পারে? আমরা নিম্নে কাফের-মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রকার সাদৃশ্য অবলম্বন নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস পেশ করলাম। আশা করি উলামায়ে কেরামের উপকার হবে:

جاء التشريع بتحريم تشبه المسلمين بالكفار ، سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم .
وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية ، خرج عنها اليوم ـ مع الأسف ـ كثير من المسلمين ، جهلاً بدينهم ، أو اتباعاً لأهوائهم ، أو انجرافاً مع العادات والتقاليد المخالفة للشرع .
ومن العجيب أن هذا الأصل ـ الذي يجهله كثير من المسلمين اليوم ـ قد عرفه اليهود الذين كانوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالفهم في كل شؤونهم الخاصة بهم .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ).. إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ ، فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ (رواه مسلم (302.)
وأدلة هذه القاعدة كثيرة في الكتاب والسنة .
أما أدلة القرآن الكريم ، فمنها :
1. قول الله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ . وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الجاثية/16-18.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا ، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعض ، ثم جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر ، شرعها له ، وأمره باتباعها ، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ، وقد دخل في (الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) كل من خالف شريعته ، و(أهواؤهم) هى ما يهوونه ، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ، ويسرون به ، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيماً ليحصل ذلك" انتهى .

ومثل هذه الآية في الاستدلال ، قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ . وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ) الرعد/36 ، 37.

فمتابعتهم والتشبه بهم فيما يختصون به هو من اتباع أهوائهم .

2.قول الله تعالى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) الحديد/16 .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :
"فقوله : (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب) نهي مطلق عن مشابهتهم ، وهو خاص أيضاً في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم ، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي" انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية (396/4) : "ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من الأمور الأصلية والفرعية " انتهى .

3.قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) البقرة/104 .

قال ابن كثير رحمه الله (197/1) : " نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم ، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص ، عليهم لعائن الله ، فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا قالوا : راعنا ، ويورون بالرعونة ، كما قال تعالى : (مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا) النساء/46 .

وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون : (السام عليكم) والسام هو الموت ، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بـ (وعليكم) وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم علينا ، والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً " انتهى .

فهذه الآيات ـ وغيرها مما لم نذكره ـ تبين أن ترك التشبه بالكفار فى أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي جاء بها القرآن الكريم.

....

وأما أدلة السنة على هذه القاعدة ، فهي كثيرة جداً ، منها :
1.عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031.)
وصحح إسناده العراقي فى تخريج الإحياء (342/1) ، وحسنه الحافظ في الفتح (222/10) ، والألباني في كتاب "حجاب المرأة المسلمة" (ص203 . (
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبِّه بهم ، كما في قوله : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ.)
فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ، ويقتضي تحريم أبعاض ذلك ، وقد يحمل على أنه صار منهم فى القدر المشترك الذي شابههم فيه ، فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك.
وبكل حال ، فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبهاً [أي : تحريم التشبه بهم من أجل أنه تشبه ، لا لسبب آخر] " انتهى.
2.روى أبو داود (652) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خَالِفُوا الْيَهُودَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ) وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود .
وهذا يدل على أن مخالفة اليهود أمر مقصود في الشرع .
3.عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) رواه مسلم (2077)
فعلّل الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس هذه الثياب بأنها من لباس الكفار
4.عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَوْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم (259 .)
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين أمراً مطلقاً ، ثم ذكر من ذلك : قص الشوارب ، وإعفاء اللحى .
5.عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ) رواه البخاري (3462) ومسلم (2103)
وعنه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (غَيِّرُوا الشَّيْبَ ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى) رواه أحمد (7492) ، وقال الألباني في "حجاب المرأة المسلمة (ص189) : " إسناده حسن " انتهى .
وهذا الحديث أدل على الأمر بمخالفتهم ، والنهى عن مشابهتهم ؛ لأن بياض الشيب ليس من فعلنا ، وقد جعل النبى صلى الله عليه وسلم إبقاءه وعدم تغييره من التشبه باليهود والنصارى ، وقد نهى عن ذلك ، فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى .
6.عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ : (اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ (يعني :

البوق) ، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى ، فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ) رواه أبو داود (498) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فعَّلل النبي صلى الله عليه وسلم كراهته للبوق بأنه من أمر اليهود ، وكراهته للناقوس بأنه من أمر النصارى ، وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى .

7.عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قال : (قلت : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ ، وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ ، قَالَ : صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ) رواه مسلم (832 .)

قال شيخ الإسلام بن تيمية :

"فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللاً ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان ، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى ، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان ، ولا أن الكفار يسجدون لها ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسماً لمادة المشابهة بكل طريق .....

وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفراً أو معصية بالنية ، ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين ، سداً للذريعة ، وحسماً للمادة" انتهى .

8. وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ) ، قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم (1134)

فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى بصيام يوم آخر مع يوم عاشوراء .

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنها : (صوموا التاسع والعاشر ، خالفوا اليهود) أخرجه البيهقي ، وصححه الألباني في "حجاب المرأة المسلمة" (ص177 .)

فهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على النهي عن التشبه بالمشركين ، والأمر بمخالفتهم ، وهذا يدل على أن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية ، فعلى المسلمين أن يراعوا ذلك في شؤونهم كلها .

وقد اختصرنا هذا البحث من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ، فمن أراد التوسع فليرجع إليه ، فإنه لم يؤلف في هذا الموضوع مثله.

জনাব এবার বুঝলেন ! দ্বীন কায়েমের জন্য কিংবা খেলাফত কায়েমের জন্য আল্লাহর শত্রু খ্রিষ্টানদের আবিষ্কৃত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা কেন নাজায়েয ও হারাম। আর এই হারামকে যারা বাতিল তাবীলের মাধ্যমে হালাল মনে করে আমরা তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট মনে করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সামান্যতম দ্বিধা ও সন্দেহ নেই।

৩. গণতন্ত্রের নির্বাচনে মুসলিম-কাফের, নারী-পুরুষ, আলেম-জাহেল, মুত্তাকী-ফাসেক নির্বিশেষে সকলের ভোটকে একই পাল্লায় মাপা হয়। মুসলিমের ভোটের যা দাম কাফেরের ভোটেরও সেই একই দাম, একজন মহিলার ভোটের যা দাম পুরুষের ভোটেরও একই দাম। আলেম ও জাহেলের ভোটের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করা হয় না। ভোটকে যারা 'শাহাদাত' এর মত গণ্য করে জায়েয বলেন, তাদের জেনে রাখা উচিত, সবার ভোটকে (শাহাদাতকে) সমান গণ্য করা কুরআনের সাথে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক বিষয়। নারী-পুরুষ, মুসলিম-কাফের ও মুত্তাকী-ফাসেকের সাক্ষ্য এক মানের নয়। সবার সাক্ষ্যের মান সমান নয়। নিম্নে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো উল্লেখ করা হল:

(أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) ، و قال سبحانه : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) ، و قال اللطيف الخبير : (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء)، و قال عز و جل : (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ) ، و قال أحكم الحاكمين : (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) }وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ} { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، فكيف نساوي بين من فرق بينهم العزيز الحكيم ما لكم كيف تحكمون ؟! فتنبه .. و لا تكن من المعرضين !!.

যে দেশের জনগণের মধ্যে পুরুষ-নারী, মুসলিম-কাফের, আলেম-জাহেল, মুত্তাকী-ফাসেক সব ধরণের লোকই আছে, সেখানে সবার ভোটকে সমান মানের গণ্য করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কেন নাজায়েয, আশা করি এসব আয়াত দ্বারা তা বুঝে এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা সঠিক বিষয়টি বুঝার ও গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

৪. নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়, তারা স্পষ্টভাবে পদ চেয়ে বেড়ায়। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে নিজেকে নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ ও আবেদন জানায়। অথচ হাদীসে পদ চাইতে এবং দায়িত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। (দেখুন, সহীহ বুখারী হাদীস নং-৬৭২৭.) যে নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে পদ চাওয়ার মত স্পষ্ট নিষিদ্ধ বিষয় বিদ্যমান সে নির্বাচন পদ্ধতি কীভাবে জায়েয হতে পারে?

বি.দ্র. ইউসুফ আ. নিজ থেকে পদ চাননি। বরং বাদশার পক্ষ থেকেই তাঁকে রাজকাজে নিয়োগ দেয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়ে ছিল। তখন তিনি নিজের পছন্দের কাজটি বাছাই করে নিয়েছেন। অতএব, ইউসুফ আ. এর উদাহরণ টেনে নির্বাচনে পদ প্রার্থিতার বৈধতা প্রমাণের অপচেষ্টা করতে যাবেন না। ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ . قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

"বাদশাহ বলল: তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল: **নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন।** ইউসুফ বলল: আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান।" (সূরা ইউসুফ:৫৪-৫৫)

এই দু'টি আয়াত সঠিক ব্যাখ্যাসহ উত্তমরূপে অধ্যয়নের অনুরোধ করছি।

৫. গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অবিচ্ছেদ্য একটি কর্ম হল, প্রার্থী কর্তৃক নিজে নিজের সাফাই পেশ করা। নিজের চরিত্র ও আচার আখলাককে ফুলের মত পবিত্র বলে প্রচার করা। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء) و قال سبحانه و تعالى : (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).

যে নির্বাচন পদ্ধতির একটি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হল, আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রচার সেই নির্বাচন পদ্ধতিকে 'শরীয়তের খেলাফ নয়' বলার সাহস কীভাবে হল?

৬. গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার আরেকটি কারণ হল, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমদেরকে শত শত দলে বিভক্ত করা হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ আপোষে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়। ইসলামের নামে যেসব দল গণতান্ত্রিক নির্বাচনে শরীক হয়, তারাও বহুদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। শুধু নামসর্বস্ব চেয়ারম্যান ও সভাপতি হওয়ার লালসায় একেকজন ইসলামী রাজনীতিবিদ (?) জনাচারেক অনুসারী নিয়ে একেকটা দল তৈরি করে বসে আছে। যেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিমগণ ফেরকায় ফেরকায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে, যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবধারিতভাবে অনেক মুসলিমের জান-মাল ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে, সেই নির্বাচনকে কী ভাবে জায়েয বলা যায়?! সেই নির্বাচনকে 'শরীয়তের খেলাফ নয়' বলে কী ভাবে স্বীকৃতি

দেয়া যায়?!! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম দায়েম রাখুন। সহীহ সামুঝ দান করুন। আমীন।

গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে কি বাধ্য করা হয়েছে?

কেউ কেউ বলে থাকে (উল্লেখিত তরুণ আলেম সাহেবও মনে করেন) 'ইসলামী দলগুলো দ্বীন কায়েমের জন্য বাস্তবসম্মত অন্য কোনো পন্থা না পেয়ে বাধ্য হয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যেহেতু তারা মুযতার বা বাধ্য হয়েছে, তাই গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি নাজায়েয ধরা হলেও তাদের জন্য জায়েয।'

এ ক্ষেত্রে কথা হল, কেউ যদি কোনো কাজ করতে বাধ্য হয়, তাহলে অবশ্যই নিম্নের বিষয়গুলোর উপস্থিতি আবশ্যক:

১. বাধ্যকারী।
২. যার হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা।
৩. যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার বর্ণনা।

এসব বিষয়ের অনুপস্থিতিতে কেউ কোনো কাজে বাধ্য হতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল, ইসলামিক গণতন্ত্রীদেরকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে কে বাধ্য করেছে? কিসের হুমকি দিয়ে বাধ্য করেছে? কোন কাজের জন্য বাধ্য করেছে? যে বিষয়ের হুমকি দিয়ে বাধ্য করা হয়েছে সেটা শরীয়তের নীতির আলোকে ইকরাহের মধ্যে গণ্য হয় কিনা? যদি গণ্য হয়ও তারপও যে কাজের জন্য বাধ্য করা হয়েছে সে কাজটা ঐ রকম ইকরাহের কারণে করা যাবে কিনা? এসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

ইকরাহের শর্ত-শরায়েত

উলামায়ে কেরামের উপকারার্থে আমরা নিম্নে ইকরাহের বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা পেশ করছি:

تعريف الإكراه وأركانه وشروطه

الإكراه لغة: عبارة عن حمل الإنسان على أمر يكرهه، وقيل: على أمر لا يريده طبعًا, أو شرعًا.

وتقول: كره الشيء كرهًا وكرهًا وكراهة وكراهية: خلاف أحبه، فهو كاره, والشيء مكروه.

ثانيًا: تعريف الإكراه اصطلاحًا:

هناك اتجاهان للعلماء في تعريف الإكراه اصطلاحًا, الأول يميل إلى المعنى اللغوي، والثاني يميل إلى المعنى العرفي والشرعي، وإليك بيان كل منهما:

الاتجاه الأول: يعرف أصحاب هذا الاتجاه الإكراه بالمعنى اللغوي، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، كالكمال بن الهمام، وابن حجر، والخطاب، وابن حزم.

فعرفه ابن الهمام بأنه: حمل الغير على ما لا يرضاه .

وعرفه ابن حجر بأنه: إلزام الغير بما لا يريده.

وعرفه الخطاب بأنه: ما يفعل بالمرء مما يضره ويؤلمه وعرفه ابن حزم بأنه: كل ما سمي في اللغة إكراه, وعرف بالحس أنه إكراه

فكل هذه التعاريف تدور حول المعنى اللغوي فقط.

الاتجاه الثاني: يعرف أصحاب هذا الاتجاه الإكراه بالمعنى العرفي والشرعي، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء:

فعرفه إبراهيم النخعي بأنه: حمل الإنسان على قول أو فعل قهرًا بغير حق، فإن كان حمله بحق فهو إجبار.

وعرفه السرخسي بأنه: اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه, أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره, أو يسقط عنه الخطاب.

وعرفه ابن عابدين بأنه: فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى, فيصير مدفوعًا إلى الفعل الذي طلب منه .

وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه, ويصير الغير خائفًا به فائت الرضا بالمباشرة.

وعرفه التفتازاني بأنه: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، فيكون معدمًا للرضا لا للاختيار.

وعرفه ابن أمير الحاج وأمير بادشاه بأنه: حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه.

وعرفه محمد بن علي التهانوي صاحب كشاف اصطلاحًات الفنون بأنه: فعل يوقعه الإنسان بغيره, فيفوت رضاه, أو يفسد اختياره مع بقاء اهليته.

وعرفه الشهاب الرملي من الشافعية بأنه: أن يهدد المكره قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العقاب, يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه وغلب على ظنه أن يفعل به ما هدد به إذا امتنع مما أكره عليه.

وبالتأمل في كل هذه التعريفات نجد أنها لا تختلف فيما بينها اختلافًا كبيرًا، فهي متفقة في المعنى والمضمون، وإن اختلفت في العبارة واللفظ، كما يلاحظ أنها ركزت على أمرين:

....

الأول: أركان وشروط الإكراه.

الثاني: ما يترتب على الإكراه من آثار.

التعريف المختار:

والتعريف الذي يمكن اختياره وترجيحه من بين تلك التعريفات السابقة هو تعريف الإمام عبد العزيز البخاري, وهو أن الإكراه: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه, ويصير الغير خائفًا به فائت الرضا بالمباشرة.

وسبب اختياري لهذا التعريف أنه يتوفر فيه أمران:

الأمر الأول: أركان الإكراه وشروطه.

الأمر الثاني: آثار الإكراه.

أما أركان الإكراه فتؤخذ من قوله: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف»، وهي كالآتي:

১- الحامل أو المكره -بالكسر- وهو الذي يحمل المكره على الفعل أو القول, وهو مستفاد من قوله: حمل»الذي يستلزم حاملًا.

২- الفاعل أو المكره –بالفتح- وهو المحمول على فعل ما أكره به الحامل, وهو مستفاد من قوله: الغير.

৩- المكره عليه، وهو الأمر الذي يجبر الحامل الفاعل على الإتيان به قهرًا، وهو مستفاد من قوله: على أمر.

8- المكره به، وهو وسيلة الإكراه, وما يتوصل به الحامل إلى حمل الفاعل على فعل المكره عليه من تخويف يجعله مدفوعًا إلى تنفيذ أمره، وهو مستفاد من قوله: يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه.

وأما شروطه فتؤخذ من قوله: يقدر الحامل على إيقاعه, ويصير الغير خائفًا فائت الرضا بالمباشرة»، وهي كالآتي:

১- أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به.

২- أن يكون المكره خائفًا على نفسه من إيقاع ما هدد به.

৩- أن يكون المكره عليه ممتنعًا منه قبل الإكراه, إما لحقه, أو لحق إنسان آخر, أو لحق الشرع.

8- أن يكون المكره به متلفًا, أو مزمنًا, أو متلفًا عضوًا, أو موجبًا عملًا ينعدم الرضا باعتباره.

وأما ما يترتب عليه من آثار فهي انعدام الرضا, وفساد الاختيار، على ما سيأتي توضيحه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

المبحث الثاني: أركان الإكراه وشروطه

لكي يتم الإكراه على الوجه الشرعي المعتبر، لا بد له من توفر جميع أركانه وتحققها، ولا بد من توفر بعض الشروط في كل ركن من هذه الأركان, وإليك بيان ذلك:

أولًا: أركان الإكراه:

للإكراه أربعة أركان هي:

১- المكره –بالكسر - وهو الذي يحمل غيره على فعل أو قول قهرًا.

২- المكره -بالفتح- وهو الذي يحمله المكره على فعل أو قول مهددًا إياه بحيث يضطره إلى أداء ما يطلبه منه من غير رضاه مع فساد اختياره.

৩- المكره عليه: هو الأمر الذي يكره الحامل الفاعل على الإتيان به.

8- المكره به: وهو وسيلة الإكراه, وكل ما يتوصل به الحامل إلى حمل الفاعل المكره عليه من تخويف يجعله مدفوعًا إلى تنفيذ أمره.

ثانيًا: شروط الإكراه:

يشترط في كل ركن من أركان الإكراه توفر بعض الشروط حتى يتحقق الإكراه وينتج أثره.

وإليك بيان شروط كل ركن من أركان الإكراه:

أولًا: شروط المكره:

يشترط في المكره -بالكسرة- أن يكون قادرًا على تحقيق ما هدد به إما بولاية، أو تغلب، أو فرط هجوم على ما صرح به جمهور العلماء، فإن لم يكن قادرًا على ذلك فإكراهه لغو لا أثر له، ويكون المكره مسئولًا عن فعله.

ذهب جمهور العلماء - من الشافعية، والمالكية وأكثر الحنابلة والصاحبان من الحنفية: إلى أن الإكراه كما يتحقق من السلطان يتحقق من غيره؛ لأن الإكراه ليس إلا إيعاد بإلحاق الضرر بالغير، وهذا يمكن أن يتحقق من كل متسلط كما يتحقق من السلطان.

ثانيًا: شروط المكره -بالفتح-

يشترط في المكره توفر الشروط الآتية حتى يتحقق الإكراه:

أولًا: أن يغلب على ظنه وقوع ما هدد به إذا امتنع عن الإتيان بالمكره عليه، وذلك لأن معيار الإكراه وثبوته شرعًا هو حدوث الخوف في نفس المكره من وقوع المهدد به، وغلبة الظن بوقوعه، وإنما يغلب على ظنه ذلك بما يحف الواقعة من قرائن تجعله متأكدًا من أن المكره لا بد فاعل ما توعده به إذا امتنع عن طاعته، والعمل بالظن الراجح تشهد له الشريعة، وغالب الرأي حجة عند تعذر اليقين.

فإن لم يغلب على ظنه ذلك، بل كان مجرد تهديد ووعيد لا ينتظر أن يحققه المكره، فلا يتحقق الإكراه حينئذ, وبالتالي لا يثبت حكمه شرعًا.

ثانيًا: أن يكون عاجزًا عن دفع المكره عن نفسه بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة، فلو كان قادرًا على النجاة من المكره لما استطاع أن يدفعه إلى فعل ما يأمر به تحت تأثير وسائل الإكراه, فلا يتحقق الإكراه حينئذ.

ونتيجة لهذين الشرطين يتحقق انعدام رضا المكره وفساد اختياره نتيجة لاضطراره وخوفه من وقوع ما أكره به من أنواع الإيذاء الذي قد يصل إلى حد فقد النفس أو المال.

ولهذا عرف بعض العلماء المكره بأنه: من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به.

ثالثًا: ألا يخالف المكره المكره بأن يأتي بفعل غير الذي أكره عليه, أو يزيد على الفعل المطلوب، أو ينقص منه، فإذا أتى المكره بشيء من ذلك كان طائعًا مختارًا فيما أتى به, فلا يتحقق الإكراه، إذ لا إكراه إلا حيث يأتي المكره بما قهر عليه امتثالًا لأمر المكره، وخوفا مما هدد به.

فلو أكره إنسان آخر على طلاق امرأته فباع داره، أو على طلاق امرأته طلقة واحدة فطلقها ثلاثًا، أو على طلاقها ثلاثًا فطلقها واحدة، فهذه الصور الثلاث التي تدل على مخالفة المكره بالتغاير في الفعل، أو بالزيادة عليه، أو بالنقصان عنه لا تعتبر إكراهًا عند الشافعية.

أما الحنفية والحنابلة: فتتحقق المخالفة عندهم بالمغايرة في الفعل, وبالزيادة عليه فقط، ولا تتحقق عندهم بالنقصان عنه، فلو أكره رجل آخر على أن يطلق جميع زوجاته فطلق واحدة منهن، لا يكون مخالفًا؛ لأن المكره إنما أقدم على ذلك رجاء التخلص من المكره بأقل ضرر، فهو مسلوب الاختيار، والإكراه قائم.

وأما المالكية: فقالوا: لا اعتبار لمخالفة المكره، فهم لا يشترطون عدم المخالفة، ومن ثم فقد نقل عنهم أن من أكره على طلاق امرأته واحدة فطلقها ثلاثًا، أو أكره على عتق عبده فطلق زوجته، لا يقع طلاقه في الظاهر؛ لأنه كالمجنون.

فالإكراه مع وجود المخالفة قائم، وترتبت عليه آثاره، فلو كان عدم المخالفة شرط في تحقق الإكراه لقالوا بوقوع الطلاق، لانتفاء هذا الشرط، إذ الشرط يترتب عليه انتفاء المشروط.

ثالثًا: شروط المكره عليه:

يشترط في المكره عليه توفر الشروط الآتية:

أولًا: أن يفعل المكره الفعل لداعي الإكراه فقط، ويكون ممتنعًا عما أكره عليه قبل الإكراه، إما لحقه كبيع ماله، أو لحق إنسان آخر كإتلاف مال الغير، أو لحق الشرع كشرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك، فإذا ألزمناه بتصرفاته في هذه الحالة لألحقنا به

الضرر، إذ أكره على التزام ما لا يريده، والشريعة الإسلامية مبنية على رفع الضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولأنه في هذه الحالة لا مخلص له عن تنفيذ الفعل المكره عليه، ولا يمكن أن يفعل إلا لداعي الإكراه، فلا يتأتى أن يفعل لداعي الشرع, أو لأي داع آخر.

فإذا أكره على القتل مثلًا، فإنه يقدم عليه وقد عظم الخوف في نفسه من أن يوقع المكره ما هدده به، فلا يقتل إلا استجابة لأمر المكره، لا للتشفي مثلًا أو الانتقام. وكذلك لو أكره على دفع الزكاة، فإنه لا يمكنه استحضار نية الدفع قربة أو عبادة، بل لم يدفع إلا استجابة لأمر المكره.

فهو حين يفعل الفعل يكون غير راض وفاسد الاختيار كذلك، إذ لو كان راضيًا لوقع الفعل منه على الوجه الذي يريد، كأن يكون قربة في العبادات، أو كأن يمتنع عن الإقدام على القتل؛ لأنه قتل ما حرم الله بغير حق.

أما لو كان الإكراه حقًّا، بأن كان المكره ممتنعًا عما وجب عليه، فأجبره إنسان عليه حسبة, فلا ضرر عليه في ذلك، كإجبار القاضي المدين على بيع بعض أملاكه لإيفاء ما عليه من ديون.

ثانيًا: أن يكون المكره عليه معينًا، بأن يكون شيئًا واحدًا كأن يكره على طلاق زوجته فاطمة أو على قتل عمرو، أما إذا كان المكره عليه شيئين أو أشياء، كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه أو أكره على قتل زيدًا أو عمرًا أو خالدًا، فهذا ليس بإكراه عند الشافعية؛ لأنهم يشترطون في الإكراه أن يكون المكره عليه معينًا، فلا إكراه مع التخيير فيما يكره المرء عليه، ومن شرط الإكراه: ألا يخالف المكره المكره، وانتقاء الشرط يترتب عليه انتقاء المشروط.

ويرى الحنفية والمالكية: أن التخيير في المكره عليه لا ينافي الإكراه, فلا يشترط عندهم أن يكون المكره عليه معينًا.

أما الحنابلة: فإنهم يوافقون الحنفية والمالكية في عدم اشتراط التعيين إذا كان المكره عليه طلاقًا، فلو أكره رجل على أن يطلق إحدى امرأتيه فطلق واحدة منهما كان مكرهًا.

ويوافقون الشافعية في اشتراط التعيين إذا كان المكره عليه قتلًا، فلو أكره رجل على قتل زيد أو عمرو، فقتل أحدهما لا يعد مكروهًا.

وأرى أنه لا وجه للتفرقة التي ذكرها الحنابلة؛ لأن الكلام في أن التخيير هل ينافي الإكراه أم لا؟ ولا فرق في هذا بين الطلاق الذي يحل الإقدام عليه، وبين القتل الذي لا يحل الإقدام عليه.

وبهذا يكون الرأي الراجح لدي هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، لتحقيق الإكراه مع التخيير في المكره عليه؛ لأن المستكره لا مندوحة له عن فعل واحد من الأمرين أو الأمور المكره عليها، فهو إما فاعل ما أكره عليه، وإما نازل به ما هدده به المكره إذا امتنع عن الإتيان بما أكره عليه، فيكون منعدم الرضا, وفاسد الاختيار.

ثالثًا: أن يترتب على فعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، فلو قال لإنسان: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فهذا لا يعد إكراهًا، لاتحاد المأمور به والمخوف به، فصار كأنه مختار له؛ لأنه لا يترتب على قتل نفسه الخلاص من القتل، فهو مقتول سواء بفعله أو بفعل المكره، وفي هذه الحالة لا يحكم عاقل أن المكره يقدم على ما أكره عليه حينئذ لاستواء المهدد به والمكره عليه، وإذا استويا فقد انعدام شرط الإكراه الخاص، وهو أن يكون المهدد به أشد خطرًا من المكره عليه، وانعدام الشرط يترتب عليه انعدام المشروط، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

بينما ذهب بعض الحنابلة: إلى عدم اعتبار هذا الشرط، واعتبر قول الإنسان لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراهًا، لكن الراجح من مذهب الحنابلة اعتبار هذا الشرط وموافقة الجمهور.

رابعًا: شروط المكره به:

يشترط في المكره به توافر الشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون التهديد بإلحاق الضرر بالمكره عاجلًا، فلو هدد به آجلًا، كأن قال رجل لآخر: طلق زوجتك وإلا قتلتك غدًا، فلا يعد ذلك إكراهًا، وبالتالي لا يثبت حكمه في الشرع، وذلك لأن التأجيل مظنة التخلص من المهدد به، إما بالاستغاثة، أو الالتجاء إلى السلطان, أو الحاكم ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة.

أما المالكية: فلا يشترط في الإكراه عندهم كون المخوف به يقع ناجزًا، بل الشرط عندهم في تحقق الإكراه هو حدوث الخوف المؤلم في نفس المكره حالًا، سواء أكان المتوعد به حالًا أو مستقبلًا، فلو قال له: إن لم تطلق زوجتك فعلت كذا بك بعد شهر، وحصل الخوف بذلك كان إكراهًا.

وأرى أن ما ذهب إليه الحنفية والشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة -وهو اشتراط كون التهديد بإلحاق الضرر بالمكره عاجلًا- هو الراجح؛ لأنه أبلغ وأقوى في إحداث الخوف في نفس المكره.

على أن الخوف من الأمور النفسية التي لا اطلاع لنا عليها، فلا بد من علامة ظاهرة على ثبوته، ولا أدل على هذا من كون الوعيد بأمر حال وشيك الوقوع.

هذا فضلًا عن أن حكم الإكراه لا يثبت إلا إذا كان المكره عاجزًا عجزًا تامًّا عن الخلاص من المهدد به، ولا يتحقق هذا إذا كان مؤجلًا؛ لإمكانه التخلص منه حينئذ بالاستغاثة, أو اللجوء إلى السلطات الحاكمة، فلا يكون عاجزًا عن التخلص منه.

وبهذا لا يثبت حكم الإكراه شرعًا لعدم تحققه مع تأجيل المهدد به، لعدم الضرورة التي تحمله على المسارعة بفعل المكره عليه.

الشرط الثاني: أن يكون الأمر الذي هدد به المكره مما يستضر به ضررًا كبيرًا غير محتمل يلحقه بسببه مشقة عظيمة، كالقتل وقطع عضو والضرب الشديد والقيد

والحبس الطويلين، أو متضمنًا أذى من يهمه أمره من الناس، كالتهديد بحبس الوالدين والزوجة.

أما التهديد بإتلاف المال, فإن كان متضمنًا إتلاف المال كله، فإنه يكون إكراهًا باتفاق.

وإن كان التهديد بإتلاف بعض المال، فقد اختلف العلماء في ذلك كما يلي:

(أ) ذهب الحنفية: إلى أن الإكراه لا يتحقق إلا بإتلاف المال كله، أما إتلاف بعضه فلا يتحقق به الإكراه، ولو كان كثيرًا.

(ب) وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الإكراه كما يتحقق بإتلاف المال كله، يتحقق كذلك بإتلاف بعضه إذا كان كثيرًا، وحد الكثرة يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، أما إتلاف المال اليسير فلا يكون إكراهًا.

(جـ) وأما المالكية: فقال المتقدمون منهم: إن في التخويف بأخذ المال ثلاثة أقوال:

الأول: لمالك: وهو أنه إكراه.

الثاني: لأصبغ: وهو أنه ليس بإكراه.

الثالث: لابن الماجشون: وهو إن كثر فإكراه, وإلا فلا.

وأما المتأخرون منهم: فقد اختلفوا في ذلك على رأيين:

الأول: جعل القول الثالث تفسيرًا للقولين الأولين، وذلك كابن بشير ومن تبعه، وعلى هذا فالمذهب على قول واحد.

الثاني: جعل الأقوال الثلاثة متقابلة إبقاء لها على ظاهرها، كابن الحاجب.

الشرط الثالث: أن يكون المهدد به أشد خطرًا على المكره مما حمله عليه، فلو كان الضرر مساويًا أو أقل، فلا يتحقق الإكراه، فلو هدد إنسان آخر بصفعه على وجهه إن لم يتلف ماله، ولم يكن من ذوي المروءات, ولا من سادة الناس ووجهائهم, فلا يعد هذا إكراهًا؛ لأن الصفع على الوجه أقل خطرًا من إتلاف المال.

ومراعاة النسبة بين المكره عليه والمهدد به قدر متفق عليه بين الفقهاء؛ لأن ضابط تحقق الإكراه: فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه خوفًا من المهدد به، ورفع الضرر الكبير في مقابلة الضرر اليسير. عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الذي يدل على نفي الضرر، وأنه لا يرفع الضرر بما يساويه.

ومن هنا فقد وضع لنا الفقهاء قاعدتين يمكن اتخاذهما أساسًا وضابطًا لأحكام الإكراه, وهما:

১- الضرر لا يزال بالضرر.

২- ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما.

أثر الإكراه في التكليف والرضا والاختيار

ويشتمل هذا الفصل على مبحثين:

الأول: أثر الإكراه في أهلية الإنسان وصلاحيته للتكليف.

الثاني: أثر الإكراه في الرضا والاختيار.

المبحث الأول: أثر الإكراه في أهلية الإنسان وصلاحيته للتكليف

لا يؤثر الإكراه بجميع أنواعه السابقة في أهلية الوجوب؛ لأن مناطها الإنسانية، فهي تثبت لكل إنسان بوصفه حيًّا، ومعلوم أن هذا الأهلية لا يؤثر فيها إلا الموت حيث يزيلها.

وكذلك لا يؤثر الإكراه بجميع أنواعه في أهلية الأداء, فلا يعدم هذه الأهلية، كما لا ينفي صلاحية المكره للتكليف, ولا يوجب سقوط الخطاب عنه، وإنما ينحصر أثره فقط في تغيير بعض الأحكام المترتبة على أهلية الأداء، مع بقاء المكره مكلفًا، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: وجود العقل والتمييز اللذين هما مناط أهلية الأداء، وعليهما مدار الخطاب.

الأمر الثاني: أن المكره مبتلى في حالة الإكراه, كما أنه مبتلى في حالة الاختيار، والابتلاء يتحقق بالخطاب.

يدل على ذلك أن فعل المكره ينقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: فرض، كما إذا أكره على أكل الميتة أو شرب الخمر بالقتل، فإنه حينئذ يفرض عليه أكل الميتة أو شرب الخمر، ولو صبر حتى قتل كان آثمًا؛ لأن الأكل والشرب كان مباحًا له؛ لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}, فثبتت الإباحة بالاستثناء، ومن أكره على مباح يفرض عليه فعله، فإن امتنع عنه ألقى بنفسه إلى التهلكة من غير فائدة, إذ ليس فيه قضاء حق الشرع.

القسم الثاني: حرام، كالإكراه على الزنا، وقتل مسلم بغير حق، فإنه يحرم عليه فعلهما عند الإكراه الملجئ، ويؤجر على ترك فعلهما.

القسم الثالث: إباحة، كالإكراه على الإفطار في رمضان، فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطر.

القسم الرابع: رخصة، كالإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان، حيث يرخص له في ذلك مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الإكراه ملجئًا.

وتردد المكره بين هذه الأقسام علامة لثبوت الخطاب في حقه؛ لأن هذه الأشياء، لا تثبت بدون الخطاب. ويأثم المكره مرة بالإقدام كما في الإكراه على الزنا وقتل النفس، ويؤجر أخرى كما في الإكراه على أكل الميتة، فإن الإقدام لما صار فرضًا يستحق به الأجر كما في سائر الفروض، أو يأثم بالامتناع مرة كما في الإكراه على الفطر للمسافر, والإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر, فإن الصبر عنهما إلى أن

يقتل حرام. ويؤجر كما في الإكراه على الكفر, فإن الصبر عنه عزيمة, والإثم والأجر متعلقان بالخطاب.

المبحث الثاني: أثر الإكراه في الرضا والاختيار

الاختيار: هو ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس.

والرضا: هو الرغبة في الشيء والارتياح له, فهو نهاية الاختيار.

وجميع الأعمال الصادرة من الإنسان لا بد لها من اختيار، إذ الإنسان لا يقدم على عمل إلا إذا ترجح عنده جانب الفعل على جانب تركه.

إلا أن الاختيار تارة يكون اختيارًا صحيحًا إذا كان منبعثًا عن رغبة في العمل، وتارة يكون اختيارًا فاسدًا إذا كان ارتكابًا لأخف الضررين, وذلك كمن أكره على أحد أمرين كلاهما شر، ففعل أقلهما ضررًا به, فإن اختياره لما فعله لا يكون اختيارًا صحيحًا, بل اختيارًا فاسدًا.

أما وجود العمل من الإنسان فلا يستلزم رضاه به، أي: رغبته فيه وارتياحه إليه، كما شهد بذلك الواقع، فقد يقوم الإنسان ببعض الأعمال وهو ليس راغبًا فيها, ولا مرتاحًا لها.

وعليه فإنه يمكن القول بأن الإكراه يعدم الرضا والاختيار اللذين هما شرط التكليف عند جمهور العلماء.

أما عند الحنفية: فيختلف تأثير الإكراه في الرضا والاختيار تبعًا لاختلاف نوع الإكراه.

فإن كان الإكراه ملجئًا -الإكراه الكامل- فإنه يعدم الرضا ويفسد الاختيار.

وإن كان الإكراه غير ملجئ -الإكراه الناقص- فإنه يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

وإن كان الإكراه بالاغتمام والهم والحزن -الإكراه الأدبي- فإنه لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

(সূত্র:আল মুলতাকাল ফিকহী, শাইখ আব্দুল আযীয বিন ফাওযান।)

কাউকে যদি প্রাণনাশ কিংবা অঙ্গহানীর হুমকী দিয়ে এমন কোনো গুনাহের কাজ করতে বলা হয়, যা করলে অন্যের হক নষ্ট হয়, যেমন: যিনা, বা কোনো মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সেক্ষেত্রে এই মুযতার/বাধ্য ব্যক্তির জন্য ঐ গুনাহের কাজ করা জায়েয নেই। বরং সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং কোনো অবস্থাতেই সে ঐ গুনাহের কাজ করবে না। যদি করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। মুযতার বা বাধ্য হয়েছে ধরে নিয়ে সে পার পাবে না।

গণতন্ত্রের নাজায়েয নির্বাচন পদ্ধতি এটা এমন এক গুনাহের কাজ যা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং যে এটা গ্রহণ করে সে অন্যদেরকেও এটার

প্রতি আহ্বান করতে থাকে। হাজার হাজার মানুষকে সে একটা নাজায়েয কাজে লিপ্ত করে ফেলে। মুসলিমেদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে ফেলে। মারামারি ও হানাহানির পরিবেশ তৈরি করে। অনেক সময় খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়। বুঝা গেল এই নির্বচন পদ্ধতি এমন গুনাহের কাজ নয়, যা মুকরাহের ব্যক্তি সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বরং এটি এমন গুনাহ যা ব্যক্তি সত্তাকে অতিক্রম করে আরো হাজারো মানুষের হক নষ্ট করে। তাই যদি কাউকে বাস্তবেই কতল, অঙ্গহানি কিংবা ভীষণ রকমের পিটুনীর হুমকি দিয়েও গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তারপরও তার জন্য ঐ হারাম পদ্ধতি গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। আর এমন হুমকি ধমকির অস্তিত্ব আমাদের দেশে অন্তত নেই। তাই ইসলামী গণতন্ত্রীদের গণতন্ত্রের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সাথে নির্বাচন পদ্ধতিও পরিহার করতে হবে।

খেলাফত কায়েমই যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে কুরআন-সুন্নাহয় বিবৃত 'দাওয়াত ও জিহাদের' বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করে খেলাফত কায়েমের পথে অগ্রসর হতে হবে। গণতন্ত্রের নাপাক স্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে তাওবা-ইস্তিগফার করে পূর্ণাঙ্গরূপে কুরআস-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আর যতদিন পর্যন্ত তারা বাতিল তাবীলের উপর ভর করে এই নাজায়েয নির্বাচন পদ্ধতিকে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করতে বাধ্য। শরীয়ত আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়।

পরিস্থিতি কি একাকী তৈরি হয় নাকি তৈরি করতে হয়?

আমার প্রিয় উস্তাদ। বড় একজন মুফতী সাহেব (আল্লাহ তাআলা দাওয়াত-জিহাদ ও শাহাদাতের পথে তাঁকে কবুল করুন)। তাঁর সাথে একবার জিহাদ বিষয়ে অনেক আলোচনা হল। তিনিও বর্তমান সময়ে জিহাদের গুরুত্ব স্বীকার করলেন। একপর্যায়ে বললেন, **'দেখ, আমরাও জিহাদকে ভালবাসি। কিন্তু আমরা একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় আছি। যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, তখন আমরাও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'**

আমার মনে হয়, এই কথা আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদের একার কথাই নয়। বরং আমাদের দেশের উলামাদের মধ্য থেকে যারা অন্তরের গভীরে জিহাদের জন্য সামান্য কিছু ভালবাসা বরাদ্দ রেখেছেন তাদের প্রত্যেকেই হয়তো এমনটিই ভাবে এবং এমনটিই বলে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কুরআন-সুন্নাহর সাথে এই কথাটির কোনো সম্পর্ক নেই। কথাটি পরিপূর্ণরূপে শরীয়াহ সাংঘর্ষিক। সংঘর্ষের দিকগুলো নিম্নে সবিস্তার উল্লেখ করা হল:

উল্লেখ্য, উস্তাদের জন্য সম্মান ও শ্রদ্ধা বরাদ্ধ কিন্তু তাকে ভুল থেকে পবিত্র মনে করা যাবে না।

আমি আমার উস্তাদকে অনেক সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁকে ভুল থেকে পবিত্র মনে করি না। উস্তাদকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা এক জিনিস আর ভুল থেকে পবিত্র মনে করা আরেক জিনিস। প্রথমটি জরুরী আর দ্বিতীয়টি হারাম। আমাদের সমাজের অনেক ছাত্র শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থান থেকে উর্ধ্বে উঠে উস্তাদকে 'পবিত্র ও নির্ভুল' মনে করতে শুরু করেছে। তাদের জেনে রাখ উচিত, আম্বিয়া আ. ব্যতীত আর কেউ পবিত্র ও নির্ভুল নয়। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ও নির্ভুল নন। তাঁদের থেকেও ভুল হয়েছে, গুনাহ হয়েছে। কিন্তু তাদের ভুল বা গুনাহ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নিষিদ্ধ। তাই উস্তাদকে সম্মান করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাকে তাকদীস করা যাবে না। তাকে 'পবিত্র ও নির্ভুল' মনে করা যাবে না। আর সাহাবায়ে কেরামের মত উস্তাদদের আলোচনা-সমালোচনা যেহেতু নিষিদ্ধ নয়, তাই তাঁদের কোনো কথা শরঈ দলীলের খেলাফ মনে হলে দলীলের আলোকে সেটা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা আবদের খেলাফও নয়, বে-আদবীও নয়। রবং অন্যদেরকে ভুল থেকে বাঁচানোর জন্য এরকম আলোচনা-পর্যালোচনা জরুরী।

উস্তাদ-শাগরিদের ইখতিলাফ কোনো নতুন বিষয় নয়। সাহাবা-তাবেয়ীনদের যুগ থেহে এই ইখতিলাফের সূচনা হয়েছে। আমাদের মাযহাবের ইমাম এবং তাঁর দুই শাগরিদের সাথে তাঁর ইখতিলাফ সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। ইখতিলাফ যখন দ্বীনের স্বার্থে হয়, আল্লাহর জন্য হয়, শরীয়তের দলীলের আলোকে হয়, তখন সেটা কোনো সমালোচনার বিষয় হতে পারে না। শরীয়তের নির্ভরযোগ্য দলীলের আলোকে কেউ আমার মতের বিরোধিতা করলে তাকে আমি আমার শত্রু ভাবতে পারি না। তাকে শত্রুভাবার অধিকারও আমার নেই। কারণ, সবার বুঝ একরকম হয় না। সবসময় সবার জেহেনে সঠিক বুঝটা ভেসে ওঠে না। তাই কেউ আমার কোনো কথা খণ্ডন করলে আমার দায়িত্ব হল, সে যে দলীলের আলোকে কথা বলেছে তার উপর নজরে সানী করা। তার কথাই যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নেয়া। আর ভুল মনে হলে, দলীলের আলোকে জবাব দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক মানহাজ বুঝার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুখে ভালবাসার দাবি, কর্মে বিরোধিতা

১. আমার শাইখের উক্তি **'আমরাও জিহাদকে ভালবাসি'**।

ভালবাসা এমন একটি জিনিস যা শুধু মৌখিক দাবির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ পায়। ভালবাসা অন্তরঘটিত বিষয়। তা দেখা যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তা অনুভব করা যায়। ভালবাসা অন্তরে থাকে কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা সত্যায়ন ও বাস্তবায়ন করে দেখায়। একজন বলল, আমি আল্লাহকে ভালবাসি। কিন্তু সে আল্লাহর প্রেমের দাবি আদায় করে না। আল্লাহর হুকুম মান্য করে না। বরং সর্বক্ষেত্রে সে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচার করে। তার বহ্যিক কর্মকাণ্ড আল্লাহর প্রেমের উপর দালালত করে না, তারপরও কি তার মৌখিক দাবি মেনে নিতে হবে? আল্লাহ তাআলাও কি তার ভালবাসার দাবি গ্রহণ করবেন? না, কখনো নয়।

'আপনারা জিহাদকে ভালবাসেন' কিন্তু এ কেমন ভালবাসা যে, যুগ যুগ ধরে আপনাদের মুখ থেকে জিহাদের প্রতি ভালবাসামূলক কোনো কথা শোনা যায় না? জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায় না? ফরযে আইন জিহাদকে বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো চিন্তা-ফিকির পরিলক্ষিত হয় না? ২০০৭ সাল থেকে জিহাদকে ফরযে আইন স্বীকার করার পরও (আমার উস্তাদ ২০০৭ সালে আমার এক ইস্তিফতার উত্তরে বাংলাদেশীদের উপর জিহাদ ফরয বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন) জিহাদের জন্য বাস্তবমুখী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না ? বরং প্রকৃত অবস্থাতো এই যে, জিহাদের প্রতি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে অনুৎসাহিত করা হয়, নিরুৎসাহিত করা হয়। জিহাদী চেতনাকে দমন করা হয়। জিহাদী মনোভাবকে দাফন করার চেষ্টা করা হয়। জিহাদী কাফেলার সাথে সম্পৃক্ত ছাত্র-উস্তাদদেরকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করে বহিষ্কার করা হয়। জিহাদ প্রেমী ছাত্রদের নাম 'কালো তালিকা' ভুক্ত করে মাদরাসার সামনে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। জিহাদপ্রেমী ছাত্র থেকে 'কখনো জিহাদ করা যাবে না, জিহাদের সাথে যুক্ত হওয়া যাবে না' মর্মে অঙ্গিকার নেয়া হয়। ছাত্র-উস্তাদদের মধ্যে জিহাদভীতি ঢুকিয়ে দেয়া হয়। জিহাদ বিদ্বেষী দাগী উস্তাদদেরকে প্রমোশন দেয়া হয়। তাদেরকে মাদরাসার প্রকৃত খায়েরখাহ মনে করা হয়। এই তো হল, জিহাদকে ভালবাসার চিত্র। জিহাদ প্রেমের প্রকৃত রূপ।

হ্যাঁ, আপনার কোনো ছাত্র ভুল পথে পরিচালিত কোনো জিহাদী সংগঠনের সাথে যদি সম্পৃক্ত হয়ে যায়, আর আপনি যদি তা জানতে পারেন, তাহলে খায়েরখাহীর সাথে তাকে ঐ সংগঠন থেকে নিবৃত্ত করে সহীহ আকীদা-মানহাজের মাধ্যমে পরিচালিত জিহাদী কাফেলার প্রতি রাহবারী করা আপনার দায়িত্ব। কিন্তু ছাত্র জিহাদকে ভালবাসে, জিহাদের ফরয ইবাদাত বাস্তবায়িত

করতে চায়, শহীদ হতে চায় শুধু সে জন্য আপনি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করলেন, শুধু এই কারণেই আপনার মনটা তার প্রতি বিষিয়ে উঠল, এটা কেমন 'জিহাদ প্রেম'? এমন জিহাদ প্রেমের নমুনা কি সালাফের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়?

অতীতে যারা জিহাদকে ভালবাসতেন তারা কী করতেন? তাঁদের ভালবাসাও শুধু মৌখিক দাবির উপর সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তারা তা বাস্তবায়নও করে দেখাতেন? নবীজী সা. এবং তাঁর সাথীবর্গ রাযি. জিহাদকে খুব বেশি ভালবাসতেন। নবীজী সা. বারবার শাহাদাতের আশা ব্যক্ত করেছেন। সাহাবায়ে কেরামকে জিহাদের উপর উদ্বুদ্ধ করেছেন। জিহাদের ফযীলতের ব্যাপারে শতাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিজের স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা, ভাই-বোন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘরবাড়ি সব কিছুর উপর জিহাদের ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। নিজে যুদ্ধের ময়দানে শরীক হয়েছেন। দান্দান শহীদ করেছেন। মাথা মুবারাকের ফেঁটে যাওয়া হাসি মুখে মেনে নিয়েছেন। নিজের খুন ঝরতে দিয়েছেন, কাফেরদের খুনও প্রবাহিত করেছেন। একবার দুইবার না, বারবার এমনটি করেছেন।

আর সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ও নবীজী সা. এর অনুসরণে কোনোরূপ কমতি করেননি। নবীজী সা. এর পবিত্র মুখ থেকে জিহাদের বাণী শুনতে শুনতে জিহাদই হয়ে গিয়েছিল তাঁদের পেশা ও নেশা। তাঁদের নেশা ও পেশাই ছিল জিহাদ। জিহাদই ছিল তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যত বেশি পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছেন, যিনি যত বেশি যুদ্ধে শরীক হয়েছেন তিনি ততবেশি মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারণের মাপকাঠি ছিল 'জিহাদ'। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তাআলা তাঁদের পূর্বাপরের সব গুনাহ মাফ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর ওহুদের যুদ্ধে শরীকদের মর্যাদা বেশি, তারপর বাইআতে রেজওয়ানে শরীকদের মর্যাদা বেশি। এর দ্বারাই এ কথা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদই ছিল তাঁদের দুনিয়া-আখেরাতের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। শাহাদাত পিয়াসী শত শত সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করে আমি লেখাকে দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। তবে একজনের ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না।

হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি. (নবীজী সা.এর ফুফাত ভাই, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাশ রাযি. এর আপন ভাই, প্রথম দিকে ইসলাম কবুলকারীদের একজন

এবং ইসলামের প্রথম যুদ্ধাভিযানের আমীর) আমার কাছে এসে বললেন, আল্লাহর কাছে দুআ করবে না? (কারণ, যুদ্ধের ময়দানে দুআ কবুল হয়)। আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। অতঃপর আমরা ময়দানের এক পাশে চলে গেলাম। আমি প্রথমে দুআর জন্য হাত তুললাম। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ! আজ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী, শক্তিশালী, রাগন্বিত এক শত্রু সেনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তার সাথে যুদ্ধ করব, সেও আমার সাথে যুদ্ধ করবে, অতঃপর আমি যেন তাকে হত্যা করে তার সাথে থাকা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করতে পারি।' আমার কথা শেষ হলে আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি. আমীন বললেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ দুআ করতে শুরু করলেন, তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার জন্যও একজন শক্তিশালী, যুদ্ধে পারদর্শী, রাগন্বিত শত্রুসেনা নির্বাচন কর। আমি শুধু তোমার জন্য তার উপর আঘাত করব, সেও আমার উপর পাল্টা আগাত হানবে। অতঃপর সে আমার উপর বিজয় লাভ করবে, আমাকে হত্যা করে আমার নাক-কান কেটে ফেলবে। এর কিছুক্ষণ পরই যখন আমি তোমার সাথে মিলিত হব, তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আব্দুল্লাহ তোমার নাক-কান কেন কাটা হয়েছে? আমি বলব, হে প্রিয়! তোমার এবং তোমার রাসূলের প্রেমের দাবি রক্ষা করতে গিয়ে আমার নাক-কান কর্তনের শিকার হয়েছে। তখন তুমি বলবে, আব্দুল্লাহ তুমি সত্য বলেছ।'

সাআদ বিন আবীওয়াক্কাস রাযি. বলেন, আব্দুল্লাহর দুআ আমার দুআর চেয়ে অনেক উত্তম ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেছিলেন। দিনের শেষ প্রহরে আমি দেখলাম, আব্দুল্লাহকে হত্যা করে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। আর তাঁর নাক-কান এক গাছের কাঁটার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। (আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা:২/২৮৬)

আল্লাহু আকবার! সুবহানাল্লাহ! কেমন ছিলেন তারা? কেমন ছিল তাঁদের শাহাদাত পিয়াসা? জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি কী পর্যায়ের গভীর ভালবাসা থাকলে মানুষ এমন দুআ করতে পারে? হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি. মুখে ভালবাসার দাবি করেননি ঠিক। কিন্তু নিজের আচার-আখলাক ও কর্ম দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি তাঁর ভালবাসা কী মানের ও কী পর্যায়ের ছিল। এখানে তো শুধু একজনের কথা উল্লেখ করলাম। আরো শত শত সাহাবীর কথা উল্লেখ করা সম্ভব যারা জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেমে মতোয়ারা ছিলেন। শাহাদাত হাসিলের মাধ্যমে আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করাই যাদের স্বপ্ন ছিল। আল্লাহর রাহে নিজেকে কুরবান করে দেয়াই যাদের ধ্যান ছিল।

এখন প্রশ্ন হল, যারা সাহাবায়ে কেরামকে রাযি. নিজেদের অনুসরণীয় মনে করে, তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে, তারা কেন জিহাদ ও শাহাদাতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আদর্শ গ্রহণ থেকে পিছিয়ে থাকে? কেন তাদের থেকে বছরের পর বছর ধরে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি প্রকৃত ভালবাসামূলক কোনো কথা ও কাজ প্রকাশ পায় না? কতশত দুআ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কেন কোনো দুআর মজলিসে কারো মুখ থেকে ভুলেও শাহাদাত প্রার্থনার কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় না? কেন মুজাহিদীনদের সফলতার জন্য দুআ করা হয় না? কেন নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জিহাদ ও শাহাদাত প্রীতির অধ্যায়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়? কেন সুন্নত জিন্দার মেহনতকারীগণ দাঁত ভাঙ্গার সুন্নত সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে? রক্ত নিয়ে খেলার সুন্নাহ সম্পর্কে নির্বাক থাকে? জিহাদ ও শাহাদাতের ক্ষেত্রে যাদের এই দৈন্যদশা তারা কীভাবে 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' এর উপর অটল থাকার দাবি করে? তারা কীভাবে নিজেদেরকে এবং শুধু নিজেদেরকেই আহলে হক মনে করে?!

হে উলামায়ে কেরাম! সচেতন হোন। নিজেদের আকীদা-মানহাজকে পুনরায় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আকীদা-মানহাজের সাথে মিলিয়ে নিন। যতটুকুর মিল পান ততটুকু রাখুন। আর যতটুকুতে অমিল দেখেন ততটুকু সংশোধন করে নিন। গতানুগতিক ধারা পরিহার করুন। মূলের দিকে ফিরে চলুন। কিতাব, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর জীবনাদর্শকে বাস্তব সম্মতভাবে আঁকড়ে ধরুন। শুনে রাখুন, এই দুনিয়ার নেতৃত্ব অচিরেই এমন এক কওমের হাতে হস্তান্তর হবে যারা সর্বক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর অনুসারী হবে। যারা শেষ যামানায় এসেও ৫০ জন আমলকারীর সমান সাওয়াব লাভ করবে। আবূ হুরাই রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন,

إن من بعدي أيام الصبر ، المتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه له أجر خمسين عاملًا.

'আমার পরে সবরের একটা সময় আসবে, ঐ সময় আজ তোমরা যে আকীদা-মানহাজের উপর আছ তা যে আঁকড়ে ধরবে সে ৫০জন আমলকারীর সাওয়াব পাবে।' (আলমুযাক্কিয়াত, দারাকুতনী পৃ.৮৮, হাদীসটির সনদ সহীহ। কোনো কোনো হাদীসে ৫০জন সাহাবীর সমান সাওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে, আবার কোনোটিতে ৫০জন শহীদের সমান সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে, তবে সেগুলোর সনদ ত্রুটি মুক্ত নয়; কথা বলার সুযোগ রয়েছে।) অতএব, এখন সময় আছে আসুন আমরাও তাঁদের একজন হওয়ার চেষ্টা করি। সাহাবায়ে

কেরামের মানহাজকে আঁকড়ে ধরি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিস্থিতির অপেক্ষায় থাকা

২. হযরতের কথার দ্বিতীয়াংশ **'কিন্তু আমরা একটা পরিস্থিতির অপেক্ষায় আছি'**।

কোনো জাতির উপর যখন জিল্লতি, বেইজ্জতী ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনার মত কঠিন আযাব নেমে আসে তখন সেই আযাব দূর করে আল্লাহর রহমত ফিরিয়ে আনার জন্য কি পরিস্থিতির অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় নাকি পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য কুরআনিক নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের সাধ্যানুযায়ী মেহনত করতে হয়? কুরআনের দিকে নজর বুলালে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তাআলা বলছেন,

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ {الرعد:১১}

"আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (র'দ:১১)

কোনো জাতি যখন আল্লাহর কোনো নেয়ামতের মধ্যে থাকে, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদের নেয়ামতের অবস্থাকে আযাব দ্বারা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা গুনাহ ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে নেয়ামত দূরিকরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে যখন কোনো জাতি আল্লাহর কোনো গজব ও আযাবে পতিত হয়, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে সেই গজব ও আযাব দূর হয় না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা ঐ অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য আল্লাহর ইবাদত তথা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বাধ্যতা ও মান্যতার দিকে ফিরে এসে আযাব ও গজব দূর হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর বাস্তব একটি উদাহরণ হল, যত দিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ জিহাদসহ ইসলামের অন্যান্য হুকুমগুলো পালন করতে ছিল, সামগ্রিকভাবে আল্লাহর বাধ্যতা ও মান্যতার ভিতর ছিল, ততদিন তারা খিলাফতের ছায়াতলে ইজ্জত ও সম্মানের জীবন-যাপনের মত বিরাট নিয়ামতের মধ্যে ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যখন বিভিন্ন প্রকার অবাধ্যতায় লিপ্ত হল, সাথে সাথে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক জিহাদকেও ছেড়ে দিল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বেইজ্জতী, বেহুরমতি ও লাঞ্ছনার মত ভয়ানক আযাব চাপিয়ে দিলেন। আজ গোটা উম্মাহ এই আযাবের মধ্যে নিপতিত। এই আযাব থেকে আমরা তখনই মুক্তি পাব যখন **জিহাদসহ দ্বীনের যাবতীয় হুকুমের দিকে ফিরে আসব**। পূর্ণাঙ্গভাবে

দ্বীনকে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানহাজকে আঁকড়ে ধরব। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এই আয়াতের শিক্ষা হল, আযাব ও গজবের পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য মেহনত করা, চেষ্টা করা। আসমান থেকে ফেরেশতা এসে পরিস্থিতি পরিবর্তন করে দিয়ে যাবেন সেই আশায় নিষ্কর্ম বসে থাকা এই আয়াতের শিক্ষা নয়। পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য অগ্রসর হতে হবে, নিজের সাধ্য বিলীন করতে হবে, এটাই এই আয়াতের শিক্ষা। একাকী পরিস্থিতি পাল্টে যাবে না। খারাপ পরিস্থিতি যেমন একাকী আসে না বরং আমাদের কর্মের কারণেই আসে, ঠিক তেমনই ভাল ও শান্তিদায়ক পরিস্থিতিও আমাদের কর্মগুণেই আসবে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

“তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল” (শুরা:৩০)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।” (রুম:৪১)

এসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যেমনিভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা ও বদ আমলের কারণে আযাব ও বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনিভাবে নেক আমল ও আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাধ্যতার দিকে ফিরে আসলে পুন:রায় নেয়ামত ফিরে পাওয়া যাবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন।

তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।" (নূর:৫৫)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণ হয়ে গেল পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে এই আশায় বসে থাকা যাবে না বরং ঈমান ও আমালে সালেহাতের মাধ্যমে পরিস্থিতি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কোনো কোনো শাইখকে এই আয়াত তিলাওয়াত করে ছাত্রদেরকে ঈমান ও নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়, তারা ছাত্র ও জনতাকে বলে থাকেন, "পৃথিবীর বর্তমান সমস্যার সমাধান ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই হবে। আমরা যদি ঈমান ও আমালে সালেহাতের উপর মেহনত করি তাহলে খেলাফত আবার আমাদের হাতে ফিরে আসবে।" কথাটা পরিপূর্ণ সত্য। কিন্তু সমস্যাটা বেঁধে যায় আমালে সালেহাত তথা নেক আমলের ব্যাখ্যায়। কথার আখেরী ফিনিশিং এভাবে দেয়া হয়, 'অতএব, আমাদের করণীয় হল, বেশি বেশি দাওয়াত ও তাবলীগে সময় দেয়া, দাওয়াতুল হকের মেহনতকে চাঙ্গা করা, যেখানে এই দুই মেহনত নাই সেখানে এই দুই মেহনত জিন্দা করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাহলেই কেবল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে, খিলাফত ফিরে আসবে'। শাইখ অতিসতর্কতার সাথে, আমালে সালেহাত থেকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে বাদ দিয়ে দেন। কখনো ভুলেও নেক আমলের ব্যাখ্যায় জিহাদের কথা বলেন না। মনে হয় জিহাদকে তিনি নেক আমলের মধ্যেই গণ্য করেন না কিংবা খিলাফত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে জিহাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু দাওয়াত ও তাবলীগ আর দাওয়াতুল হক দ্বারাই খেলাফত কায়েম হয়ে যাবে।

ছাত্র জমানায় বহুবার আমি আমার শাইখ ও প্রিয় উস্তাদ থেকে এই আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা শুনেছি। যখন শুনতাম তখনই আমার অন্তর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করত না। কিন্তু উস্তাদের কাছে এ বিষয়ে 'মুরাজাআত' করার মত সহসও পেতাম না। কারণ, উস্তাদের কোনো কথার উপর এশকাল হওয়া, উস্তাদের কাছে কোনো কথার দলীল জানতে চাওয়া বড় ধরণের বেয়াদবীর মধ্যে গণ্য করা হয়। তাই উস্তাদকে আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি।

প্রিয় পাঠক! যদিও আমার উস্তাদ আমলে সালাহাতের ব্যাখ্যায় জিহাদের কথা বলেন না, কিন্তু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সা. জিহাদকে নেক আমলের মধ্যে গণ্য করেন, শুধু গণ্যই করেন না, বরং নবীজী সা. ঈমানের পরই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

"একদা নবীজী সা. কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? নবীজী সা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? নবীজী সা. বললে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোনটি? নবীজী সা. বললেন, হজ্জে মাবরূর। " হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই আছে। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে জিহাদের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসগুলো দ্রষ্টব্য।

যে আমলকে ঈমানের পরই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে সেই আমল কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়? যে আমলের ফযীলতের ব্যাপারে শতাধিক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেই আমল কি আমালে সালেহাতের অন্তর্ভুক্ত নয়? প্রচলিত ধারার তবলীগ আর দাওয়াতুল হকের ভিতরই নেক আমল সীমাবদ্ধ হয়েগেল? তালিবুল ইলমদেরকে আর কত অন্ধকারে রাখা হবে? আর কত সরলমনা ছাত্রদের থেকে সত্য গোপনের অপচেষ্টা করা হবে?!

এত মেহনত তারপরও ফেতনা কমছে না কেন?

আমার প্রিয় উস্তাদের মত আরো অনেকেই তাবলীগ ও দাওয়াতুল হকের উপর আমল করার দ্বারাই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং খিলাফত ফিরে আসবে বলে মনে করে। মনে করা এক জিনিস, আর বাস্তবতা আরেক জিনিস। ১৯২৭ সালে তাবলীগ জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ প্রায় ৯০ বছর হয়ে গেল, তাবলীগের মেহনত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। কোটি কোটি মুসলমান তাবলীগের পরশে ধন্য হল। হাজার হাজার মসজিদ তাবলীগের উসূল মোতাবেক চলতে শুরু করল। এক চিল্লা ও তিন চিল্লার লাখ লাখ জামাআত বের হল। কিন্তু এই ৯০ বছরে প্রচলিত তাবলীগের মাধ্যমে পৃথিবীর এক ইঞ্চি ভূমিতেও আল্লাহর দ্বীন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেতো আমরা শুনিনি? পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডে তাবলীগওয়ালারা আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করেছে বলেতো দেখা যায়নি? কিছু দিন পূর্বে দাওয়াতুল হকের ২৩ তম বার্ষিক ইজতেমা শেষ হল। ২৩ বছরের এই দীর্ঘ মেহনতের ফলাফল কী? বাংলাদেশের কোনো একটি থানায় কিংবা গ্রামেও কি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে? দ্বীন এবং দ্বীনওয়ালারা কি ইজ্জত সম্মানের জিন্দেগী লাভ করেছে? শিরক, বিদআত, মাজার পূজা, কবর পূজার মত ঈমান বিধ্বংসী ফেতনা দূর হয়েছে? হ্যাঁ, কিছু লোকের আযান, ইকামাত ও নামায সহীহ হয়েছে। কিছু

লোকের মধ্যে দ্বীন পালনের তড়প তৈরি হয়েছে। কিছু লোকের মধ্যে দ্বীনের প্রতি মহব্বত তৈরি হয়েছে। কিন্তু দ্বীন কায়েম ও খিলাফতের সাথে যেজন্য তবলীগ ও দাওয়াতুল হককে যুক্ত করা হচ্ছে তার তো কিছুই হয়নি।

সীমাহীন গতিতে তাবলীগের মেহনত বেড়েছে, দাওয়াতুল হকও পিছিয়ে নেই,ওয়ায়েজীন উলামাগণও শত শত ওয়াজ মাহফিল করছেন, গত বিশ বছর পূর্বেও যেখানে এক থানায় বছরে একটা ওয়াজও হত অনেক কষ্টে, সেখানে একই থানায় এখন বছরে ৩০-৪০ টি ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে। মাদরাসাও বসে নেই। সবার সাথে তালমিলিয়ে মাদরাসার সংখ্যাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নামে বে-নামে শত শত মকতবও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। নিত্যনতুন মসজিদের সংখ্যাও বাড়ছে। এগুলো সবই ভাল ও প্রসংশনীয় বিষয়। কিন্তু ভাবনার বিষয় হল, দ্বীনের মেহনত এত বেড়েছে, তবুও সমাজ থেকে শিরক, বিদআত, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নাস্তিকতার মত ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো কমছে না কেন? দিন দিন ঝড়ের গতিতে এগুলো বাড়ছে কেন? পরকীয়া, ধর্ষণ, যিনা, ছিনতাই, রাহাজানী, চুরি, ডাকাতি, বদমাইশি, বখাটেপনা, সুদ-ঘুষের মত ধ্বংসাত্মক ব্যাধি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে কেন? কী এর রহসহ্য? কী এর সমাধান?

সাধারণ মানুষগুলো চলমান লাঞ্ছনা ও অশান্তির জীবন থেকে বাঁচার জন্য উলামায়ে কেরামের কথা মত, তাবলীগে যাচ্ছে, দাওয়াতুল হক করছে, বাচ্চাদেরকে মাদরাসায় দিচ্ছে, ওয়াজ মাহফিল শুনতে যাচ্ছে। টংগী, যাত্রবাড়ী ও চরমোনাইর ইজতিমায়ও যাচ্ছে, এসব পথে হাজার হাজার টাকাও খরচ করছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সফলতা পাচ্ছে না। ঈমান আনার পর, উলামাদের নির্দেশনা মোতাবেক যুগ যুগ ধরে আমলে সালেহাত করার পরও দ্বীন কায়েম হচ্ছে না, দ্বীন ও দ্বীনওয়ালাদের ইজ্জত ফিরে আসছে না, ওয়াদাকৃত খেলাফতের অস্তিত্ব দৃশ্যমান হচ্ছে না। কী এর কারণ? কারণ একটিই। তাহল, কুরআনিক দিকনির্দেশনা প্রত্যাখান করে নিজেদের মন মত নেক আমল করা। নিজেদের দুনিয়াবী সমস্ত স্বার্থ ঠিক রেখে যতটুকু নেক আমল করা যায় ততটুকু করা। যেই নেক আমল করলে দুনিয়ার স্বার্থ হাত ছাড়া হয় না, তা করা। আল্লাহর শত্রুদের বেঁধে দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করে দ্বীন পালন ও নেক আমল করার হিম্মত হারিয়ে ফেলা। আমেরিকা অসন্তুষ্ট হয় এমন নেক আমল না করা। আল্লাহ শত্রুদের চাহিদা মোতাবেক মডারেট মুসলিম ও উদারপন্থি মুসলিম হওয়া। উদারতা দেখাতে গিয়ে হিন্দুদের দূর্গা পূজা আর বৈশাখী উৎসবকেও নিজেদের উৎসব মনে করা। ‘ধর্ম যার যার

উৎসব সবার’- এর মত কুফুরী আকীদা লালন করা। নিজেদের অজান্তেই দুনিয়ার প্রেমে বুঁদ হয়ে যাওয়া।

বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত দুনিয়া থেকে কুফর, শিরকসহ যাবতীয় ফেতনা ফাসাদ এবং যাবতীয় অশ্লীলতা কীভাবে দূর হবে আর দ্বীন কীভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ সুবহানাহুর জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সে ব্যাপারে স্পষ্টরূপে ঘোষণা দিয়ে বলছেন,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (৩৮) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“তুমি কাফেরদেরকে বলে দাও যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না (কুফর-শিরকসহ সব) ফেতনা শেষ হয়ে যায়; এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।” (আনফাল:৩৮-৩৯)

আমরা যতদিন পর্যন্ত এই ইলাহী ঘোষণার দিকে ফিরে না আসব, কাফের, মুশরেক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত না হব, যত দিন পর্যন্ত না দুষ্টের শক্তিকে চিরতরে নিঃশেষ করে দিব, ততদিন পর্যন্ত দ্বীন কায়েম হবে না। সমাজ থেকে ফেতনা নির্মূল হবে না। কুফর, শিরক, বিদআত, মাজারপুজা, পীরপুজা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, যিনা, ধর্ষণ, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বখাটেপনা, বদমাইশি ও সুদ-ঘুষের মত ফেতনা এবং ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে আমাদের সমাজ পবিত্র হবে না। কারণ, পৃথিবীতে কুফর, শিরক, বিদআতসহ অন্যান্য গুনাহগুলোকে রাষ্ট্রীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ ঐ গুনাহগুলোকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবধরনের নিরাপত্তা দিচ্ছে, সব রকমের সহযোগিতা করছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতায় গুনাহগুলো প্রচার-প্রসার লাভ করছে।

যার শক্তির উপর ভিত্তি করে অপরাধীরা অপরাধ করছে, যার সাহস ও সহযোগিতাকে পুঁজি করে পাপাচারীরা পাপ করছে, সেই শক্তিমান নিরাপত্তাদাতাকে কিছু না বলে সাধারণ পাপীদের সংশোধন করার ফিকির বোকামী বই কিছু নয়। সাপের লেজ না মাড়িয়ে মাথায় আঘাত করাই বুদ্ধি

মানের কাজ। সামরিক শক্তিধর তাগুত শুধু দাওয়াত দ্বারা পরিবর্তন হবে না। দাওয়াতের সাথে সাথে একটি ধারালো তরবারীও তাদের সামনে পেশ করতে হবে। সে জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিকড় কাঁটার আদেশ কেরেছেন। বৃক্ষের শিকড় কেটে দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব এমনিতেই মরে যায়, একাকী ধ্বংস হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুফর, শিরক, বিদআতসহ সবরকমের অশ্লীলতা-বেহায়াপনা এবং দুষ্ট ও অনিষ্টের লালনকারী, প্রশ্রয়দাতা, নিরাপত্তাদাতা ও প্রচারক 'সামরিক শক্তিধর' রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিলে, শিকড় কাটার মত সুফল আসবে। রাষ্ট্রের হর্তা-কর্তা ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিক যখন একজন মুত্তাকী,পরহেযগার, সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হবে তখন তার প্রভাব, প্রতাপ ও প্রতিপত্তিতেই সিংহভাগ শিরক, বিদআত, বেহায়াপনা ও অন্যান্য গুনাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর দেওয়া দণ্ড বিধি যখন প্রয়োগ করা হবে, তখন তার বরকত ও প্রভাবে বাকী অন্যায়-অনাচারও বন্ধ হয়ে যাবে। লোক সম্মুখে চোরের যখন হাত কেটে দেয়া হবে, ডাকাত ও সন্ত্রাসীর যখন ডান হাত ডান পা কর্তন করা হবে, মদ্যপ ও যিনাকারীকে যখন নির্ধারিত পরিমাণ বেত্রাঘাত করা হবে, সুদখোর মহাজন ও ঘুষখোরের উপর যখন তাদের প্রাপ্য শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যার পরিবর্তে হত্যার বিধান যখন কায়েম করা হবে, তখন মানুষ শাস্তির ভয়ে হলেও গুনাহ ছাড়তে বাধ্য হবে। সবার সম্মুখে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার শংকা ও শরমে হলেও মানুষ সমস্ত অপরাধ থেকে পবিত্র হওয়ার চেষ্টা করবে। এভাবেই একটা মুসলিম সমাজ পুত-পবিত্র ও শান্তিময় সমাজে পরিণত হবে। সমস্ত অন্যায়-অনাচারমুক্ত শান্তিপুরিরূপে গড়ে উঠবে। মুসলিমদের শান্তি, সম্মান, শৌর্যবীর্জ এবং বিজয়ী ইসলামের প্রকৃতরূপ দেখে তখন কাফেররাও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে। ইসলাম কবুল করে তারা ধন্য হবে। কারণ, স্বভাগতভাবেই মানুষ বিজয়ী জাতির কৃষ্টিকালচার ও আদর্শ গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। নবীজী সা. এর শেষ তিন বছর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় যে খুব অল্প সময়ে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছিল, বিশাল বড় ভূখণ্ড নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এর মূল রহস্য ছিল এটাই। ইসলাম যখন বিজয়ের আসনে সমাসীন হয়, তখন বাস্তবে ইসলামের প্রকৃত মহানুভবতা দৃশ্যমান হয়। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম তা মানুষ প্রাক্টিক্যালি দেখার সুযোগ পায়। তখন হাজার হাজার পৃষ্ঠা খরচ করে মানুষকে ইসলামের সৌন্দর্য ও মহাত্ম বুঝানোর দরকার হয় না। ঘন্টার পর ঘন্টা বয়ান করে মানুষকে দ্বীন বুঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। দাওয়াতের ক্ষেত্রেও তখন বিধর্মীয় গ্রন্থের

রেফারেন্স টানার প্রয়োজন হয় না। তাগুতী শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণে প্রধান প্রতিবন্ধক লোকগুলো যখন ধ্বংস হয়ে যায়, আর ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা কাফেরদের উপর যখন লাঞ্ছনার প্রতীক জিযিয়া কর আরোপ করা হয়, তখন তারা বুঝতে পারে এবং দেখতে পারে যে, ইজ্জত-সম্মান, শান্তি-সহমর্মিতা এবং দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা শুধু ইসলামেই আছে। তখন তারা এই সম্মান ও মর্যাদার পথ গ্রহণ করতে আর দেরি করে না, দ্বিধা করে না। একদিকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণে প্রতিবন্ধক তাগুতী শক্তির অনুপস্থিতি, অপর দিকে ইসলামের সৌন্দর্য ও মহাত্ম সে নিজ চোখে দর্শন করে, আবার মুজাহিদীনে ইসলামের পক্ষ থেকে 'কূনূ মিসলানা' (আমাদের মত হয়ে যাও)-এর সরল আহ্বানও পায়, তখন সে নিজের জন্য ইসলামের শাহী দরজা উন্মুক্ত দেখতে পায়। আর প্রবল আবেগ, আগ্রহ ও ইখলাস নিয়ে ইসলামে দাখেল হয়ে ধন্য হয়। গত কালের ইসলাম বিরোধী মানুষটি আজ মুজাহিদীনে ইসলামের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজ রক্তীয়দের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতেও দ্বিধা করে না। সে যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে সেই সত্য দিকবিদিক ছড়িয়ে দেয়ার জন্য, সেই সত্যকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেও সত্যের সৈনিক হয়ে যায়। নিজের জান-মালের নজরানা পেশ করে অশেষ-অসীম জান্নাত হাসিল করে নেয়।

কুরআনের এই মহাআদর্শ (যা যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রমাণিত) ছেড়ে আমরা যতই অন্যান্য নেক আমল করিনা কেন (কিছু সাওয়াব হলেও) কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাবলীগের ৯০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং দাওয়াতুল হকের প্রায় ৩০ বছরের মেহনত তো এ কথাই প্রমাণ করছে। ইসলামী গণতন্ত্রীদের পঁচা গণতন্ত্রের কথা না হয় নাই বললাম।

তাই আসুন এই কুরআনিক দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের দিকে ফিরে আসি। আল্লাহর শত্রুদের সামরিক শক্তি নির্মূল ও নিঃশেষ করে দিয়ে আল্লাহর কালিমাকে বুলান্দ করার সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে দেই। অন্যান্য নেক আমলের পাশাপশি সামরিক শক্তি অর্জনের পথে অগ্রসর হই। আসুন না নবীজী সা. এর অনুসরণে আমরাও ২৩ বছরের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করি! দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া এবং জিহাদ ও কিতালের সমন্বয়ে একটা স্বচ্ছ, সুন্দর কর্মপন্থা গ্রহণ করে দ্বীন কায়েমের বাস্তব সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করি! ইনশা আল্লাহ সর্বোচ্চ ২৩ বছর দাওয়াত, তালীম, তাযকিয়া এবং জিহাদ ও কিতালের সমন্বয়ে গঠিত মানহাজের উপর আমল করার পর আমরা দেখতে পাব যে, তৎকালিন 'জাযীরতুল আরবে'র মত আমাদের দেশটাও একটা আদর্শ-শান্তিময় দেশে পরিণত হয়েছে। যেখানে কোনো অন্যায়-অনাচার

থাকবে না। থাকবে না কোনো জুলম-নির্যাতন। ধনী-গরীবের প্রভেদ থাকবে না। সাংস্কৃতি চর্চার নামে থাকবে না কোনো অশ্লীলতা। বাকস্বাধীনতার নামে থাকবে না কোনো নাস্তিকতা। মুনাফার নামে থাকবে না কোনো সুদ। উপঢৌকনের নামে থাকবে না কোনো উৎকোচ। ‘বড় ভাই’ও ‘গডফাদারে’ র নামে থাকবে না কোনো সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজ। থাকবে না পোশাক পরেও ‘উলঙ্গ’ কোনো নারী। থাকবে না কোনো পতিতালয়, কোনো মদও জুয়ার আড্ডা। বিনোদনের নামে চলবে না কোনো দেশী কিংবা বিদেশী সিরিয়াল। সহশিক্ষার নামে থাকবে না কোনো নষ্টামি। ফ্রিমিক্সিং এর নামে থাকবে না কোনো বেহায়াপনা। সাহিত্যের নামে থাকবে না কোনো যৌন সুরসুড়ীর অস্তিত্ব। এমন একটি দেশ গড়ার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিস্থিতি তৈরি হলে যারা ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তাদেরকে বলছি

৩. আমার উস্তাদে মুহতারামের কথার তৃতীয়াংশ **‘যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে, তখন আমরাও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব।’** কখনো কখনো তিনি বলে থাকেন, **‘জিহাদের পরিবেশ তৈরি হয়েগেলে আমরাই থাকব প্রথম সারিতে’**।

মা-শা আল্লাহ অনেক উত্তম কথা। আজকাল জিহাদ ভীতির যুগে এমন কথাইবা কয়জনের মুখ থেকে শোনা যায়! কিন্তু সমস্যা হল, আল্লাহ তাআলা শুধু এজাতীয় মৌখিক কথায় আশ্বস্ত হন না। মৌখিক জমা–খরচে আল্লাহকে আশ্বস্ত করা যায় না। জিহাদের প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ইন্তিজাম এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কারো এই দাবি গ্রহণ করেন না যে, **সময় হলে আমরাই প্রথম সারিতে থাকব**। অন্তসারশূণ্য, বাস্তবতা বিবর্জিত এই দাবি খণ্ডনে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (88) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ(8৫) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

“আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের ভাল জানেন। নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে (জিহাদে না যাওয়ার ব্যাপারে) অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে

তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। **আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো।** কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।” (তাওবা:৪৪-৪৬)

ইমাম কুরতুবী রহ. এই আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন,

قوله تعالى (:ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة) أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف.

“যদি তারা বাস্তবেই জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত, তাহলে জিহাদী সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করত, সরাঞ্জাম প্রস্তুত করত। অতএব, প্রস্তুতি গ্রহণ না করাটাই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তারা বাস্তবে জিহাদে বের হতে চায় না।” (দেখুন, তাফসীরে কুরতুবী)

যেকোনো ইবাদাত কারো উপর ফরয হওয়ার পূর্বেই তা শিক্ষা করতে হয় এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করতে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, বালেগ হওয়ার পূর্বে নামায ফরয হয় না। কিন্তু নবীজী সা. চান্দ্র মাস হিসাবে বাচ্চাদের বয়স সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে নামাযের আদেশ দিতে বলেছেন। আবার দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে পিটাই করতে বলেছেন। অথচ দশ বছরে যেহেতু বাচ্চারা সাধারণত বালেগ হয় না, তাই তাদের উপর তখনও নামায ফরয নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রহমতের সাগর প্রিয় নবীজী সা. বাচ্চাদেরকে মারতে বলেছেন। কী এর রহস্য? রহস্য একটাই, যেহেতু আনাগত ভবিষ্যতে তার উপর নামায ফরয হতে যাচ্ছে, তাই সে যেন বালেগ হওয়ার পূর্বের এই ৫/৬ বছরে ধীরে ধীরে নামাযের জরুরী মাসায়েল শিক্ষার সাথে সাথে আমলী মশকের মাধ্যমে নামায শিখে নেয়। আর তার যেন নামাযের অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং বালেগ হওয়ার পর সে যেন নামাযে কোনো রকম অবহেলার সুযোগ না পায়। সেজন্যই মূলত সাত বছর বয়স থেকেই নামাযের আদেশ করতে বলা হয়েছে। সাত বছর বয়সেই যাকে নামাযের আদেশ করতে বলা হয়েছে, তাকে অবশ্যই সাত বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই নামাযের মৌলিক বিষয়গুলোও শিখিয়ে দিতে হবে। এই বর্ণনা দ্বারা বুঝাগেল, যে কোনো ইবাদাত ফরয হওয়ার পূর্বেই সেই ইবাদাত সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ ইলম ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা জরুরী। যাতে ফরয হয়ে যাওয়ার পর ফরয আদায়ে কোনোরূপ বিলম্ব না হয়। কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত। কখনো ফরযে কিফায়া থাকে। আবার কখনো ফরযে আইন হয়, যেমন এখন বিশ্ব মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরযে আইন।

কিন্তু জিহাদ ফরযে কিফায়ার স্তরে থাকুক কিংবা ফরযে আইন এর স্তরে সর্বাবস্থায় জিহাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাখা ফরয। এটা যেমন উপরে বর্ণিত নামাযের বিষয়টি থেকে সাব্যস্ত হয়, তেমনি যুক্তিও এটাকে সমর্থন করে। কারণ, শত্রু যখন হামলা করে বসবে, হাজার হাজার আলেম-উলামা ও মুসলিমকে কতল করতে শুরু করে দিবে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিবে। মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করতে শুরু করবে, মূল্যবান-মূল্যহীন সমস্ত সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে, আরাকানীদের মত রিক্ত হস্তে উদ্বাস্তু জীবন যাপনে বাধ্য করবে, তখন তো হত্যাকারী, লুণ্ঠনকারী ও ধর্ষক ঐ পিশাচকে প্রতিহত করাই ফরযে আইন হবে। তখন যদি আপনি শত্রুকে প্রতিহত করা বাদ দিয়ে, নিজের বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোট্ট ভাই-বোন, অসহায় স্ত্রী-সন্তানকে শত্রুর হামলা থেকে না বাঁচিয়ে গাজীপুর কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের বন-জঙ্গল আর পাহাড়ে গিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণে লিপ্ত হন, তাহলে তো আপনি ফরয তরককারী বলে বিবেচিত হবেন। তাছাড়া কোনোরূপ পূর্ব-প্রস্তুতি ব্যতীত আপনি কি নিজে নিজেকে শত্রুর হামলা থেকে রক্ষা করতে পারবেন? আপনিই যদি আত্মরক্ষা করতে না পারেন, নিজেকে নিজে বাঁচাতে নাপারেন, তাহলে আপনি শত্রুর হাত থেকে ফঁসকে গিয়ে কীভাবে প্রস্তুতি অর্জন করবেন? সে সুযোগ আপনার কীভাবে অর্জন হবে?

আর আপনি এমনটা কীভাবে আশা করছেন যে, শত্রু হামলা করার সাথে সাথে আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মত যোগ্য মুজাহিদও পাওয়া যাবে? পূর্ব থেকেই যদি জিহাদী কাফেলা বিদ্যমান না থাকে, সহীহ জিহাদী সংগঠনগুলো সামান্য পরিসরে হলেও যদি জিহাদের চর্চা করতে না পারে, আলেম-উলামাগণ যদি পূর্ব থেকেই জিহাদকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করেন, তাহলে তখন আপনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কি আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে মুজাহিদ পাঠিয়ে দিবেন? নাকি জমিন ফুঁড়ে কোনো প্রশিক্ষক বের হয়ে আসবে? এখন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যদি আপনারা জিহাদ বাস্তবায়নের জন্য একজন আমীর খুঁজে না পান, তখনকার সেই উত্তাল অবস্থায় আপনারা কীভাবে একজন সর্বসম্মত আমীর নির্বাচন করবেন? কীভাবে সেই সর্বসম্মত আমীরের অধীনে আপনারা একত্রিত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন? সেই আমীর সাহেবেরই যদি জিহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকে, তখন সে কীভাবে লাখ লাখ আলেম উলামা ও তলাবায় পরিপূর্ণ একটি জিহাদী কাফেলা পরিচালনা করবেন? একদম আনাড়ি, অনভিজ্ঞ, বিশৃঙ্খল বিরাট জনশক্তি কি তখন আমীর সাহেবের জন্য বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না? আর এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে আমীর সাহেব রাতারাতি

কীভাবে এই পর্যায়ে উন্নীত করবেন যে, তারা ২/৩ বছর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, বহু বছরের অভিজ্ঞ সুশৃঙ্খল একটি বাহিনীর সাথে লড়ার যোগ্য হয়ে উঠবে?

ভাবছেন পরিবেশ কায়েম হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ৭১ এর মত ভারত সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে? কিংবা সরকারের সেনাবাহিনী আপনাদের পক্ষে দাড়াবে? কস্মিনকালেও না। মনে রাখতে হবে, হিন্দুস্তান হক ও বাতিলের মধ্যকার এক চূড়ান্ত যুদ্ধের অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে জায়গায় জায়গায় যুদ্ধের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। এই আগুন আর নিভানো যাবে না। ধীরে ধীরে এই আগুন পুরো ভারত উপমহাদেশকে গ্রাস করবে। এই যুদ্ধ হবে হিন্দুস্তানের ইতিহাসের হক ও বাতিলের সর্বশেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ হিন্দুস্তানে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্র শক্তি একজোট হয়ে মিত্র বাহিনীর রূপ ধারণ করবে। আপনাদের স্বাক্ষরিত 'শান্তির ফতওয়ায়' (?) যাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এই সম্মিলিত কাফের ও তাগুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে হকের ঝাণ্ডা হাতে তাঁরাই বুক টান করে লড়বে ইনশাআল্লাহ। বিপদের দিনে সেই সূর্য সন্তানদেরকেই আপনারা পাশে পাবেন। কেউ যদি সেদিন আপনাদের দুরাবস্থায় আপনাদের সঙ্গী হয়, আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাহলে সেই জঙ্গীরাই আপনাদের সঙ্গী হবে। অবশ্য তাদের সংখ্যা খুব কম হবে। কারণ, এখন যারা প্রথম সারিতে থাকার ওয়াদা দিচ্ছে, তখন তাদেরকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। তারা কম হলেও তাদের কোয়ালিটি খুব উন্নত হবে। সবর ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়ার সাথে সাথে তারা সামরিক ক্ষেত্রেও বেশ দক্ষ হবে। আল্লাহর শত্রুদের সংখ্যার তুলনায় তাদের সাংখ্যা খুব নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই অল্প সংখ্যক মুজাহিদের হাতেই কাফের-মুরতাদদের বিশাল পরাক্রমশালী বাহিনীকে কচুকাটা করাবেন। হিন্দুস্তানের ভূমি কাফের-মুরতাদদের পদচারণা মুক্ত হবে। আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে। সর্বত্র কালিমা খচিত সাদা ও কালো পতাকা উড্ডীন হবে। কাফের-মুরতাদদের নেতাদেরকে মুজাহিদগণ বন্দী করবেন। তাদের গলায় ও পায়ে শিকল ও বেড়ি পরিয়ে মুজাহিদদের হেডকোর্টার 'শামে' নিয়ে যাওয়া হবে। হিন্দুস্তান বিজয়ী বাহিনী যখন শামে গিয়ে পৌঁছবে, তখন তারা জানতে পারবেন যে, দাজ্জালকে হত্যা করতে ঈসা.আ. আসমান থেকে অবতরণ করেছেন। (ইতি পূর্বে ইমাম মাহদী ও দাজ্জালেরও আত্মপ্রকাশ ঘটবে)। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হচ্ছে:

হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস

....

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام) . روى النسائي -

"নবীজী সা. এর আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সা. বলেছেন, আমার উম্মতের দুইট দলকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। একটি ঐ দল যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে আরেক ঐ দল যারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. এর সঙ্গী হবে।" (সুনানে নাসায়ী হাদীস নং-৩১২৪, হাদীসটির সনদ সহীহ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي ، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ . " سنن النسائي .

"হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবীজী সা. আমাদের সাথে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন। আমি যদি ঐ যুদ্ধ পাই তাহলে আমি ঐ যুদ্ধে আমার জান ও মাল খরচ করব। ঐ যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের একজন বলে বিবেচিত হব। আর যদি আমি ফিরে আসি তাহলে আমি আবূ হুরাইরা জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ পেয়ে যাব।" (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং-৩১২৩, মুসনাদে আহমাদ:১২/২৮, হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল কিন্তু পূর্ববর্তী সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি এই হাদীসের মূল ভাষ্যকে সমর্থন করে। তাই এটি গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই।)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوْمًا الْهِنْدَ ، فَقَالَ : " لَيَغْزُوَنَّ جَيْشٌ لَكُمُ الْهِنْدَ ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوا بِمُلُوكِ السِّنْدِ مُغَلْغَلِينِ فِي السَّلَاسِلِ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ فَيَنْصَرِفُونَ حِينَ يَنْصَرِفُونَ ، فَيَجِدُونَ الْمَسِيحَ ابنَ مَرْيَمَ بِالشَّامِ " ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُ تِلْكَ الْغَزْوَةَ بِعْتُ كُلَّ طَارِدٍ وَتَالِدٍ لِي وَغَزَوتُهَا ، فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا انْصَرَفْنَا ، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرِّرُ يَقْدَمُ الشَّامَ فَيَلْقَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، فَلَأَحْرِصَنَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ ، فَأُخْبِرَهُ أَنِّي صَحِبْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا ، وَقَالَ : " إِنَّ جَنَّةَ الآخِرَةِ لَيْسَتْ كَجَنَّةِ الأُولَى يُلْقَى عَلَيْهِ مَهَابَةٌ مِثْلَ مَهَابَةِ الْمَوْتِ ، يَمْسَحُ وَجْهَ الرِّجَالِ وَيُبَشِّرُهُمْ بِدَرَجَاتِ الْجَنَّةِ " .

"হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবীজী সা. হিন্দুস্তানের আলোচনা করলেন, তখন বললেন, অবশ্যই তোমাদের একটি বাহিনী হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে, তারা সেই যুদ্ধে বিজয়ী হবে এমনকি তারা

হিন্দুস্তানের রাজা-বাদশাদেরকে শিকলে আবদ্ধ করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা সেই বাহিনীর সদস্যদের (অতীত-ভবিষ্যতের) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তারা যখন হিন্দুস্তান থেকে ফিরে আসবে তখন তারা শাম আঞ্চলে ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.কে পেয়ে যাবে।...” (মুসনাদে ইসহাক বিন রাহুয়া, হাদীস নং-৪৭১)

এসব হাদীস দ্বারা বুঝে আসে নবীজী সা. হিন্দুস্তানের যে যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন এবং যে যুদ্ধের ফযীলত বর্ণনা করেছেন, সেটি মূলত হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ যুদ্ধের ব্যাপারে খাস। তবে চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে সংগঠিত অন্যান্য এমন যুদ্ধ যা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য হবে কিংবা চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ হবে তাও এই ফযীলতের আওতাভুক্ত হতে পারে। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। ‘যোদ্ধাগণ শামে গিয়ে ঈসা.কে দেখতে পাবে’ এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধের শেষাংশ ইমাম মাহদীর উপস্থিতিতে তাঁর কমাণ্ড মোতাবেক হবে। কারণ, ইমাম মাহদি ঈসা আ. এর অবতীর্ণ হওয়ার সাত কিংবা নয় বছর পূর্বে আত্ম প্রকাশ করবেন।

ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের পূর্বে যেসব বিষয় ঘটবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা ধীরে ধীরে সবই বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হকের ঝাণ্ডাবাহী উলামায়ে কেরাম এখনও ঘুমিয়ে আছেন। এখনও অনেকে মনে করছে আগামী হাজার বছরেও ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের সম্ভবাবনা নেই। অথচ ইমাম সুয়ূতী রহ. মুসলিম উম্মাহর হায়াত কম হওয়া সত্ত্বেও বেশি সাওয়াব পাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস বিশ্লেষণ করে বলেছেন, এই উম্মতের হায়াত ১৫শ শতাব্দীকাল অতিক্রম করবে বলে মনে হয় না। তাঁর বিশ্লেষণ সহীহ কিনা তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, কিন্তু যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে ১৫শ শতাব্দী পূর্ণ হতে আর মাত্র ৫২ বছর বাকী আছে। এর মধ্যে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আগমন, ঈসা আ. এর অবতরণ, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয়, কুফ্ফারদের পরাজয়সহ সব কিছু ঘটে যাবে। অতঃপর ঈসা আ. এর ইন্তিকালের পর একটা ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে। এই বাতাস সমস্ত মুমিনের রূহ কেড়ে নিবে। তখন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলনেওয়ালা কোনো মুসলিম অবশিষ্ট থাকবে না। এমনই এক অবস্থায় কিয়ামাত সংগঠিত হবে। কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে নির্ধারণ করে কোনো কিছু বলার উপায় নেই। কিয়ামতের ইলম আল্লাহ তাআলা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর হায়াত শেষ হওয়া সম্পর্কে হাদীসের আলোকে কিছু বলার অবকাশ রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর হায়াত শেষ হওয়া আর কিয়ামত সংগঠিত হওয়া এক বিষয় নয়।

যাই হোক আপনাদের ভাষ্যমতে যখন জিহাদ ফরয হয়ে যাবে, জিহাদের পরিবেশ কায়েম হয়ে যাবে, তখন যেন প্রস্তুতির পিছনে পড়ে মূল ফরয তরক করতে না হয়, সেজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর সর্বাবস্থায় জিহাদের পূর্ব-প্রস্তুতিকে ফরয করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন তা দ্বারা তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করতে পার আল্লাহর শত্রুদেরকে, তোমাদের শত্রুদেরকে এবং তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।” (আনফাল:৬০)

তাই আসুন সময় থাকতেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত হই। নিজেও প্রস্তুতি নেই আর নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকেও প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বকুল করুন। আমীন।

নবীওয়ালা কাজের শিরোনামে যা চলছে তা কি আসলেই নবীওয়ালা কাজ?

প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগকে যুগ যুগ ধরে ‘নবীওয়ালা কাজ’ বলে প্রচার করা হচ্ছে। ‘নবীওয়ালা কাজ’ বলে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, আম্বিয়া আ.গণ যে মিশন ও মাকসাদ নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, প্রচলিত দাওয়াত-তাবলীগ একই মিশন ও মাকসাদ বাস্তবায়ন করছে। শুধু তারাই নবীগণের আনীত কাজ করছে। তারা যা করছে তা সবটাই নবীগণের কাজ। তাই সবাইকে এই ‘নবীওয়ালা কাজের’ সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। আলেম জাহেল নির্বিশেষে সকলকেই এই নবীওয়ালা কাজ করা উচিত।

অনেক উত্তম কথা। নবীওয়ালা কাজ সকল মুসলিমকেই করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগই আসলে নবীওয়ালা কাজ? নাকি প্রকৃত নবীওয়ালা কাজ অন্য কিছু? নবী-রাসূলগণের প্রেরণের মিশন ও মাকসাদ কি প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ নাকি অন্য কোনো মিশন ও মাকসাদে তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল? প্রচলিত তাবলীগওয়ালারা যা করছে নবীগণের মিশন কি

শুধু এতটুকুই ছিল? প্রচলিত তাবলীগ ছাড়া কি অন্যকোনো কার্যক্রম নবীগণ আঞ্জাম দেননি? আসুন বর্তমান কিংবা নিকট অতীতের ফেতনার যুগের কারো ব্যাখ্যা বা কথার উপর নির্ভর না করে নবী-রাসূল আ. বিশেষ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.কে প্রেরণের মিশন ও মাকসাদ সম্পর্কে জানার জন্য কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফুস সালেহীনের দ্বারস্থ হই। কুরআন-সুন্নাহ থেকে জেনে নেই কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা এই ধরায় নবী-রাসূলে প্রেরণ করেছেন? তাঁদের মিশন ও মাকসাদ কী ছিল? এরপর প্রচলিত 'নবীওয়ালা কাজের' সাথে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত নবীগণের আ. মিশন ও মাকসাদ মিলিয়ে নেই। তাহলেই ইনশাআল্লাহ চলমান 'নবীওয়ালা কাজে'র হাকীকত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

নবী-রাসূল প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্যসমূহ

১. আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন সকল মানুষের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য, আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত অন্য সকলের ইবাদত অস্বীকার করে খাঁটিভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, তাগুতকে অস্বীকার করে ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে:

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ}

"আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তার কাছে অবশ্যই এই ওহী প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যাতীত আর কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমারই ইবাদত কর" (সূরা আম্বিয়া:২৫)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ }

"আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে এ মর্মে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাগুতকে বর্জন কর"। (সূরা নাহল:৩৬,তাগুতের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানার জন্য গ্রন্থের শুরু অংশটা পুনরায় দেখার অনুরোধ রইল।)

নবী-রাসূলগণের কাজের মৌলিক এবং প্রধান কাজই হল, তাওহীদের আহ্বান জানানো। কাফেরদের কাছে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেয়া। তাগুতকে বর্জন করার শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব পূজনীয়দের অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের শিক্ষা প্রদান করা। এখন যারা নবীওয়ালা কাজের দাবিদার, তাদের মধ্যে এই মৌলিক বিষয়গুলোর

কোনোটাই পাওয়া যায় না। না তারা কাফেরদেরকে তাওহীদের আহ্বান জানায়, না তাগুত বর্জনের শিক্ষা দেয়, আর না আল্লাহ ব্যতীত অন্যসব পূজনীয়দের অস্বীকার করতে বলে। নবী-রাসূলগণের মিশন ও মাকসাদের মৌলিক বিষয়গুলোই যাদের মধ্যে অনুপস্থিত তারা কীভাবে নবীওয়ালা কাজ আঞ্জাম দেয়ার দাবি করতে পারে?

২. যেসব উদ্দেশ্যে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করা হয়েছে তার একটি হল, মানুষকে ইলম, নেক আমল ও তাযকিয়া শিক্ষাদান। ইরশাদ হচ্ছে:

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ}

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" (সূরা জুমআ.২)

এ বিষয়গুলোও প্রচলিত দাওয়াত-তাবলীগের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিকৃত পন্থায় ফাযায়েলের কিছু আলোচনা হলেও জরুরী মাসআলা-মাসাইলের শিক্ষা সেখানে নেই। তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে তাদের অবহেলার কথা তো সর্বজন স্বীকৃত।

৩. নবী-রাসূল প্রেরণের বড় একটি মাকসাদ হল, দ্বীন কায়েম করা, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নাযিলকৃত কিতাবের আইন-কানুন অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করা। ইরশাদ হচ্ছে:

: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ}

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়ে ছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়ে ছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, **তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর** এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মূশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।" (সূরা শুরা:১৩)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

"তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" (সূরা তাওবা:৩৩)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}

"নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।" (সূরা নিসা:১০৫)

নবীজী সা. ইরশাদ করেন:

عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِبالسَّيْفِ، حتى يُعبدَ اللهُ وحدَه لا شريك له،وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"কিয়ামাতের পূর্বে আমি তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছি, আমার তরবারী ততক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ না লা-শরীক এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। আমার বল্লমের নিচে আমার রিযিক রাখা হয়েছে। যে আমার আনীত দ্বীনের বিরোধিতা করবে সে লাঞ্ছনার শিকার হবে, আর যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদেরই অর্ন্তভুক্ত হবে।" (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৫১১৪, হাদীসটি সহীহ।)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى.

"নবীজী সা. বলেছেন, মানুষজন যতক্ষণ না এ কথার স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত

কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি...” (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৫, মুসলিম হাদীস নং-২২)

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূল বিশেষ করে হযরত মুহাম্মাদ সা. এর প্রেরণের একটি বড় উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দ্বীনকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যসব দ্বীনের উপর আল্লাহর দ্বীনকে জয়যুক্ত করা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা। আর নবীজী সা. তরবারীসহ প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর তরবারী ততক্ষণ কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে থাকবে, যতক্ষণ না তারা কুফর ছেড়ে দিয়ে তাওহীদ গ্রহণ করে নেয়।

এসব আয়াত ও হাদীসের বাস্তবরূপ দানের জন্যই নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর দাওয়াতের পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপঃ

নবীজী সা. এর দাওয়াতের ক্ষেত্র ছিল কাফের-মুশরিকরা। কাফেরদের মধ্য থেকে যারা তাওহীদের আহ্বান গ্রহণ করত তারাই মুসলিম বলে সাব্যস্ত হত। তাঁদের ঈমানী-আমলী উন্নতির জন্য নবীজী সা. বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। জিহরতের পূর্ব পর্যন্ত নবীজী সা. নানাবিধ কারণে শুধু মৌখিক দাওয়াতের উপর সীমাবদ্ধ ছিলেন। হিজরতের পর যখন মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনকে জয়যুক্ত করার হুকুমও আসল তখন নবীজী সা. দাওয়াতের পদ্ধতি পরিবর্তন করলেন। তখন নবীজী সা. দাওয়াতের জন্য সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতেন। সেই বাহিনী একেক কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতো। তারা যদি ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাত তাহলে তাদেরকে জিযিয়া কর প্রদান সাপেক্ষে দারুল ইসলামের অধীন হয়ে থাকার আহ্বান জানানো হত। এই প্রচেষ্টাও ব্যার্থ হলে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্তক যুদ্ধ ঘোষণা করা হত। যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের সমর শক্তি ধ্বংস করত: তাদেরকে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হত। কিন্তু ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হত না। বরং দারুল ইসলামের অধীনস্ত হয়ে থাকতে বাধ্য করা হত। ইসলামের বিজয়ের পর যখন সাধরণ কাফের জনতা খুব নিকট থেকে ইসলামের সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পেত, মুসলিমদের সুন্দর আচার-আখলাক দেখতে পেত, তখন তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হত।

মদীনার দীর্ঘ জীবন পুরোটা সময় জুড়ে নবীজী সা. এভাবেই দাওয়াতের কাজ করেছেন। নবীজী সা. এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ পদ্ধতিতেই দাওয়াতের কাজ করেছেন।

কারণ, দাওয়াতের কাজ দ্বারা শুধু দাওয়াতই মাকসাদ নয়, বরং দ্বীনের বিজয় সাধনও প্রধান একটি মাকসাদ। তাই দ্বীনের বিজয় সাধনের জন্য যেরকম দাওয়াতী কর্মপন্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল নবীজী সা. আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তেমন কর্মপন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। সংক্ষেপে এই কর্মপন্থাকে 'দাওয়াত ও জিহাদ' এর কর্মপন্থা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, নবীওয়ালা কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজই হল, দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে তাওহীদের আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর তাওহীদকে পৃথিবীর বুকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। মুখের কথায় যদি কাফেররা তাওহীদের বাণী গ্রহন না করে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তরবারী পরিচালনা করা। যে জামাআত কাফেরদের কাছে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত পন্থায় তাওহীদের আহ্বান পৌঁছানোর ফিকির করে না, আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত পন্থায় কার্যক্রম গ্রহণ করে না, নবী-রাসূল প্রেরণের মৌলিক মিশন ও মাকসাদকেই যারা এড়িয়ে যায়, ঐ মাকসাদকে যারা নিজেদের মাকসাদই মনে করে না, মনে করলেও বাস্তব কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, তারা কীভাবে নিজেদের কাজকে 'নবীওয়ালা কাজ' বলে প্রচার করতে পারে?! তারা কীভাবে মনে করতে পারে যে, এই কাজ যারা না করবে তারা গোমরাহ! তারা কোন সাহসে এ কথা বলে বেড়ায় যে, এই কাজ নূহ আ. এর কিশতীর মত, যারা এই কিশতীতে উঠবে না, তারা সবাই হালাক হয়ে যাবে!?

সঠিক পন্থায় 'মুমিনদের ইসলাহের ফিকির করা' একটি উত্তম কাজ। এ কাজেও অনেক সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে, নিজেদের আবিষ্কৃত 'বিশেষ এক পন্থা ও পদ্ধতির ইসলাহের ফিকির' কেই 'নবীওয়ালা কাজ' বলে প্রচার করা কোনো ভাবেই যথার্থ নয়। নবীওয়ালা কাজতো বলা যাবে ঐ কাজকেই যে কাজের জন্য মৌলিকভাবে নবী-রাসূলকগণ প্রেরিত হয়েছেন, মৌলিকভাবে যে কাজ নবী-রাসূলগণ করে গিয়েছেন। তাঁদের শাখাগত হাজারো কাজের একটি কাজকে গ্রহণ করে সেটাকে নবীওয়ালা কাজ বলে প্রচার করা কোনোভাবেই উচিত নয়, কারণ, এর দ্বারা মুসলিমগণ এ মর্মে ভ্রান্তির শিকার হতে পারে যে, এই কাজটির জন্যই মূলত নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। আর বাস্তবতা তো এটাই যে, অলরেডি মুসলিমগণ ঐ বিশেষ জামাআতের দ্বারা উল্লেখিত ভ্রান্তির শিকার হওয়ার সাথে সাথে আরো বহু ধরণের ভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সেসব লিখে কিতাবের পরিসর বৃদ্ধির ইচ্ছে নেই।

দাওয়াত ও তাবলীগের ভাইদের সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ বা শত্রুতা নেই। বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করার মত হীন কোনো উদ্দেশ্যও আমার নেই। আমার জানা ও দেখামতে তাবলীগের হাজার হাজার ভাই এমন আছে যারা ইখলাসের সাথে দ্বীনের কাজ করতে চায়, নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর তরীকা ও মানহাজ অনুসরণ করে দ্বীনের কাজ করতে আগ্রহী। আমি সেই সব মুখলিস ভাইদের জন্য নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর দাওয়াতের কর্মপন্থা বর্ণনা করে দিলাম। আশা করি প্রত্যেক মুখলিস ব্যক্তি 'দাওয়াত ও তাবলীগের' প্রচিলত কর্মপন্থার উপর নিজের মেহনতকে সীমাবদ্ধ না রেখে দ্বীন কায়েমের ও প্রচারের মৌলিক পদ্ধতি 'দাওয়াত ও জিহাদ' এর পথে ফিরে আসবেন। আমাকে আপনার শত্রু না ভেবে কুরআন-হাদীসের যে উদ্ধৃতিগুলো এখানে উল্লেখ করা হল, সেগুলো নিয়ে বিশেষভাবে রিসার্চ ও অনুসন্ধান চালানোর জন্য আবেদন করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 'নবীওয়ালা কাজ দাওয়াত ও জিহাদে'র পথে কবুল করুন। আমীন।

জিহাদের অর্থ

সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত যেমন শরীয়তের একটি পরিভাষা জিহাদও একটি পরিভাষা। সলাত, সিয়াম ইত্যাদির যেমন আবিধানিক অর্থ ব্যতীতও পারিভাষিক একটি অর্থ আছে, তেমনি জিহাদেরও শাব্দিক অর্থ ব্যতীত পারিভাষিক একটি অর্থ আছে। সব ইবাদাতের ক্ষেত্রে যেমন পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, জিহাদের ক্ষেত্রেও পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হল, জিহাদসহ ইসলামের যেকোনো ইবাদাতকে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মানসিকতা নিয়ে বুঝা। সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের যে অর্থ বুঝেছেন আমাদেরকেও সেই অর্থই বুঝতে হবে। আমরা যদি জিহাদের এমন কোনো অর্থ করি যে অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. করেননি, কিংবা এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করি যে অর্থ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. গ্রহণ করেননি, তাহলে আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এমন কে আছে যে দাবি করতে পারে যে, সে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে জিহাদ বেশি বুঝে! যে নবীজী স. নিজে ২৭টি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৩টি অভিযান প্রেরণ করেছে, আর যে সাহাবীগণ নবীজী সা. ও তাঁর খলীফাদের নেতৃত্বে শত শত যুদ্ধে শরীক হয়েছেন, তাদের চেয়ে বেশি জিহাদকে আর কে বুঝেছে? মদীনার বাজারে যখন জিহাদের এলান হয়েছিল, তখন 'হুরুল মদীনা' খ্যাত

নব বধূর মধুচন্দ্রিমা কুরবান করে ঘোরা ও তরবারি কিনে যারা জিহাদের ময়দানে চলেযেতেন তাদের চেয়ে বেশি জিহাদকে আর কে বুঝতে পারে?

কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার আলোকে জিহাদের অর্থ নিম্নরূপ:

জিহাদের শাব্দিক অর্থ: চেষ্টা করা, মেহনত করা।

পারিভাষিক অর্থ: 'আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আল্লাহর কালিমাকে বুলান্দ করার জন্য কাফের-মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজের চেষ্টা, মেহনত ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা।'

অতএব, যুদ্ধের প্রয়োজনে অর্থ দান করা, যুবান দ্বারা মানুষকে যুদ্ধের উপর উৎসাহিত করা, লিখনী দ্বারা যুদ্ধের জরুরী বিষয়গুলো মুসলিমদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়া সবই জিহাদের মধ্যে গণ্য হবে। কারণ, এসবই করা হয়, যুদ্ধকে বাস্তব রূপ দানের জন্য। যুদ্ধকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনার জন্য যেসব মেহনত করা হবে তা জিহাদের পারিভাষিক অর্থের মধ্যে শামিল হবে। (চার মাযহাবের ফকীগণের সংজ্ঞার সারাংশ এখানে পেশ করা হল। আশা করি কোনো ফকীহ এই সংজ্ঞাকে অস্বীকার করতে পারবে না।)

উলামায়ে কেরামের জন্য আরবীতে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সারনির্জাস উপাস্থাপন করা হল:

الجهاد في لغة العرب: "الجهاد: مصدر جاهد، وهو من الجهد -بفتح الجيم وضمها- أي: الطاقة والمشقة، وجاهَدَ العدوَّ مجاهَدة وجِهادًا: قاتلَه، وجاهَد في سبيل الله، والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب، أَو اللسان أَو ما أَطاق من شيء" (لسان العرب بتصرّف).

الجهاد في الشرع: يدور المعنى الشرعي عند أغلب الفقهاء: على قتال المسلمين للكفار، بعد دعوتهم إلى الإسلام، أو الجزية؛ فيَمتنعون، وكذلك دفع الكفار عن حُرمات المسلمين وبلادهم، كلّ ذلك إعلاءً لكلمة الله. - فالجهاد عند الحنفية: "بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزّ وجلّ؛ بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك، والدعاء إلى الدين الحقّ، وقتال مَن لم يقبله" (انظر: بدائع الصنائع، وحاشية ابن عابدين).

والجهاد عند المالكية: "قتال مسلم كافرًا غير ذي عهد، لإعلاء كلمة الله تعالى" (انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك).

وعند الشافعية والحنابلة: "بذل الجهد في قتال الكفار" (انظر: فتح الباري)، ومطالب أولي النُّهى.

....

والظاهر كما نَرى، من هذه التعريفات: حصر الجهاد في قتال الكفار، وهذا هو تعريف الجهاد عند الإطلاق، وهذا ما أجاب به النبي عليه السلام، حين سُئل: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم» (أخرجه أحمد وابن ماجه). حتى قال ابن رُشد: "الجهاد في سبيل الله إذا أطلق؛ فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف، حتى يدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون" (انظر: المقدمات). - ولا ينصرف إلى غير قتال الكفار، إلا بقرينة تدل على المراد! كقوله عليه السلام: المجاهد: من جاهد نفسه في طاعة الله» (السلسلة الصحيحة:৫৪৯)، فالمراد ها هنا: جهاد النفس. وكذلك هناك جهاد الشيطان.. إلخ.

لذا: فحقيقة الجهاد؛ أنواع وأشكال: - فكما قال الراغب: "وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، والشيطان، والنفس، وتدخل الثلاثة في قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج من الآية:৭৮]" (انظر: المفردات). - ويقول ابن تيمية: "وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله؛ من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله؛ من الكفر والفسوق والعصيان" (مجموع الفتاوى). - بل حتى قال البُهوتي: "ومنه هجو الكفار كما كان حسان رضي الله عنه يهجو أعداء النبيّ عليه السلام" (انظر:كشاف القناع).

تنبيـــه: التفريق المشهور عند البعض، والذي يذكرون فيه حديث: رجعنا من الجهاد الأصغر، إلى الجهاد الأكبر»، ويريدون به صرف الناس عن جهاد الكفار، بحُجة جهاد النفس؛ ففَهمٌ خاطىء، وضربٌ من الخبط والخلط، وهذا الحديث ضعيف لا يصحّ، ضعّفه البيهقي والعراقي والسيوطي وغيرهم. كما أن وصف قتال الكفار بالجهاد الأصغر لم يدلّ عليه دليل، من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا قول مُعتبَر!

الخلاصة: عموم ما يَرد في الكتاب والسُّنة ونصوص أهل العلم من ذِكر الجهاد، وفضائله، ومناقبه؛ فالمراد به: الجهاد الحقيقي، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، ولا يُحمَل على غير ذلك إلا بقرينة. والله المُوفق والمُستعان!

নফসের জিহাদ, শয়তানের সাথে জিহাদ ইত্যাদি শাব্দিক বিবেচনায় জিহাদ। পারিভাষিক অর্থে এগুলো জিহাদের মধ্যে শামিল নয়। কুরআন-সুন্নাহের যেখানেই জিহাদ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানেই পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। কুরআন-সুন্নাহয় জিহাদ ও মুজাহিদীনদের যত ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে, তা সবই পরিভাষিক মুজাহিদীনদের জন্য নির্ধারিত। নফসের জিহদকারী নফসের সাথে কিংবা শয়তানের সাথে জিহাদ করতে করতে যদি মরেও যায় তারপরও তাকে শহীদ বলা হবে না, তাকে ইসলামের পরিভাষায় মুজাহিদও বলা যাবে না। সে আখেরাতেও পারিভাষিক মুজাহিদ

এবং শহীদের সমান সাওয়াব প্রাপ্ত হবে না। পারিভাষিক জিহাদকে কুরআন-সুন্নাহয় অনেক ক্ষেত্রে ‘কিতাল’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মধ্যে জিহাদের শাব্দিক অর্থ নিয়ে অত্যাধিক পরিমাণ টানাহেঁচরা করার রোগ পরিলক্ষিত হয়। তারা জিহাদের শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় দ্বীন-ইসলামের যেকোনো চেষ্টা-মেহনতকে পারিভাষিক জিহাদ বলে চালিয়ে দিতে চায়। কেউ কেউ তো গণতন্ত্রের কুফুরী পদ্ধতির নির্বাচনকেও জিহাদ বলতে দ্বিধা করছে না। তাদের আমীর সাহেব যিনি কিনা ‘আমীরুল মুজাহিদীন’ (?) তিনি ভরা মজলিসে ঘোষণা করছেন, ‘বর্তমান জামানায় অস্ত্রের জিহাদ সম্ভব নয়, এই জমানায় অস্ত্রের জিহাদ অচল’। আরেকটি দল যারা এখন পৃথিবীর সবদেশেই অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে। কাফেররা তাদের দ্বীনী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। তাদের অতিভক্ত কেউ কেউ পারিভাষিক জিহাদের ফযীলতসম্পন্ন আয়াত ও হাদীসগুলোকে প্রচলিত ধারার নতুন আবিষ্কৃত কাজের উপর আরোপ করে। তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে মুজাহিদ ভাবতে শুরু করে দেয়। অথচ তাদের কেউ কখনো কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেনি, অস্ত্র ধরার মনোবাসনাও পোষণ করেনি।

আচ্ছা জনাব! শাব্দিক অর্থটাই যদি সব হত তাহলে আপনি সলাত আদায়ের জন্য এত কষ্ট করেন কেন? সলাতের শাব্দিক অর্থ তো দুআ-দরূদ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় কিছু দুআ-দরূদ পাঠ করুন, তাহলেই তো আপনি মুসল্লী বনে যাবেন। নামায আদায় করেছেন বলে বিবেচিত হবেন। নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ দান করে যাকাত আদায়ের কী প্রয়োজন? বৎসর পুরো হওয়ার পর নির্ধারিত এক দিনে নিজের অপবিত্র কাপড়টা পবিত্র করে নিন, তাহলেই তো লেঠা চুকে যায়। কারণ, যাকাতের শাব্দিক অর্থ তো পবিত্র করা। লাখ লাখ টাকা খরচ করে মক্কায় যেয়ে হজ্জ করার কী প্রয়োজন? হজ্জের নির্ধারিত সময়ে কোনো ভাল কাজের ইচ্ছা ও নিয়ত করুন। তাহলেই তো হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কারণ, হজ্জের শাব্দিক অর্থ তো ইচ্ছা করা নিয়ত করা। এবার বুঝলেন তো জিহাদের শাব্দিক অর্থ নিয়ে কেন টানাহেঁচোরা করা যাবে না। কারণ, একই টানাহেঁচোরা যদি অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে করা হয়, তাহলে ইসলামের কিছুই বাকী থাকবে না। ইসলামের মূল আকার-আকৃতি ধ্বংস হয়ে নতুন এক অদ্ভূত ইসলামের জন্ম হবে। যে ইসলামের সাথে নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কোনো মুনাসাবাত থাকবে না।

নিম্নে আমরা জিহাদ ও মুজাহিদদের কিছু ফযীলত উল্লেখ করছি। ফযীলতের আয়াত হাদীসগুলোর মধ্যে বিষেভাবে ফিকির করবেন। সেখানে মুজাহিদীনে ইসলামের যেসব কার্যক্রমের কথা, যেসব গুণাগুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা যারা নিরাপত্তার সাথে দেশে দেশে, শহরে শহের ঘুরে বেড়ায়, যারা গণতন্ত্রের কুফুরী নির্বাচনকে জিহাদ বলে সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেয়, যারা নফসের মুজাহাদাকে বড় জিহাদ বলে প্রচার করে, তাদের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা দেখুন। অতঃপর নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

জিহাদের ফযীলত

ফযীলতের আয়াতসমূহ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ .

১. “অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা কুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ:৪-৭)

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ .

২. “যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম।” (তাওবা:২০)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١) الحديد

৩. “তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।” (আল হাদীদ:১০-১১)

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ . وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ .

৪. “আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাক আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয় ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ, ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।” (আলে ইমরান:১৫৭,১৬৯-১৭১)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ . لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ .

৫. “যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিক দাতা। তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে

....

পৌঁছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল।" (সূরা হজ্জ:৫৮-৫৯)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

৬. "আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।" (তাওবা:১১১)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

৭. "যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (নিসা:১০০)

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا .

৮. "কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহা পুরষ্কার দান করব।" (নিসা:৭৪)

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا . دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

৯. "গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে,-সমান নয়। যারা জান

ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রে'করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা নিসা:৯৫-৯৬)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ .

১০. "তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম।" (তাওবা:১৯-২০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

১১. "মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।" (সূরা: সাফ্ফ:১০-১৩)

ফযীলতের হাদীসসমূহ

....

عن ابى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ـ رضى الله عنه قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ". قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ " مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ".

১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।' সাহাবীগণ বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, 'সেই মুমিন যে, পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদে রাখে।' (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৫)

عن ابى هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ ـ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ".

২. আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্যই আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করছে, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত (নামায/নামায) আদায়কারীর ন্যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর পথের মুজাহিদের জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছেন, যদি তাকে মৃত্যু দেন তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা পুরস্কার বা গানীমতসহ নিরাপদে ফিরিয়ে আনবেন। (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ " وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ "

৩. আবূ হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দুরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সবচাইতে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে

জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ ইবনু ফুলাইহ্ (রহ.) তাঁর পিতার সূত্রে (নিঃসন্দেহে) বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৮)

عَنْ سَمُرَةَرضى الله عنه قال، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ "

৪. সামুরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম যে, দু'ব্যাক্তি আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। তারপর আমাকে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল; এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যাক্তি আমাকে বলল, এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর। (বুখারী হাদীস নং-২৫৯৯)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

৫. আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হইতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে উত্তম। (বুখারী হাদীস নং-২৬০০)

অর্থাৎ, জিহাদের ময়দানে সকালের কিছু সময় কিংবা বিকালের কিছু সময় অতিবাহিত করার সাওয়াব এই পরিমাণ যে, কেউ যদি দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মালিক হয়ে যায়, আর সে সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করে দেয়, তাহলে যত সাওয়াব হবে, জিহাদের ময়দানে এক সকাল কিংবা এক বিকাল অতিবাহিত করলে তার চেয়েও বেশি সাওয়াব হবে। সুবহানাল্লাহ! (ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য, এই হাদীসটি তাবলীগী ভাইদের একটি ফেভারিট হাদীস। তারা প্রচলিত তাবলীগের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করে থাকে। অথচ হাদীসে বর্ণিত ফযীলতটি প্রচলিত ধারার তাবলীগের জন্য বর্ণিত হয়নি। এই হাদীসে 'আল্লাহর রাস্তা' দ্বারা জিহাদ ও কিতাল উদ্দেশ্য এবং জিহাদ ও কিতালের সাথেই এই ফযীলত খাস। হাদীসটি হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহের প্রায় সকল কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে। আর প্রত্যেক কিতাবেই হাদীসটিকে 'জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে' বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি জিহাদের ফযীলতের জন্য নির্ধারিত হওয়ার

ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনের ঐক্যমত রয়েছে। তাছাড়া ইমাম নববী শরহে মুসলিমে এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ. শরহে বুখারীতে হাদীসে বর্ণিত “আল্লাহর রাস্তা”র ব্যাখ্যা ‘জিহাদ, কিতাল ও যুদ্ধ’ দ্বারা করেছেন। তাই এই হাদীস দ্বারা কোনো ক্রমেই প্রচলিত তাবলীগী কাজের ফযীলত সাব্যস্ত হয় না।

যেসব সরলমনা তাবলীগী ভাইয়েরা এই হাদীসকে নিজেদের কাজের ফযীলতের ব্যাপারে ভেবে ধোঁকা খাচ্ছেন তাদেরকে বলছি, যদি আপনি বাস্তবেই এই ফযীলত পেতে চান তাহলে প্রকৃত নবীওয়ালা কাজ ‘দাওয়াত ও জিহাদের’ পথে চলে আসুন। আর প্রত্যেক তাবলীগী ভাইয়ের কাছে সবিনয় অনুরোধ, আপনারা এই হাদীসটি বর্ণনা করবেন না, সাধারণ মানুষকে ধোঁকায় ফেলবেন না। আপনাদের কাজটি ‘ইসলাহুল মুমিনীন’ বৈ কিছু নয়। ‘ইসলাহুল মুমিনীন’-এর জন্য যেসব ফযীলত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেসব বর্ণনার উপর ক্ষ্যান্ত হোন। হাদীসের অপব্যাখ্যা থেকে নিজেও বাঁচুন অপরকেও বাঁচতে সহযোগিতা করুন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَرَدُّوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ " لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ " . فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ " مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

৬. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমান কি আমল হতে পারে? তিনি বললেন, তোমরা তা পারবে না। সাহাবীরা দু'বার কি তিনবার একই প্রশ্নের পুনারাবৃত্তি করলেন। আর প্রত্যেক বারেই তিনি বললেন, তোমরা তাতে সক্ষম নও। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, আল্লাহর পথে মুজাহিদের উদাহরণ হলো সে সিয়াম পালনকারী ও সালাত কায়েমকারীর মত যে তার সালাত ও সিয়াম পালনে কখনো ক্লান্ত হয় না যতদিন না আল্লাহর পথের সে মুজাহিদ তার ঘরে ফিরে আসে। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৫)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ "

৭. আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার পথের মুজাহিদরা আমার দায়িত্বে। যদি তার রূহ কবয

করি তবে তাকে আমি জান্নাতের ওয়ারিছ করব আর যদি তাকে (বাড়িতে) ফিরিয়ে আনি তবে ছওয়াব বা গনীমতসহ তাকে ফিরিয়ে আনবো। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৬)

عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ " .

৮. ফাযালা ইবনু উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে তার আমলের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (সীমান্ত) পাহারা দানরত অবস্থায় মারা যায় আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং তাকে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদে রাখবেন। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

৯. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন সাওম পালন করবে আল্লাহ তাআলা তার থেকে জাহান্নাম-কে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দিবেন। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৮)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ ذَلِكَ الْيَوْمُ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا " .

১০. আবূ সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর পথে যদি কোন বান্দা একদিন সিয়াম পালন করে তবে সে দিনটি জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দেয়। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬২৯)

عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

১১. "মেকদাম বিন মা'দী কারব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সা. বলেছেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শহীদ ছয়টি বিশেষ মর্যাদায়

ভূষিত হবে। ১. রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেয়া হবে ২. জান্নাতে তার অবস্থান সে দেখতে পাবে ৩. কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে ৪. কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে সে নিরাপদ থাকবে ৫. তাঁর মাথায় সম্মানের মুকুট পরিধান করানো হবে যার একটি ইয়াকূত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব থেকে উত্তম ৬. ৭২ জন হুরে ঈনার সাথে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে ৬. তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকে ৭০ জনের ব্যাপারে তার শাফাআত কবুল করা হবে।" (তিরমিজি হাদীস নং-১৬৬৩, হাদীসটি সহীহ।)

عن عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار

১২. 'আব্দুর রহমান বিন জাব্‌র রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে বান্দার পদদ্বয় আল্লাহর রাহের জিহাদের ধূলিতে ধূলিমলিন হবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।' (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৬৫৬, হাদীসটি ইমাম বুখারী জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।)

عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله عين باتت تحرس في سبيل الله

১৩. "হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। ১. এমন চোখ যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে ২. এমন চোখ যা জিহাদের ময়দানে পাহাদারীতে রাত্রি জাগরণ করেছে।" (হাদীসটি ইমাম তিরমিজি জিহাদের ফযীলতের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাদীস নং-১৬৩৯, হাদীসটি সহীহ)

عن ابى هريرة رض. قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم فى سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك.

১৪. "হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে জখমি হবে সে কিয়ামাতের দিন এমতাবস্থায় আসবে যে, তার জখম থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। রক্তের রঙ রক্তের মতই হবে কিন্তু তা থেকে মেশক আম্বরের সুঘ্রাণ ছড়াবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম, উভয়ে হাদিসটি জিহাদ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন)

عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك

لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزو في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن.

১৫. "হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. এর একজন সাহাবী এমন এক পাহাড়ী উপাত্যকা থেকে যাচ্ছিল যেখানে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা রয়েছে। ঝর্ণাটির স্বচ্ছতায় তিনি মুগ্ধ হলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আমি জনমানব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই উপাত্যকায় ইবাদাতের জন্য অবস্থান করতাম তাহলে অনেক ভাল হত। তবে নবীজী সা. থেকে অনুমতি নেয়া ব্যতীত আমি কখনোই এমনটি করব না। অতঃপর তিনি নবীজী সা. এর কাছে নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন। তখন নবীজী সা. বললেন, "এমনটি কর না, কেননা তোমাদের কারো আল্লাহর রাহে জিহাদের ময়দানে অবস্থান করা সত্তুর বছর নিজ ঘরে নামায পড়া থেকে উত্তম। তোমরা কি এটা পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন? তবে শোন, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর, যেকেউ দুইবার উটের দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় (অর্থাৎ সামান্য সময়/৫-৬ মিনিট সময়) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে..." (হাদীসটি জামে তিরমিজিতে জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নং-১৬৫০)

উল্লেখ্য, 'দুইবার উটের দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়' কে সামান্য সময়/৫-৬ মিনিট দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হল, বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দুগ্ধদানকারী পশু যেমন: গরু, মহিষ, উট ইত্যাদির দুধ দোহনের সময় কিছুক্ষণ দোহন করার পর যখন বানের দুধ কমে যায়, তখন দুগ্ধ দোহন বন্ধ করে দিয়ে বাছুর দিয়ে বান চোষানো হয়। ৫-৬ মিনিট কিংবা তার চেয়েও কম সময় চোষানোর পর যখন বানে দুধ চলে আসে তখন পুন:রায় দুগ্ধ দোহন শুরু করা হয়। এ অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, সামান্য সময় তথা ৫-৬ মিনিট সময় আল্লাহর রাহে যুদ্ধে শরীক হতে পারলেই জান্নাতে দাখেল হওয়ার সনদ পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

জিহাদের জন্য কি ঈমান বানানো শর্ত?

....

عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا.

১৬. 'হযরত বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (ওহুদ যুদ্ধের দিন) নবীজী সা. এর নিকট লৌহবর্মে আচ্ছাদিত এক ব্যক্তি (আমর বিন সালেহ আল-আনসারী রাযি.) আসল। নবীজী সা. এর কাছে এসে সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমি আপনার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করব নাকি প্রথমে ইসলাম কবুল করব? নবীজী সা. বললেন, প্রথমে ইসলাম কবুল কর এরপর যুদ্ধে শরীক হও। অতঃপর লোকটি ইসলাম কবুল করল এবং যুদ্ধে লিপ্ত হল এমনকি কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিহতও হল। তখন নবীজী সা. বললেন, সে অল্প আমল করল কিন্তু অনেক বেশি সাওয়াব পেল। (সহীহ বুখারী হাদীস নং-২৬৫৩)

যে সব ভাইয়েরা ঈমান বানানোর বাহানা দিয়ে বছরকে বছর জিহাদের হুকুম থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাদের জন্য এই হাদীসের মধ্যে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে। লক্ষ্য করুন, এই সাহাবী কালিমা পড়ার পর জিহাদ ব্যাতীত দ্বীনের অন্যকোনো আমলই করেননি। কালিমা পড়েই তিনি জিহাদে শরীক হলেন এবং কিছুক্ষণের ভিতর শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেলেন। অথচ তিনি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং তাবলীগ কিছুই করার সুযোগ পাননি। তার নেক আমল শুধু কালিমা এবং জিহাদ। নবীজী সা. তাকে বলেননি যে, হে আমর! আগে ঈমানের মেহনত কর, তিন চিল্লা দিয়ে ঈমান বানাও, তারপর যুদ্ধে শরীক হও।

আসল কথা হল, কালিমা পড়ার সাথে সাথেই একজন মুসলিমের উপর শরীয়তের সকল হুকুম নিজ নিজ গুরুত্ব মোতাবেক পালনীয় বলে সাব্যস্ত হয়। উল্লেখিত সাহাবী মুসলিম হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তখন কাফেরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই অন্যকোনো আমলের জন্য তিনিও দেরি করতে চাননি, আর শরীয়ত প্রণেতা সা.ও তাকে দেরি করতে বলেননি। বরং তিনি সময়ের ফরযে আইন আদায়ের জন্য তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। বুঝাগেল শরীয়তের জরুরী হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ একজন নওমুসলিও জিহাদে শরীক হতে পারবে। এতে কোনো বাঁধা নেই। তাহলে যারা বছরকে বছর চিল্লায় সময় লাগাচ্ছে, প্রত্যেক বছর তিন মাসের জন্য বের হচ্ছে, তাদের কি এখনও

জিহাদে 'সময় লাগানোর' সময় আসেনি? আরো কত বছর বা কত দিন মেহনত করলে জিহাদে শরীক হওয়ার মত ঈমান বনবে? এর কি কোনো সময়-সীমা নির্ধারিত আছে? নাকি হায়াত শেষ হয়ে গেলেও জিহাদের উপযুক্ত ঈমান বনবে না?!

ঈমান বানানোর বাহানা দিয়ে যেমনিভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি জিহাদের হুকুম থেকেও অব্যাহতি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেকেউ নিজেকে মুসলিম দাবি করবে তার উপর শরীয়তের সমস্ত হুকুমই বর্তাবে। হ্যাঁ, বিশেষ ওযরের কারণে কারো থেকে কোনো হুকুম সাময়িকভাবে মাওকুফও হতে পারে। জিহাদে 'না যাওয়া' বৈধ হওয়ার জন্য শরীয়ত যতগুলো ওযরকে ওযর বলে গণ্য করে, তার মধ্যে 'ঈমানের দুর্বতা' নেই। অতএব, ঈমানের দুর্বলতার বাহানা দিয়ে ফরযে আইন জিহাদ পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। কেউ যদি ঈমান বানানো কিংবা ঈমানের দুর্বলতার বাহানা দাঁড় করিয়ে ফরযে আইন জিহাদ থেকে বাঁচার পাঁয়তারা করে, তাহলে তার ঈমান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এক পর্যায়ে ঈমান হারা হয়ে মুনাফেক হওয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচার জন্য 'বাহানা' দাঁড় করানো থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

জিহাদের ফাণ্ডে দানের ফযীলত

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (১২০) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (১২১) التوبة

"মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। **আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত**

প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।" (তাওবা:১২০-১২১)

নির্যাতিত আয়াত

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরা বাকারা:২৬১-২৬২)

এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে উলামায়ে কেরাম মসজিদ-মাদরাসার জন্য দান কালেকশন করে থাকেন। আমরা মুফাস্সিরগণের ব্যাখ্যার আলোকে দেখব যে, আয়াতটি কি আসলেই মসজিদ-মাদরাসায় দানের ফযীলতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি অন্যকোনো ক্ষেত্রে।

ইমাম তবারী রহ. আয়াতের ব্যাখ্যার এক পর্যায়ে বলেন:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني بذلك: مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم

ইমাম সা'দী ফী-সাবীলিল্লাহর ব্যাখ্যায় বলেছেন:

هذا بيان للمضاعفة التي ذكرها الله في قوله مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وهنا قال) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: (أي: في طاعته ومرضاته، وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله

ইমাম বগবী রহ. বলেছেন,

وأراد بسبيل الله الجهاد وقيل جميع أبواب الخير

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেছেন:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سعيد بن جبير : في طاعة الله . وقال مكحول : يعني به : الإنفاق في الجهاد ، من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك ، وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : الجهاد والحج ، يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف ; ولهذا قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة

ইমাম কুরতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

وسبل الله كثيرة وأعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا

তাফসীরুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে:

ذكر بعض المفسرين أن هاتين الآيتين نزلنا في صدقة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما حث الناس حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك، جاء عبد الرحمن بأربعة آلاف درهم فقال: يا رسول الله كانت لي ثمانية آلاف فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلاف، وأربعة آلاف أقرضتها لربي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت» . وجاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال عبد الرحمن بن سمرة- راوي الحديث- فرأيته صلّى الله عليه وسلّم يدخل يده فيها ويقلبها ويقول: «ماضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان» . وقال أبو سعيد الخدري: رأيت النبي صلّى الله عليه وسلّم رافعا يديه يدعو لعثمان ويقول: يا رب عثمان إنى رضيت عن عثمان فارض عنه.

এসব তাফসীরকে বিবেচনায় রেখে আমরা বলছি, এক টাকা দান করলে সাত শত টাকা দানের সাওয়াব কিংবা তার চেয়েও অধিক সাওয়াব সর্ব প্রথম ‘জিহাদের ফাণ্ডে’ দানের জন্য প্রযোজ্য। জিহাদের ফাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য নেক কাজে দান করলেও সাওয়াব হবে কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে দানের মত সমপর্যায়ের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। তাই হে ভাই আসুন, জিহাদের ফাণ্ডে দান করুন। জিহাদের যেকোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার একটি টাকা কমপক্ষে সাতশত টাকার সাওয়াব নিয়ে আসবে। নিয়ত ও ইখলাসের তারতম্যের কারণে আল্লাহ তাআলা কাউকে এক টাকার বিনিময়ে অগনিত সাওয়াবও দান করবেন। মসজিদ-মাদরাসা ও এতীম খানায় দেওয়ার মত বহু লোক রয়েছে। কিন্তু জিহাদের ফাণ্ডে দেওয়ার কেউ নেই। আমাদের উলামায়ে কেরামের সত্য গোপনের কারুকার্যের নিপুনতার সুফলে (?) অধিকাংশ মানুষ জানেই না যে, জিহাদের ফাণ্ডেও টাকা-পয়সা দান করা যায়; জিহাদও দানের একটি ফাণ্ড। মসজিদ মাদরাসায় দান করতে উৎসাহিত করার জন্য উল্লেখিত আয়াতটি তিলাওয়াত করা হয়, অথচ আয়াতটি মৌলিকভাবে যে ফাণ্ডে দানকে

উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে সে ফাণ্ডের কথা ভুলেও সাধারণ মুসলিমদেরকে জানানো হয় না।

জিহাদের ফাণ্ডে দানের আরেকটি আয়াত উলামায়ে কেরাম কর্তৃক অনুরূপ নির্যাতনের শিকার। আয়াতটি হল:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١) التوبة

"আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে: অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহাসাফল্য।" (তাওবা:১১১)

এই আয়াতটির "আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত" এতটুকু বলে উলামাগণ থেমে যান। মনে হয় কোনো এক অদৃশ্য অপশক্তি তাদের যুবানকে বন্ধ করে দেয়। কোনো ক্রমেই তারা সামনের অংশটুকু বলার সাহস রাখেন না। একই আয়াতের শুরু অংশটুকু বলে সহজ-সরল মুসলিমদের থেকে মাদরাসা-মসজিদের জন্য টাকা উঠানো হয়। অথচ আয়াতের পরবর্তী অংশ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের বিনিময়ে। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে/ জিহাদে যারা নিজের জান ও মাল খরচ করবে, নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন। এই আয়াতে মসজিদ-মাদরাসায় দানের ফযীলতের কথা বলা হয়নি। মসজিদ-মাদরাসায় দান করলেও অনেক সাওয়াব হবে কিন্তু এই আয়াতটি পাঠ করে যখন আপনি জিহাদের ফান্ডে দানের কথা বাদ দিয়ে শুধু মসজিদ-মাদরাসার জন্য কালেকশন করেন, তখন সাধারণ জনতা বুঝতে শুরু করে যে, আয়াতটি হয়তো বিশেষভাবে মসজিদ-মাদরাসায় দানের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি একদমই এমন নয়। বরং আয়াতটি বিশেষভাবে জিহাদের ময়দানে জান-মাল উৎসর্গের ফযীলতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

তাই হে উলামায়ে কেরাম! আল্লাহকে ভয় করুন। সত্য গোপন করা থেকে নিজে বাঁচুন অন্যকেও বাঁচান। মনে রাখবেন, যেভাবে চলছে এভাবেই যদি

চলতে থাকে, এভাবেই যদি আপনার হায়াত শেষ হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আপনি আপনার মুসল্লী ও ভক্তদের দ্বারা অভিযোগে আক্রান্ত হবেন। আপনার মুসল্লী ও ভক্তরা যখন দেখবে, অন্যান্য মুসলিমগণ জিহাদের ফাণ্ডে দান করে অশেষ-অসীম সাওয়াবের মালিক হয়েছে, আর আপনার কথামত তারা মসজিদ-মাদরাসায় দান করে সেই পরিমাণ সাওয়াব পায়নি, তখন তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে। মসজিদ-মাদরাসায় যারা দান করার তারা করবেই। জিহাদের ফাণ্ডের প্রয়োজনও আল্লাহ তাআলা পূরণ করে দিবেন, কিন্তু সত্য গোপন করতে গিয়ে কেন আপনি শুধু শুধু নিজের উপর শাস্তি ডেকে আনতে যাবেন?! এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআ-হাদীসের বাণীগুলো যথাযথভাবে মানুষের সামনে পেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

"আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন। এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।" (বাকারা:২৪৪-২৪৫)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে খুব সুন্দর মিল রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর রাহে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর নিজের জন্য করজে হাসানা চেয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেহেতু জানেন যে, যুদ্ধের নিদের্শ বাস্তবায়ন করার জন্য অগনিত অর্থকড়ির প্রয়োজন হবে, ধন-সম্পদ ব্যয় করা ব্যাতীত যুদ্ধের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েই যুদ্ধের জন্য দান করতে উৎসাহিত করেছেন। আর দানের কথাটিকে তিনি 'করজে হাসানা' বলে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে করজে হাসানা দেয়ার একটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত হল:

عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح : يا رسول الله أوإن الله تعالى يريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح قال : أرني يدك ، قال فناوله ، قال : فإني أقرضت الله حائطا فيه ستمائة نخلة . ثم جاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيه وعياله ، فناداها : يا أم الدحداح ، قالت : لبيك ، قال : اخرجي ، قد أقرضت ربي عز وجل حائطا فيه ستمائة نخلة.

ইবনে কাসীর ও কুরতুবী রহ. সহ অন্যান্য মুফাস্সিরগণ উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে নিম্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, "এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ" এই আয়াত যখন নাযিল হল, তখন আবূদ্ দাহদাহ রাযি. বললেন, আল্লাহ তাআলা কি আমাদের নিকট করজ চাচ্ছেন?! নবীজী সা. বললেন, হ্যাঁ, হে আবূদ্ দাহদাহ আল্লাহ তাআলা করজ চাচ্ছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে আপনার হাত দেখান। অতঃপর তিনি নবীজী সা.এর হাত ধরে বললেন, ছয়শত খেজুর বৃক্ষ সমৃদ্ধ আমার একটি বাগান আমি আল্লাহকে করজ দিলাম।...'

আরেক বর্ণনায় আছে, আবূদ্ দাহদাহ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে করজ চাচ্ছেন অথচ তিনি অমুখাপেক্ষী সত্তা! নবীজী বললেন, হ্যাঁ,তিনি তোমাদের থেকে করজ যাচ্ছেন, করজের বিনিময়ে তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য। (এক পর্যায়ে আবূ দ্দাহদাহ রাযি. বললেন) আমার দুইটি বাগান আছে, একটি নিম্ন ভূমিতে আরেকটি উঁচু ভূমিতে, আল্লাহর কসম তা ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদ নেই, আমি এই দু'টি বাগানই আল্লাহকে করজে হাসানা দিয়ে দিলাম। তখন নবীজী সা. বললেন, তুমি তোমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য একটি রেখে দেও আরেকটি দান কর। তখন তিনি বললেন, তাহলে আপনি সাক্ষি থাকুন, দুইটির মধ্যে যেটি উত্তম অর্থাৎ ছয়শত খেজুর গাছ সমৃদ্ধ বাগানটি আমি আল্লাহর জন্য দান করলাম, আল্লাহকে করজে হাসানা দিলাম। (তাফসীরে কুরতুবী, সূরা বাকারা:২৪৫)

সুবহানাল্লাহ! কেমন ছিলেন তাঁরা! আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। প্রিয় পাঠক! আসুন আমরাও এই সাহাবীর অনুসরণে নিজের প্রিয় সম্পদগুলো আল্লাহর রাহে দান করি। যে জিহাদের ফান্ডে দান করার জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করেছেন, আজ সেই ফান্ডটিই সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত। আসুন জিহাদের ফান্ডে দান করুন। দ্বীন বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করুন। নিজের প্রিয় সম্পদগুলো দান করে আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত ক্রয় করে নিন। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ " .

খুরায়ম ইবনু ফাতিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন কিছু ব্যায় করে তাঁর জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লিখা হবে। (তিরমিজী হাদীস নং- ১৬৩১, হাদীসটি তিনি জিহাদের ফযীলতের অধ্যায় বর্ণনা করেছেন।)

قال الامام ابن ماجه حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " : مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ سورة البقرة آية ٢٦١. "

'হযরত আলী, আবূ দ্দারদা, আবূ হুরাইরা রাযি.সহ আরো অনেক সাহাবী নবীজী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদে দান করল আর নিজে ঘরে বসে রইল, সে প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাতশত দেরহামের সাওয়াব পাবে। আর যে নিজে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে শরীক হল এবং আল্লাহ রাহের যুদ্ধে খরচও করল সে প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে সাত লাখ দেরহাম দান করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর নবীজী সা. এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন 'আল্লাহ যাকে চান তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন' (সূরা বাকারা:২৬১, ইবনে মাজাহ হাদীস নং-২৭৫৪)

হাদীসের রাবী খলীল বিন আব্দুল্লাহ অপরিচিত হওয়ায় হাদীসটি যদিও যয়ীফ কিন্তু এর মূলভাষ্য আয়াত ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। তাছাড়া ফযীলতের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে যয়ীফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য হয়। যাই হোক, তাবলীগী ভাইয়েরা এই হাদীস এবং এ জাতীয় আরো কিছু হাদীস প্রচলিত তাবলীগে টাকা-পয়সা খরচ করার ফযীলতের ব্যাপারে প্রচার করে থাকেন। অথচ এই হাদীসটি যে জিহাদের ফাণ্ডে দানের ফযীলতের ব্যাপারে নির্ধারিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাদীসের মধ্যে 'যুদ্ধ' শব্দটি স্পষ্টতই উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদীসটি জিহাদের ফযীলত বুঝানোর জন্য 'জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে' বর্ণনা করেছেন। অতএব, এই হাদীস দ্বারা কোনোভাবেই প্রচলিত তাবলীগে দানের ফযীলত সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অপব্যাখ্যা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

....

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "

আদী ইবনু হাতিম তাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন সাদাকা অতি উত্তম, তিনি বললেন, আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন গোলাম দান করা বা কোন তাবু ছায়া গ্রহণের জন্য প্রদান বা আল্লাহর পথে জওয়ান উষ্ট্রী প্রদান। (তিরমিজি হাদীস নং-১৬৩)

হাদীসের মর্ম হলঃ উত্তম সদকা হল, মুজাহিদদের খেদমতের জন্য গোলাম দান করা, মুজাহিদদের থাকার জন্য তাবু দান করা এবং পরিবহনের জন্য জোয়ান উট দান করা। বর্তমানে যেহেতু গোলাম এবং উট পাওয়া একরকম অসম্ভব, তাই আপনি টাকা ও গহনা দান করতে পারেন। কারণ, এর দ্বারাই সব প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব।

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .

যায়দ ইবনু খালিদ জুহানী (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) কোন যোদ্ধাকে আসবাব পত্র দিয়ে সাহায্য করে সে যেন নিজে জিহাদ করল। যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার জিহাদে গমনের পর তার পরিবার পরিজনের দেখা শোনা করল সেও যেন জিহাদ করল। (তিরমিজী হাদীস নং-১৬৩৪)

যারা সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, কিন্তু নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু ধন-সম্পদ আছে, তার জন্য সম্পদ দ্বারা জিহাদ করা ফরয। সম্পদ দ্বারা জিহাদের একটি সূরত এই যে, যে ভাই জিহাদে চলে গেছেন তার পরিবার পরিজনের যাবতীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। তাদেরকে নিজের পরিবারের অংশ মনে করে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা। যে এমনটি করবে, সে সরাসরি জিহাদে অংশ গ্রহণ না করেও জিহাদরত মুজাহিদের সমান সাওয়াব পাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উত্তমরূপে মুজাহিদ ভাইদের পরিবারের খোঁজখবর রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জিহাদ পরিত্যাগের অশুভ পরিণতি

জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায় তখন জিহাদ পরিত্যাগ করা, জিহাদের ফরয আদায় নিজের দায়িত্ব মনে না করে অন্যের দায়িত্ব মনে করা বড় রকমের কবীরা গুনাহ। এই গুনাহ এতই ভয়ংকর এবং আল্লাহ তাআলার নিকট এতই অপছন্দনীয় যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা এই গুনাহের শাস্তি প্রদান করেন। ইরশাদ হচ্ছে,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ . إِلا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।” (সূরা তাওবা:৩৮-৩৯)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সা‘দী রহ. বলেন,

(قوله تعالىإلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً) في الدنيا والآخرة ، فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب ، لما فيه من المضار الشديدة فإن المتخلف قد عصى الله تعالى ، وارتكب لنهيه ، ولم يساعد على نصر دين الله ، ولا ذَبَّ عن كتاب الله وشرعه ، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم ، الذي يريد أن يستأصلهم ، ويمحق دينهم ، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان ، بل ربما فَتَّ في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله ، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد ، فقال : (إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً) فإنه تعالى متكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته ، فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهرياً.

“আল্লাহ তাআলার বাণী ‘যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন’ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে আযাব দিবেন। কারণ, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে জিহাদে বের না হওয়া কঠিন আযাব ওয়াজিবকারী কবীরা গুনাহ। তখন জিহাদে বের না হওয়ার মধ্যে অনেক ধরণের ক্ষতি নিহিত রয়েছে। যেমন, যে ব্যক্তি ফরযে আইন যুদ্ধের জন্য বের হল না প্রথমত সে আল্লাহ তাআলা অবাধ্য হল, দ্বিতীয়ত সে আল্লাহর দ্বীন

বিজয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করল না, তৃতীয়ত আল্লাহর কিতাব ও শরীয়ত হেফাজতের জন্য ভূমিকা রাখল না, চতুর্থত নির্যাতিত মুসলিম ভাইদেরকে তাদের এমন শত্রুদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করল না, যে শত্রুরা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে চায়, তাদের দ্বীনের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। তাছাড়া যে লোকটা জিহাদের বের হল না, সে যদি সমাজের অনুসরণীয় শ্রেণীর কেউ হয়, তখন অনেক দুর্বল ঈমানের লোকেরা জিহাদে বের না হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণের সুযোগ পায়। বরং অনেক সময় তাদের বের না হওয়াটা যেসব মুমিনগণ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যার অবস্থা এমন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির ধমকি দেওয়াই ইনসাফের চাহিদা। আল্লাহ তাআলা যেহেতু দ্বীনের সাহায্য করা এবং দ্বীনের কালিমাকে বুলান্দ করা নিজের জিম্মায় নিয়েছেন, তাই তিনি এ মহান কাজটি অবশ্য অবশ্যই কাউকে না কাউকে দিয়ে করিয়ে নিবেন, চাই আমরা তার আদেশ পালন করি কিংবা না করি। সেজন্য তিনি বলেছেন,"এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (তাফসীরে সা'দী, সূরা তাওবা আয়াত:৩৮-৩৯)

জিহাদে বের না হয়ে ধন-সম্পদ ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতীর ফিকিরে ঘরে বসে থাকাকে আল্লাহ তাআলা 'নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

"আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে এবং নিজে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।" (বাকারা:১৯৫)

"নিজে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না" এর ব্যাখ্যায় হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাযি. বলেন:

عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، قَالَ كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ

الإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلاَحَهَا وَتَرَكْنَا الْغَزْوَ فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .

আসলাম আবূ ইমরান আত-তুজীবী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রোম সাম্রাজ্যের কোন এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম। তখন আমাদেরকে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে রোমের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করল। মুসলিমদের পক্ষ হতেও একই রকম বা আরো বিশাল একটি বাহিনী যাত্রা শুরু করল। তখন মিসরবাসীর শাসক ছিলেন উকবাহ ইবনু আমির (রাযিঃ) এবং বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাযালাহ ইবনু উবাইদ (রাযিঃ)। একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বুহ্য ভেদ করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলিমগণ সশব্দে চিৎকার করেন এবং বলেন, সুবহানাল্লাহ! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তখন আবূ আইয়্যূব আল-আনসারী (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে এখন শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতাম তাহলে ভাল হতো। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "তোমরা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না" (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৯৫)। কাজেই মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করা এবং জিহাদ ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস। অতএব আবূ আইয়্যূব আল-আনসারী (রাযিঃ) বাড়ি-ঘর ছেড়ে সব সময় আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন। অবশেষে তিনি রোমে (তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্ক) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। (সুনানে তিরমিজি হাদীস নং-২৯৭২)

....

তিরমিজির শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযি'তে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِإِلْقَاءِ الْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَةِ هُوَ الإِقَامَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَتَرْكُ الْجِهَادِ اهـ

"হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করা'র অর্থ হল, পরিবার ও ধন-সম্পদের মধ্যে অবস্থান করা এবং জিহাদ পরিত্যাগ করা।"

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ لَمْ يَغْزُ ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا ، أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) . حسنه الألباني في صحيح أبي داود

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনি, অথবা কোনো যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে দেয়নি কিংবা আল্লাহর পথের যোদ্ধার পরিবারকে উত্তমরূপে দেখভাল করেনি, কিয়ামাতের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাকে হঠাৎ বিপদে আক্রান্ত করবেন।"(সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-২৫০৩)

আরো বর্ণিত হয়েছে:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق

"হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেনি এবং যুদ্ধের আকাংখাও অন্তরে পোষণ করেনি সে এক প্রকার মুনাফিকির উপর মৃত্যুবরণ করল।" (সহীহ মুসলিম হাদীস নং-১৯১০)

আরো বর্ণিত হচ্ছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. (الحديث رواه أحمد (৪৯৮৭) وأبو داود (৩৪৬২) وصححه الألباني في صحيح أبي داود)

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবীজী সা.কে বলতে শুনেছি "যখন তোমরা ঈনা নামক সূদী কারবার করবে, বলদের লেজ ধরবে, কৃষি কাজে খুশি থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ

তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। আর ঐ লাঞ্ছনা তোমাদের থেকে দূর করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।” (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-৪৯৮৭, সুনানে আবূ দাউদ হাদীস নং-৩৪৬২, শাইখ আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেনছেন।)

এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, জিহাদ পরিত্যাগ করলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে হবে আর আখেরাতেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। সমস্ত মুসলিম এই হুকুমের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের। আরেফ বিল্লাহ পীর সাহেবগণ এবং শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতীগণও এই শাস্তি থেকে পার পাবে না। জিহাদ পরিত্যাগের অশুভ পরিণতিতে সকলেই আক্রান্ত হবে। জিল্লত ও লাঞ্ছনার আযাব তো আমরা এখন সকলে সমান হারেই ভোগ করছি। এছাড়া আখেরাতের আযাব তো রয়েছেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আযাব থেকে বাঁচার জন্য হলেও জিহাদের ফরয বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জিহাদ ইসলামের রুকন নয়, তবে ...

কোনো কোনো আলেম তার ছাত্রদেরকে জিহাদ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এ কথা বলে থাকে যে, “জিহাদ নিয়ে এত লাফালাফি কর কেন? জিহাদ তো ইসলামের পাঁচ রুকনের ভিতর নেই”।

একথা বলে তারা ছাত্রদেরকে এটা বুঝাতে চায় যে, জিহাদ যেহেতু ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই জিহাদ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। জিহাদের হুকুম আদায়ের জন্য অগ্রসর হওয়ার কোনো দরকার নেই। কমপক্ষে ছাত্র জমানায় তোমরা ইসলামের রুকনগুলো শিখ। এরপর যখন ফারেগ হয়ে যাবে তখন না হয় জিহাদ বিষয়ে ভেবে দেখবে।

ইসলামের রুকন বা স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ছাত্র জমানায় যদি জিহাদ নিয়ে পড়াশুনা করা, জিহাদের ফরয আদায়ের জন্য উদ্যোগি হওয়ার প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে পাঠ্য পুস্তক থেকেও জিহাদের বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কুরআন-হাদীসের যেসব আয়াত ও হাদীস জিহাদের কথা বলে সেসব আয়াত ও হাদীসগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন করে কুরআন-হাদীস সংকলন করা যায় কিনা ঐ সব আলেমরা তা ভেবে দেখতে পারে।

ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় যদি জিহাদ একটি অগ্রাহ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এই পাঁচটি ছাড়া ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলোও অগ্রাহ্য করতে হবে, সেগুলোও এড়িয়ে যেতে

হবে। অতএব, মুআমালাত (লেনদেন), মুআশারাত (হুকুক) ও তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মশুদ্ধির বিষয়গুলোও এড়িয়ে যেতে হবে। জিহাদের মত সেগুলোকেও অবজ্ঞা করতে হবে। এসব বিষয় রপ্ত করতে ছাত্রদেরকে নিষেধ করতে হবে। কারণ, ইসলামের রুকনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটাই যদি জিহাদের দোষ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো রুকনের পাঁচটি বিষয় ছাড়া ইসলামের অন্যান্য সব বিষয় একই দোষে দুষ্ট। অতএব, ছাত্রদেরকে শুধু জিহাদ নয়, ঐসব আলেমদের উচিত মুআমালাত, মুআশারাত ও তাযকিয়াহসহ ইসলামের বাকী সমস্ত বিষয়েই ছাত্রদেরকে নিরুৎসাহিত করা। কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে এমনটা করতে দেখা যায় না। বরং যারা ইসলামের রুকন না হওয়ায় ছাত্রদেরকে জিহাদের প্রতি নিরুৎসাহিত করে, তাদের অনেককে মুআমালাত, মুআশারাত ও তাযকিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাই তাদের এই কর্মপন্থা দ্বারা একথাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলামের রুকন নয়' এ কথা বলে তারা মূলত শুধু জিহাদকেই এড়িয়ে যেতে চায় এবং শুধু জিহাদের প্রতিই ছাত্রেদেরকে নিরুৎসাহিত করতে চায়।

প্রিয় পাঠক! জিহাদকে এড়িয়ে যেতে চাওয়া এবং জিহাদের প্রতি অন্যদেরকে নিরুৎসাহিত করা এটা যে নিরেট মুনাফিকীর আলামত সেটা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

যাই হোক মূল আলোচনায় আসা যাক। জিহাদ ইসলামের রুকন নয়, তবে ইসলামের শীর্ষচূড়া। রুকন বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমন একটা ঘর দাঁড় করানো যায় না। তেমনিভাবে শীর্ষচূড়া বা ছাদ ব্যতীত কোনো ঘর পূর্ণাঙ্গ হয় না। যে ঘরে ছাদ নেই সে ঘর যেমন থাকার উপযোগী নয়, সে ঘরে অবস্থান করে যেমন রোদ-বৃষ্টি ও ঝড়-তুফান থেকে বাঁচা যায় না, আত্মরক্ষা করা যায় না, ঠিক তেমনি জিহাদ ব্যতীত ইসলাম সুরুক্ষিত নয়। জিহাদ ছাড়া ইসলাম নামক ঘরটা ছাদহীন দাঁড়িয়ে থাকার মত। তখন ইসলাম নামক ঘরে যারা প্রবেশ করবে, ইসলামের অনুসারী হবে, তারা ইসলামের শত্রু পক্ষের ঘাত, প্রতিঘাত, হামলা ও আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে না। ইসলামের অনুসারীদেরকে বাঁচানো ও নিরাপত্তা প্রদান সম্ভবপর হবে না। অতএব, স্তম্ভ ও ছাদ উভয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। স্তম্ভ ছাড়া যেমন ছাদ দাঁড়াতে পারে না। ঠিক তেমনি ছাদহীন শুধু স্তম্ভেরও কোনো মূল্য নেই। তাই স্তম্ভ ও ছাদ উভয়টাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। দুইটার একটাকেও হাত ছাড়া করা যাবে না। প্রিয় নবীজী সা. বলেছেন,

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني عن النار. قال: (سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت). ثم قال: (ألا أدلك على أبواب الخير؟). قلت: بلى يا رسول الله! قال: (الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين). ثم تلا قوله تعالى: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ..)، ثم قال: (ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟). قلت: بلى يا رسول الله! قال: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد). ثم قال: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟). قلت: بلى يا رسول الله! قال: (كف عليك هذا). وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال **:ثكلتك أمك** ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم (أو قال: على مناخرهم) إلا حصائد ألسنتهم؟!).

“হযরত মুআয বিন জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোনো এক সফরে নবীজী সা. এর সঙ্গে ছিলাম। একদিন চলতে চলতে আমি তাঁর খুব নিকটে চলে আসলাম। তখন আমি চলন্ত অবস্থায় বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সা. আপনি আমাকে এমন আমল সম্পর্কে অবগত করুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। নবীজী সা. প্রতিউত্তরে বললেন, তমি খুব বড় বিষয়ে জানতে চেয়েছ, তবে আল্লাহ তাআলা যার জন্য সহজ করে দেন তার পক্ষে এটা খুব সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে। যাকাত প্রদান করবে। রোযা রাখবে। বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে। অতঃপর নবীজী সা. বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজা সম্পর্কে অবগত করব না? আমি বললাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবীজী সা. বললেন, সাওম বা রোযা ঢাল স্বরূপ, আর দান-সাদাকাহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। আর তাহাজ্জুদ নামায সালেহীনদের নির্দশন। অতঃপর নবীজী তিলাওয়াত করলেন, ‘শয্যা থেকে তাদের পৃষ্ঠদেশ পৃথক হয়ে যায়...’ এরপর বললেন, আমি কি তোমাকে মূল বিষয়, স্তম্ভ এবং শীর্ষচূড়া সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ ফরমান। **নবীজী সা. বললেন, ‘মূল বিষয় হল, ইসলাম, খুটি হল, নামায, আর শীর্ষ চূড়া হল, জিহাদ।’...** (হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী। মুসনাদে আহমাদ:৫/২৩১, সহীহু সুনানে ইবনে মাজাহ:২/৩৫৯, আল মুজামুল কাবীর তবরানী:২০/১০৩)

পাঠক! হাদীসের মধ্যে নবীজী সা. জিহাদকে ইসলামের শীর্ষ চূড়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ ইসলামের আমলসমূহের মধ্যে টপলেভেলের আমল হল জিহাদ। জিহাদ সর্বোচ্চ পর্যায়ের আমল। জিহাদের সাওয়াব অন্যান্য আমল থেকে অনেক বেশি। কারণ, জিহাদের মধ্যে অন্য যেকোনো আমলের তুলনায় কষ্টও বেশি। আর যে আমলে কষ্ট যত বেশি হয়, সে আমলে সাওয়াবও ততবেশি হয়। জিহাদের মধ্যে যেহেতু নিজের সব চেয়ে প্রিয় দুইটি জিনিস জান ও মাল আল্লাহর কাছে হাদিয়া স্বরূপ পেশ করা হয়, তাই এই আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি খুশি হন এবং এর সাওয়াবও সবচেয়ে বেশি প্রদান করেন। তাহলে এই জিহাদকে 'ইসলামের রুকন নয়' বলে ছোট করা/ অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ রয়েছে কি? ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ার আমলের ব্যাপারে কোনো খাঁটি মুমিনকি অন্য মুমিনকে নিরুৎসাহিত করার হিম্মত করতে পারে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তালিবুল ইলমদের উপর কি জিহাদের হুকুম বর্তায় না?

অনেক ছাত্রভাই এ কথা স্বীকার করে যে, বর্তমান সময়ে জিহাদ ফরযে আইন। কিন্তু তার বুঝ কম থাকায় সে মনে করে, এই ফরয পালনের দায়িত্ব যারা তালিবুল ইলম নয়, তাদের। তালিবুল ইলমদের দায়িত্ব হল, মনোযোগসহ ইলম অর্জন করা। জিহাদ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তার দায়িত্ব নয়।

হে প্রিয় ভাই! তোমার চিন্তা-ভাবনাকে একটু শানিত কর। গতানুগতিক ভাবনাগুলো পরিহার কর। ইসলাম ও ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে একটু ফিকির করে দেখ। তুমি যদি নিজেকে মুসলিম ও মুমিন মনে কর, তাহলে এটা জেনে রেখ যে, তুমি বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তোমার উপর ইসলামের অন্যান্য ইবাদাতের মত জিহাদও ফরয হয়ে গিয়েছে। চান্দ্র মাস হিসাবে তোমার বয়স যদি ১৫ বছর হয়ে থাকে, আর তুমি যদি শরয়ী ওযর মুক্ত হয়ে থাক, তাহলে পৃথিবীর কোনো কিছুর অজুহাত দেখিয়েই বর্তমান ফরযুল আইন জিহাদ থেকে বাঁচার তোমার কোনো পথ নেই। একজন মুসলিম বালেগ হওয়ার পর যেমন, নামায, রোযা ফরয হয় এবং স্বামর্থ্য থাকলে হজ্জ-যাকাতও ফরয হয়, ঠিক তেমনি ভাবে জিহাদও ফরয হয়।

জিহাদ কোনো রাজনীতি নয়; জিহাদ হল, আল্লাহর ফরয হুকুম, ফরয ইবাদাত। গণতন্ত্রের পঁচাগান্ধা রাজনীতি ছাত্রদের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ হওয়া চাই এবং আমাদের নিকট-অতীতের আকাবিরগণ ঐসব রাজনীতি থেকে

তলাবাদেরকে বাঁচতেও বলেছেন। কিন্তু জিহাদ আর রাজনীতি এক বিষয় নয়। জিহাদ তো হল, ইসলামের শীর্ষচূড়া, মহাপুণ্যময় এক ফরয আমল। অতএব, আল্লাহর অন্যান্য হুকুম থেকে জিহাদকে আলাদাভাবে নেওয়ার এবং দেখার সুযোগ কোথায়?

একজন সাধারণ মুসিলম কিংবা আলেম যিনি তালিবুল ইলম নন, তার উপর যেমন জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূলতে ফরযে আইন হয়, ঠিক তেমনিভাবে তালিবুল ইলমদের উপরও ফরযে আইন হয়। কুরআন ও হাদীসের কোথাও জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে তালিবুল ইলমদেরকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহর বাণী:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

সূরা তাওবার ১২২ নং এই আয়াতটি জিহাদ ফরযুল কিফায়াহ থাকাবস্থার সাথে খাস এবং আয়াতটি নাযিলও হয়েছে জিহাদ ফরযুল কিফায়ার অবস্থায়। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিহাদ ও শাহাদাতের ফযীলত হাসিল করার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। যখনই কোনো অভিযানের ঘোষণা করা হত, তখন সকলেই অভিযানে বের হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যেতেন। কেউই ঘরে বসে থাকতে চাইতেন না। এই যখন ছিল তখনকার সকল মুসলিমের অবস্থা তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, সকল মুমিনের অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, বরং কিছু লোককে দ্বীনের গভীর ইলম অর্জনের জন্য বের হওয়া উচিত। এটা ছিল এমন এক সময়ের কথা যখন:

১. প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তি জিহাদ ও শাহাদাতের ফযীলত হাসিলের জন্য ব্যাকুল ছিলেন।
২. মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে দ্বীনের বিজয় সূচিত হয়েছিল। জাযীরতুল আরবের বিশাল ভূখণ্ড ইসলামের অধীনে চলে এসেছিল।
৩. আল্লাহর কালিমা বুলান্দ হয়েছিল।
৪. পৃথিবীর কোথাও একজন মুসলিমও কাফের কর্তৃক নির্যাতন-নিগ্রহের শিকার ছিল না।
৫. মুসলিমগণ জিহাদে ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক জিহাদ পরিচালনা করছিলেন। কুফর শাসিত ভূখণ্ডগুলো ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার অভিযানে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন।
৬. ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব আদায়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মুজাহিদ প্রস্তুত ছিল।

৭. আরব ভূখণ্ডে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

৮. ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের জান-মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শক্তি ও হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিল।

আর অপর দিকে নবীজী সা. এর হায়াতও শেষ হয়ে এসেছিল। ওহীর ধারাবাহিকতা চিরতরে বন্ধ হওয়ার সময়ে ঘনিয়ে আসতেছিল। কিন্তু তখনও ইলমে ওহী পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত হয়নি। তাই আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিজয় সূচিত হওয়ার পর কিছু মুসলিমকে ইলমে ওহীর ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে বললেন, যেন নবীজী সা. এর ইন্তেকালের পরও ইলমে ওহী পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত থাকে। ইলমের চাহিদ পূর্ণ হয়, সব জটিলতার শরয়ী সমাধান সম্ভব হয়।

১৪৩৯ হিজরীতে এসে বর্তমান আমরা দশম হিজরীর (যে সময় উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে) সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছি। দশম হিজরীতে ইসলাম ও মুসলিমদের যে জয়জয়কার অবস্থা ছিল, বর্তমানে ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থা সম্পূর্ণ তার উল্টো। আজ মুসলিমগণ তাদের ধর্ম, জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু কোনো ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখণ্ডে মুসলিমগণ নির্যাতন, হত্যা ও গুমের শিকার। আল্লাহর শত্রুরা একজোট হয়ে, পৃথিবীকে মুসলিম শূণ্য করার পাঁয়তারা করছে। অভিভাবক শূণ্য মুসলিমদের ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে।

অপর দিকে ইসলামের শুরু যুগের উলামাগণ ইলমে ওহীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষণ করেছেন। ইলমে ওহী আজ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত। ইসলাম ও মুসলিমদের এই অধপতনের যুগেও পৃথিবী লাখ লাখ উলামায়ে কেরামের পদচারণায় মুখরিত। এমতাবস্থায় ফরযুল আইন জিহাদের ফরযিয়্যাত আদায়ের ক্ষেত্রে 'ইলম অন্বেষণ' ও তথাকথিত 'সনদধারী' আলেম হওয়ার খাহেশকে বাঁধারূপে পেশ করা কোন যুক্তি এবং শরীয়তের কোন দলীলের আলোকে বৈধ? না বন্ধু, কোনো দলীল ও যুক্তির আলোকেই বৈধ নয়। অন্যদশজন মুসলিমের মত তোমার উপরও জিহাদ একই রকম ফরযে আইন হয়েছে। তাই ইলম অন্বেষণের বাহানায় এই ফরযকে অবহেলা করার সামান্যতম অবকাশও নেই।

তালিবুল ইলমগণ ফরযুল আইন জিহাদে কীভাবে শরীক হবে?

কেউ বলতে পারে, আচ্ছা বুঝলাম জিহাদ আমাদের উপর ফরযে আইন এবং এও বুঝলাম আমাদেরকে তালিবুল ইলম থাকাবস্থায়ই জিহাদে শরীক হতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, তালিবুল ইলমদের জিহাদে শরীক হওয়ার বাস্তব সম্মত পদ্ধতি কী হবে?

এর উত্তরে আমরা বলব, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বর্তমানের জিহাদের পদ্ধতি পূর্বেকার জিহাদের মত নয়। এখন মুজাহিদদের সংখ্যা ও সামর্থ্য শত্রুদের তুলনায় 'অতুল্য' হওয়ায় মুজাহিদগণ গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন। এ পদ্ধতির যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় লাগে। কিন্তু এই পদ্ধতির উপকার হল, সামান্য সংখ্যক মুজাহিদ যৎসামান্য অস্ত্র নিয়েই অত্যাধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর সাথে লড়ার সুযোগ পায়। গেরিলা মুজাহিদগণ জনতার সাথে মিশে থাকে। জনতা থেকে তাদেরকে বিশেষভাবে আলাদা করা যায় না। ফলে, শত্রু ধোঁকা খায়। শত্রু পক্ষ নিজের 'শত্রুকে' শনাক্ত করার সুযোগ পায় না। ৫/৭জনের ছোট একটি সারিয়া অর্তকিত হামলা করে চোখের পলকে প্রস্থান করে। মুজাহিদবাহিনীর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু শত্রু পক্ষের ক্যাম্প ও শিবিরে ছোটখাট কিয়ামত ঘটে যায়। এ পদ্ধতির যুদ্ধে ঐ পক্ষই শেষ বিজয়ের হাসি হাঁসতে পারে, যারা ধৈর্যের সাথে নিরাপত্তা অটুট রেখে অটল অবিচল থাকে। যাদের মনো সংযোগ ও মনোবল ঠিক থাকে। আর যে পক্ষ মনো সংযোগ হারিয়ে ফেলে, যাদের মনোবলে ধস নামে, যারা প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজেদেরকে অরক্ষিত মনে করতে বাধ্য হয়, তারা ধৈর্য হারা হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে এলোমেলো অভিযানের মাধ্যমে নিজেদের শেষ শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে। তখন পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোনো গতি থাকে না। নিকট অতীতের সোভিয়েথ ইউনিয়নের পরাজয় এবং বর্তমানের ন্যাটো-তালেবান যুদ্ধ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যাই হোক, গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমগণ যেসব কাজের মাধ্যমে ফরযুল আইন জিহাদে শরীক হতে পারে তা নিম্নরূপ:

১. নিজের সাধ্যমত তাহকীক করার পর কোনো সহীহ জিহাদী কাফেলার সঙ্গী হওয়া। কাফেলা কর্তৃক প্রদেয় দায়িত্বগুলো আদায় করা। বর্তমানে যেহেতু বাংলাদেশেও আল-কায়েদার কাজ চলছে (আলহামদুলিল্লাহ), তাই আমি সকলকে আল-কায়েদাকে বেছে নেওয়ারই পরামর্শ দিব। কারণ, তাদের রয়েছে সহীহ আকীদা ও মানহাজ এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছর বিশ্বময় জিহাদের অভিজ্ঞতা।

২. জিহাদ বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশুনা করা। জিহাদ কখন ফরযে কেফায়া, কখন ফরযে আইন, শত্রু কে? মিত্র কে? জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? তাওহীদ, শিরক, তাগুত, তাগুতবর্জন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করা। জিহাদকে দলীলের মাধ্যমে বুঝা। কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভর করে জিহাদকে না বুঝা।

৩. জিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন লেখা তৈরি করে তা ইলেক্ট্রনিক্স কিংবা প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা। তবে এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. জিহাদী কাফেলার মিডিয়া শাখার কোনো কিছুর অনুবাদ প্রয়োজন হলে অনুবাদ করে দেয়া।

৫. সময় সুযোগ করে ছোট ছোট কোর্সে শরীক হয়ে জিহাদের জরুরী বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জন করা।

৬. নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, উস্তাদ ও সহপাঠিদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করা। তাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দাওয়াত ও জিহাদের পথের পথিক বানানোর চেষ্টা করা।

৭. নিজে নিজের সাধ্যানুযায়ী জিহাদ বিল মালের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা। অন্যদেরকেও উৎসাহিত করা।

৮. জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণ অর্জন করা। যথা তাকওয়া ও সবরের গুণেগুনান্বিত হওয়া।

৯. আখেরাত নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা ভাবনা করা। জান্নাতে বড় মর্যাদা হাসিলের ফিকির রাখা। শাহাদাত অর্জনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জেনের জন্য উদ্যেলিত হওয়া। দুনিয়ার সব ধরণের লোভ ত্যাগ করা।

১০. জিহাদের ময়দানে সৈনিকের সংকট পড়লে দায়িত্বশীল ভাইয়ের কাছে নিজেকে পেশ করা। সরাসরি যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে আল্লাহর শত্রুদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়া।

১১. জিহাদ কেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে শিখা। জিহাদময় এক স্বপ্নীল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা। মাদরাসা-মসজিদের খেদমতকে ছাড়িয়ে আল্লাহর আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মত বড় স্বপ্ন দেখা।

১২. নিজের সব কিছু সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর মত গড়ার চেষ্টা করা। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যেমন আখেরাত নিয়ে এবং জিহাদ ও শাহাদাত নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন, নিজেও তেমন স্বপ্ন দেখা। পুরো পৃথিবীময় দ্বীনের বিজয় সাধনের জন্য নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করা।

১৩. দৈনিক কিছু সময় ব্যায়াম করার চেষ্টা করা। সম্ভব হলে, নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে, কারাতে-কুংফুর প্রশিক্ষণ অর্জন করা।

১৪. জিহাদের ময়দানে কাজে লাগবে এমন সব যোগ্যতা অর্জন করা যেমন: সাতার, মটোর বাইক, প্রাইভেটকার, ট্রাক, নৌকা, ট্রলার ইত্যাদি চালনা রপ্ত করা। নার্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা, ইলেক্ট্রনিক্স ও পদার্থ বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। লেদ মেশিন (লৌহজাত দ্রব্য দিয়ে বিভিন্ন আকার আকৃতির বস্তু বানানোর মেশিন) এর কাজ শেখার চেষ্টা করা। এ যোগ্যতাগুলো যুদ্ধের ময়দানে অনেক কাজে লাগবে।

১৫. কষ্ট সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করা। বিশেষ করে ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করা। মাঝ পথে আরাম না করে স্বাভাবিক গতিতে ধারাবাহিক ২-৩ ঘন্টা হাঁটার চেষ্টা করা। সম্ভব হলে ১৫-২০ কেজি ওজন বহন করে হাঁটা।

১৬. সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার চেষ্টা করা এবং আইয়্যামে বিযের দিনগুলোতেও (আরবী মাসের ১৩,১৪,১৫ তারিখ) রোযা রাখার চেষ্টা করা। মাঝে মাঝে শুধু শুকনো খাবার (চিড়া, মুড়ি, খেজুর, রুটি) এর উপর ২/৩ দিন থাকার চেষ্টা করা।

১৭. খাবারের ক্ষেত্রে সব ধরনে বাছবিচার পরিত্যাগ করা। যেকোনো হালাল বস্তু খাওয়ার মানসিকতা রাখা।

১৮. সব ধরণের বিলাসিতা ও অহেতুক খরচ পরিত্যাগ করা। জিহাদ বিরোধী অভ্যাস পরিত্যাগ করা, যথা বেশি খাওয়া, বেশি ঘুম, অলসতা, প্রতিদিন গোসল করা, প্রতিদিন কাপড় পরিবর্তন, পান বা এজাতীয় অন্য কিছুকে অভ্যাসে পরিণত করা থেকে বাঁচা।

১৯. উম্মাহর কল্যাণ চিন্তা নিজের মধ্যে প্রোথিত করা। গুনাহ ছেড়ে দেয়া বিশেষ করে বদ নজরীর গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

২০. নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য, উম্মাহর জন্য এবং মুজাহিদ ভাইদের সফলতার জন্য দুআ করতে থাকা। আশা করা যায়, তালিবুল ইলম ভাইয়েরা ইলমী ইদারায় ইলম অর্জনে মাশগুল থেকেও উল্লেখিত কাজগুলোর প্রায় সবক'টি কাজই করতে পারবে। আর এভাবে তারা গেরিলা যুদ্ধের যমানায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ে সক্ষম হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহর শত্রুদের ক্ষেত্রে জিরোটলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে

আল্লাহর শত্রু যেমন, আমেরিকা-ইসরাইলসহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে (জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধরত, যুদ্ধে সাহায্যকারী, যুদ্ধে পরামর্শ ও উস্কানীদাতা অন্যান্য সব কাফের গোষ্ঠী এবং কুফুরী আইন দ্বারা পরিচালিত সব মুসলিম দেশের শাসক ও সশস্ত্র বাহিনী (বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী এবং সশস্ত্র বাহিনীও এর মধ্যে শামিল) এদের ক্ষেত্রে জিরোটলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। এদের কাউকে সামান্যতম ছাড় দেয়ার অবকাশ নেই। এদের দুঃখে হাঁসতে হবে এবং এদের সুখে কাঁদতে হবে। এরা কেউ মুসলিমদের যৎসামান্য সহমর্মিতারও উপযুক্ত নয়। ইসলামের শত্রুরা যখন কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন তাদের জন্য কোনো ধরণের সহমর্মিতা প্রকাশ করা কিংবা অন্তরে লালন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

বদর যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের মধ্য থেকে ৭০জন নিহত হয়েছিল। নিহতদের অনেকেই মুহাজির মুজাহিদদের আত্মীয়-স্বজন ছিল। তাদের ক্ষেত্রে নবীজী এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর আচরণ কেমন ছিল? তাদের নিহত হওয়ার

কারণে কি নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি. দুঃখ ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলেন? ইতিহাস কী বলে? ইতিহাসতো বলে, একটা মৃত কুকুরকে যেমন পা ধরে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়, তদ্রুপ নবীজী সা. সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে কাফেরদের শবদেহ টেনে নিয়ে একটা গর্তে ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। গর্তে ফেলা শেষে তিনি কাফেরদের প্রত্যেকের নাম ধরে ডেকে ডেকে বললেন, হে উৎবা, হে শায়বা, হে অমুক... তোমরা তোমাদের প্রভুর অঙ্গীকার সত্য পাইলে কি? আমি তো আমার প্রভুর অঙ্গীকার ঠিক ঠিক পেয়েছি'। (বুখারী:২/৫৬৫)

নবীজী সা. এর প্রিয় চাচা আবূ তালিব, যিনি নবীজী সা. কে দ্বীন-ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন আবূ তালিবের পুত্র আলী রাযি. নবীজী সা. কে বললেন, 'আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মারা গেছে' নবীজী সা. উত্তরে বললেন, 'তাকে মাটিতে আবৃত করে দাও'। নবীজী সা. প্রিয় চাচার দাফন-কাফনেও উপস্থিত হননি। তার মৃত্যুতে তিনি কোনো দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেননি।

এখান থেকে সবক হাসিল করতে হবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের সম্প্রদায়ের মৃতদের সাথে মুসলিমদের আচরণ কেমন হবে, এই ঘটনা থেকে তার শিক্ষা হাসিল করতে হবে। নবীজী সা. যা করেননি। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যা করেননি। আমরা তা করার অধিকার রাখি না।

মুসলিম উম্মাহর কোনো শার্দুল যখন নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিশেষ করে পশ্চিমাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়। তাদের কোনো আড্ডাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দেয়, ইরাক, সিরায়া, ফিলিস্তিন, আফগান, আরাকনসহ অন্যান্য স্থানের মুসলিম গণহত্যার প্রতিশোধ নেয়, তখন সাধারণ মুসলিম, আলেম ও তালিবুল ইলম নামের কলংক কিছু ইতরকে দেখা যায় যে, তারা আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ করছে। কেউ কেউ ফেসবুকের প্রোফাইল পিক চেঞ্জের মাধ্যমে করে, কেউবা স্ট্যাটাস দিয়ে করে কেউ বা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে করে। আবার কেউ বায়ান, বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে করে। যে যেভাবেই আল্লাহর শত্রুদের জন্য সহমর্মিতা

দেখাবে, শত্রুদের দুঃখে দুঃখিত হবে সে মূলত নাজায়েয ও হারাম কাজ করল। আল্লাহর শত্রুদের জন্য আফসুস ও দুঃখ প্রকাশ করা কিংবা সহমর্মিতা প্রকাশ করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই।

জেনে রাখা উচিত যে, শরীয়ত মতে শত্রু পক্ষের নাগরিক দুইভাগে বিভক্ত। ক. মুকাতিল/ যোদ্ধা খ. গাইরে মুকাতিল/ অযোদ্ধা। যোদ্ধা হল, ঐ সব পুরুষ চান্দ্রমাস হিসাবে যাদের বয়স ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি। চাই তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক। আর অযোদ্ধা হল, নারী, ১৫ বছরের কমের শিশু এবং অসুস্থতা কিংবা বার্ধক্যের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অক্ষম পুরুষ। তবে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের মধ্য থেকে কেউ যদি কথা, কাজ বা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে তাদের যোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করে, তাহলে তারাও যোদ্ধা সাব্যস্ত হবে এবং হত্যার উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে আমেরিকা, ইসরাইল, ফ্রান্স, বৃটেনসহ অধিকাংশ দেশেই নারীদেরকেও সশস্ত্র বাহিনীতে নেয়া হয়। তাই পাশ্চত্যের নারীরাও এখন কতলের হুকুম থেকে নিরাপদ নয়।

আর বর্তমানে সামরিক ও বেসামরিক নাগরিক নামে দেশের জনগণকে যে দুইভাগ করা হয়, এই তাকসীম শরীয়ত স্বীকৃত নয়। বরং শরীয়ত যাদেরকে যোদ্ধা গণ্য করে চাই তারা সরাসরি যুদ্ধে শরীক হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তাদের হত্যা করা বৈধ। আর যারা যোদ্ধা নয়, তাদেরকেও ক্ষেত্র বিশেষ হত্যা করা জায়েয আছে। যেমন ধরুন, আমেরিকার একটি রেল স্টেশন। স্টেশনে এই মুহূর্তে ১০০জন মানুষ আছে। এদের মধ্যে ৬০ জন ১৫ বছরের অধিক বয়সী পুরুষ। ২০ জন নারী ও ২০ জন শিশু রয়েছে। এই অবস্থায় কোনো মুজাহিদ যদি আমেরিকানদেরকে তাদের উচিত পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য শক্তিশালী বোমা বিষ্ফোরণের মাধ্যমে এই একশতজনকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে শরীয়ত মতে এটা নাজায়েয বা অবৈধ কাজ নয়। বরং এটা পরিপূর্ণ বৈধ একটি কাজ। কারণ, মুজাহিদের হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল ঐ ৬০জন বালেগ পুরুষ যারা শরীয়ত মতে যোদ্ধা এবং হত্যার উপযুক্ত। নারী আর শিশুগুলো মূল টার্গেট ছিল না। বরং এখানে মূল টার্গেটকে মারতে গিয়ে নারী ও শিশুরা

অপরিহার্জভাবে নিহত হয়েছে। এ জন্য এই হামলাটি নাজায়েয বা অবৈধ হয়নি। কারণ, মূল টার্গেটকে মারতে গিয়ে যদি অপরিহার্জভাবে ২/৪জন অযোদ্ধাকে মারতে হয়, তাহলে শরীয়ত এই হত্যাকাণ্ডের বৈধতা দান করে। এমনকি শত্রুকে মারতে গিয়ে যদি ২/৪জন মুসলিমকেও অনিচ্ছাকৃতভাবে মেরে ফেলতে হয়, তাহলে এই হত্যাকাণ্ডও শরীয়ত সমর্থন করে। যেমন ধরুন, উত্তরার র‍্যাব হেডকোয়ার্টারে একজন মুজাহিদ ইস্তিশহাদী হামলা চালাল। হামলায় ৫০জন র‍্যাব সদস্য জাহান্নামে গেল আর সাথে সাথে পথিকদের মধ্য থেকে দশজন সাধারণ মুসলিও নিহত হল। এই হামলাও শরীয়ত মতে বৈধ। কারণ, এখানে হামলার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল আল্লাহর শরীয়তের শত্রু র‍্যাব সদস্যদের হেডকোয়ার্টার। অভিযানের সময় কিছু সাধারণ মুসলিম সেখানে উপস্থিত থাকায় অপরিহার্জভাবে তারাও নিহত হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড শরীয়তমতে হারাম বা অবৈধ নয়। বরং এটি জায়েয। 'তাতাররুস' বা মানব ঢালের মাসআলায় ফকীহগণ এইসব বিধান স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী ব্যক্তি যেন সেসব অধ্যায় বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে নেয়।

অতএব, আল্লাহর শত্রুদের উপর যখন মুজাহিদদের প্রতিশোধের কোনো অগ্নিগোলা নিক্ষিপ্ত হয়, তারা যখন দুঃখিত হয়, ব্যথিত হয়, তখন যারা নিজেদেরকে মুমিন দাবি করে, তাদের আনন্দিত হতে হবে। আনন্দিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। যেখানেই আল্লাহর শত্রুদেরকে পাওয়া যাবে, যেখানেই আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় বাঁধাদানকারীদেরকে পাওয়া যাবে, সেখানেই তাদেরকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে। তাদেরকে হত্যা করতে হবে। তাদের ঘারের উপর তরবারী চালাতে হবে। তাদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"যখন সম্মানিত মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা যেখানেই পাবে মুশরিকদেরকে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দি করবে, তাদেরকে বয়কট

....

করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওঁৎপেতে বসে থাকবে। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু'। (সূরা তাওবা:৫)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ.

"অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা স্মরণে রেখ। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।' (সূরা মুহাম্মাদ:৪)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন।" (সূরা ফাতাহ:২৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আর কাফেররা যেন তোমাদের মধ্যে রূঢ়তা পায় (সহমর্মিতা নয়), আর যেনে রেখ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সঙ্গে রয়েছেন।" (সূরা তাওবা:১২৩)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (১২) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (১৩) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ.

"যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। **কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে মার জোড়ায় জোড়ায়।** যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। আপাতঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব।" (আনফাল:১২-১৪)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।" (সূরা মায়েদা:৬৮)

এসব আয়াতের উপর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহর শত্রুদের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করার হিম্মত দিন। তাদের সাথে সব রকমের বন্ধুত্ব ছিন্ন করার তাওফীক দিন। তাদের দুঃখে আনন্দিত হওয়ার মত ঈমানী জযবা দান করুন। আমীন।

মুহতারাম ইমাম ও খতীব সাহেবদের খেদমতে নিবেদন

১. ইমামতি করাকে নিছক একটি পেশা বা চাকুরি মনে করবেন না। এটি একটি গুরুদায়িত্ব। এ দায়িত্বের ব্যাপারে আপনি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।' সহীহ বুখারী ও মুসলিম

২. প্রতি মুহূর্তে মনে রাখবেন, এ মুসল্লায় আপনি কার প্রতিনিধি? এর হক আপনার দ্বারা কত টুকু আদায় হচ্ছে?

৩. আপনি যেহেতু মসজিদের ইমাম, মহল্লার ইমাম। তাই সর্বদিক দিয়েই 'ইমাম' (অনুসরণীয়) হওয়ার চেষ্টা করুন। কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, মোআমালা -মোআশারায়, ইবাদত-বন্দেগীতে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আপনি জনসাধারণের মডেল হয়ে যান।

৪. আপনার ভিতর-বাহির যেন এক রকম হয়। বরং ভিতরটা যেন বাইরের চেয়ে সুন্দর হয়। আপনি সবার সামনে যেমন, সবার দৃষ্টির আড়ালেও যেন তেমনই হোন।

৫. সময়ের ব্যাপারে যত্নবান হোন। কোন ভাবেই যেন সময় নষ্ট না হয়। জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে 'দ্বীনের চাহিদা' অনুযায়ী কোন খেদমতে ব্যয় করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন,إضاعةالوقت من علامةالمقت সময় নষ্ট করা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হওয়ার লক্ষণ।

৬. নিজের ব্যাপারে কখনোই ভাববেন না যে, আমি এখন ফারেগ (অবসর) হয়েগেছি। এখন আর আমার ইলম অর্জন করার এবং দ্বীনের ব্যাপারে আরো জানার কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে ধীরে ধীরে আপনি আসলেই ফারেগ (সব কিছু থেকে খালি) হয়ে যাবেন।

৭. কোন এক নামাযের পর মুসল্লিদেরকে নিয়মিত কিছু কিছু জরুরী মাসআলা-মাসায়েল শোনান। এটা ঈমান ও তাওহীদ থেকে শুরু করতে পারেন। ওযু-গোসলের মাসআলা কম-বেশি সবাই জানে।

৮. সপ্তাহে একদিন তাফসীর করতে পারেন। সম্ভব হলে আরেক দিন হাদিসের দরস দিতে পারেন। তাফসীরের জন্য অন্তত মাআরিফুল কুরআন, ইবনেকাসীর, তাওযীহুলকুরআন, তাফসীরে সূরা তওবাহ ও তাফসীরে উসমানী দেখতে পারেন। দরসে হাদিসের জন্য অন্তত রিয়াযুস সালিহীন ও মাআরিফুল হাদীস দেখতে পারেন।

৯. দ্বীন সব মুসলমানের কাছেই দামী। তাই নিজ থেকে এ দামী জিনিসটা যত দিবেন ততই মানুষ আপনার দ্বারা উপকৃত হবে। আর এর ফলে তারা আপনাকে আন্তরিক ভাবে মহব্বত করবে।

১০.'হক কথা বলব' এ সিদ্ধান্তটা প্রথমে নিন। এরপর কী ভাবে বলবেন? তা ভাবুন। 'হক কথা না বলা' কিতমানে ইলম-ইলম গোপন করা, এটি লানতযোগ্য অপরারধ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ

'নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও অভিসম্পাত।' (সূরা বাকারা:১৫৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'নিশ্চয়ই যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না

তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।' (সূরা বাকারা:১৭৪)

১২. দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সবধরনের কথা আপনার শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেয়া আপনার দ্বীনী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে এরাই একদিন আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ

'স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব (ও তারইলম) দেয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে যখন আল্লাহ এমর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা তা মানুষের সামনে বর্ণনা করবে, গোপনকরবে না।' সূরা আলে ইমরান-১৮৭

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা (সম্পূর্ণরূপে) পৌঁছেদিন। (কোন কিছুই গোপন করবেন না) যদি আপনি এরূপ (সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়ার কাজটি) না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। (কারণ, কিছু গোপন করা সবগোপন করার মতোই)। তাফসীরে জালালাইন সূরামায়িদাহ -৬৭

১৩. মানুষের ভয় যেন আল্লাহর ভয়ের উপর প্রাধান্য না পায়।

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির চিন্তা ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশে লেগে থাকে আল্লাহ তাআলা মানুষের (অসন্তুষ্টির) ক্ষতি থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির চিন্তা ছেড়ে মানুষের সন্তুষ্টির তালাশে লেগে থাকে আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের কাছেই ছেড়েদেন। -জামেতিরমিযী

عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه ، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ، ومن

أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه . "

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে যাদেরকে খুশি করে ছিল তাদেরকেও তার উপর অসন্তুষ্ট করেদেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশি করার জন্য মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে যাদেরকে অসন্তুষ্ট করে ছিল তাদেরকেও তার উপর সন্তুষ্ট করেদেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে তাকে এবং তার কথা ও কাজকে অতিসুন্দর করেদেন। - মু'জামে তাবারানী হাদীস নং-১১৬৯৬

১৪. 'যাহা বলিব সত্যবলিব তবে সব সত্য বলিব না' এ নীতি গ্রহণ করা কোন নায়েবে রাসূলের কাজ হতে পারে না। আলেমরাও যদি সত্য বিষয়টি উম্মতের সামনে প্রকাশ না করেন, তাহলে আর করবে কারা? এ দায়িত্বটা তাহলে পালন করবে কে? (আল্লাহ না করুন) আমাদের অবস্থা যদি 'ইহুদী পন্ডিত' দের মতো হয়ে যায় তাহলে পরিণতিও কিন্তু তাদেরই মত হবে। আল্লাহর নিয়ম সবার ক্ষেত্রে একই।

১৫. আল্লাহর দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার জযবা-প্রেরণা যদি আপনার মধ্যেই না থাকে, তাহলে আপনার কথা শুনে অন্যদের মধ্যে দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা কী ভাবে তৈরি হবে? তাই নিজে আগে দ্বীনের জন্য ত্যাগ শিকারের নিজের মধ্যে লালন করতে শুরু করুন।

১৬. জুমআর বয়ানকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উন্মুক্ত দরস মনে করবেন। অতএব, এর জন্য খুবভালভাবে প্রস্তুতি নিবেন। এখানে আপনার শ্রোতাদের অধিকাংশই সাধারণ মুসলমান। তাদের কাছে তাদের বুঝের অনুকূল করে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সবকথা আপনাকেই পৌঁছাতে হবে। কারণ, তাদের অধিকাংশের কাছে দ্বীনের সঠিক কথা পৌঁছার বিশুদ্ধ মাধ্যম একদমই সীমিত।

আর আপনি হলেন তাদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর প্রধান মাধ্যম। অতএব, আপনার দায়িত্বটা কত বড় তা একটু উপলব্ধি করুন।

১৭. আলোচনা গতানুগতিক বা দায়সাড়া গোছের না হয়ে বিষয় ভিত্তিক ও ধারাবাহিক হলে ভাল। ঈমান-তাওহীদ ও শিরক-বিদআত থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে জীবনের সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। বিশেষভাবে ঈমান ও তাওহীদের পরিচয়, ঈমান ভংগের কারণ, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শিরক-কুফর ও বিদআতের পরিচয় এবং তা থেকে বাঁচার উপায়, কেয়ামতের আলামত এবং শেষ যমানার বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যতবাণী ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

১৮. কুরআন শরীফ বা হাদিসের কোন কিতাব সামনে নিয়ে কথা বলার পরিবেশ বানানোর চেষ্টা করুন। কারণ, কুরআন শরীফ বা হাদিসের কোন কিতাব সামনে নিয়ে দ্বীনের এমন অনেক বিষয় নিয়ে খুব সহজেই আলোচনা করতে পারবেন, যা এভাবে না হলে তুলনামূলক একটু কঠিন হবে।

১৯. সব সময় আল্লাহর কাছে 'সৎ' থাকার চেষ্টা করুন। আল্লাহ যেন আপনাকে 'ভাল' জানেন।

২০. সর্বদা এস্তেগনা-অমুখাপেক্ষীতার সাথে থাকার চেষ্টা করুন। কেউ যেন কখনোই মনে করতে না পারে যে, আপনি তার কাছে কিছু আশা করেন।

২১. একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কখনোই কারো নিকট থেকে কোন কিছুর আশা করবেন না।

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَايُحِبّكَ اللهُ، وَازْهَدْفِيمَاعِنْدَالنَّاسِ يُحِبّكَ النَّاس.

তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে 'যুহ্‌দ' অবলম্বন কর, তাহলেআল্লাহর কাছে প্রিয় হবে এবং মানুষের কাছে যা আছে (টাকা-পয়সা, ইজ্জত-সম্মান)এর ব্যাপারে যুহ্‌দ অবলম্বন কর, তাহলে মানুষের কাছে প্রিয় হবে।

২২. কমিটির কাউকে কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্মান দেখাবেন না। এতে সাধারণ মুসল্লিরা আপনাকে চাটুকার ভাববে।

২৩. কখনও কারও বাসায় দাওয়াত খেতে যাবেন না। এতে আপনি দ্বীন-দুনিয়া উভয় দিক দিয়ে লাভবান হবেন। এতে একেতো মুসল্লিদের অন্তরে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা বাড়বে। পাশাপাশি অনাকাঙ্খিত অনেক কিছু থেকে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন। যেমন, উপার্জন হারাম এমন কারো বাসায় আপনাকে কখনও বাধ্য হয়ে যেতে হবে না। হ্যাঁ, প্রকৃত পক্ষে দ্বীনদার, আপনাকে মন থেকে মহব্বত করে এমন কেউ খুববেশি পিড়াপিড়ি করলে খাবার রুমে পাঠিয়ে দিতে বলবেন। দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কখনও কারও বাসায় যাবেন না। এতেই সবার অন্তরে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা অক্ষুন্ন থাকবে। অন্যকোন উদ্দেশ্যে যেমন, রুগী দেখা, বয়ান ইত্যাদির জন্য-যেতে পারেন। সাধারণ মুসল্লীদের কেউ খুব বেশি পিড়াপিড়ি করলে খাবার পাঠিয়ে দিতে বলবেন। এরপর ইচ্ছে হলে খাবেন, নাহলে অন্য কাউকে দিয়ে দিবেন।

২৪. আপনাকে হাদিয়া হিসেবে যা দেয়া হবে তাকে প্রকৃত অর্থেই ‘হাদিয়া’ মনে করুন; পারিশ্রমিক মনে করবেন না। এর কমবেশি সম্পর্কে নিজ থেকে কখনো কোনো কিছু বলবেন না। এটা কখনোই আপনার খেদমতের বিনিময় হতে পারে না। আপনি যে খেদমত করছেন, তার বিনিময় কি এতই কম যে, তা মানুষ দিতে সক্ষম! আপনার কাজের বিনিময় তো মহান আল্লাহ দিবেন।

২৫. কোন ধরনের বিদআত ও খেলাফে সুন্নত কাজে কিছুতেই জড়াবেন না। প্রথম থেকেই কৌশলে এসব থেকে দূরে থাকুন। প্রথমদিকে এসবে জড়িয়ে গেলে পরে যখন বলবেন তখন মানুষ বলবে, এত দিনতো আপনিও এসব করেছেন। এখন কেন নিষেধ করছেন? এসব বিদআত হলে এত দিন আপনার এসব হাদিস কোথায় ছিল?

২৬. মোনাজাত সবসময় নিঃশব্দে করুন। এতে আপনি অনেক ফেতনা থেকে বেঁচে থাকতে পারবেন। ধীরেধীরে বুঝিয়ে এপর্যায়ে নিয়ে যাবেন, যেন কখনো কখনো মোনাজাত ছেড়েও দিতে পারেন।

২৭. নিজের ব্যক্তিগত আমলের প্রতি খুবই যত্নবান হোন। সকাল-সন্ধ্যার আযকার, মাসনূন দুআ এবং অর্থ বুঝে উপদেশ গ্রহনের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন

নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করুন। নিয়মিত কোনো হাদীসের কিতাব, সাহাবায়ে কেরামের জিবনী এবং সালাফুস সালেহীনের জীবন চরিত অধ্যায়ন করুন।

২৮. সব সময় এক মাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। তিনি যখন আপনাকে এ মসজিদের খেদমতে নিয়োজিত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার পর অন্য যেকোনো মসজিদে অবশ্যই আপনি নিয়োজিত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তাই আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আপোস করার চিন্তা কখনোই করবেন না।

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍقَدْرًا.

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করেদেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিকদেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।' সূরা তালাক: ২,৩

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করেদেন।' সূরা তালাক : ৪

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে বিরাট পুরস্কার দেন।' সূরা তালাক : ৫

আল্লাহতা আলা আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ক্ষতবিক্ষত উম্মাহ: প্রতিবছর হজ্জ ও উমরাহ

আমাদের সমাজে হজ্জ ও উমরাকারীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এমন অনেক মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে যারা বছরে ৪/৫বারও উমরা সফরে যায়। প্রতিবছর অন্তত একবার উমরা করে এমন মুসলিমের সংখ্যার তো কোনো কমতি নেই। প্রতিবছর কিংবা একবছর পরপর নফল হজ্জে যায় এমন হাজীদের সংখ্যাও অনেক। আসলে নফল হজ্জ ও উমরাহ নেক আমলসমূহের মধ্য থেকে একটি নেক আমল। করলে সাওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই।

ভাবনার বিষয় হল, জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার যমানায়, লাখ লাখ টাকা খরচ করে প্রতিবছর নফল হজ্জ বা উমরায় যাওয়ার সুযোগ শরীয়তে আছে কিনা এটা একটু খতিয়ে দেখা উচিত। আমাদের বড়দের উচিত এ বিষয়ে একটু চিন্তা-ফিকির করে, শরয়ী দলীলের আলোকে উম্মাহকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

তবে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান বলে, আরাকান, কাশ্মীর, আফগান, সিরিয়া, ফিলিস্তীনে যখন উম্মাহর সদস্যরা অনাহারে, অর্ধাহারে দিনগুজরান করছে, এসব এলাকায় যখন প্রতিদিন উম্মাহর শত শত অবলা, অসহায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হচ্ছে। জালেম কাফেরদের হাজারটনি বোমা যখন উম্মাহর ঘর-বাড়িগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত করছে, অর্থের অভাবে যখন মুজাহিদ বাহিনী নিজেদের করণীয়গুলো সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন জিহাদ বিল মালের ফরয আদায় বাদ দিয়ে শুধু আবেগের টানে হজ্জ ও উমরা সফর কোনো ক্রমেই বৈধ হতে পারে না। সালাফগণ জিহাদ ফরযে আইন হওয়া অবস্থায় ফরয হজ্জের সফরকেও পিছিয়ে দিতে বলেছেন। জিহাদের ফরয আদায়ের পর হজ্জ করতে বলেছেন। কারণ, হজ্জ দ্বারা ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিল হয়। কিন্তু জিহাদ দ্বারা উম্মাহর সামগ্রিক উপকার হাসিল হয়। তাই সালাফগণ জিহাদকে ফরয হজ্জের উপরও অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন। সেখানে জিহাদ ফরযে আইনের যমানায় নফল হজ্জ ও উমরার কথা বলাই বাহুল্য।

ভুলে গেলে চলেবে না যে, অর্থশীলদের জন্য অর্থ দ্বারা জিহাদে শরীক হওয়া ফরযে আইন। জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন দৈনন্দিন প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া পরিমাণ অর্থকড়ি রেখে বাকি সমস্ত অর্থ জিহাদের ফাণ্ডে দান করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময়ে যদি কেউ নিজের ও নিজের অর্থ-কড়ির উপর অর্পিত শরয়ী দায়িত্ব আদায় না করে খাহেশাতে নফস বাস্তবায়নের জন্য নফল হজ্জ বা উমরায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে, তাহলে এটা শরীয়ত ও আকল কোনো বিবেচনায়-ই বৈধ হওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। শরীয়তের ইবাদাত ও হুকুম-আহকামের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস রয়েছে। যথা: ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, মুস্তাহাব, নফল এই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলো পালনীয়।

অতএব, যেমনিভাবে কোনো মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের উপর প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ নেই, তেমনিভাবে ফরযের উপর নফলকে প্রাধান্য দেওয়ার সুযোগ নেই। 'সুযোগ নেই' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কেউ যদি ফরয বা ওয়াজিব বাদ দিয়ে মুস্তাহাব বা নফলে লিপ্ত হয়, তাহলে তার ঐ নফল ও মুস্তাহাব আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফরয-ওয়াজিব ত্যাগ করার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব বা নফলের বাহানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। ধরুন, কেউ একজন মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ৫০ রাকাত নফল নামায পড়ল। নফলের মধ্যে সে এতই স্বাদ ও মজা অনুভব করতে লাগল যে, নফল পড়তে পড়তে ফরয কাযা হয়ে গেল। মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেল। এই লোকটি যে, ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদাত করল, তার এই নফল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এই নফলের কথা বলে সে ফরয পরিত্যাগের গুনাহ থেকে মুক্তিও পাবে না। তাই যারা প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচ করে নফল হজ্জ ও উমরা করছেন, তারা একটু ভেবে দেখুন, যেই রবকে খুশি করার জন্য আপনি এত-এত টাকা খরচ করছেন, সেই রব যদি এই অর্থ ব্যয়ে আপনার প্রতি খুশি না হন, তাহলে আপনি এটা করবেন কেন? রবকে খুশি করাই যদি মাকসাদ হয়, তাহলে যে পথে টাকা খরচ করলে রবের ফরয হুকুমও আদায় হবে রবও খুশি হবেন সেই পথে কেন অর্থ-কড়ি খরচ করবেন না?! আল্লাহ

তাআলা আমাদেরকে শরীয়তের হুকুম-আহকামসমূহের পর্যায়ক্রমিক অবস্থান বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না

তিনি শায়েখ আবরারুল হক রহি. এর খলীফা, দাওয়াতুল হকের শীর্ষস্থানীয় একজন মুরুব্বী, ঢাকার বহু আলোচিত-সমালোচিত একটি মাদরাসার প্রধান মুফতী কাম শাইখুল হাদীস, ওয়াহাতী তাবলীগে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালনকারী একজন মুহাক্কিক আলেম, চলমান রাজনীতি ও সরকারী লোকজন থেকে দূরে অবস্থানকারী একজন নির্ভরযোগ্য আলেমে দ্বীন, হাজারো উলামা, তলাবা ও সাধারণ মানুষের দ্বীনী রাহবার। এমন একজন বড় ব্যক্তি মাদরাসার উস্তাদদের সাপ্তাহিক মশওয়ারা মজলিসে তাবলীগ, দাওয়াতুল ইসলাম এবং জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গে বললেন, " **জিহাদতো শরীয়তে আছে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না।**"

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত। আল্লাহ তাআলা জিহাদকে ফরয করে দিয়েছেন। ঈমানের পরেই নবীজী সা. জিহাদকে শ্রেষ্ঠ আমল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। নবীজী সা. জিহাদকে ইসলামের শীর্ষচূড়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। জিহাদের উপর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, আমর বিল মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার, দ্বীনের প্রচার-প্রসার, হুদুদ, কিসাস বাস্তবায়নসহ মুসলিম উম্মাহর সমস্ত কল্যাণ নির্ভর করে। নবীজী সা. এর হাদীসের ভাণ্ডারে নামাযের পরই সবচেয়ে বেশি হাদীস জিহাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনুল কারীমের মধ্যে ফরয ইবাদাতের মধ্য থেকে জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনাই সবচেয়ে বেশি করেছেন। জিহাদের আলোচনা যে পরিমাণ করেছেন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের আলোচনা সে পরিমাণ করেননি। জিহাদ এমনই গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদাত, জিহাদের প্রয়োজনে নামাযকে তার ওয়াক্ত থেকে পিছিয়ে দেয়ার তথা কাযা করার অনুমতি আছে। জিহাদের প্রয়োজনে ফরয রোযা না রাখার এবং ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। জিহাদ ফরযে আইন হলে ফরয হজ্জও পিছিয়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কোথাও কিছু লোক যদি অনাহারে না খেয়ে মরার উপক্রম হয়, আর অপরদিকে মুজাহিদ ভাইদের অর্থকড়ির প্রয়োজন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে অনাহারীদেরকে না দিয়ে সাদাকা ও যাকাতের সমস্ত মাল মুজাহিদ ভাইদেরকে দিয়ে দেওয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এই যখন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সা. এর কাছে জিহাদের অবস্থান সেক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মহব্বতের দাবিদার এবং

ওয়ারাসাতে আম্বিয়ার পদবীধারী ব্যক্তি কীভাবে এ কথা বলতে পারে যে, 'আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না।'

কেউ যদি একথা বলে যে, আমাদের মাদরাসায় নামায চলবে না, কিংবা এ কথা বলল যে, আমাদের মাদরাসায় রোযা চলবে না- সেক্ষেত্রে কি তার ঈমান থাকবে? কস্মিন কালেও নয়। শরীয়তের ছোট থেকে ছোট একটা হুকুমকেও যদি কেউ অপছন্দ/ঘৃণা করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যায়। যেমন কেউ যদি মেছওয়াকের সুন্নাহ কে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে তাহলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। এই যখন অবস্থা তখন জিহাদের মত এত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাতকে যদি কেউ আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে-অপছন্দ করে, তাহলে তার ঈমানের কী দশা হবে তাকি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

জিহাদ একটি ফরয ইবাদাত। এটি সব সময়ই ফরয থাকে। কখনো ফরযে কেফায় হয়। আবার পরিস্থিতির কারণে কখনো ফরযে আইন হয়ে যায়। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশীদের উপরও যে জিহাদ ফরযে আইন আশাকরি পাঠক তা ইতিমধ্যে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। এই অবস্থায় 'আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না।' বলা আর 'আমাদের মাদরাসায় নামায চলবে না', 'রোযা চলবে না' বলার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? যদি কেউ আমাদের মাদরাসায় নামায চলবে না, রোযা চলবে না বলার কারণে বে-ঈমান হয়ে যায়, কাফের মুরতাদে পরিণত হয়, তাহলে 'আমাদের মাদরাসায় জিহাদ চলবে না' বলার কারণে তার ঈমানের কী হালত হবে তা পাঠকই বলুন।

সেই যুগের মুনাফেকদেরকে আল্লাহ তাআলা মুনাফেক সাব্যস্ত করেছেন মূলত জিহাদকে কেন্দ্র করেই। মদীনার মুনাফেকদের ব্যাপারে কুরআনে কারীমের সূরা তাওবা, আহযাব, মুনাফিকূনসহ বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জিহাদকে অপছন্দ করে, জিহাদকে ঘৃণা করে, জিহাদে বেরহওয়াকে কষ্টকর মনে করে, বিভিন্ন বাহানায় জিহাদ থেকে বেঁচে থাকতে চায়, জিহাদের পথে অর্থকড়ি খরচ করতে চায় না ইত্যাদি ইত্যাদি-এসব কারণে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদেরকে মুনাফিক সাব্যস্ত করলেন এবং তাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিলেন, 'নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে (চিরকাল) অবস্থান করবে' (নিসা:১৪৫)। সেই যুগে জিহাদকে অপছন্দ করা এবং ঘৃণা করার পরিণাম ও পরিণতি যদি চিরকালের জাহান্নাম হয়ে থাকে, তাহলে জিহাদ ফরযে আইনের এই যুগে জিহাদকে অপছন্দ করা, ঘৃণা করা এবং মাদরাসায়

জিহাদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরিণাম ও পরিণতি কি ভিন্ন কিছু হবে? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করেন।

ইবনুল কাইয়্যিম রহি. এই ক্যাটাগরির আবেদ, যাহেদ এবং নামসর্বস্ব ওরাসাতুল আম্বিয়াদের সম্পর্কে খুব উত্তম কথা বলেছেন। আমরা তার বক্তব্য হুবাহু উল্লেখ করা উপযোগী মনে করছি। হয়তো পাঠকগণ এরদ্বারা উপকৃত হবেন।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ই'লামুল মুআক্কিয়ীনে বলেন:

وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا؛ فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي؛ فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من ثلاثين وجها ذكرها شيخنا - رحمه الله - في بعض تصانيفه؛ ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبما كان عليه هو وأصحابه رأي أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان، وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ ، وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم - قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب؛ فإنه القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل.

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا «أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وكذا، فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ فقال: به فابدأ؛ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. «

....

وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد «أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا» ؟. اهـ اعلام الموقعين 2\120-121

"ইবলিস অধিকাংশ মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে যে- নির্দিষ্ট কিছু যিকির, তিলাওয়াত, নামায, রোযা, যুহদ ও দুনিয়াত্যাগের মতো আমলসমূকে তাদের সামনে সুসজ্জিত করে দেখিয়েছে। আর তারা (আমর বিল মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার, জিহাদ ও দ্বীনর পথের কষ্টসাধ্য) এসব আমল পরিত্যাগ করেছে। বাস্তবে নবীগণের প্রকৃত উত্তরসুরিদের দৃষ্টিতে এরাই সবচেয়ে কম দ্বীনদার শ্রেণীর লোক। কেননা দ্বীন তো হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর আদেশ পালন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আবশ্যকীয় হকগুলো আদায় করে না, সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা আদেশ পালন না করা ত্রিশ দিক দিয়ে নাফরমানী করার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। আমাদের শায়েখ (ইবনে তাইমিয়া) রহ. তার এক কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যে দ্বীন পালন করে গেছেন, সে সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞতা রাখেন, তারা দেখতে পান, দ্বীনদ্বার বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকাংশই (এখন) সবচেয়ে কম দ্বীনদ্বার শ্রেণীর লোক। আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ বস্তুগুলো পদদলিত হতে দেখেও, আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা লঙ্ঘিত হতে দেখেও, আল্লাহর দ্বীন পরিত্যক্ত হতে দেখেও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর প্রতি বিমুখতা দেখেও যার অন্তর প্রশান্ত, যবান নিশ্চুপ- তার মধ্যে আবার কিসের দ্বীনদ্বারি? কিসের কল্যাণ? সে তো বোবা শায়তান, যেমন বাতিল বলনেওয়ালা সবাক শয়তান। দ্বীনের ধ্বংস তো এদের কারণেই হচ্ছে; উদরপূর্তির ব্যবস্থা আর গদি ঠিক থাকলে দ্বীনের কি হল না হল সে নিয়ে যাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাদের মধ্যে যাদের দ্বীনদারি সবচেয়ে ভালো, তাদের অবস্থা হল: একটু চিন্তিত হয় আর হালকা সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি এদের সম্মান ও সম্পদে কোন আঘাত লাগে, তাহলে রেগে আগুন হয়ে যায়। সর্বসামর্থ্য দিয়ে নাহি আনিল মুনকারের (???) তিনো স্তর (হাত, যবান ও অন্তর) প্রয়োগ করে।

এরা যে শুধু আল্লাহর (রহমতের) দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছন তা-ই নয়, বরং নিজেদের অজান্তেই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মুসিবতের শিকার হয়েছে। আর তাহলো- অন্তরের মৃত্যু। কেননা অন্তর যতটা প্রাণবন্ত হয় আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য তার ক্রোধ তত বেশি হয়; দ্বীনের জন্য তত বেশি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়।

ইমাম আহমদ রহ. সহ আরো অনেকে একটি আছার উল্লেখ করেছেন: আল্লাহ তায়ালা এক ফেরেশতাকে আদেশ দিলেন, অমুক অমুক জনপদ ধ্বসিয়ে দাও। ফেরেশতা আরজ করল, হে রব! কিভাবে ধ্বংস করবো, সেখানে তো অমুক ইবাদতগুজার বান্দা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব দেন, তাকে দিয়েই শুরু করো। (অন্যায় কাজ দেখেও) আমার জন্য কোন এক দিনও তার চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখা দেয়নি।

আবু উমার (ইবনে আব্দুল বার) রহ. 'তামহিদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আল্লাহ তায়ালা এক নবীর নিকট ওহী পাঠান, তুমি অমুক যাহেদকে বলো, দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা তুমি দুনিয়াতে অগ্রিম প্রশান্তি বেছে নিয়েছো। আমার ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার দ্বারা তুমি সম্মান লাভ করেছো। কিন্তু তোমার উপর আমার যে হক রয়েছে, তার জন্য তুমি কি করেছো? যাহেদ আরজ করল, হে রব! আমার উপর আপনার কোন্ হক পাওনা আছে? আল্লাহ তায়ালা জওয়াব দিলেন, আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন বন্ধুকে তুমি মহব্বত করেছো? কিংবা আমার সন্তুষ্টির জন্য কি কোন শত্রুর সাথে শত্রুতা করেছো?"- ই'লামুল মুআক্কিয়ীন ২/১২০-১২১

প্রিয় পাঠক! বর্তমান বাংলাদেশে দ্বীনদার বলে সমাজে যারা প্রসিদ্ধ তাদের অধিকাংশের অবস্থাই কিন্তু ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বিবৃতির সাথে মিলে যায়। আমি এখানে মাত্র একজন বড় ব্যক্তির হালত তুলে ধরলাম। অনুসন্ধানি দৃষ্টি দিলে এরকম আরো অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে। এদের ভক্ত ও মুরীদ হাজারো আলেম-উলামার অবস্থাও কিন্তু এমনই। মিষ্টার ফরীদ উদ্দীন মাসুদকে এই জন্য ধন্যবাদ দেই যে, সে তার জিহাদ বিরোধী অবস্থান গোপন করেনি, উম্মতকে দ্বিধাদন্ধে ফেলেনি। সে নিজের ভিতরের বিষকে প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু দ্বীনের রাহবার দাবিদারদের মধ্যে আজ হাজারো 'গোপন ফরীদ' জন্ম নিয়েছে। এই 'গোপন ফরীদদের' দ্বারা উম্মত বেশী গোমরাহ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা উম্মতকে হেফাজত করেন। আমীন।

আল্লাহর হুকুম জিহাদ-কিতাল বর্তমানে ঈমান যাচাঁইয়ের কষ্টিপাথর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি জিহাদ-কিতাল দ্বারাই এখন মুমিনদের ঈমান পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। কে খাঁটি ঈমানদার আর কে নির্ভেজাল মুনাফিক আপনি জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা দ্বারাই তা পরিস্কারভাবে বুঝে নিতে পারবেন। জিহাদের মাসআলায় আজ পুরো পৃথিবীর মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েপড়েছে। তালেবান-আলকায়েদাসহ অন্যান্য হকপন্থী জিহাদী দলগুলোর সাথে জড়িত, সম্পৃক্ত ও তাদেরকে যারা ভালবাসে পৃথিবীময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন মুষ্টিমেয় কিছু লোক জঙ্গী-সন্ত্রাসীহ নানাধরনের অপবাদ উপেক্ষা করে আল্লাহর হুকুম জিহাদকে ধরে রেখেছে। জিহাদের জন্য নিজের সবকিছু কুরবান করে দিচ্ছে। অপর দিকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানসহ পৃথিবীর সমগ্র কাফের জনগোষ্ঠীর সাথে সাথে মুসলিমদের সমস্ত দল-উপদলও জিহাদ ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে জিহাদকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সালাফী, আহলে হাদীস, মাযহাবী, লা-মাযহাবী, হক্কানী পীরের মুরীদ, ভণ্ড পীরের ভক্ত, মারেফতী, বাতেনী, শিয়া, রেজভী, বেরেলবী, কাদিয়ানী, জামাতী, মিলাদী, কিয়ামী, তাবলীগী, কওমী-দেওবন্দী নির্বিশেষে সব ঘরনার নামধারী মুসলিমগণ জিহাদকে রহিত ও অকার্যকর করার ক্ষেত্রে আজ কাফেরদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছে। কেমন যেন এখন জিহাদই কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই শ্রেণির দ্বীনের রাহবার(?)দের সামনে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলো পাঠ করলেই আপনি তাদের চেহারায় ঘৃণা, অপছন্দ ও বিরক্তির স্পষ্ট আলামত ভেসে উঠতে দেখবেন। অন্তরের নেফাকের কারণে শতচেষ্টা সত্ত্বেও তারা বিরক্তি ও অপছন্দের আলামত লুকাতে পারবে না। সে গোস্বায় লাল হয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে আপনাকে হয়তো থামিয়ে দিবে, কিংবা ঘার ধাক্কা দিয়ে আপনাকে কামরা থেকে বের করে দিবে। তাদের কেউ কেউ তো আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্রকেই জিহাদের চাদর পরিয়ে দিয়েছে। আর কেউ কেউ তথাকথিত 'দাওয়াত ও তাবলীগ' কেই জিহাদ মনে করে প্রকৃত জিহাদ থেকে বাঁচার পাঁয়তারা করছে। আবার কেউ অঘোষিতভাবে মাদরাসায় জিহাদকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে, আর কেউ ঘোষণা দিয়েই নিষিদ্ধ করেছে।

এই যখন উম্মতের রাহবার এবং প্রসিদ্ধ দ্বীনদার (?) শ্রেণির অবস্থা তখন আপনাকে সতর্ক না থেকে কোনো উপায় নেই। এজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের অনুকরণ, অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকুন। নিজের দ্বীন ও ঈমানকে হেফাজত করুন। তাওহীদ, শিরক, তাগুত, তাগুতবর্জন নিয়ে কথা বলে এবং জিহাদকে

ভালবাসে, জিহাদ ও কিতালের ফযীলত বর্ণনা করে, মানুষকে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করে আর সাধ্যানুযায়ী নিজেও জিহাদের ফরীযা আদায়ে চেষ্টা করে এমন আলেমদেরকে খুঁজে বের করুন। তাদেরকে নিজের দ্বীনী রাহবাররূপে গ্রহণ করুন। তাদের সাথে লেগে থাকুন। অন্ধ অনুসরণ পরিত্যাগ করে দলীল ভিত্তিক ইলম অর্জনের চেষ্টা করুন। ফেতনার এই জমানায় কঠিনভাবে কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরুন। নবীজী সা. এর সীরাত অধ্যায়ন করুন। খুলাফায়ে রাশেদীনসহ অন্যান্য বড় বড় মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামের জীবনী অধ্যায়ন করে তাঁদের মত জীবন গড়ার চেষ্টা করুন। দেখবেন দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা আপনার পদচুম্বন করছে। যাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হল সেই তো সফলকাম হল। জাহান্নামের স্পর্শ থেকে বাঁচতে পারা আর জান্নাতে দাখেল হতে পারাইতো মুমিনের সফলতা । এরচেয়ে বড় সফলতা আর কিছুতেই নেই। হে আল্লাহ তুমি এই কিতাবের সংকলক ও পাঠকদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেও আর জান্নাতে দাখেল করিয়ে দেও।

বি.দ্র. ফরযে আইন জিহাদের হুকুম যদি কেউ শুধু অলসতা বশত ছেড়ে দেয় তাহলে সে কাফের হবে না, বরং ফাসেক হবে। কিন্তু যদি কেউ জিহাদকে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে তাহলে সে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে। সে যতবড় আল্লামা আর শাইখুল হাদীসই হোকনা কেন সেটা দেখার বিষয় নয়।

“ হে আল্লাহ! আমি যদি আমার হায়াতে ইমাম মাহদী আলাইহির রিযওয়ান এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পেয়ে যাই, তাহলে আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে তাঁদের দলভুক্ত ও অনুসারী হয়ে তোমার দ্বীন কায়েমের জন্য তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার তাওফীক দান কর” আমীন। আমার এই দুআয় যারা ‘আমীন’ বলবে তুমি তাদেরকেও কবুল করে নিও।

সমাপ্ত